এম. এ. পার্ট - ওয়ান

রাষ্ট্র বিজ্ঞান

প্রথম পত্র
দ্বিতীয় পত্র
তৃতীয় পত্র

প্রথম ও দ্বিতীয় অর্ধ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
ডাইরেকটরেট অব্ ডিস্ট্যান্স্ এডুকেশন
গোলাপবাগ ঃ বর্ধমান-৭১৩১০৪
পশ্চিমবঙ্গ

সম্পাদক

অধ্যাপক অনিলবরণ রায়
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১০

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান - ৭১৩ ১০৪
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
পুনর্মুদ্রণ : ২০১২

প্রকাশনা

ডাইরেক্টর, ডিসট্যান্স এডুকেশন
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

আর্থিক সহায়তা

ডিসট্যান্স এডুকেশন কাউন্সিল
নয়াদিল্লি, ভারত

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ

ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা - ৭০০ ০৫৬

সম্পাদকের নিবেদন
দ্বিতীয় পত্র প্রথম অর্ধ পর্যায় ওয়ান

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতিক্রমে ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নতুন স্নাতকোত্তর পাঠক্রম চালু হয়। নতুন পাঠক্রমের অন্তর্ভূক্ত বিষয়গুলিকে নতুনভাবে লেখানোর প্রয়োজন হয়। এই কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টরেট অফ্ ডিস্ট্যান্স এডুকেশন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত কলেজ এবং অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষ অধ্যাপকদের নিযুক্ত করেন। অধ্যাপকগণকে দায়িত্ব দেওয়া হয় এমনভাবে বিষয়গুলিকে পরিবেশন করতে যাতে তা সহজবোধ্য হয় এবং অন্য কারোর সাহায্য ছাড়াই ছাত্র-ছাত্রীরা তা অনুধাবন করতে পারেন।

বর্তমান পুস্তিকাটিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দ্বিতীয় পত্রের দ্বিতীয় অর্ধের অন্তর্ভূক্ত কয়েকটি বিষয় — উদারনীতিবাদ (Liberalism), নব উদারনীতিবাদ (Neo-Liberalism) এবং কর্তৃত্ব (Authority), স্বাধীনতা (Liberty), অধিকার (Right) ও ন্যায় (Justice), সম্পর্কে আর্নেষ্ট বার্কার, হ্যারোল্ড ল্যাস্কি, জন রলস্ প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতবাদ আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়গুলিকে যথাযথভাবে যুক্তিসহকারে ভাগ করে প্রাঞ্জল ভাষায় তা পরিবেশন করে এবং নমুনা প্রশ্নাবলী, অনুশীলনী ও প্রশ্নপঞ্জীর সাহায্যে পাঠ উপকরণকে পূর্ণাঙ্গ এবং সুবোধ্য করে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন পুস্তিকাটির লেখক অধ্যাপক সুশীল রঞ্জন রায়।

ধন্যবাদ জানাই আমার বিভাগীয় সহকর্মীদের এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টরেট অফ্ ডিস্ট্যান্স এডুকেশন-এর অধিকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ডঃ ষোড়শীমোহন দাঁ ও সহ-অধিকর্তা শ্রী নবকুমার ঘোষকে এবং সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক অমিত কুমার মল্লিক মহাশয়কে — যাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা, উদ্যোগ ও অনুপ্রেরণা ছাড়া এই কাজটি সাফল্যের সাথে করা সম্ভব হতো না। আশাকরি ছাত্র-ছাত্রীদের যথার্থ কাজে লাগবে এই পাঠ-উপকরণগুলি।

বর্ধমান
২৩শে আগষ্ট, ২০০৬

ডঃ অনিলবরণ রায়
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

দ্বিতীয় পত্র প্রথম অর্ধ পর্যায় - ১

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

অধ্যাপক সুশীল রঞ্জন রায়
অধ্যাপক অনিলবরণ রায়
প্রাক্তন রীডার,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান
বর্ধমান রাজ কলেজ, বর্ধমান

সূচীপত্র

পর্যায়-১

পাঠ একক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তায় 'উদারনৈতিক' চিন্তাধারার জনক রামমোহন	৩
২	বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ	১০
	বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্য-চিন্তা	১৫
৩	গান্ধী (Unit-I), (Unit-II)	২২
৪	নেহেরু ও তাঁর সমাজতন্ত্র	৩২
৫	মানবেন্দ্রনাথ ও নয়া মানবতাবাদ	৩৫
৬	যুক্তি, সভ্যতা এবং জাতীয়তাবাদ ঃ শ্রী অরবিন্দ	৩৯
৭	কৌটিল্যের রাষ্ট্রপরিচালন তত্ত্ব	৪৪
৮	স্বামী বিবেকানন্দ	৫৩
৯	Plato's Theory of the Ideal State	৬১
১০	Aristotle's Teleological theory of the State	৬৫
১১	Machiavelli : Power, Morality & Religion	৬৭
১২	পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার ধারা—জন লক	৬৯
১৩	Hobbes (হবস)	৭৪
১৪	Locke (লক)	৭৬
১৫	Rousseau (রুশো)	৭৮
১৬	Mill (মিল)	৮০
১৭	Hegel (হেগেল)	৮৩
	References	৮৬

সূচীপত্র

দ্বিতীয় পত্র প্রথম অর্ধ পর্যায় - ১

পাঠ একক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	উদারনীতিবাদ ও তার সংকট	৯১
২	নয়া-উদারনীতিবাদ ও তার বিভিন্ন দিক	১০৭
৩	এল. টি. হবহাউস ঃ (স্বাধীনতা তত্ত্ব)	১২৭
৪	সম্প্রদায়বাদিতা (কম্যুনিটারিয়াননিজম)	১৩০
৫	বহুসংস্কৃতিবাদ (মাল্টিকালচারালিজম)	১৩৩
৬	আর্নেষ্ট বার্কার (১৮৭৪-১৯৬২)	১৩৫
৭	হ্যারল্ড জে. ল্যাস্কি (১৮৯৩-১৯৫০)	১৫৪
৮	জন রলস্ ঃ ন্যায়ের তত্ত্ব	১৭৩

সূচীপত্র

পর্যায়-২

পাঠ একক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	রাষ্ট্র সংক্রান্ত মার্কসীয় তত্ত্ব	১৯৩
২	রাষ্ট্র প্রসঙ্গে লেনিনের বক্তব্য	১৯৮
৩	বিপ্লব প্রসঙ্গে লেনিনের বক্তব্য	২০১
৪	সাম্রাজ্যবাদ প্রসঙ্গে লেনিনের বক্তব্য	২০৫
৫	জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে স্তালিনের তত্ত্ব	২১০
৬	ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল	২১৫
৭	রোজা লুক্সেমবুর্গ	২১৯
৮	জর্জ লুকাস	২২৪
৯	জার্জেন হ্যাবারমাস	২২৯
১০	আনতোনিও গ্রামশি	২৩৪
১১	পৌরসমাজ সংক্রান্ত গ্রামশিয় ধারণা	২৪০
১২	মাওবাদ এবং নয়া গণতন্ত্র প্রসঙ্গ	২৪৪
১৩	মাওৎসে তুং এর সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ধারণা	২৪৮
১৪	মার্কসীয় পদ্ধতি সম্পর্কে আলথুসে	২৫২
১৫	Gramsci's Concept of Civil Society	২৬১
১৬	পাশ্চাত্যে মার্কসবাদের বিবর্তনের তিনটি ধারা ও তাদের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা	২৬৭

সূচীপত্র

তৃতীয় পত্র

পাঠ একক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আচরণবাদী আন্দোলন	২৮১
২	রাজনীতির ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্ব ঃ ডেভিড ইস্টন	২৮৬
৩	অ্যামন্ডের রাজনীতির কাঠামো-কার্যবাদী বিশ্লেষণ	২৯১
৪	কার্ল ডয়েশ্চর রাজনীতির যোগাযোগ সংক্রান্ত মডেল	২৯৯
৫	গোষ্ঠী কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী	৩০৫
৬	ভারত এবং পাকিস্তানে রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ রাজ্যের উত্তরাধিকারের (Legacy) প্রভাব	৩০৯
৭	ভারতে জনজাতি ভিত্তিক রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল	৩১৫
৮	ইসলামিক মতাদর্শ ও পাকিস্তানের উদ্ভব	৩২১
৯	পাকিস্তানের উদ্ভবে ইসলামের ভূমিকা	৩২৫
১০	পাকিস্তানের দাবি প্রসঙ্গে ইকবালের দৃষ্টিভঙ্গীর বিবর্তন	৩২৭
১১	পাকিস্তান প্রসঙ্গে কেমব্রিজ গোষ্ঠীর চিন্তাভাবনা	৩২৮
১২	স্বাধীনোত্তর পাকিস্তানে ইসলামের ভূমিকা	৩৩০
১৩	সিন্ধের জাতিগত সমস্যা ও মহাজির কোয়ামি মাহাজ (MQM) এর আন্দোলন	৩৩৮
১৪	বালুচ জাতিগোষ্ঠীয় আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ	৩৪৩
১৫	বাংলাদেশের জাতীয়তা সংক্রান্ত সমস্যা	৩৪৬
১৬	শ্রীলঙ্কার জাতিগত রাজনীতি	৩৪৯
১৭	শ্রীলঙ্কার JVP বিদ্রোহ	৩৫৬
১৮	SAARC চার্টারের দূর্বলতা	৩৬১
১৯	সার্ক সমস্যবলী ও ভবিষ্যৎ	৩৬৩
২০	দক্ষিণ এশিয়ার জাতিগত দ্বন্দ্ব	৩৭০

ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তায় 'উদারনৈতিক' চিন্তাধারার জনক রামমোহন

প্রথম পত্র ঃ প্রথমার্ধ

প্রথম পাঠ

First Paper

First Half

প্রথম পাঠ

ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তায় 'উদারনৈতিক' চিন্তাধারার জনক রামমোহন

ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জাতীয় জীবনের সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন রামমোহন রায়। মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে ধর্মীয় কুসংস্কার, অন্ধ আবেগ ও রক্ষণশীলতা থেকে মুক্ত করে বিশ্বজনীন মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তাঁর জীবনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। বস্তুতপক্ষে, গোঁড়া হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের ইউরোপে উদ্ভূত এক নতুন ভাবাদর্শ দ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন — সেই নতুন ভাবধারাটি 'উদারনৈতিক' ভাবধারা নামে পরিচিত ছিল। এই পশ্চিমী-উদ্ভূত উদারনৈতিক ভাবধারার প্রধান আদর্শ হল — ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধর্মীয় বন্ধন থেকে মুক্ত এক সমাজব্যবস্থা এবং সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ এক বিশ্বজনীন মানব আদর্শ। রামমোহন রায় এই পশ্চিমী নব উদারনৈতিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকেও 'উদারনৈতিক' চেতনায় প্রভাবিত করার জন্যে নিরলস প্রচেষ্টা করে গেছেন। তিনি ছিলেন আধুনিক ভারতবর্ষের উদারনৈতিক চিন্তাধারা বিকাশের একজন উল্লেখযোগ্য পথিকৃৎ।

ইউরোপে উদারনৈতিক চিন্তাধারার সূত্রপাত

মধ্যযুগের ইউরোপের দেশগুলি যখন ক্ষয়িষ্ণু ধারণার দ্বারা পরিচালিত হত, তখন ইউরোপের সমাজব্যবস্থায় রেনেসাঁ বা নবজাগরণের ভাবধারার এক জোয়ার সমগ্র ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থাকে গভীরভাবে আপ্লুত করে। মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছিল — রাজা বা শাসকের এবং খৃষ্টীয় চার্চের মধ্যে কর্তৃত্বের দ্বন্দ্ব অবিরত মানুষকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। এই অবস্থায় রেনেসাঁ বা নবজাগরণ মানুষকে যুক্তির আলোকে সমগ্র জগৎকে বিশ্বাস করার ও গ্রহণ করার পথ দেখায়। কোনরকম ধর্মীয় আবেগের বাইরে শাসকের নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বই চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। নবজাগরণের 'Spirit of enquiry' কে কাজে লাগিয়ে সূচিত হয় শিল্প-বিপ্লবের। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি এমনকি কৃষিব্যবস্থারও উন্নতি শুরু হয়। ইউরোপের দেশগুলি বিশেষত ইংল্যাণ্ড দেশের মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ করেও অতিরিক্ত দ্রব্যাদি অনুন্নত দেশে বিক্রি করে প্রচুর লাভ করতে লাগল। এই ব্যবসা ও প্রচুর মুনাফা লাভের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে এক নতুন শ্রেণী — যার অস্তিত্ব মধ্যযুগের সমাজব্যবস্থায় ছিল না। এই নতুন শ্রেণী — 'বুর্জোয়া' শ্রেণী নামে পরিচিত হতে শুরু করল। ক্রমশঃ বুর্জোয়া শ্রেণীরই প্রতিপত্তি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হল। এই নতুন বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য নতুন মতবাদ সৃষ্টি করে — যা পরবর্তীকালে 'উদারনৈতিক' চিন্তাধারা নামে পরিচিত হতে থাকে। ব্যক্তি স্বাধীনতার বিকাশ ও সীমিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাই ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের বুর্জোয়া শ্রেণীর আদর্শ। সদ্য আবির্ভূত বুর্জোয়া শ্রেণী মধ্যযুগের ইউরোপের নিপীড়িত মানুষকে স্বাধীন জীবনের ও সমৃদ্ধ সমাজের স্বপ্ন দেখায়।

ভারতে বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাব ও রামমোহনের উদারনৈতিক ভাবধারার বিকাশ ঃ

ভারতে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার সূত্রপাতের অব্যবহিত পরেই সেখানে ইউরোপের বুর্জোয়া শ্রেণীর অনুরূপ এক শ্রেণীর উত্থান ঘটে। সমকালীন ভারতের বুর্জোয়াদের অবশ্য তখনও শ্রেণী সচেতনতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি তবে ভারতের বুর্জোয়ারা মূলতঃ বাণিজ্য স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত প্রধানত নগরকেন্দ্রিক এক সংকীর্ণ গোষ্ঠী ছিল। সদ্য-আবির্ভূত ভারতীয় বুর্জোয়া ও তাদের 'উদারনৈতিক' ভাবধারার মাধ্যমে সমৃদ্ধশালী ও কুসংস্কারমুক্ত ভারত গঠনের স্বপ্ন ছিল রামমোহনের। তিনি নিজে কোন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রতত্ত্ব গঠন করেননি তবে ইউরোপের উদারনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা আপ্লুত রামমোহন আধুনিক ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্র, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা, পরধর্মসহিষ্ণুতা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উদারনৈতিক ভাবাদর্শের প্রতিষ্ঠা — প্রভৃতির ওপর গুরুত্বপূর্ণ ও সৃজনশীল দার্শনিক চিন্তাধারার অভিব্যক্তি পরিস্ফুট করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে, তিনি জন্মভূমি ভারতবর্ষের কল্যাণার্থে উদারনৈতিক আদর্শ গ্রহণের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন পশ্চিমী কয়েকজন রাষ্ট্রদার্শনিক ও ইউরোপের কয়েকটি ঘটনার মাধ্যমে।

দার্শনিক বেন্থাম ও মন্টেস্কু ঃ

বেন্থামের হিতবাদ দর্শন ঃ ১৮৩১ সালে জার্মান দার্শনিক বেন্থামের সাথে রামমোহনের পরিচয় হয়। বেন্থামের হিতবাদী দর্শন (Utilitarian Philosophy) রামমোহনকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। এই দর্শন অনুযায়ী মানুষের সুখ সম্প্রসারণ ও দুঃখ দূরীকরণের জন্য রাষ্ট্রের কার্যাবলী ও সিদ্ধান্তসমূহ বিচার করার প্রয়োজন আছে — এমনকি সীমিত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা রাষ্ট্রে বসবাসকারী মানুষের সুখ বৃদ্ধির জন্যে যদি প্রয়োজন হয়, তবে তাও মেনে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। বেন্থাম প্রকৃতপক্ষে সর্বতোভাবে ব্যক্তি-মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার ওপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

বেন্থামের হিতবাদী দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রামমোহন ভারতীয় সমাজ সংস্কার এবং নৈতিকতা ও আইনের মধ্যে পৃথকীকরণের জন্যে বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন।

মন্টেস্কুর ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ঃ অপরদিকে রামমোহনের ওপর ফরাসী দার্শনিক মন্টেস্কুর প্রভাব অনস্বীকার্য। মন্টেস্কু সরকারী কার্যাবলীর স্বতন্ত্রীকরণ অর্থাৎ প্রশাসনিক, আইনবিষয়ক ও বিচারবিভাগীয় ক্ষমতার পৃথক পৃথক কর্মক্ষমতার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। রাষ্ট্রের শাসন, আইন ও বিচারবিভাগীয় কর্মসূচী যদি পৃথক ও স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয় তবেই, মন্টেস্কুর মতে, জনগণের পক্ষে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করা সম্ভব। অর্থাৎ একক হস্তে শাসনবিভাগীয়, আইনবিভাগীয় ও বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা যদি কেন্দ্রীভূত হয় তবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার স্বৈরতান্ত্রিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং সেক্ষেত্রে জনগণের পক্ষেও স্বাধীনতার পূর্ণ স্বাদ আস্বাদন করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে মন্টেস্কু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণের সাথে সাথে Rule of Law বা আইনের অনুশাসনের নীতিকেও আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন।

রামমোহন উদারনৈতিক চিন্তাবিদ্ মন্টেস্কুর Separation of Powers বা ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ও Rule of Law বা আইনের অনুশাসনের নীতিকে গভীরভাবে অনুধাবনের প্রয়োজন আছে বলে মনে করতেন।

মন্টেস্কু ও বেন্থাম ছাড়াও আরও কয়েকজন পশ্চিমী সমাজবাদী চিন্তাবিদ— সাঁ সিমো, রবার্ট ওয়েন এবং শার্ল ফুরিয়ে প্রভৃতি চিন্তাবিদ্দের ধারণার সাহায্যেও রামমোহন রায় তাঁর উদারনৈতিক চিন্তাধারাকে আরও সমৃদ্ধ করেছিলেন। এছাড়া তাঁর উদারনৈতিক চিন্তাধারা গঠনের জন্য আরও দুজন উদারনৈতিক চিন্তাবিদের নাম উল্লেখের দাবি রাখে— তাঁরা হলেন ডেভিড হেয়ার এবং ডিরোজিও।

ফরাসী বিপ্লব ও শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে উদারনৈতিক ধারণার বিকাশ ঃ

পশ্চিমী দার্শনিকগণ ছাড়াও রামমোহন রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের দুটি বিপ্লবের দ্বারা তাঁর উদারনৈতিক চিন্তাধারাকে গঠন করেছিলেন।

(১) ফরাসী বিপ্লব (রাজনৈতিক বিপ্লব)

(২) শিল্প বিপ্লব (অর্থনৈতিক বিপ্লব)

ফরাসী বিপ্লব ঃ এই বিপ্লব ফ্রান্সে সংগঠিত হলেও সমগ্র মানবজাতির সভ্যতাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। স্বৈরতান্ত্রিক বুঁরবো রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করে ফরাসী বিপ্লব সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ দ্বারা সমগ্র বিশ্বের উদারনৈতিক ও প্রগতিশীল নেতাদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের চরম বঞ্চনা ঃ স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও সুবিধাভোগী অভিজাতদের তুলনায় বিদ্যা, বুদ্ধি ও অর্থসম্পদে বলীয়ান ফরাসী বুর্জোয়া ও দরিদ্র কৃষকরা Third Estate বা তৃতীয় শ্রেণী নামে পরিচিত ছিল। রাষ্ট্রীয় সকল সুযোগ সুবিধা কুক্ষিগত করে রেখেছিল প্রথম দুই শ্রেণী অর্থাৎ রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্র। মধ্যবিত্ত ও কৃষক সম্প্রদায় ও বুর্জোয়া সম্প্রদায় সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও সকল সুযোগ সুবিধা থেকে ছিল বঞ্চিত। অথচ শিক্ষা-দীক্ষা, বুদ্ধিমত্তা ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় প্রথম দুটি শ্রেণী অপেক্ষা যোগ্যতাসম্পন্ন হয়েও রাষ্ট্রে তাদের কোন মর্যাদা ছিল না। জাতীয় করের ৯০ শতাংশ এই মধ্যবিত্তদের বহন করতে হত। নিরুপায় হয়ে দরিদ্র কৃষকরা বছরের এক তৃতীয়াংশ সময়ে আলু খেয়ে জীবনধারণ করত। তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে শহরাঞ্চলের দরিদ্র কারিগর ও শ্রমজীবী সম্প্রদায়ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্বভাবতই সমাজজীবনের বৈষম্য দূর করার জন্য বুদ্ধি ও অর্থনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন বুর্জোয়ারা বিপ্লবে নেতৃত্ব দেয়। অথচ ফ্রান্সের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ইংল্যাণ্ড ও সুদূর আমেরিকাতেও ব্যক্তি স্বাধীনতা স্বীকৃত ছিল।

ফরাসী বুর্জোয়াদের নেতৃত্ব ঃ ফরাসী বুর্জোয়ারা অবশ্য বিপ্লব বা প্রতিবাদের আবেগপ্রবণ সমর্থন পেয়েছিলেন বিভিন্ন বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক যথা ভলতেয়র্, রুশো, মন্টেস্কু, ডিডেরো ও ফিজিওক্রাটদের লেখনীর মাধ্যমে। দার্শনিকরা ফরাসী স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের অন্যায়, ও অবিচারগুলিকে বিশ্লেষণ করে জনমানসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেন। এই দার্শনিকরাই স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণকে দণ্ডায়মান হতে শিখিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে দার্শনিকরাও মধ্যবিত্ত সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাই মধ্যবিত্ত সমাজের অভাব অভিযোগ তাঁদের রচনায় প্রতিফলিত হয়েছিল।

গৌরবময় বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের অনুপ্রেরণা ঃ এছাড়াও অবশ্য ফরাসী জনসাধারণ গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল ইংল্যাণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের দ্বারা। প্রজাতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিল ফরাসী জনসাধারণকে উভয় দেশের বিপ্লবই। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে প্রজাতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত করা ফরাসী জনসাধারণের পক্ষে বাস্তবে সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে।

ফরাসী বিপ্লবপ্রসূত জনগণতান্ত্রিক আদর্শ ও ফরাসী জনসাধারণের উদারনৈতিক মতবাদের উপর আস্থা রামমোহন রায়কে এককথায় আচ্ছন্ন করে তোলে। রামমোহনের এই বিশ্বাস জন্মায় যে ফ্রান্সে উদারনৈতিক মতবাদের প্রাধান্যের সদর্থক ও সহায়ক ফলশ্রুতি হিসাবে সে দেশের শিল্প, রাজনীতি ও রাষ্ট্রদর্শন বিশেষভাবে বিকশিত হয়েছে।

শিল্প-বিপ্লব ঃ ইংল্যাণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় হিসাবে বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাব এবং এই শ্রেণীর নেতৃত্বে ব্রিটিশ নাগরিকদের অবাধ স্বাধীনতার সুযোগ এবং বিশেষত ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সংস্কার আইন বা Reform Acts-এর মাধ্যমে ব্রিটিশ নাগরিকদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণের ব্যবস্থায় রামমোহন

মুগ্ধ হয়ে পড়েন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতেও ব্রিটেনের মত সাংবিধানিক বা সংসদীয় সরকার প্রবর্তন করলে এবং ব্রিটিশদের সঙ্গে ভারতীয়দের সংযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করলে ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটবে এবং ভারতবাসী আরও বেশি স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগের সুযোগ পাবে। সেই অর্থে শিল্প-বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে ইংল্যাণ্ডের উদারনৈতিক-সাংবিধানিক সরকারের ইতিবাচক ভূমিকা দ্বারা রামমোহন গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

জন লকের উদারনৈতিক ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত রামমোহন ঃ

সর্বোপরি, উদারনৈতিক মতবাদের প্রবক্তা জন লকের চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত রামমোহন রায় তাঁর উদারনৈতিক ভাবনাকে আরও বেশি শক্তিশালী করে গড়ে তুলেছিলেন।

সপ্তদশ শতকের ইংরাজ রাষ্ট্রচিন্তা একদিকে রাজনৈতিক স্বৈরতন্ত্র ও অন্যদিকে প্রজাতন্ত্রবাদের টানাপোড়েনে জর্জরিত, তখনই লকের উদারবাদ সমকালের আকাঙ্খা পূরণ করেছে। ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতিসূচক দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ ব্যক্তির স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের প্রতি প্রবল আস্থা এবং একই সঙ্গে ব্যক্তিকে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের অধীনে রাখার যে চিন্তা লকের দর্শনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা সমকালের আশা ও আকাঙ্খার প্রতিফলন। লকের উদারবাদ যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তা হলো—

(১) এই উদারবাদ ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী।

(২) তিনি যে স্বাধীনতার কথা বলেছেন তা মানুষের সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। লকের উদারবাদ যে মানুষকে উপস্থাপিত করে— তার সংযম আছে, সম্ভ্রমবোধ আছে, আছে নৈতিকতা ও মানবতাবোধ।

রামমোহনের উদারনৈতিক ভাবধারার বিভিন্ন দিক ঃ

প্রকৃতপক্ষে, পশ্চিমী উদারনৈতিক চিন্তাধারার গুণগ্রাহী ভক্ত রামমোহন মধ্যযুগীয় ভারতের জনজীবনে পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক চিন্তাধারার স্পর্শে উন্নত ভারতীয় সভ্যতা গঠনের প্রয়াসী হয়েছিলেন। ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে, পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ও সেই সঙ্গে তাঁর উদারনৈতিক চেতনাকে আরও অর্থবহ করে তোলার জন্য তিনি ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার কতকগুলি বিষয়ে সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। সেগুলি হল— শিক্ষাবিস্তার, ধর্মীয় বিষয়ে উদারনৈতিক আদর্শ, বিশ্বজনীন মানবতার আদর্শ, অর্থনৈতিক উদারনীতি, আইনের অনুশাসন, ব্যক্তি স্বাধীনতার ধারণা, সামাজিক ন্যায় প্রভৃতি।

(ক) শিক্ষাবিস্তার ঃ রামমোহন বুঝতে পেরেছিলেন ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতবর্ষের সংসদীয় উদারনৈতিক গণতন্ত্রের জন্য সদা সতর্ক সুশিক্ষিত জনগনের বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাই তিনি ভারতীয়দের মধ্যে সচেতনতা ও সহনশীলতা সৃষ্টি ও সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা বিস্তারের ওপর জোর দিয়েছিলেন। আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা, বিশেষত ইংরাজী ভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন বহু ভাষাবিদ, তবুও তিনি ইংরাজি সহ অন্যান্য পশ্চিমী ভাষা শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কারণ পশ্চিমী ভাষা বিশেষত ইংরাজির মাধ্যমেই যে উদারনৈতিক ধ্যান ধারণার সাথে ভারতীয়দের পরিচিত হওয়া সম্ভব তা তিনি নিজে উপলব্ধি করেছিলেন।

(খ) ধর্মীয় বিষয়ে উদারনৈতিক আদর্শ ঃ তাঁর মতে যে কোন ধর্ম স্বীকার ও অনুশীলনের অধিকার যে কোন নাগরিকের আছে। ধর্মীয় কারণে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ অভিপ্রেত নয়। ভারত ও ভারতবাসীর ঐক্য ও সংহতি এবং স্বাধীনতার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ধর্মীয় অনৈক্য ও সাম্প্রদায়িক সংঘাত। রামমোহনের মতানুসারে প্রত্যেকে স্ব স্ব ধর্মমত ও ধর্মপথ অনুসারে ঈশ্বরের আরাধনা করবে এবং ধর্মীয় কর্তব্য পালন করবে। কেউ এক্ষেত্রে অন্যের কাজে কোনরকম বাধা বিপত্তির সৃষ্টি করতে পারে না। তাঁর মতে ঈশ্বরের কাছে সকলেই

সমান এবং সকল ধর্মের মূল কথা অভিন্ন। তবে রামমোহন ব্যক্তিগতভাবে খৃষ্টধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন কারণ তিনি ধারণা করেছিলেন যে খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে উদারনৈতিক আদর্শ ও পরধর্মসহিষ্ণুতা অধিক পরিমাণে বর্তমান। তবে তিনি New Testament-এর অতিপ্রাকৃত বর্ণনা গ্রহণ করতে পারেন নি তাঁর যুক্তিবাদী মননশীলতার জন্য। তিনি বিভিন্ন আধ্যাত্মিক মতাদর্শের মৌলিক উপাদানসমূহকে সমন্বিত করে একেশ্বরবাদের কথা বলেছিলেন।

(গ) বিশ্বজনীন মানবতাবাদী ঃ তাঁর বিশ্বমানবতাবাদী চেতনার মধ্যেও উদারনৈতিক ধ্যান ধারণার অভিব্যক্তি ঘটেছে। মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানমনস্কতার উপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনের মাধ্যমে রামমোহন বিশ্বমানবের সমন্বয় সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মনে করতেন সমগ্র মানবজাতি অভিন্ন সমাজের অন্তর্ভুক্ত।

(ঘ) অর্থনৈতিক উদারনীতি ঃ জমিদারদের অন্যায় অবিচার থেকে সাধারণ মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তাঁর আন্তরিকতার অন্ত ছিল না। জমিদারের খাজনা বৃদ্ধির অধিকারকে তিনি সমর্থন করেননি। অনুরূপভাবে আবার জমিদারের ওপর থেকে করভার হ্রাস করার কথাও তিনি বলেছিলেন। কৃষকদের ওপর চিরস্থায়ী ব্যবস্থার কোন প্রতিকূল প্রভাব যাতে না পড়ে সে বিষয়ে চিন্তিত ছিলেন।

তিনি প্রধানত ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে বুর্জোয়াতান্ত্রিক ভাবধারার বিকাশ ভারতে সম্ভব হবে বলে মনে করতেন এবং সেই বুর্জোয়াতান্ত্রিক ভাবধারাই ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সহায়তা করবে বলে ধারণা পোষণ করতেন। তার ওপর ব্রিটিশদের ভারতে আগমনের পূর্বেকার স্বৈরতান্ত্রিক মুঘল শাসক ও রাজপুতদের আচরণকে তিনি পছন্দ করতেন না। ব্রিটিশরাই ভারতে এসে ভারতীয়দের কিছুটা Civil Liberties এর সুযোগ দিয়েছে বলে মনে করতেন।

তিনি স্ত্রী জাতির বংশানুক্রমিক সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্তির জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি ১৮২২ সালে তাঁর লেখা "Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females according to the Hindu Law of inheritance" নামক প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন যে প্রাচীন আইনজ্ঞ যাজ্ঞবল্ক, নারদ, কাত্যায়ন, বিষ্ণু এবং ব্যাসের মতে স্বামীর মৃত্যু হলে, মা এবং ছেলে সম্পত্তির সমান অংশীদার হবে এবং কন্যা পাবে সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ।

(ঙ) রামমোহন ও আইনের অনুশাসন ঃ ভারতের সাংবিধানিক ইতিহাসে উদারনীতিবাদের প্রভাবে প্রভাবিত হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে রামমোহনের আইনের অনুশাসন তত্ত্বের অন্যতম নীতি—আইনের দৃষ্টিতে সাম্য নীতির প্রতি তীব্র সমর্থন। তিনি লণ্ডনে থাকাকালীন সময়ে দেখেছিলেন যে ব্রিটিশ শাসন ও সমাজব্যবস্থার একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল "আইনের অনুশাসন বা আইনের দৃষ্টিতে সাম্য" নীতিকে গ্রহণ করা।

কিন্তু ভারতে, ব্রিটিশ সরকার "আইনের দৃষ্টিতে সাম্য" নীতিকে অস্বীকার করেছে বলে রামমোহন তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ব্রিটিশ সরকার ভারতে বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করে সমকালীন সরকারী চাকুরীতে ভারতীয়দের নিয়োগ বাতিল করে অনেক সময় অযোগ্য ইংরাজদের নিয়োগের পদ্ধতি চালু করেছে। রামমোহন ইংরাজ সরকারের এই নীতির বিরোধিতা করে উচ্চ সরকারী পদে যোগ্যতাকেই একমাত্র বিবেচ্য নীতি হিসাবে গ্রহণ করার দাবি জানিয়েছেন।

উদারনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী রামমোহন ভারতে প্রতিটি নাগরিকের জন্য ন্যায়বিচারকে সুনিশ্চিত করার ব্যাপারে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। তিনি পরাধীন ভারতের আইন ও বিচারবিভাগীয় সংস্কার সাধন করে ভারতীয়দের অন্যায় ও অবিচারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সদা সতর্ক ছিলেন। সনাতন ভারতের সমাজের ঐতিহ্য বজায় রেখে জনকল্যাণমুখী দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়েছেন।

(চ) মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ঃ বাক্ স্বাধীনতা বা মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সেই সাথে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন উদারনৈতিক ভাবাপন্ন রামমোহন। তাঁর মতে ব্যক্তি জীবনে জাতীয় স্বাধীনতা হল এক অপরিহার্য সম্পদ। তাঁর অসীম স্বাধীনতাস্পৃহার জন্যই ইংরাজ প্রীতি ও ইংরাজ নির্ভরতা প্রবল ছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। তবে, ব্রিটিশ শাসনের আমলে ভারতের জনগণের বাক্ স্বাধীনতা ও বিশেষতঃ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিভিন্ন অজুহাতে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। রামমোহন অবশ্য তখন দেশবাসীর বাক্ স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার প্রতিবাদে এবং বিশেষত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দাবি করে সুপ্রীম কোর্টের নিকট তাঁর লিখিত আর্জিপত্র পাঠিয়েছিলেন (Petition against Press regulation)। সুপ্রীম কোর্ট তাঁর আর্জি প্রত্যাখ্যান করলে তিনি ইংল্যাণ্ডের রাজার কাছে আবেদন জানান। শেষ পর্যন্ত গভর্নর জেনারেল মেটকাফ মেকলের সাহায্যে সংবাদপত্রের নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তবে একথা উদারনৈতিক মতবাদ বিশ্বাসী রামমোহন রায় বুঝতে পেরেছিলেন যে জনগণের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষা ও সচেতনতার প্রকাশই একমাত্র পারে স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে।

(ছ) সামাজিক ন্যায় ও নারী জাতির সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ঃ সমাজসংস্কারমূলক কাজকর্মের মাধ্যমেও রামমোহনের উদারনৈতিক মতাদর্শের অভিব্যক্তি ঘটেছে। সমকালীন সামাজিক সমস্যাসমূহের সমাধানের ব্যাপারে রামমোহন মানবতাবাদী আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। সামাজিক ন্যায়বিচারকে সুনিশ্চিত করার জন্য রামমোহন জাতি ও বর্ণগত বিচারে হিন্দুসমাজের স্তরবিন্যাস্যের বিরোধিতা করেছেন। নারী জাতিকে সামাজিক নিপীড়ন থেকে নিষ্কৃতি প্রদানের জন্য রাজা রামমোহন সর্বপ্রকারের প্রয়াসী হয়েছেন। স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার ঘটলেই নারীজাতি স্বাবলম্বী হবে এবং সামাজিক অন্যায় ও অবিচারের বিরোধিতা করতে পারবে। পৈতৃক সম্পত্তিতে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মানবতাবাদী ও উদারনৈতিক মতবাদী রামমোহন বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

রামমোহন রায় হিন্দু সমাজের প্রচলিত 'সতীদাহ' প্রথাকে রদ করার জন্য সমগ্র দেশে আন্দোলন গঠন করেন ও নেতৃত্ব দেন। ১৮২৯ সালে 'সতী' প্রথা বিরোধী আইন প্রণীত হয়।

সমকালীন সমাজব্যস্থায় নারী জাতির দুঃখ দুর্দশার অন্যতম কারণ হিসাবে তিনি 'বহুবিবাহ' ব্যবস্থাকে দায়ী করেন। এজন্য তিনি বহু-বিবাহ ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছিলেন।

রামমোহনের উদারনৈতিক আচরণের সমালোচনা ঃ

তবে রামমোহনের উদারনৈতিক ও মানবতাবাদী আদর্শ অনেক বিদগ্ধ সমালোচক দ্বারা সমালোচিত হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে সুমিত সরকার, অশোক সেন, রজত রায় প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমালোচকদের মতে তাঁর মানবতাবাদী ও উদারনৈতিক আদর্শ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশে বিশেষ ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি। উদারনৈতিক মতবাদী রামমোহন ছিলেন ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার প্রধানত পৃষ্ঠপোষক। ভারতীয় রাজনৈতিক বিষয়টি ছিল তাঁর কাছে গৌণ। সুমিত সরকার মন্তব্য করেছেন যে — The Process of modernisation pioneered by Rammohan Roy was a transition from Pre-Capitalist society in the direction 'not of full - blooded bourgeois modernity, but at a weak and distorted caricature of the same.

উদারনৈতিক মতবাদী রামমোহনের প্রকৃত মূল্য ঃ তবে একজন উদারনৈতিক মতবাদের ধারক ও বাহক হিসাবে রামমোহন রায়ের সমাজ সংস্কার, শিক্ষার বিস্তার ও নারীজাতির মুক্তি আন্দোলন, বাক্ প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন, আইনের চোখে সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা তৎকালীন ভারতবর্ষে নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা ছিল। বরুন দে তাঁর 'A Biological Perspective on the Political and Economic Ideas of Rammohan Roy' — লেখায় মন্তব্য করেছেন যে 'Rammohan's Political and economic ideas merit veneration only by these who worship the history of India's Liberalism'.

Suggested Reading :

১. Political Thought in Modern India – Ed. by Thomas Pantham, Kenneth L Deutsch

২. Modern Indian Pol. Thought – Vishwanath Prasad Varma.

৩. বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা ঃ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

৪. A History of the Modern World – 1763 and After – Ajoy Chandra Banerjee

৫. আধুনিক ইউরোপ সমীক্ষা ঃ নীহারেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

৬. রাষ্ট্রচিন্তার ধারা ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী

৭. ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন ঃ অনাদি মহাপাত্র।

প্রশ্নাবলী ঃ

১. What are the distinctive features of European Liberalism ?

২. How would you locate the features of liberalism in Rammohun ?

৩. Examine the Political ideas of Rammohun.

৪. Critically discuss Rammohun's ideas on social reforms.

———————

দ্বিতীয় পাঠ

বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ

ভূমিকা ঃ

ঊনিশ শতকে ইউরোপ থেকে আগত যে-দু'টি মতবাদ ভারতে নবজাগরণের জোয়ার সৃষ্টি করেছিল, সেগুলি হোল উদারনীতিবাদ ও জাতীয়তাবাদ। ঐ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কলেজের বিতর্ক সভায় কিংবা সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে জাতীয় ভাবনা-চিন্তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করত। শিক্ষিত বাঙালী যুব-সমাজ জাতীয় ধ্যান-ধারণার দ্বারা যে কতখানি প্রভাবিত হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'জাতীয় মেলা'র প্রতিষ্ঠা, 'জাতীয় পত্রিকা'র প্রকাশ, 'জাতীয় পার্টি' গঠন ইত্যাদির মধ্যে। কিন্তু ঐ সময় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণার অবস্থিতি ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র নব-অঙ্কুরিত ঐ আবেগকে সুস্পষ্ট দার্শনিক রূপ দিয়ে সুসম্বদ্ধভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছিলেন।

জাতি গঠনের উপাদানসমূহের অনুপস্থিতি ঃ

বঙ্কিম তাঁর 'ভারত কলঙ্ক' নামক প্রবন্ধে জাতীয়তাবাদের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেছেন। এই উপাদানগুলি হোল — **(ক)** একটি বিশেষ জাতির সঙ্গে সেই জাতিভুক্ত প্রতিটি মানুষের স্বার্থগত একাত্মতা এবং **(খ)** অন্যান্য জাতির স্বার্থের সঙ্গে একটি বিশেষ জাতির স্বার্থের পৃথকীকরণ। তাঁর মতে, একটি জাতির কল্যাণ অপর জাতির পক্ষে অকল্যাণকর হতে পারে। আবার, দু'টি জাতির মধ্যে সংঘাত দেখা দিলে একে অপরের ক্ষতিসাধন ক'রে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য সচেষ্ট হয়। এই ধরনের মনোভাব ভাল বা মন্দ যাই হোক্ না কেন, যে-জাতি এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ, সে-ই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। জাতীয়তাবাদের এই দু'টি লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য তদানীন্তন ভারতে অনুপস্থিত ছিল বলে বঙ্কিম মনে করতেন। আর্যদের ভারত আগমনের সময় তাদের মধ্যে ঐক্য বিরাজ করলেও পরবর্তী সময়ে যখন তারা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে, তখন তাদের মধ্যে ভাষাগত ও ধর্মীয় বিভেদ দেখা যায়। সমকালীন ভারতের বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং বিভিন্ন প্রদেশের মানুষের মধ্যে একতার অভাব বঙ্কিম বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন। এমনকি, তখন একই জাতি ও ধর্মের মধ্যে অনৈক্য দেখা দিয়েছিল। এইভাবে বাঙালী, পাঞ্জাবী, মারাঠী, রাজপুত, হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্যই ভারতের দুর্ভগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া, প্রাচীন ভারতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে শাসকদের স্বার্থগত ক্ষেত্রে ঐক্য ছিল না। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ক্ষত্রিয়শ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছিল। এইভাবে রাজা ও প্রজার স্বার্থ অভিন্ন না হওয়ায় সাধারণ মানুষের স্বাধীনতাবোধ বলে কিছুই ছিল না। রাজশক্তির প্রতি সাধারণ মানুষ সম্পূর্ণ উদাসীন থাকত। কারণ, রাজ-সিংহাসনে যিনিই বসুন না কেন, তিনি প্রজাদের খাজনা মকুব করতেন না। তাই শাসক দেশীয়ই হোন বা বিদেশীই হোন, তাতে তাদের কিছুই লাভ-ক্ষতি হবে না বলে সাধারণ মানুষ মনে করত। বঙ্কিমের মতে, স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদের ধারণা তখন ভারতীয়দের কাছে অপরিচিতই ছিল এবং ইংরেজরাই ভারতীয়দের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে শিক্ষাদান করেছে। 'ভারত-কলঙ্ক' নামক প্রবন্ধে বঙ্কিম লিখেছেন, "যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিত্তভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম — স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে, তা হিন্দু জানিত না।"

জাতীয়তাবাদের দ্বিতীয় উপাদান হোল অন্য জাতির প্রতি আগ্রাসী ও ঘৃণার মনোভাব পোষণ করা। বঙ্কিমের মতে, ভারতে এই উপাদানটির অনুপস্থিতির কারণ হোল ঈশ্বরের প্রতি ভারতীয়দের বিশেষ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী। একজন খ্রীস্টান ঈশ্বরকে স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট বলে মনে করেন। তিনি বিশ্বের শাসক হলেও তাঁর সঙ্গে শাসিতের মৌলিক ব্যবধান বর্তমান। কিন্তু হিন্দুদের ঈশ্বর-ধারণা সম্পূর্ণ পৃথক। তারা ঈশ্বরকে সব কিছুর 'অন্তরাত্মা' বলে ভাবে। তাই

তারা মনে করে যে, মানুষকে ভালো না বাসলে ঈশ্বরকে ভালবাসা যায় না। একজন জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত হিন্দুর কোন শত্রু নেই। কারণ, তিনি মানুষকে ভালবাসেন বলে বিভিন্ন জাতিভুক্ত মানুষ তার কাছে অতি আপনজন। তারা মুসলমান বা ইংরেজদের মতো অপর জাতিকে পদানত রাখতে চায় না; বরং, তারা স্বেচ্ছায় ইংরেজদের হিন্দু-সাম্রাজ্য প্রদান করেছে। এইভাবে বঙ্কিম প্রমাণ করেছিলেন যে, জাতীয়তাবাদের দু'টি প্রধান লক্ষণ হিন্দুদের মধ্যে বিশেষভাবে অনুপস্থিত।

ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের প্রচার ঃ

বঙ্কিমচন্দ্র উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ বাঙালীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটাতে গেলে ধর্মের সাহায্য অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। তাই তিনি 'কমলাকান্তের দপ্তরে' বঙ্গ ভূমিকে দেবী দুর্গা বলে বর্ণনা করেছেন। সংস্কৃতে একটি শ্লোক রয়েছে — 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী'। বঙ্কিমচন্দ্র আর এক ধাপ অগ্রসর হয়ে মাতা এবং মাতৃভূমিকে দেবী হিসেবে জনসমক্ষে তুলে ধরেন। বহুকাল পূর্বে ভারতমাতার যে-স্বর্ণমূর্তি দীনতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিল, তাকে পুনরুদ্ধারের জন্য দেশবাসীর কাছে তিনি ব্যাকুল আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি তাঁর 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের মধ্যে মাতৃভূমির সঙ্গে দেবী দুর্গার অভিন্নতা বর্ণনা ক'রে ভারতবাসীর মনে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। পরবর্তী সময়ে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের মধ্যে ঐ সঙ্গীত সংযোজিত হওয়ার ফলে ভারতের জাতীয়তাবাদী চিন্তা নতুন মাত্রা লাভ করে। তিনি ব্যষ্টিকে সমষ্টির দেহ হিসেবে দেখেছিলেন। এই দেহের প্রাণই হোল জন্মভূমি। ব্যষ্টি ও সমষ্টির এরূপ সমন্বয় সাধন ছাড়া ঐ সময়ে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব ছিল না। তাই দেশাত্মবোধকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং দেশমাতৃকাকে দেবী তুল্য হিসেবে তিনি বর্ণনা করেছিলেন। 'আনন্দমঠ'-এর বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমের রাষ্ট্রচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। ভবানন্দের মুখ দিয়ে তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, সন্তানদের কাছে দেশ ছাড়া আর কোন জননী নেই।

নানা দিক থেকে 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা যায়।

প্রথমতঃ, এই সঙ্গীতের মধ্যে তিনি কেবল দেশমাতৃকারূপী দেবী দুর্গার অসাধারণ রূপের বর্ণনাই করেননি, সেই সঙ্গে 'বহুবলধারিণী', 'রিপুদলবারিণী' ও 'দশপ্রহরণধারিণী' অর্থাৎ প্রতীক স্বরূপা বলে বর্ণনা করেছেন। এ হেন দুর্গার তথা দেশমাতৃকার যাঁরা সেবক হবেন, তাঁরা যে আত্মশক্তি সম্পর্কে আস্থাশীল থাকবেন, তা বলাই বাহুল্য।

দ্বিতীয়তঃ, দেবী-মায়ের শক্তির উৎস জনগণের বিশেষ কোন অংশ নয়, বরং দেশের সমগ্র জনগণ। তিনি 'আনন্দমঠ'-এ জাতীয় মুক্তিসেনা গঠনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এইভাবে বঙ্কিম কার্যতঃ জনসাধারণের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদান করার কথা বলে রুশোর মতো গণ-সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। বস্তুতঃ, তাঁর রচিত 'সাম্য' এবং 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এ তিনি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

তৃতীয়তঃ, তিনি ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির সমন্বয় সাধন করেছিলেন। দেশকে সব অধিবাসীর জীবন বলে তিনি বর্ণনা করেছিলেন। ব্যক্তির জ্ঞান, আচার-আচরণ, প্রেম ও বিশ্বাস মাতৃভূমি-সঞ্জাত বলে তিনি মনে করতেন। ব্যক্তির সঙ্গে জাতির এরূপ সমন্বয় ছাড়া জাতীয় একাত্মতা আসবে না বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। দেশমাতৃকাকে দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী বলে বর্ণনা ক'রে তিনি ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বঙ্কিমচন্দ্র নিরাকারবাদী হলেও অনগ্রসর উপাসকদের কাছে মূর্তি-পূজার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি রামমোহনের সঙ্গে একমত ছিলেন। আর সেজন্যই দেবী-মূর্তির সাহায্যে তিনি দেশমাতৃকার বন্দনা করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'আনন্দমঠ'-এ জাতীয়তাবাদকে 'ধর্ম' হিসেবে বর্ণনা ক'রে কার্যতঃ বাঙালী

যুবকদের মনে জাতীয়তাবাদের দাবাগ্নি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'আনন্দমঠ'-এ সন্ন্যাসীদের নেতা ভবানন্দ মহেন্দ্রকে বলেছিলেন, সন্ন্যাসীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নতুন সমাজে কোন মা থাকবেন না। কারণ, দেশই হোল তাঁদের মা। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু দেবী কালীর নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, কালী হলেন ভারতের অধঃপতনের প্রতীক। তাঁর গায়ের রং কালো, কারণ সমগ্র দেশ চরম দুঃখ-দুর্দশার কবলে পতিত; তিনি নগ্না, কারণ ভারতের সমস্ত ধনসম্পদ অপহৃত; তাঁর গলায় মুন্ডমালা, কারণ সমগ্র দেশ কার্যতঃ শ্মশানে পরিণত। তিনি আপন পদতলে শিবকে দলন করেছেন, কারণ ভারতবাসী তাদের নিজেদের কল্যাণের পথ নিজেরাই রুদ্ধ করেছেন। এরপর বঙ্কিম দেবী দুর্গার মধ্যে ভারতের মহিমায় ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করেছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত তথা 'আনন্দমঠ' উত্তরকালে বাংলার বিপ্লবীদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। বঙ্কিমের অনুশীলন তত্ত্বের প্রভাবে বিশ শতকের একেবারে প্রথম দিকে 'অনুশীলন সমিতি' নামে একটি বিপ্লবী দলের আবির্ভাব ঘটেছিল। স্বামী বিবেকানন্দও ছিলেন বঙ্কিমের বিশেষ গুণগ্রাহী। এক সময় বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ 'আনন্দমঠ'-এর অনুকরণে 'ভবানী মঠ' গঠনের চেষ্টা করেছিলেন। উইলি-হত্যাকারী মদনলাল ধিংড়াকে ১৯০৯ সালে ফাঁসিকাঠে তোলা হলে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি।

তবে বঙ্কিমচন্দ্র কেবল বিপ্লববাদের তাত্ত্বিক গুরু ছিলেন না। বরং, রাষ্ট্র-বিপ্লবের পরিবর্তে গঠনমূলক সমাজোন্নয়নের প্রতি তাঁর অধিক আগ্রহ ছিল। তাছাড়া, আবেগ ও উচ্ছ্বাস থেকে মুক্ত রাখার জন্য তিনি জাতীয়তাবাদকে একটি সুস্পষ্ট দার্শনিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থটি এই বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে। তিনি কোঁতের দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাঁদের মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য ছিল। কোঁৎ ছিলেন নিরীশ্বরবাদী দৃষ্টবাদের প্রবক্তা। কিন্তু বঙ্কিমের ধর্ম-প্রত্যয় পুরোপুরি ঈশ্বরবাদী। শান্ডিল্যের 'ভক্তিসূত্র' বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি সব বৃত্তিকে ঈশ্বরাভিমুখী করার সময় মানবহিতের প্রশ্নটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর আদর্শ ছিল সর্ব জীবের প্রতি প্রেম। সর্বোপরি, কোঁতের দেশাত্মবোধ ছিল সংকীর্ণ; কিন্তু উদারতন্ত্রী বঙ্কিম ধর্মকে দেখেছিলেন প্রেম ও প্রীতির সঞ্চারক হিসেবে।

পশ্চিমী জাতীয়তাবাদের সমালোচনা ঃ

এক সময় ইউরোপের রাষ্ট্রীয় ধারায় ধর্মের যথেষ্ট প্রভাব থাকলেও ক্রমে ধর্মের স্থান অধিকার করে জাতীয়তাবাদ। কিন্তু সেই জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতা সম্পর্কে অতি মাত্রায় সচেতন ছিলেন বলেই তিনি লিখতে পেরেছিলেন, "ইউরোপীয় Patriotism ধর্ম্মের তাৎপর্য্য এই যে, পরসমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে"। কিন্তু বঙ্কিমের দেশপ্রেম তথা জাতীয়তাবাদের মূল কথা হোল মানুষকে ভালবাসা। তাই তিনি কেবল নিজের দেশ ও জাতিকে ভাল বাসার কথা না বলে সমগ্র মানব সমাজকে ভালবাসার ওপর জোর দিয়েছেন। এইভাবে তিনি জাতীয়তাবাদের সঙ্গে আন্তর্জাতিকতার সমন্বয় সাধনের তত্ত্বে গভীরভাবে আস্থাশীল ছিলেন। তবে মানবজাতিকে ভালবাসা তথা আন্তর্জাতিকতা বলতে কখনই অপরের দ্বারা নিজের দেশ বা জাতির অপমান সহ্য করাকে বোঝায় না। বঙ্কিমের মতে এর অর্থ হোল সকলের প্রতি সমান শ্রদ্ধা প্রদর্শন। আমরা যেমন অপরের ক্ষতি করব না, তেমনি আমাদের ক্ষতিসাধনের জন্য অপরকে সুযোগও দেব না। তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ইউরোপে জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতার সমন্বয় সাধিত হয়নি বলে গ্রীক, রোমান ও ইহুদী সভ্যতা এবং খ্রীষ্ট ধর্ম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। বঙ্কিম বিশ্বাস করতেন যে, ইউরোপীয় রেনেশাঁই সেখানকার জাতীয়তাবাদের উৎস। রেনেশাঁর প্রভাবেই বিভিন্ন দেশের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভাষা, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে এবং তারই মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল জাতীয়তাবাদের। তাই সর্বভারতীয় ভাষা হিসেবে ইংরাজীর পক্ষপাতী হওয়া সত্ত্বেও তিনি জাতীয়তাবাদের বিকাশের জন্য আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ বিধানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ

করেছিলেন। তিনি তাঁর 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সাহায্যে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বাঙালীদের সমাজ-সচেতন ও জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলার জন্য প্রয়াসী হন।

সীমাবদ্ধতা ঃ

কিন্তু বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদ-সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনার সীমাবদ্ধতাগুলি আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। এইসব সীমাবদ্ধতার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ

প্রথমতঃ, 'জাতি' বলতে বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছিলেন, তা স্পষ্ট নয়। তাই তিনি আর্য জাতির প্রতিশব্দ হিসেবে 'বাঙালী', 'পাঞ্জাবী', 'তৈলঙ্গী', 'মহারাষ্ট্রী' ইত্যাদির প্রয়োগ করেছেন। আবার, জাতীয়তাবাদকে তিনি বিচার করেছেন কখনও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, আবার কখনও প্রাদেশিকতার মনোভাব নিয়ে।

দ্বিতীয়তঃ, বঙ্কিমের চিন্তা-ভাবনা মূলতঃ প্রাদেশিক স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ, তিনি শুধু বাংলার কথাই বলেছেন, ভারতের কথা তাঁর রচনায় অনুচ্চারিত থেকে গেছে বলে অনেকের অভিযোগ। কিন্তু এই অভিযোগ সর্বাংশে সত্য নয়। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বিমানবিহারী মজুমদার বলেছেন, একটি প্রদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অভিন্নতা আনয়নের মধ্যে দিয়ে তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশের পথ উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন। এইভাবে প্রাদেশিক জাতীয়তাবাদ পুরোপুরিভাবে সম্প্রসারিত হলে একটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে বলে বঙ্কিম মনে করতেন। অবশ্য তিনি কোথাও তাঁর এই চিন্তাকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করেননি।

তৃতীয়তঃ, গোপাল হালদারের মতে, স্বদেশ-প্রীতি ও জাতীয়তাবাদের কথা বললেও বঙ্কিম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অপেক্ষা সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে জাতীয় সংস্কৃতির প্রতিরোধ গড়ে তোলাকেই 'মুখ্য স্বাদেশিক কর্ম' বলে তিনি মনে করতেন। তাই 'জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রবুদ্ধ বাস্তববাদী (realist) জাতীয় সংস্কৃতি' গঠনে তাঁর যতটা দৃষ্টি ছিল, তার থেকে তিনি অনেক বেশি আত্মনিয়োগ করেছিলেন জাতীয় জীবনকে অধ্যাত্মবাদী সাংস্কৃতিক ধারায় প্রবাহিত করার কাজে।

চতুর্থতঃ, বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদ ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদ। গোপাল হালদারের মতে, "যে-জাতীয় সংস্কৃতি তাঁর মুখ্য সাধনা, তা-ও হিন্দু সংস্কৃতি। এ বিষয়ে যত তর্ক উঠুক, এ ধারণাটাই বঙ্কিম পাঠে ভারতের অ-হিন্দুর মনে বদ্ধমূল হতে বাধ্য। বঙ্কিম-কথিত জাতীয় সংস্কৃতিতে অ-হিন্দু ভারতীয়দের স্থান নগণ্য — অ-হিন্দুদের অস্তিত্বই যেন অজ্ঞাত।" বস্তুতঃ, তাঁর জাতীয়তাবাদ হিন্দু-পুনরুজ্জীবনবাদের নামান্তর হওয়ায় মুসলমানরা কোনদিনই জাতীয়তাবাদের মূল স্রোতে মিশে যেতে পারেনি। তাই 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী' প্রভৃতি কথা যত সহজে হিন্দুদের আবেগ-আপ্লুত করুক না কেন, তা নিশ্চতভাবেই মুসলমানদের কাছে অস্বস্তিকর। আর সেজন্যই তাদের কাছে 'বন্দেমাতরম্' জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। তাই গোপাল হালদারের মন্তব্য হোল, "আদর্শের দিক থেকে তাঁর স্বদেশ প্রীতি যত মহান হোক্, তা বড় বেশি রকমের ধর্মাশ্রয়ী। কার্যত বহু ধর্মের দেশে ধর্মাশ্রিত স্বদেশপ্রীতি একজাতীয়তার পথে বিঘ্নোৎপাদন করে।" মুসলমানদের বোঝাতে গিয়ে 'যবন', 'ম্লেচ্ছ', 'নেড়ে' প্রভৃতি ঘৃণাব্যঞ্জক শব্দ প্রয়োগের ফলে তাঁর মুসলমান-বিদ্বেষী মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে। তাই তাঁর প্রচারিত জাতীয়তাবাদ কতখানি ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ ছিল, তা নিয়ে উত্তরকালে তুমুল বিতর্ক দেখা দেয়।

উপসংহার ঃ

নানা প্রকার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দোমাতরম্' সঙ্গীত এবং 'আনন্দমঠ', উপন্যাস পরবর্তী সময়ে বাংলার বিপ্লবীদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাছাড়া, স্বামী বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ঘোষ, মহামতি গোখেল, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখের চিন্তা ও চেতনাকে বঙ্কিম যে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন, সে বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করার কোন অবকাশ নেই। তবে একথাও সত্য যে, আধুনিক সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে আলোকিত বঙ্কিমের জীবন-জিজ্ঞাসা ('এ জীবন লইয়া কী করিব?') ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পটভূমিকায় প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব-তরঙ্গিত জটিলতার জন্ম দিয়েছে। আর সেজন্যই তাঁর জীবনদর্শন ও রাজনীতি কখনই সরল রৈখিক পথে অগ্রসর হতে পারেনি। তাই শেষ পর্যন্ত আরব্য উপন্যাসের সিন্দবাদ নাবিকের কিংবা গ্রীক পুরাণের সিসিফাসের মতো সাংস্কৃতির ঔপনিবেশিকতার বিশাল বোঝার চাপে বঙ্কিমের আধুনিকতা, যুক্তিবাদ ও মননশীলতা বিপর্যস্ত হয়েছে।

References :

1. M K Haldar, *Foundations of Nationalism in India : Study of Bankimchandra Chattopadhyay* (1989)
2. M K Haldar, *Renaissance and Reaction in Nineteenth Century Bengal* (1973)
3. Sisirkumar Das, *The Artist in Chains : The Life of Bankimchandra Chatterjee* (1984)
4. Tapan Ray Chaudhuri, *Europe Recondidered : Perceptions of the West in Nineteenth Century Bengal,* (1988)
5. Partha Chatterjee, 'Culture and Power in the Thought of Bankimchandra' in Thomas Pantham & Kenneth L Deutsch (ed). *Political Thought in Modern India,* 1986
6. অমলেশ ত্রিপাঠী, 'বঙ্কিম চিন্তায় পাশ্চাত্য প্রভাব', *দেশ,* সাহিত্য সংখ্যা, (১৩৯৫ বঙ্গাব্দ)
7. প্রশান্ত বিহারী মুখোপাধ্যায়, 'বঙ্কিমের জীবনদর্শন', *পশ্চিমবঙ্গ,* বঙ্কিম সংখ্যা (১৪০২ বঙ্গাব্দ)
8. রাখালচন্দ্র নাথ, 'বঙ্কিমচন্দ্র কি 'প্রতিক্রীয়াশীল ছিলেন'?, *পশ্চিমবঙ্গ,* বঙ্কিম সংখ্যা, (১৪০২ বঙ্গাব্দ)
9. বদরুদ্দীন উমর, 'বঙ্কিমচন্দ্রের আর্থ-সামজিক চিন্তা', *অনীক,* বঙ্কিম মূল্যায়ন সংখ্যা, (১৯৯০)
10. সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, 'বঙ্কিমচন্দ্রের বিপ্লব চিন্তা', *অনীক,* বঙ্কিম মূল্যায়ন সংখ্যা, (১৯৯০)
11. দীপঙ্কর চক্রবর্তী, 'বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনীতি', *অনীক,* বঙ্কিম মূল্যায়ন সংখ্যা (১৯৯০)
12. বিজিত কুমার দত্ত, 'বঙ্কিম-মানস ঃ দ্বিধা আর দ্বন্দ্ব', *পশ্চিমবঙ্গ,* বঙ্কিম সংখ্যা, (১৪০২ বঙ্গাব্দ)
13. অশোক কুণ্ডু, 'বঙ্কিমচন্দ্র ও ভারতীয় জাতীয়তাবোধ', *পশ্চিমবঙ্গ,* বঙ্কিম সংখ্যা, (১৪০২ বঙ্গাব্দ)

Unit – II

বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্য-চিন্তা

বঙ্কিমের সাম্য-চিন্তার পটভূমি ঃ

বৈষম্যমূলক সমাজব্যস্থার জঠর থেকেই সাম্যের ধারণাটি জন্মলাভ করেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বৈষম্যকে স্বাভাবিক, দৈব-নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় বলে মনে করা হোত। কিন্তু পাশ্চাত্যে সাম্য নিয়ে বৈজ্ঞানিক অন্বেষা শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। রুশোর 'অসাম্যের উৎপত্তি' (১৭৫৫), 'আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' (১৭৭৬), 'ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯)-এর সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার শ্লোগান প্রভৃতির মধ্যে যে-সাম্যচিন্তার সূত্রপাত ঘটে, ঊনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে মার্কস-এঙ্গেলসের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) মাধ্যমে নব্য জমিদারতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে সাম্য সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়। তৎকালীন বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মনন ও চিন্তনের মধ্যে সাম্যের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাংলা তথা ভারতে সাম্য-চিন্তার অগ্রদূত ছিলেন ডিরোজিও এবং তাঁর শিষ্যরা। পরবর্তীকালে প্যারীচাঁদ মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, শিশিরকুমার ঘোষ প্রমুখের রচনায় চাষীর দুরবস্থা এবং ক্ষেতমজুর ও গ্রামবাসীদের দুঃসহ জীবনের কথা বিশেষ স্থান লাভ করে। অনুরূপভাবে, রাধানাথ শিকদার, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখের রচনাতে শ্রমিকদের এবং রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখের রচনায় কৃষকদের জীবনের করুণ কাহিনী ফুটে ওঠে। এরূপ প্রেক্ষিতে ১৮৭৩-৭৫ সালে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধ এবং 'বঙ্গদেশের কৃষক' নামে ধারাবাহিক প্রবন্ধের কিছু অংশ নিয়ে ১৮৭৯ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

বঙ্কিমের সাম্য-চিন্তার ওপর বিদেশী মনীষীদের প্রভাব ঃ

বঙ্কিমের 'সাম্য' গ্রন্থটির মধ্যে 'কমিউনিজম' এবং 'ইন্টারন্যাশনাল' কথা দু'টির উল্লেখ থাকলেও মার্কস-এঙ্গেলসের চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর পরিচিতি ছিল না বলে কোন কোন বঙ্কিম-বিশেষজ্ঞ মনে করেন। তবে তাঁর চিন্তার ওপর রুশো, ভলতেয়ার, কোঁৎ, স্পেন্সার, বেন্থাম, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাছাড়া, তাঁর রচনায় সাঁ সিমোঁ, শার্ল ফুরিয়ে, রবার্ট ওয়েন, এতিয়েন কাবে, প্রুধোঁ, লুই ব্লাঁ প্রমুখের উল্লেখ রয়েছে। সর্বোপরি, তিনি বুদ্ধ, যীশু খ্রীষ্ট ও রুশোকে সাম্যের তিন 'অবতার' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

বঙ্কিমের দৃষ্টিতে সাম্য ঃ

পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক রাষ্ট্র-দার্শনিকগণ পৌর ও রাজনৈতিক সাম্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেও মার্কসবাদীরা সাম্যকে আলোচনা করেছেন প্রধানতঃ অর্থনৈতিক দিক থেকে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র মূলতঃ সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্যের আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন। সাম্য সম্পর্কে তাঁর প্রাথমিক বক্তব্য হোল — "মনুষ্যে মনুষ্যে সমান। কিন্তু এ কথার এমত উদ্দেশ্য নহে যে, সকল অবস্থার সকল মনুষ্যই সকল অবস্থায় সকল মনুষ্যের সঙ্গে সমান।" অর্থাৎ 'সব মানুষ সমান' — একথা বললেও বঙ্কিমচন্দ্র স্বাভাবিক অসাম্যকে অস্বীকার করেননি। তাই তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, বুদ্ধিমান ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিরা সমাজের আজ্ঞাদাতা হিসেবে এবং বুদ্ধিহীন ও দুর্বলেরা আজ্ঞাপালনকারী হিসেবে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করবে। রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বঙ্কিম তাঁর 'বাহুবল ও বাক্যবল' নামক প্রবন্ধে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, প্রাক্-সামাজিক প্রকৃতির রাজত্বে কোনরূপ 'বৈষম্য' না থাকায় ধনী-দরিদ্রের অস্তিত্ব ছিল না। তিনি ঐ অবস্থাকে 'দারিদ্র্যশূন্য' অবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, দারিদ্র হোল বৈষম্যের ফল এবং এই বৈষম্য হোল 'সামাজিকতার নিত্যফল'। বঙ্কিমচন্দ্র বৈষম্যকে দু'টি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা — **(ক)** স্বাভাবিক এবং **(খ)** সামাজিক। তাঁর মতে, স্বাভাবিক বৈষম্য

থেকে যে-সামাজিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়, তা-ও প্রকৃতিগতভাবে স্বাভাবিক। যে-সামাজিক বৈষম্য পুরোপুরিভাবে মনুষ্য-সৃষ্ট, তাকে তিনি অস্বাভাবিক এবং অন্যায় বলে বর্ণনা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ প্রাচীন রোমের প্লেবিয়ান ও পেট্রিসিয়ান, দাস-মালিক, ভদ্রলোক ও ছোটলোক, ব্রিটিশ শাসক ও ভারতীয় প্রজা প্রভৃতির কথা তিনি বলেছেন। তিনি মনে করতেন যে, সমাজের মধ্যে স্বাভাবিক বৈষম্য সঙ্গত কারণেই থাকতে পারে; কিন্তু অধিকারের বৈষম্য আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। 'বঙ্গদেশের কৃষক' নামক প্রবন্ধে তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সামাজিক অগ্রগতির পথে যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হোল অস্বাভাবিক বৈষ্যমের আধিক্য। ভারতের দীর্ঘস্থায়ী দুর্দশার কারণ হোল এই ধরনের বৈষম্যের ব্যাপক অবস্থিতি। এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্র 'সামাজিক সাম্য' বলতে কার্যতঃ সুযোগ-সুবিধা লাভের সমানাধিকারকে বোঝাতে চেয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বর্তমানে যে-অর্থে বাংলায় 'অসাম্য' কথাটি প্রয়োগ করা হয়, বঙ্কিমচন্দ্র সেই অর্থে 'বৈষম্য' শব্দটি প্রয়োগ করেছিলেন।

বঙ্কিমের চোখে বৈষম্যের প্রকারভেদ ঃ

বঙ্কিমচন্দ্র যেসব সামাজিক বৈষম্যকে অস্বাভাবিক বলে মনে করতেন, সেগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হোল — **(ক)** অর্থনৈতিক বৈষম্য, **(খ)** বর্ণ ও জাতপাতের বৈষম্য এবং **(গ)** লিঙ্গগত বৈষম্য।

(ক) অর্থনৈতিক বৈষম্য ঃ বঙ্কিমচন্দ্র অর্থনৈতিক বৈষম্যকে 'সর্বাপেক্ষা' 'গুরুতর' বৈষম্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এরূপ বৈষম্য এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করে, যেখানে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি স্ফূর্তির ফোয়ারায় অবগাহন করে। অপরদিকে, সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ খেতে না পেয়ে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্স হোল এরূপ বৈষম্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি বৈষম্য-পীড়িত ফ্রান্সের সাধারণ মানুষের ভয়াবহ দারিদ্রের চিত্র তুলে ধরে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, "এই বৈষম্য কদর্য্য, অপরিশুদ্ধ, রাজশাসন প্রণালীজনিত।" তাঁর মতে, কেবল রুশো-প্রচারিত সাম্যের আর্দশই ফরাসী বিপ্লব ঘটিয়েছিল। এমনকি, তিনি রুশোকে 'সমাজতন্ত্রের জনক' হিসেবে চিহ্নিত করতেও দ্বিধা করেননি। কারণ, 'ভূমি সাধারণের' অর্থাৎ জমিতে সকলের সমান অধিকার — এই কথা বলে রুশো যে মহাবৃক্ষের বীজ বপন করেছিলেন, তাতে নিত্যনতুন ফল ফলতে লাগল। 'কমিউনিজম' এবং 'ইন্টারন্যাশনাল' হোল সেই বৃক্ষের ফল। এক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদের মধ্যে পার্থক্যের ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র অবহিত ছিলেন কিনা, তা সুস্পষ্টভাবে বলা সম্ভব না হলেও তিনি যে জমির ওপর সাধারণ মালিকানার প্রতিষ্ঠা এবং সম্পদের সম-বন্টনের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

বঙ্কিম সম্পত্তির উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত বিষয়ে মিলের বক্তব্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মিল সমাজতন্ত্রী না হলেও তাঁর উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত বক্তব্যের সঙ্গে বঙ্কিম সহমত পোষণ করতেন। মিলের মতোই তিনি একথা বলেছেন যে, আইনসম্মতভাবে অর্জিত সম্পদের ওপর অধিকার রয়েছে। তাই মৃত্যুর পূর্বে উইলের মাধ্যমে সে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী স্থির ক'রে যেতে পারে। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে কেউ যদি উত্তরাধিকারী স্থির ক'রে যেতে না পারে, তাহলে তার বৈধ অথবা অবৈধ পুত্রের স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ তাকে প্রদান করার পর অবশিষ্ট সম্পদ রাষ্ট্রের হাতে চলে যাবে। আবার, সন্তানহীন কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার আত্মীয়স্বজন সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে না; সেই সম্পদের মালিক হবে জনসাধারণ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বঙ্কিমচন্দ্র ব্রিটিশ উত্তরাধিকার ব্যবস্থা অপেক্ষা হিন্দু-ধর্মশাস্ত্র ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলেছেন। আবার, হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ব্যবস্থা অপেক্ষা শরিয়ত ব্যবস্থাকে অপেক্ষাকৃত ভাল বলে মনে করলেও তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, অদ্যাবধি উত্তরাধিকার সম্পর্কে যথার্থ ব্যবস্থা বিশ্বের কোথাও বিদ্যমান নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র 'সাম্য'-এর তৃতীয় পরিচ্ছেদে পরাণ মণ্ডল নামে এক কৃষকের চরিত্রকে সম্মুখে রেখে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল হিসেবে জমিদারী শোষণ ও পীড়নের এক মর্মন্তুদ চিত্র অঙ্কন করেছেন। সামন্ত-শাসনে পরাণ

মণ্ডলের মতো লোকেরা জমিদার ও তাঁর এজেন্টদের দ্বারা অত্যাচারিত, প্রতারিত, শোষিত ও লুণ্ঠিত হয়েছে। তাদের রক্ষা করার জন্য কেউ নেই। এমনকি, আদালতও পরাণ মণ্ডলদের রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসে না। আদালতের ভূমিকা সম্পর্কে বঙ্কিমের বক্রোক্তি হোল — আদালত বেশ্যালয়ের সমতুল্য। কারণ, অর্থ ছাড়া এই দু'টি জায়গায় প্রবেশাধিকার লাভ করা যায় না। তাই পরাণ মণ্ডলদের অবধারিতভাবে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। তিনি তাঁর 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এ ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। কারণ, এই আইনবলে সামন্ত-শোষণ ও অত্যাচারকে বৈধতার ছাপ প্রদান করা হয়। এমনকি, এই আইন প্রণয়ন ক'রে কর্ণওয়ালিশ কৃষকদের কার্যতঃ হাত-পা বেঁধে জমিদারদের থাবার নীচে ফেলে দিয়েছিলেন বলে তিনি অভিযোগ করেন।

তবে বঙ্কিমের চোখে সব জমিদারই অত্যাচারী ছিলেন না। সব জমিদারকে ধূর্ত ও অত্যাচারী বলাকে তিনি সত্যের অপলাপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কারণ, জমিদারদের মধ্যে অনেকেই দয়ালু, প্রজাবৎসল এবং সৎ ছিলেন বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর মতে, কেবল ছোট জমিদাররাই বেশি অত্যাচারী হতেন। কারণ, তাঁদের রাজকীয় মর্যাদা রক্ষা ও বিলাস-ব্যসনের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হোত। সেই অর্থ সংগ্রহের জন্যই তাঁরা অত্যাচারী নায়েব, গোমস্তা প্রমুখকে নিয়োগ করতেন। বলা বাহুল্য, বঙ্কিম জমিদারী শোষণ ও নিপীড়নের অবসান ঘটানোর জন্য জমিদারদের সহৃদয়তার ওপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন। অর্থাৎ জমিদারদের কাছে আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমেই ন্যায়বিচার পাওয়া সম্ভব বলে তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। অনুরূপভাবে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তীব্র সমালোচনা করলেও তিনি শেষ পর্যন্ত এই ব্যবস্থার বিলোপ সাধন চাননি। কারণ, তিনি মনে করতেন যে, ১৭৯৩ সালে যে-ভুল করা হয়েছে, তার সংশোধন অসম্ভব। আধুনিক বাঙালী সমাজ সেই ভুলের ওপর ভিত্তি ক'রেই গড়ে উঠেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান ঘটলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং বলা যায়, সমাজ বিপ্লব ঘটতে পারে এমন কোন কাজকেই বঙ্কিম সমর্থন করতে পারেননি। এমনকি, তিনি এই অভিমতও ব্যক্ত করেছিলেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাতিল করা হলে ব্রিটিশ শাসকদের কলঙ্ক হবে এবং ভারতীয় প্রজাদের নিকট তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হবে।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কায়িক ও মানসিক শ্রমের অনিবার্য বিভাজনের কথা উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি বাক্‌ল-রচিত 'ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য হিস্ট্রি অব্ সিভিলাইজেশন ইন্ ইংল্যান্ড' নামক গ্রন্থের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বঙ্কিমের মতে, যে-কোন সমাজ জ্ঞানই হোল সভ্যতার ভিত্তি। জ্ঞানের উন্নতি ছাড়া সমাজের নৈতিক উন্নতি ঘটতে পারে না। তাঁর মতে, জ্ঞান স্বতঃস্ফূর্তভাবে বৃদ্ধি পায় না। সেজন্য প্রয়োজন শ্রম ও যথেষ্ট অবকাশ। প্রত্যেকেই যদি জীবনের বস্তুগত প্রয়োজনীয়তা পূরণের কাজে ব্যস্ত থাকে, তাহলে জ্ঞানার্জনের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাশ তাদের থাকে না। তাই সমাজের মধ্যে এমন একটি শ্রেণী থাকে, যাদের দৈহিক পরিশ্রম করতে হয় না। এই শ্রেণীভুক্ত লোকেদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করতে হয় কায়িক শ্রমে নিযুক্ত ব্যক্তিদের। কায়িক শ্রমে নিযুক্ত ব্যক্তিরা তাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদন করলে উদ্বৃত্ত উৎপাদন সঞ্চিত হয়। এই উদ্বৃত্ত বা সঞ্চয়কে বঙ্কিম 'সামাজিক ধনসঞ্চয়' বা 'আদিম ধনসঞ্চয়' বলে অভিহিত করেছেন। 'আদিম ধনসঞ্চয়ে'র তত্ত্ব রচনা করতে গিয়ে তিনি সম্ভবতঃ মার্কসের 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থটির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে মার্কস ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ধনসঞ্চয় তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বঙ্কিমের তত্ত্বে সেরূপ দৃষ্টিভঙ্গী স্বাভাবিক কারণেই অনুপস্থিত। যাই হোক্, তিনি ভারতীয় সমাজকে দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, যথা — (১) 'শ্রমোপজীবী' এবং (২) 'বুদ্ধ্যুপজীবী'। শেষোক্ত শ্রেণী প্রথম শ্রেণীর উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী লাভ করে। এইভাবে দেশের উৎপন্ন ধন দু'ভাগে বিভক্ত হয়। তার এক ভাগ লাভ করে শ্রমোপজীবীরা এবং অন্য ভাগ লাভ করে বুদ্ধ্যুপজীবীরা। বঙ্কিম প্রথম ভাগটিকে 'মজুরির বেতন' এবং দ্বিতীয় ভাগকে 'মুনাফা'

হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মুনাফাতে শ্রমোপজীবী শ্রেণীর কোন অধিকার নেই। শ্রমোপজীবীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও তারা মুনাফার মধ্য থেকে 'এক পয়সাও' পায় না। সুতরাং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পদের আনুপাতিক বৃদ্ধি ঘটাতে না পারলে শ্রমোপজীবীদের দুঃখ-দুর্দশা পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। বঙ্কিম এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, শ্রমোপজীবী শ্রেণীর দুঃখ-দুর্দশা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সমাজের মধ্যে অসাম্য তীব্র আকার ধারণ করে। এইভাবে 'ধনের তারতম্য' অধিকারের তারতম্য সৃষ্টি করে। ফলে শ্রমোপজীবীদের ওপর বুদ্ধ্যুপজীবীদের প্রভুত্ব বাড়তে থাকে। বঙ্কিমের মতে, "অধিক প্রভুত্বের ফল অধিক অত্যাচার"। এই শূদ্র-শোষণ ও পীড়নের যথার্থ্য প্রমাণের জন্য বুদ্ধ্যুপজীবীরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা একের পর এক স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশাসন তৈরী করে। তিনি বুদ্ধ্যুপজীবী তথা ব্রাহ্মণদের এই পীড়নের ত্রিবিধ ফলের কথা উল্লেখ করেছেন। এই ত্রিবিধ ফল হোল শ্রমোপজীবী বা শূদ্রদের বেতনের স্বল্পতা অর্থাৎ দারিদ্র্য, অবকাশের অভাবে বিদ্যালোচনার অভাব অর্থাৎ মূর্খতা এবং বুদ্ধ্যুপজীবীদের প্রভুত্ব ও অত্যাচার বৃদ্ধি অর্থাৎ দাসত্ব।

(খ) বর্ণ ও জাতপাতের বৈষম্য ঃ বঙ্কিমের দৃষ্টিতে শ্রেণী এবং বর্ণ সমার্থবাচক। তিনি যাদের শ্রমোপজীবী বলেছেন, তারা হোল শূদ্র, ভারতীয় বর্ণ ব্যবস্থার চতুর্থ তথা শেষ স্তরে যাদের অবস্থান। বর্ণ ব্যবস্থার প্রথম স্তরে যাঁদের অবস্থান, তাঁরা হলেন প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণরা ক্ষত্রিয়দের মতো শাসকও ছিলেন। প্রাচীন ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে ক্ষত্রিয় রাজাদের অবস্থিতি বিশেষভাবে চোখে পড়লেও পণ্ডিত, উচ্চশিক্ষিত এবং সুদক্ষ হওয়ায় ব্রাহ্মণরা রাজনৈতিক কর্তৃত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করতেন। এই ব্রাহ্মণরা ছিলেন প্রাচীন ভারতের ইংরেজ, যাঁদের তিনি 'ইংরেজ' বলে অভিহিত করেছেন। সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টি নিয়ে বঙ্কিম সামাজিক শক্তির সঙ্গে রাজনৈতিক শক্তির পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। তাঁর মতে, ব্রাহ্মণরা রাজনৈতিক শাসক বলে সাধারণভাবে বিবেচিত না হলেও তাঁরাই ছিলেন কার্যতঃ সমাজের প্রভু। কিন্তু বঙ্কিম বর্ণ-বৈষম্যে আদৌ আস্থাশীল ছিলেন না। তিনি বর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে প্রভুত্ব বিস্তার প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই 'বর্ণ পীড়ন' এবং ধর্মশাস্ত্র পীড়ার বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর মতে, বিশ্বে যত ধরনের সামাজিক অসাম্য বর্তমান রয়েছে, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর হোল প্রাচীন ভারতের বর্ণ-বৈষম্য। তিনি এই অভিমত পোষণ করেছেন যে, প্রাচীন ইউরোপে বিজেতা প্রভু ও বিজিত বন্দীর মধ্যেকার সম্পর্কও বর্ণ-বৈষম্যের মতো নিষ্ঠুর ছিল না। বর্ণ ব্যবস্থা কীভাবে আইন, ন্যায়বিচার ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য ডেকে এনেছিল, তা তিনি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, জ্ঞানের বিকাশ সব অগ্রগতির কেন্দ্রবিন্দু হলেও ব্রাহ্মণরা শূদ্রদের জ্ঞান লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল। 'সাংখ্যদর্শন' নামক রচনায় বঙ্কিম মন্তব্য করেছেন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল শিক্ষা হোল জ্ঞানই শক্তি এবং হিন্দুরা বলেন জ্ঞানই মুক্তি। কিন্তু শূদ্ররা ঐ শক্তি এবং মুক্তি থেকে বঞ্চিত। এইভাবে শ্রমোপজীবীদের তথা শূদ্রদের ওপর বুদ্ধ্যুপজীবী তথা ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য বা প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মিথ্যা চেতনার সৃষ্টি, মনোজগতের ওপর আধিপত্য তথা প্রভুত্ব বিস্তার এবং সেই কাজে বুদ্ধ্যুপজীবী শ্রেণীর ভূমিকা, জ্ঞানই শক্তির সমার্থক প্রভৃতি যেসব ধারণার অবতারণা বঙ্কিম করেছেন, সেগুলির মধ্যে আমরা খুঁজে পাই মার্কস, গ্রামসি কিংবা ফুকোর আধুনিকতম সুগভীর চিন্তা-ভাবনা।

(গ) লিঙ্গগত বৈষম্য ঃ বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' গ্রন্থের পঞ্চম তথা শেষ অধ্যায়ে লিঙ্গগত বৈষম্যের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রেও তিনি মিলের 'দ্য সাবজক্শন অব্ উইম্যান' দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। 'প্রাচীনা ও নবীনা' নামক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে, পুরুষ এবং নারী — এই দু'টি সমান ভাগে সমাজ বিভক্ত। এদের সম-অগ্রগতি ছাড়া সমাজের সাধারণ অগ্রগতি কখনই সাধিত হতে পারে না। 'সাম্য' নামক গ্রন্থে তিনি বলেছেন যে, সব মানুষেরই সমান অধিকার রয়েছে। যেহেতু স্ত্রীলোকেরাও মানুষ, সেহেতু পুরুষদের মতোই তাদেরও সমানাধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সব দেশেই, বিশেষতঃ ভারতে নারীরা পুরুষদের দাস মাত্র। বঙ্কিম নারীদের সংসারের 'তৈযসপত্র' এবং 'খাঁচায় আবদ্ধ পশু'-র সঙ্গে তুলনা করেছেন। পশুদের ক্লেশ নিবারণের জন্য বিভিন্ন সমিতি থাকলেও পুরুষের কর্তৃত্বের কারাগারে বন্দী নারীদের ক্লেশ নিবারণের সেরূপ কোন ব্যবস্থা না

থাকায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। নারীরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, উত্তরাধিকার কিংবা চলাফেরার অধিকার থেকে বঞ্চিত, এমনকি, তাদের জীবিকার্জনের স্বাধীনতাও নেই। তাঁর ভাষায়, "এখানে রমণী পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনী; যে বুলি পড়াইবে, সেই বুলি পড়িবে। আহার দিলে খাইবে, নচেৎ একাদশী করিবে। পতি অর্থাৎ দেবতাস্বরূপ।" বঙ্কিম স্ত্রীলোকেদের শিক্ষাদানের জন্য পৃথক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এবং সহশিক্ষার ব্যবস্থা করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এমনকি, তিনি পুরুষদের মতোই তাদের জীবিকার্জনের অধিকার প্রদান করার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি গৃহকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের মতো পুরুষদেরও আত্মনিয়োগ করার দাবি জানিয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র আর এক ধরনের লিঙ্গগত বৈষম্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তা হোল — নারীদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা। তিনি পৈত্রিক সম্পত্তির ওপর নারীদের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার সপক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। পুরুষদের বহুবিবাহ, লাম্পট্য, মদ্যপান ইত্যাদির কঠোর সমালোচনা করতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। তাঁর 'বিষবৃক্ষ' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ পরনারী-আসক্ত স্বামীর প্রতি যথাক্রমে সূর্যমুখী ও ভ্রমরের নিজ নিজ পতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার যৌক্তিকতাকে তিনি সমর্থন করেছেন। কিন্তু পুরুষদের মতো নারীদের পুনর্বিবাহের প্রশ্নে বঙ্কিম ছিলেন কিছুটা দ্বিধান্বিত। 'বাহুবল ও বাক্যবল' নামক প্রবন্ধে তিনি বিধবা বিবাহের সপক্ষে সোচ্চার হলেও 'সাম্য' নামক গ্রন্থে তাঁর মন্তব্য হোল — বিধবা বিবাহ ভালও নয়, আবার মন্দও নয়। তাদের এই অধিকার থাকা উচিত হলেও বিধবাদের পুনর্বিবাহ আদৌ ভাল জিনিস নয়।

সমালোচনা ঃ

নানা দিক থেকে বঙ্কিমের সাম্য-চিন্তার সীমাবদ্ধতাগুলিকে তুলে ধরা যেতে পারে ঃ

(১) বঙ্কিম ফরাসী বিপ্লবের জন্য রুশোর চিন্তাকেই কেবল গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের রুশোর অবদান থাকলেও সমকালীন ফ্রান্সের বিষয়গত উপাদানগুলির গুরুত্বকে অস্বীকার করা হলে ইতিহাসের প্রতি অবিচার করা হবে। বলা বাহুল্য, বঙ্কিম ঐসব উপাদানকে যথেষ্ট গুরুত্ব না দিয়ে ইতিহাসের প্রতি সত্যনিষ্ঠ থাকতে পারেননি।

(২) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে ব্রিটিশদের 'চিরস্থায়ী কলঙ্ক' বলে বর্ণনা করেও তিনি সমাজ-বিপ্লবের ভয়ে এরূপ বন্দোবস্তের অবসান ঘটানোর বিরোধিতা করেছেন। তাছাড়া, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্যায় ও কুফল, জমিদারদের নির্যাতন, কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করলেও তিনি মন্তব্য করেছেন, "আমরা জমিদারের 'দ্বেষক' নহি। কোন জমিদার কর্তৃক কখনও আমাদের অনিষ্ট হয় নাই। বরং অনেক জমিদারকে আমরা বিশেষ প্রশংসাভাজন বিবেচনা করি।" আবার, কখনও তিনি মন্তব্য করেছেন, "আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা 'জমিদার সম্প্রদায়' সম্বন্ধে বলিতেছি না"। তাঁর এরূপ স্ব-বিরোধী বক্তব্য লক্ষ্য ক'রে প্রখ্যাত মার্কসবাদী লেখক বদরুদ্দীন উমর মন্তব্য করেছেন, "ঊনিশ শতকে ভারতীয় প্রতিক্রিয়ার অন্যতম প্রধান প্রতিনিধি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষকদের নিদারুণ বিপর্যয়ের কথা স্মরণ করে মাঝে মাঝে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করলেও ইংরেজ-সৃষ্ট সামন্ত-স্বার্থের ধারক, বাহক ও সেবক হিসেবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সপক্ষে ... বক্তব্য হাজির করেন।" বদরুদ্দীন উমর একথাও বলেছেন যে, "বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা সাধারণভাবে উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর চিন্তা থেকে পৃথক ছিলো না।" কারণ, ঘোর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অজুহাতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান না ঘটানো, সামাজিক বিপ্লবের অননুমোদন প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্যে প্রবল শ্রেণী-সচেতনতা এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রতি অনুরোক্তি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

(৩) 'বাংলাদেশের কৃষক'-এ বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই স্বীকার করেছেন, যে, তিনি কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা অবসানের জন্য সরকার কিংবা জনগণের কাছে অভিযোগ পেশ করেননি। তার পরিবর্তে তিনি জমিদারদের কাছে অভিযোগ জ্ঞাপন করেছেন। তাই সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মন্তব্য হোল অভিযুক্ত ব্যক্তিরাই হলেন বিচারক। আর বঙ্কিম

তাঁদের কাছেই অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। শ্রী চৌধুরীর মতে, এছাড়া বঙ্কিমের কাছে আর কোন বিকল্প ছিল না। কারণ, জনগণের কাছে এই অভিযোগ পেশ করা হলে কৃষক বিদ্রোহ দেখা যাবে। আর শ্রেণীগত কারণেই তিনি এরূপ বিদ্রোহ আন্তরিকভাবেই চাননি। তাই বদরুদ্দীন উমর বঙ্কিমকে 'কৃষকদের একজন শ্রেণীশত্রু' বলে চিহ্নিত করেছেন। সম্ভবতঃ তাঁর এই শ্রেণীগত চিন্তার বন্যায় বঙ্কিমের যাবতীয় প্রগতিশীলতা খড়কুটোর মতো ভেসে গিয়েছিল। তাই পরবর্তী সময়ে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, 'সাম্যটা সব ভুল' এবং তিনি সাম্য সম্পর্কে তাঁর পূর্ব অভিমত প্রত্যাহার ক'রে নেন ও 'সাম্য' গ্রন্থটির প্রচার বন্ধ ক'রে দেন। এমনকি, 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এর পুনর্মুদ্রণের ভূমিকাতে তিনি লিখেছিলেন, "বঙ্গদেশের কৃষকে' দেশীয় কৃষকদিগের যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আর নাই। জমিদারের আর সেরূপ অত্যাচার নাই ... কৃষকদিগের অবস্থারও অনেক উন্নতি হইয়াছে। অনেক স্থলে এখন দেখা যায় প্রজাই অত্যাচারী, জমিদার দুর্বল।" বঙ্কিমের এরূপ পরিবর্তনের কারণ হোল তাঁর ওপর হিন্দুধর্মের অস্বাভাবিক প্রভাব বৃদ্ধি। এর প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর ধর্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণচরিত্র', 'শ্রীমদ্ভাগবত গীতা', 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম', প্রভৃতি রচনার মধ্যে। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে আহমদ শরীফ মন্তব্য করেছেন যে, এমনিতে মানুষের জীবনে স্ববিরোধিতা থাকেই। তাছাড়া, উনবিংশ শতাব্দী ছিল নব্যবঙ্গে অস্থিরতা ও স্ববিরোধিতার কাল। শেষ দশ বছরে বঙ্কিম 'চিত্তসুদ্ধি' নামক অমৃতের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই 'চিত্তসুদ্ধি' আসে ধর্মবোধ ও ধর্মভাব থেকে। তাই বঙ্কিম বলেছিলেন, 'মনুষ্য জীবনের সর্বাংশই ধর্ম কর্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। ইহাই হিন্দু ধর্মের প্রকৃত ধর্ম।' অন্য এক সময় তিনি লিখেছিলেন, 'কেবল হিন্দু ধর্মই সম্পূর্ণ ধর্ম।' এইভাবে সাম্য থেকে ধর্মতত্ত্বে উপনীত হওয়ার জন্য বঙ্কিমকে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়। কিন্তু তাঁর সেই চলা সামনের দিকে নয়, পেছনের দিকে। সাম্যের পূজারী বঙ্কিমের ঈশ্বর-পূজারীতে রূপান্তর তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার স্ববিরোধিতারই প্রকাশ মাত্র। তাই নারী-মুক্তির তত্ত্বে আস্থাশীল হয়েও শেষ পর্যন্ত তিনি তার বাস্তব রূপায়ণকে সমর্থন করতে পারেননি। যে-বঙ্কিম একদিন নারীর স্বাধীনতা ও সমানধিকারের কথা বলে আধুনিক নারীবাদীদের পথপ্রদর্শক হিসেবে নিজের দাবিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন, তিনিই কিনা শেষ পর্যন্ত 'পতি পরম গুরু' তত্ত্বের প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। এর প্রমাণ হিসেবে দেবী চৌধুরানীর চূড়ান্ত পরিণতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে ঋষি বঙ্কিম গুরুমুখ-নিঃসৃত বাণী হিসেবে শিষ্যকে শোনান — স্বামী ঈশ্বরস্বরূপ। অথচ নারী তাকে বন্ধু, এমনকি ভৃত্য হিসেবে গণ্য করতে চায়। এর থেকে অধর্ম আর কী হতে পারে! এখানে বঙ্কিম-মানস সামন্ত-সমাজের চার দেওয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ।

উপসংহার ঃ

নানা প্রকার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বঙ্কিমের সাম্য-চিন্তা আজও পাঠকের বিস্ময় উদ্রেক করে। কারণ, উনিশ শতকে 'ভদ্রলোক ও ছোটলোক', 'ধনসঞ্চয়', 'শ্রমোপজীবী', 'বুদ্ধ্যুপজীবী', বৈষম্য', 'পীড়ন', 'প্রভুত্ব' প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর যে-বিশ্লেষণ, তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য আজকের বিশ্বেও সমভাবে প্রযোজ্য। সর্বোপরি, তাঁকে বিচার করতে হবে তাঁর যুগের আলোতে। সে যুগে দাঁড়িয়ে তিনি এ যুগের কথা বলতে পেরেছিলেন। আর সেজন্যই তিনি হতে পেরেছেন কালজয়ী বঙ্কিম।

References :

1. B N Ganguly, *Concept of Equality : the Nineteenth Century Indian Debate* (1975)
2. M K Haldar, *Renaissance and Reaction in Nineteenth Century Bengal* (1973)

3. Sisirkumar Das, *The Artist in Chains : The Life of Bankimchandra Chatterjee* (1984)

4. Tapan Ray Chaudhuri, *Europe Reconsidered : Perceptions of the West in Nineteenth Century Bengal,* (1988)

5. Kalyan Bhattacharya, 'Sociology of inequalities : Bankimchandra's Essay of *Samya' in the Journal of Socio-Political Studies*, vol. 1, No. 1, 1992.

6. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *বঙ্কিমচন্দ্রের জমিদার ও কৃষক* (১৯৮৮)

7. অমলেশ ত্রিপাঠী, বঙ্কিম চিন্তায় পাশ্চাত্য প্রভাব', *দেশ*, সাহিত্য সংখ্যা, (১৩৯৫)

8. অসীম দাশগুপ্ত, 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও নিবারণ চক্রবর্তী, *বিষয় স্বাধীনতা ও অন্যান্য বিষয়* (১৯৯২)

9. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, 'সাম্যবাদী বঙ্কিমচন্দ্র', *পশ্চিমবঙ্গ,* বঙ্কিম সংখ্যা (১৪০২ বঙ্গাব্দ)

10. প্রশান্ত বিহারী মুখোপাধ্যায়, 'বঙ্কিম জীবনদর্শন', *পশ্চিমবঙ্গ,* বঙ্কিম সংখ্যা (১৪০২ বঙ্গাব্দ)

11. রাখালচন্দ্র নাথ, 'বঙ্কিমচন্দ্র কি প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন'?, *পশ্চিমবঙ্গ,* বঙ্কিম সংখ্যা, (১৪০২ বঙ্গাব্দ)

12. সৌম্যেন্দ্র কুমার গুপ্ত, 'বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক' ঃ উৎসের সন্ধানে', *অনীক,* বঙ্কিম মূল্যায়ন সংখ্যা (১৯৯০)

13. বদরুদ্দীন উমর, 'বঙ্কিমচন্দ্রের আর্থ-সামজিক চিন্তা', *অনীক,* বঙ্কিম মূল্যায়ন সংখ্যা, (১৯৯০)

14. সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, 'বঙ্কিমচন্দ্রের বিপ্লব চিন্তা', *অনীক,* বঙ্কিম মূল্যায়ন সংখ্যা, (১৯৯০)

15. দীপঙ্কর চক্রবর্তী, 'বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনীতি', *অনীক,* বঙ্কিম মূল্যায়ন সংখ্যা (১৯৯০)

তৃতীয় পাঠ

গান্ধী

Basic Precepts of Satyagraha

Unit - I

সত্যাগ্রহের অন্তর্নিহিত মৌল ধারণাগুলি স্বয়ং গান্ধী লর্ড হ্যান্টারের নেতৃত্বে গঠিত Disorder Inquiry Commitee-র এক অধিবেশনে 9th Janu. 1920 আমেদাবাদে প্রশ্নোত্তরের সময় স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। প্রশ্নের জবাবে তিনি সংক্ষেপে বলেন সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হল লক্ষ্য পূরণের জন্য হিংসার বিকল্প পথ নির্ধারণ করা যা সম্পূর্ণত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, এটি হল রাজনৈতিক জীবনে domestic law প্রয়োগের প্রচেষ্টা। পরিবারের মধ্যে কেবল অন্যায় বা অবিচারের প্রতিকারের জন্য যখন মানুষ নিজে কৃচ্ছসাধন করে অন্যদের সংশোধন করতে চেষ্টা করে, কিন্তু অন্যায়কারীকে আঘাত করে না, সত্যাগ্রহ হল সেই ধরনের একটি অস্ত্র বা পদ্ধতি। গান্ধী বোঝাতে চেয়েছিলেন সত্যাগ্রহ ধারণার মধ্যে সেইজন্য তিনটি উপাদানকে মৌল বলা যেতে পারে, truth বা সত্য, Non-Violence বা অহিংসা, এবং Self-suffering বা আত্মনিগ্রহ।

গান্ধী বলেছিলেন এই সত্যাগ্রহ অস্ত্র হিসাবে ব্যবহারে যে বিশেষ প্রয়োগ দক্ষতা দরকার তার উপরই তার সার্থকতা নির্ভর করবে। গান্ধী বোঝাতে চেয়েছেন যেকোন নিরস্ত্র আন্দোলন সত্যাগ্রহ নয়। তিনি সত্যাগ্রহ ধারণাকে 'দূরাগ্রহ' থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করতে চেয়েছেন। আপাত দৃষ্টিতে অনেক নিরস্ত্র আন্দোলন সত্যাগ্রহ মনে হতে পারে, কিন্তু তার মূল কথা হল 'soul force' আত্ম শক্তি।

সত্যাগ্রহের প্রথম মৌল নীতি truth বা সত্য সম্পর্কে গান্ধী বলেছেন সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা তাকে এক বিশেষ শক্তিমণ্ডিত করে, যখন সেটি love force বা প্রেমের শক্তিতে পরিণত হয়। তিনি সত্যকে that which is, অর্থাৎ যা আছে, যার ক্ষয় নেই, যা অবিনশ্বর এবং শাশ্বত, তার সাথেই তুলনা করেছেন। ফলে সত্য এবং অসত্য অর্থাৎ যা নেই এবং থাকতে পারে না তাদের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সত্যের এই চরমত্বের স্বীকার, তার বিশ্বজনীনতা, অসীমত্ব গান্ধীর চোখে অভ্রান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, এই সত্য কীভাবে অর্জন করা যাবে ? গান্ধী স্বীকার করেছিলেন মানুষের পক্ষে সমগ্র সত্যকে জানা সুকঠিন। তার একমাত্র চেষ্টা হবে সত্য উপলব্ধির সঙ্গে নিজের জীবনকে যথাসাধ্য সেই আদলে গড়ে তোলা। বলা বাহুল্য এই আদর্শ জীবন সত্যনিষ্ঠভাবে যাপন করতে হলে মানুষকে কর্ম ও চেতনায় হিংসা পরিহার করতে হবে। গান্ধীর কথায় তাই সত্য হল চরম, end বা উপেয়, আর সেই সত্য অর্জনের means বা উপায় হল অহিংসা।

গান্ধী বলেছেন প্রতিটি মানুষ নিজের জীবনে সত্যের একটি খণ্ডিত অংশকেই উপলব্ধি করতে পারে। স্বভাবতই সত্য সম্পর্কে শেষ কথা বলা (finality) বা অভ্রান্ততা (infallibility) দাবী করা অসম্ভব। প্রত্যেক মানুষকে স্বীকার করতে হবে যে অন্যদের বক্তব্যের মধ্যেও সত্যের উপাদান থাকতে পারে, ফলে সত্য হয়ে পড়ে আপেক্ষিক, যার অর্থ হল অন্যের বক্তব্য এবং অবস্থান সম্পর্কে সহনশীলতা।

সত্যাগ্রহের দ্বিতীয় মৌল নীতি অহিংসা সম্পর্কে গান্ধী প্রথম থেকেই বলে এসেছেন যে, যেকোন ধরনের সামাজিক তাৎপর্যপূর্ণ কাজ যদি সত্য উপলব্ধির দিকে অগ্রসর হয়, তাহলে তার "অনিবার্য্য অনুসিদ্ধান্ত হবে অহিংসা"।

গান্ধী বলেছেন এই সত্য গুহায় বসে ধ্যান করে পাওয়া যায় না, জাগতিক সম্পর্ক মুক্ত জীবন যাপন মানুষের সত্য দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে। সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেই তাই সত্যের অনুসন্ধান করতে হবে।

গান্ধী বলেছেন অহিংসা তার জীবন বিশ্বাসের শেষ কথা। এই অহিংসাকে তিনি তার creed বা মতবাদেরও শেষ কথা বলেছেন। তিনি অহিংসার সংজ্ঞায় বলেছিলেন "পূর্ণ স্বার্থশূন্যতা"। এই স্বার্থশূন্যতার অর্থ হল আত্মসম্পর্কিত সমস্ত চিন্তাভাবনা থেকে নিজেকে মুক্ত করা। গান্ধী স্পষ্টতই বলেছেন, অহিংসার অর্থ কেবল জীব হত্যা থেকে বিরত থাকা নয়, ফলে অহিংসার মর্মবস্তুতে কোন নঞর্থক ধারণা বা তাৎপর্য নেই। অনেকের মনে হতে পারে অন্যের কোন ক্ষতি না করাই অহিংসা। সেখানে কার্যত নিষ্ক্রিয়তার ধারণা প্রশ্রয় পায়। গান্ধী তার বিপরীতে বলেছেন অহিংসার তাৎপর্য হল সদর্থক, অর্থাৎ সমস্ত কাজের মধ্যে দিয়ে অন্যকে ভালোবাসা, এমনকি যে ক্ষতি করে কিংবা করতে চায় তারও কল্যাণ করা, (doing good to the evil doer)। এই প্রসঙ্গেই গান্ধী বলেছেন অন্যায় সহ্য করা তাই পাপ। তিনি স্পষ্টত বলেছেন, "সক্রিয় অহিংসা হল অন্যায়কারীর প্রতিরোধ করা"।

গান্ধী যে অহিংসার তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন সেটি ছিল সর্বতোভাবে active বা সক্রিয় এবং militant বা জঙ্গীয়ানার তত্ত্ব। এখানেই অহিংসার গতিময়তার দিক, সবকিছুর উপরে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। গান্ধীর অহিংসা ধারণায় অন্যায় ও অন্যায়কারীর প্রতি সবিনয় সমর্থন বা অনুমোদনের কোন স্থান নেই। এই দৃষ্টিকোণ থেকে গণ-আন্দোলনে অহিংসাকে তিনি যখন কৌশল (technique) রূপে গ্রহণ করতে চান, তখন তার তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

Self-Suffering বা আত্ম নিগ্রহ সত্যাগ্রহের তৃতীয় মৌল নীতি। চিরায়ত হিন্দু শাস্ত্রে আত্মনিগ্রহ বা কৃচ্ছসাধনকে তপস্যা বলা হয়েছে। মানুষ তপস্যা করে মোক্ষ বা নিজের মুক্তি লাভের জন্য। গান্ধী এই তপস্যাকে সামাজিক পরিসরে প্রয়োগ ও অনুসরণীয় করতে চেয়েছিলেন। তার লক্ষ্য আত্মমুক্তি ছিল না, তিনি সকলের মুক্তির কথাই ভেবেছিলেন।

সত্যাগ্রহে এই আত্মনিগ্রহ প্রয়োগ করা হবে প্রথমত বিরোধী পক্ষকে নৈতিকতার দিক থেকে মত পরিবর্তন করে স্বমতে আনার জন্য। সুতরাং একজন সত্যাগ্রহী নিজের ব্যক্তি চরিত্রের দৃঢ়তা, পবিত্রতা, অবিচল লক্ষ্যমাত্রা এবং সেগুলি পূরণের জন্য যেকোন কষ্ট স্বীকার, সম্মতি, এই সবকটি উপাদান দিয়ে একত্রে বিরোধী পক্ষের ভাবান্তর বা হৃদয় পরিবর্তনের জন্য কাজ করবে। গান্ধী বলেছেন এই বিশেষ অর্থে আত্ম নিগ্রহ প্রয়োগ করা হলে তখন আর শারীরিক কষ্ট থাকে না। হাসি মুখে অন্যের পরিবর্তনের জন্য যখন কেউ আত্মনিগ্রহ করে তখন যে বিপুল শক্তির উদ্ভব ঘটে সেটাই মানুষকে সব কাজে সফল করে তোলে।

আত্মনিগ্রহের একটি সদর্থক হাতিয়ারগত মূল্য আছে। এই আত্ম নিগ্রহ প্রকটভাবে চোখে পড়ার মত ঘটনা নয়। মানুষ নীরবে একান্ত যখন স্বার্থশূন্য হয়ে অন্যের জন্য আত্মনিগ্রহ করে তখন তার অভিঘাত ব্যাপক হয়ে ওঠে। গান্ধীর কাছে এই আত্মনিগৃহ কোন বিশেষ ধরনের মানসিক প্রবণতা বা কুসংস্কার ছিল না। তিনি কখনো একথা বলেননি এবং বিশ্বাসও করেন নি যে, কোন সম্পূর্ণ অজানা, অনিশ্চিত বিষয়ের জন্য আত্মনিগ্রহ করা যায়। আত্মনিগ্রহের লক্ষ্য থাকে গান্ধী এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন আত্মমগ্ন, অবিবেকী, সামাজিক চৈতন্যহীন মানুষদের মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই আত্ম নিগ্রহের প্রয়োজন আছে। ফলে তার মধ্যে একটি conscious sacrifice বা সচেতন ত্যাগের দিক আছে। এই ত্যাগ দু'রকমের হতে পারে, যথা — জাগতিক সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি, আর জাগতিক সমস্ত বন্ধনের মধ্যে থেকে সব কিছু ত্যাগ করার আনন্দ উপলব্ধি করা। "অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ মহানন্দময়" ধারণার সঙ্গে গান্ধীর এই বক্তব্যের আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করা যায়।

গান্ধী বলেছেন, আত্ম নিগ্রহের মধ্যে দিয়ে মানুষ যখন মৃত্যু বরণের ঝুঁকি নেয়, তখনই সত্যাগ্রহের বিপুল শক্তি প্রকাশ পায়। বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে গান্ধী এই আত্ম নিগ্রহকে অস্ত্র রূপে ব্যবহার করে প্রমাণ করে

দিয়েছিলেন যে এই অস্ত্র কোথায় ব্যবহার করা হবে এবং কখন ব্যবহার করা হবে সে ব্যাপারে কোন বাঁধা ধরা ছক কাটা নিয়ম নেই। এক কথায় বলা যায় গান্ধী আত্মনিগ্রহকে কোন dogma-য় পরিণত করেননি। যখন কোন লক্ষ্য পূরণের জন্য মানুষ আত্মাহুতি দেওয়ার চেষ্টা করে, তখন তাকে আত্মনিগ্রহের একটি চরম দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখ করা হয়। গান্ধীর পথের সঙ্গে তার হুবহু মিল না থাকলেও এই আত্মাহুতির নৈতিক শক্তি অস্বীকার করা যায় না। সত্যাগ্রহ তত্ত্বের এই তিনটি মৌল উপাদান গান্ধীর জীবনদর্শন তথা রাজনৈতিক চিন্তাভাবনায় কেন্দ্রীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

Satyagraha as a technique

Unit - II

গান্ধী সত্যাগ্রহকে যেভাবে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন, সাধারণ মানুষের ধারণার থেকে তার পার্থক্য খুব বেশি। সত্যাগ্রহের নানা রূপ হতে পারে, প্রত্যেকটি রূপের স্থান কাল এবং পাত্রপাত্রীগত বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। তার জন্যই বস্তুত টেকনিক হিসাবে সত্যাগ্রহের মধ্যে কিছু কিছু তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন ভারতে গান্ধী এই সত্যাগ্রহকে স্বাধীনতা আন্দোলনে দুইভাবে প্রয়োগ করেছেন, একবার আইন অমান্যের হাতিয়ার হিসাবে, আরেকবার অসহযোগ হিসাবে। গান্ধী লক্ষ্য করেছিলেন অসহযোগ সত্যাগ্রহ যে ধরনের জনশক্তির বিকাশ ঘটিয়েছিল, ১৯২০-২২ সালের সেই আন্দোলনগুলি মানুষের চেতনাকে উন্নত এবং ব্যাপক করার জন্য প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ১৯৩০-৩৩-এর আন্দোলন যে ভিত্তির উপর শুরু করা হয় তার পরিবেশ ও পরিস্থিতি ছিল আলাদা। তাই অসহযোগের পরিবর্তে আইন অমান্যকে সত্যাগ্রহের technique রূপে বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হয়।

গান্ধী সত্যাগ্রহকে অহিংস বিদ্রোহ বলেছেন, যার অর্থ হলো কোনভাবে হিংসার আশ্রয় না নিয়ে বিদ্রোহের স্বাভাবিক গুণ বা লক্ষণগুলি প্রকাশ কর। অসহযোগ আন্দোলনে এই অহিংস বিদ্রোহকে গান্ধী প্রয়োগ করেছিলেন "বিদেশী শাসনের অনাচারে জনগণের না জেনে বুঝে, সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় (unwitting and unwilling) অংশ গ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ" হিসাবে। তাই সেখানে ধর্মঘট, হরতাল, বয়কট এবং সরকারী কাজকর্ম বা প্রতিষ্ঠান থেকে পদত্যাগের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আইনঅমান্য আন্দোলনে বিদ্রোহ অনেক বেশী সুসংগঠিত এবং সরাসরি শুরু করার সুযোগ এসেছিল। গান্ধী তাই ধর্মঘট, হরতাল কিংবা বয়কটের উপর জোর দেননি, শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সরকারের আইনের গণ প্রতিরোধের ডাক দিয়েছিলেন। গান্ধী বারবার হুঁশিয়ারী দিয়েছেন যে, সত্যাগ্রহ টেকনিক হিসাবে প্রয়োগ করার সময় মনে রাখা দরকার তাৎপর্যের দিক থেকে এটি হল "moral equivalent of war" বা যুদ্ধের সমতুল্য নৈতিক দিক।

কোন যুদ্ধের মধ্যে যেমন লক্ষ্যপূরণের অনমনীয় দৃঢ়তা নিয়ে মানুষ কাজ শুরু করে, যে লক্ষ্য সম্পর্কে তার কোন সংশয় থাকে না, সত্যাগ্রহেও সেই রকম সংশয়াতীত উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করার প্রয়োজন হয়। কোন সত্যাগ্রহী অবিশ্বাস থেকে, ইতস্তত মনোভাব থেকে, অনন্যোপায় হয়ে এই টেকনিক সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করতে পারে না। গান্ধীর সত্যাগ্রহের টেকনিক সংক্রান্ত বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করা গেলে তার অন্যান্য কতকগুলি দিকের মধ্যে তিনটি স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। সেগুলি হল ঃ

(1) technique of rational discussion; (2) technique of self suffering to evoke love in others, এবং (3) demystifying a system of oppression.

(1) সত্যাগ্রহ কোন জটিল বিষয়ের সমাধানের জন্য এমনভাবে প্রযুক্ত হতে পারে যেখানে তার মূল লক্ষ্য হবে কোন বিরোধমূলক পরিস্থিতিতে সমাধানের সর্বোত্তম পথ খুজে বের করার জন্য সম্পূর্ণ যুক্তিভিত্তিক আলোচনা

এবং তার মাধ্যমে অন্যদের বোঝানোর চেষ্ট করে স্বমতে আনার উদ্যোগ নেওয়া। এখানে তাই একজন সত্যাগ্রহী যখন আলোচনার সূচনা করেন তখন তার লক্ষ্য থাকে প্রতিপক্ষকে নিজের ভুল ভ্রান্তি বুঝতে সাহায্য করার মাধ্যমে মত পরিবর্তনে উদ্বুদ্ধ করা। বলাবাহুল্য এই technique গণভিত্তিতে প্রয়োগ করা যায় না, তাকে ব্যক্তি বা বড়জোর গোষ্ঠীগত ভিত্তিতে প্রয়োগ করা সম্ভব।

Rational discussion শুরু হলে কোন বিরোধের মীমাংসা ঘটবেই, একজন সত্যাগ্রহী ততদূর প্রত্যাশা করেন না। তার উদ্দেশ্য থাকে খোলামনে বিনয়ের সঙ্গে নিজের অবস্থান ঘোষণা করে প্রতিপক্ষের বক্তব্যকে শোনা, তার যুক্তিগুলি অনুধাবনের চেষ্টা করা। সত্যাগ্রহী যদি মনে করে কেবল তার বক্তব্যই একমাত্র সত্য, প্রতিপক্ষের বক্তব্যের সত্যতা নেই, তাহলে এই টেকনিক ব্যর্থ হবে। বলাবাহুল্য কোন পক্ষ যদি সত্যের চূড়ান্ত রূপ সম্পর্কে নিঃসংশয় হয়, তাহলে rational discussion এ তার আপত্তি বা অসুবিধা থাকার কথা নয়, একেই যুক্তিসম্মত আলোচনার প্রথম দিক বলা হয়েছে।

কিন্তু দ্বিতীয় দিক হল সেই বাস্তবতা থেকে উদ্ভুত যেখানে দুটি পক্ষ সত্যকে সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছে। সত্যাগ্রহী সেই অবস্থায় অন্যের মত যথাসাধ্য বোঝার চেষ্টা না করলে, নিজের অবস্থান পূনর্বিবেচনায় সম্মত না হলে এই টেকনিক ব্যর্থ হতে বাধ্য। গান্ধী তাই এখানে পারস্পরিক বিশ্বাস বা trust এর উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন।

এই টেকনিক প্রয়োগে তৃতীয় দিক হিসাবে লক্ষ্য রাখতে হবে ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি যেন সত্যাগ্রহীর দৃষ্টিকোণ আচ্ছন্ন না করে। গান্ধী বলেছেন ঘৃণা, বিদ্বেষ পক্ষপাত ইত্যাদি ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি থেকে জন্মায়। স্বভাবতই rational discussion যদি এই সব অপবুদ্ধিগুলি এড়াতে না পারে সে ক্ষেত্রে তার সাফল্যের কোন সম্ভাবনা নেই।

গান্ধী স্বীকার করেছেন, বিরোধমূলক পরিস্থিতিতে সাধারণ rational discussion-এর পরিবেশ থাকে না। কারণ সেখানে মানুষ ব্যাপকভাবে নিজের মত সব কিছুর উপরে সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, ফলে এক ধরনের সংকীর্ণতা, বিশ্বাসের ঘাটতি, বিদ্বেষ, প্রতিপক্ষের অকল্যাণ কামনা, মানসিক জড়ত্ব এবং নিছক একগুয়েমি কাজ করে যা rational discussion-এর পরিপন্থী। গান্ধী বলেছেন এই টেকনিকের ত্রুটিগুলি দক্ষিণ আফ্রিকায় আন্দোলন পরিচালনা কালে তিনি বারবার লক্ষ্য করেছিলেন। অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত যে গান্ধী স্বয়ং আন্দোলনের সূচনা ও পরিচালনাকারী হয়েও মাঝে মাঝে নিজেকে মানসিকভাবে কিছুটা বিচ্ছিন্ন করে, অন্দোলনকারীদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে দুই পক্ষের বক্তব্য মূল্যায়নের চেষ্টা করতেন। এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে গান্ধী বোঝেন যে, rational discussion কোন বিরোধের মীমাংসায় টেকনিক হিসাবে প্রয়োগ করা খুব কঠিন কাজ।

কারণ মানুষের সত্য ধারণাগুলি পরিবেশ ও পরিস্থিতির সামান্য সুযোগে বিকৃত হয়ে যায়। তাৎক্ষণিক লাভক্ষতির অঙ্ক তাদের প্ররোচিত করে। নৈতিকতার প্রতি তীব্র আকর্ষণ নিজের মনে গড়ে তুলতে না পারলে কারো পক্ষেই এই টেকনিক সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি উপলব্ধি করেন ইওরোপীয়রা ভারতীয় এবং এশিয়াবাসীদের সম্পর্কে এমন একটি বদ্ধমূল ধারণা থেকে কাজ করে যে, নিজেদের অন্যায় অবিচার সম্পর্কে তাদের সমস্ত চেতনা নষ্ট হয়ে যায়। এশিয়াবাসীদের যদি অসভ্য বর্বর ধরে নেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে তাদের প্রতি অমানবিক আচরণে কোন বিবেক দংশন হওয়ার কথা নয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গরা ঠিক তাই করেছিল, সুতরাং বর্ণবাদ তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে চালু করতে কোন অসুবিধা হয়নি। গান্ধী তাই বলেছেন বিরোধের যেকোন স্তরে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি যদি objectivity হারায়, অর্থাৎ বাস্তবকে খোলা মনে দেখতে না চায় বা পারে, সে ক্ষেত্রে অপক্ষপাতমূলক অবস্থান প্রত্যাশা করা যায় না। সব সময় reason এবং rationality এই

দাবি করে যে যুক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সকলকে নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে হবে। কেবল তখনই বিরোধের মীমাংসায় যুক্তিযুক্ততার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন যুক্তিবোধের গুরুত্ব যে অনুপাতে স্বীকৃত হবে সেই অনুপাতেই কোন সমস্যার সমাধানে হিংসা প্রয়োগের সুযোগ কমে আসবে। তিনি যখন হিংসাকে অসত্য বলেন, তখন তিনি এটাই বোঝাতে চান অহিংসা এমন একটি শক্তি যা একান্ত ভাবে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, এই সত্য মেনে নেওয়া হলে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে অর্থাৎ Rational discussion এ বিরোধ মীমাংসা সহজ হয়।

গান্ধী অবশ্য reason কে নৈতিকতামুক্তভাবে মেনে নিতে পারেন নি, তাঁর মনে হয়েছিল যুক্তি নৈতিকতার স্পর্শ হারালে এমন Cold logic এ পরিণত হয়, বেশিরভাগ মানুষের মনের কাছে যার আবেদন সীমিত হয়ে পড়ে। তাই নৈতিকতার সংস্পর্শে এলে যুক্তির মহত্ব এবং গুরুত্ব দুটোই বাড়ে। বস্তুত তিনি অহিংসার তত্ত্বকে বিশ্বজনীন রূপ দেওয়ার তাগিদ থেকে নৈতিকতার সঙ্গে reason এর নিবিড় সম্পর্ক ঘটাতে চেয়েছিলেন।

বিশেষজ্ঞরা বলেছেন গান্ধী যখন অহিংসার কথা বলেন তখন তিনি নৃতত্বের সেই বিশেষ তাত্ত্বিক ধারণার উপর জোর দেন যেখানে 'মনুষ্যত্বম্ অদ্বিতীয়ম্'। ফলে এই মনুষ্যত্বের মাপকাঠি থেকে সব কিছু বিচার করা হলে reason একান্তভাবে নৈতিকতা বোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে।

গান্ধীর এই ধারণায় ontology বা জ্ঞানতত্ত্বের সঙ্গে কিছুটা পার্থক্য লক্ষিত হয়। সেখানে জ্ঞানের যে চরমত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, গান্ধী বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সেটি মানতে পারেন নি। তিনি বিশ্বাস করতেন সত্যের মত জ্ঞানও হল আপেক্ষিক, সুতরাং যেকোন সময়ে যেমন সত্যের চূড়ান্তরূপ দেখতে পাওয়া যাবে না, সেইরকম চূড়ান্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে reason এর সাবভৌমত্ব কায়েম করাও যাবে না। তাই সত্যাগ্রহীর পক্ষে পথ হল reason এর সঙ্গে morality এর সংমিশ্রণ করা।

গান্ধী মনে করতেন যুক্তি এবং নৈতিকতাবোধ একত্রে থাকলে পরেই মানুষের চিন্তা ও কাজের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য আসে। বিশুদ্ধ যুক্তি কিংবা বিশুদ্ধ নৈতিকতা বলে কিছু হয় না। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে এই পারমানবিক যুগে পদার্থবিদ্যার এমন অনেক নির্ভুল সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে যাচ্ছে যা কয়েক দশক আগে অকল্পনীয় ছিল।

গান্ধী যুক্তি ও নৈতিকতাবোধের সবচেয়ে বড় শত্রু হিসাবে হিংসাকে চিন্তা করেছেন। তিনি হিংসাকে বলেছেন Hydra-Headed Monster, যেহেতু হিংসা একবার প্রশ্রয় পেলে কোথায় কত ভাবে নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে তা কল্পনা করা যায় না। তাই হিংসাকে সর্বপ্রযত্নে বাদ দিতে হবে। চিরায়ত যুক্তিবোধ সত্যাসত্য, হিংসা অহিংসার প্রশ্নে যতদূর ভাবতে পেরেছিল, আধুনিক জগৎ তার থেকেও অনেক এগিয়ে গেছে। যেমন মনের ধর্ম, মানবধর্ম প্রভৃতি ধারণাগুলি চিরায়ত যুক্তি বোধের মধ্যে তেমন প্রাধান্য পায়নি, কিন্তু একালের মানুষ এইসব বিষয়গুলি মনে রেখেই যুক্তির কাঠামোকে নতুনভাবে সাজাতে বাধ্য হয়েছে। ফলে reason এবং violence, এই দুইয়ের মধ্যে যে dichotomy আছে তার ধারণা মানুষকে নতুন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করছে। গান্ধীর বক্তব্য তাই ছিল — হিংসার সর্বতোমুখী প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াগুলি লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে কেন Moralsuasion এত প্রয়োজন। মানুষ নৈতিকতা বর্জিত বিশুদ্ধ যুক্তি দিয়ে হিংসার মোকাবিলা করতে পারবে না। আর হিংসার মোকাবিলা করা না গেলে মানব সমাজ ও মনুষ্যত্বের ভিত্তিটাই ভেঙে পড়বে। পক্ষান্তরে মানুষ যদি নৈতিকতাবোধ থেকে অহিংসাকে গ্রহণ করে সেক্ষেত্রে তার এমন শক্তি ও উদ্দীপনা আয়ত্তাধীন হয় যা দিয়ে অসাধ্য সাধন করা সম্ভব। গান্ধীর rational discussion কে সত্যাগ্রহের অন্যতম টেকনিক বলার পিছনে এই মানসিকতা কাজ করছে বলে তত্ত্ববিদরা নিঃসংশয়।

(2) আত্ম নিগ্রহ কে সত্যাগ্রহের টেকনিক হিসাবে গ্রহণ করার পিছনে যে মানসিকতা কাজ করেছিল, তাকে অসত্য এবং হিংসার বিপরীতে Power of suffering love বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গান্ধী অসত্যের মোকাবিলা করার জন্য প্রতিপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চাইতেন। কিন্তু যখনই দেখা যেত সেইসব আলোচনা আসলে প্রচারের উদ্দেশ্যে সংগঠিত, তার পিছনে সমস্যা সমাধানের কোন আন্তরিকতা নেই, তখনই তাঁর মনে হয়েছিল যে, প্রতিপক্ষের মনে একটি নৈতিক সাড়া জাগানোর জন্য অহিংস নীতিতে অবিচল থাকতে গেলে তাকে আত্মনিগ্রহের পথ নিতে হবে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই টেকনিক প্রতিপক্ষকে ধীরে হলেও সুনিশ্চিতভাবে নিজের অবস্থান পূনর্মূল্যায়নে উদ্বুদ্ধ করবে। গান্ধী বিশ্বাস করতেন শুভেচ্ছার মনোভাব প্রতিপক্ষের মধ্যে জাগিয়ে তোলার কোন বিকল্প নেই।

যে কোন সত্যাগ্রহ শুরু করার পূর্বে গান্ধী নিজে এবং অন্যান্য সত্যাগ্রহীদের আত্মসমীক্ষার কথা বলতেন। সেগুলি হল ঃ (১) নিজের লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন, স্বচ্ছ ধারণা এবং তার স্বপক্ষে যুক্তির সমাবেশ; (২) সরকার কিংবা প্রতিপক্ষকে জনপ্রিয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া যে, সত্যাগ্রহীদের দাবি কতটা ন্যায়সঙ্গত এবং তার পিছনে জনসমর্থনের পরিমাণ কত বেশি; (৩) প্রতিপক্ষকে বুঝিয়ে দেওয়া এই সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য হল আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করার শেষ চেষ্টার চরম পত্র।

গান্ধী নিজের জীবনে প্রতিটি সত্যাগ্রহের ক্ষেত্রেই এই তিন মূল নীতি অনুসরণ করেছিলেন। তিনি যখন সত্যাগ্রহকে নৈতিক কাজ বলে উল্লেখ করতেন, যখন এই নৈতিকতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কোন সত্যাগ্রহ শুরু করার সময় হিংসা পরিহারে শপথ নেওয়ার জন্য বাধ্যবাধকতা কায়েম করেছিলেন, তখন এটাও বোঝাতে চেয়েছিলেন যে অন্যায়ের প্রতিবাদের জন্য সত্যাগ্রহ সেই অন্যায়ের অংশ হিসাবে যদি প্রতিপক্ষ সত্যাগ্রহীদের উপর হিংসা প্রয়োগ করে তাহলেও অহিংস থাকতে হবে।

আত্মনিগ্রহের মধ্য দিয়ে প্রতিপক্ষের মনে ভালোবাসার উদ্রেক করা সবসময়ই কতটা সম্ভব হয়েছে গান্ধী স্বয়ং তার কোন ব্যাখ্যা বিবরণ দেননি। তিনি অবশ্য বিভিন্ন সময়ে পরস্পর সম্পর্কিত কিন্তু তিন ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। **প্রথমত**, তিনি আত্ম নিগ্রহের মনস্তাত্ত্বিক অভিঘাতের কথা বলেছেন। তার মনে হয়েছিল কোন মানুষের পক্ষেই অন্যের উপর একটানা নির্যাতন চিরকাল চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কিছু দিনের মধ্যেই এই একপেশে নির্যাতনজনিত অবসন্নতা তার সমস্ত উদ্যোগ ব্যর্থ করে দেবে। গান্ধী বলেছেন প্রতিপক্ষ যতই ক্রুদ্ধ, হিংস্র হয়ে উঠবে ততই তার মনের উপর মনস্তাত্ত্বিক অভিঘাতের সম্ভাবনা বাড়বে।

দ্বিতীয়ত, গান্ধী সময় সময় আত্মনিগ্রহের ফলে ভালোবাসার আধ্যাত্মিক শক্তির উদ্ভব হয় বলে দাবি করেছেন। তার মনে হয়েছে যীশু যেভাবে আত্মনিগ্রহ সহ্য করে তার সমস্ত প্রতিপক্ষকে ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন, যেকোন কঠিন সমস্যার মোকাবিলায় একালেও সেই একই পথ গ্রহণ করা সম্ভব। তাঁর মনে হয়েছিল ভালোবাসা হল একটি অদৃশ্য নীরব শক্তি, যা মানুষকে শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকারে বাধ্য করে।

তৃতীয়ত, গান্ধী বলেছেন ভালোবাসার 'আধ্যাত্মিক অভিঘাত' এবং আত্মনিগ্রহের মনস্তাত্ত্বিক অভিঘাত এই দুইয়ের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় এমন এক সমুন্নত নৈতিকতাবোধের উদ্ভব ঘটে যা কঠিন সমস্যার সমাধানের পথ খুলে দিতে পারে। তখনই সব পক্ষই আত্মসমীক্ষায় বসে এবং নিজেদের ভুল ত্রুটিগুলি কোথায় কতটা ঘটেছে তার কারণ খোঁজে। সেটাই হল সমাধানের সুনিশ্চিত পথ।

গান্ধী তাঁর রাজনৈতিক জীবনের গোড়ার দিকে উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভালোবাসার জন্য কৃচ্ছসাধনের সীমাবদ্ধতা আছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ট্রান্সভাল আইনসভার কোন এক আইনের বিরুদ্ধে কয়েকমাস ধরে সত্যাগ্রহ

করেও কোন সুফল পাওয়া যায়নি। নাটালের imigration bill এর বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আরো দীর্ঘস্থায়ী এবং কষ্টকর হয়েছিল। সরকারের পক্ষ থেকে কার্যত কোন বিশেষ সুবিধা না দিয়েই গান্ধীকে আন্দোলন প্রত্যাহারে বাধ্য করা হয়েছিল। তাছাড়া suffering love যদি প্রভূত ক্ষমতা সম্পন্ন হত তাহলে উপরোক্ত কোন ক্ষেত্রেই সত্যাগ্রহের সাফল্য এমন অকিঞ্চিৎকর হত না। তাই এই নামমাত্র সাফল্য দেখেই গান্ধী বুঝেছিলেন, সত্যাগ্রহ সফল করতে গেলে একক উদ্যোগ নয়, সমষ্টিগত চাপ থাকার প্রয়োজন আছে। এই দঃ আফ্রিকাতেই দেখা গিয়েছে ১৯১৩ সালে খনি শ্রমিকদের তিনি ধর্মঘটে আহ্বান করেছেন, সেই ধর্মঘট যাতে ভেঙে না যায় তার চেষ্টা করেছেন, শ্রমিকদের একাংশে কাজে ফিরে যাওয়ার মানসিকতা দেখা গেলে সর্বপ্রযত্নে ঐক্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। ফলে খনির মালিক এবং সরকারের উপর চাপ পড়েছে ধর্মঘট অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এবং গান্ধী সফল হয়েছেন। সুতরাং ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা, যথেষ্ট সংখ্যক মানুষের সত্যাগ্রহী আন্দোলন তাকে সাফল্য এনে দিতে পারে। ব্যক্তির উদ্যোগ, তা যত আন্তরিকই হোক না কেন, সেই সাফল্য নাও আনতে পারে।

ভারতে ফিরে আসার পর গান্ধী আরো বেশি উপলব্ধি করেন যে, এই মহাশক্তিধর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ suffering, innocent suffering প্রভৃতিকে কোন গুরুত্বই দেয় না। সুতরাং সত্যগ্রহ ধারণায় পরিবর্তন আনা দরকার। **এই অভিজ্ঞতার সূত্রেই গান্ধী সত্যাগ্রহের সঙ্গে অভিনব, অত্যন্ত কার্যকর হাতিয়ার হিসাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বয়কট, আইন অমান্য, করদানে অস্বীকার, অহিংস প্রতিরোধ, ধর্মঘট এবং অন্যান্য উপকরণগুলি একের পর এক ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।** গান্ধী অনুভব করেন সরকারকে 'compell' এবং 'force' করার মত অবস্থায় উপনীত হওয়া না গেলে, suffering love পর্যায়ের সত্যাগ্রহ আদৌ ফলপ্রসূ হবে না। এই মানসিক পরিবর্তনের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যখন গান্ধী সত্যাগ্রহকে 'non violent warfare' (অহিংস যুদ্ধ); 'peaceful rebellion' (শান্তিপূর্ণ বিদ্রোহ); 'civilized form of warfare' (সুসভ্য যুদ্ধ); 'war bereft of violence' (হিংসাবর্জিত যুদ্ধ) প্রভৃতি নামে অভিহিত করতে থাকেন। গান্ধী সত্যাগ্রহের বর্ণনায় এইসব শব্দগুলি সচেতনভাবে প্রয়োগের সময় বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, তার সত্যাগ্রহ সম্পর্কে নিজস্ব ধারণায় Radical পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। শুধু তাই নয় যখন থেকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কট, ধর্মঘট এবং করদান বন্ধ করে দেওয়া হয়, তখন থেকে সত্যাগ্রহ প্রচণ্ড নিপীড়নমূলক হয়ে উঠেছে বলে যেসব অভিযোগ করা হয় গান্ধী তার গুরুত্ব অস্বীকার করতে পারেননি।

এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিতর্কিত প্রেক্ষিতেই গান্ধী তাঁর আরো বিতর্কিত technique হিসাবে fasting এর সূচনা করেন। অনশনকে সত্যাগ্রহ বলা হবে কিনা, সে বিষয়ে গান্ধী স্পষ্টভাবে কিছু বলেননি। রাজনৈতিক জীবনে তিনি ১৭বার অনশন করেছেন, স্বেচ্ছায় অনশনের মেয়াদ দীর্ঘ না করলে মোটামুটি সেগুলি সপ্তাহব্যাপী ছিল। এদের মধ্যে তিনবার অনশন করা হয়েছে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে, তিনবার সাম্প্রদায়িক ঐক্যের জন্য, চারবার হিংসার বিরুদ্ধে, একবার আমেদাবাদের ধর্মঘটি শ্রমিকদের নিজেদের শপথের প্রতি দায়বদ্ধ থাকতে, তিনবার আত্মশুদ্ধির জন্য এবং শুধু তিনবার সরকারের বিরুদ্ধে। এমনকি সরকারের বিরুদ্ধে অনশন একবার করা হয়েছিল রাজকোটে রাজার বিরুদ্ধে, একবার তার হরিজন পত্রিকা ও কাজ নিষিদ্ধ করে দেওয়ার জন্য ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে, আর একবারই মাত্র ভাইসরয় গান্ধীর অনুগামীদের হিংসাশ্রয়ী আন্দোলনের জন্য তাকে দায়ী করায় তার প্রতিবাদ স্বরূপ।

এই তালিকা থেকে বোঝা যায় ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে কোন রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্য অথবা কোন রাজনৈতিক চাপসৃষ্টির জন্য গান্ধী অনশন করেননি, তিনি জানতেন অনশন তার সমালোচক ও অনুগামী উভয় পক্ষকেই অত্যন্ত বিব্রত করে। তাই তাকে বারবার অনশনের সপক্ষে অনেক যুক্তি খাড়া করতে হয়েছে। গান্ধী বলেন সারা জীবন দেশের সেবায় উৎসর্গ করার জন্য তাঁর অধিকার জন্মেছে দেশবাসীর কোন

ভুলভ্রান্তির জন্য তিরস্কার করার; এবং তাদের ভুলভ্রান্তির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা তার কাছে 'ধর্ম' বলে মনে হয়েছে। এই অধিকারবোধ এবং ধর্মবোধ গান্ধীকে অনশনে প্রবৃত্ত করেছে। এটা হল একধরনের voluntary crucification (স্বেচ্ছামূলক আত্মবিসর্জন)। গান্ধী তাঁর অনশনের তিনটি লক্ষ্যমাত্রার কথা বলেছেন। প্রথমত, অনশন হল গান্ধীর নিজস্ব ভঙ্গিতে কোন কিছুর জন্য দুঃখ ও বেদনাবোধ প্রকাশ করা, তার প্রিয়জন অনভিপ্রেত কোন কাজ করলে তাদের বুঝিয়ে সংশোধন করার জন্য অনশন করা তার অন্যতম লক্ষ্য। দ্বিতীয়ত, তিনি তাঁর প্রিয় দেশবাসীর আচার আচরণের অসংগতি, অন্যায় প্রভৃতির প্রায়শ্চিত্ত করার দায় বহন করেন বলেই অনশন তার কাছে কর্তব্য বলে মনে হয়। তৃতীয়ত, অনশনের উদ্দেশ্য হল দেশবাসীর 'sluggish conscience' (ঝুলে পড়া বিবেকবোধ) জাগ্রত করতে, 'Sting them into action' (কোন কাজে সক্রিয় করে তুলতে); তাদের 'moral energies' (নৈতিক শক্তি) জাগ্রত করতে গান্ধীর মনে হয়েছিল অনশন হল একটি সুতীব্র আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা।" ভারতে মানুষ প্রায়শ্চিত্ত করে ভারতে যেভাবে আত্মশুদ্ধি করে গান্ধী অনশনে সেটাই করতে চেয়েছিলেন। সুতরাং অনশনের মধ্য দিয়ে তিনি যেমন জনগণের রাজনৈতিক কার্যাবলীর জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্বস্বীকার করে নিয়েছেন, তেমনই নৈতিক বিশুদ্ধতা সমস্ত কাজের মধ্যে বজায় রাখার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতেও চেয়েছেন।

গান্ধী বলেছেন অনশনের অভিঘাত হল একান্তভাবে নৈতিক, তিনি জানতেন তাঁর অনশন প্রভূত চাপ সৃষ্টি করে, যা একধরনের 'নৈতিক নিপীড়নে' (moral coercion) পরিণত হয়। কিন্তু এটা হল ক্রুশবিদ্ধ যিশু যেমন তার অনুগামী ও বিরোধীদের উপর নিপীড়ন করেছিলেন ঠিক তারই অনুরূপ। তাঁর অনশন যে কতটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে ডঃ অমিয় চক্রবর্তীর বিদেশ থেকে লেখা এক প্রতিবেদনে তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা আছে। সাধারণভাবে যেমন অনেকে মনে করেন কোন কঠিন সামাজিক বা রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূর করার জন্য অনশন ছিল গান্ধীর কাছে একান্ত নিজস্ব প্রতিবাদের একটি পদ্ধতি। তবু অনশনে গান্ধী যে চ্যালেঞ্জ প্রতিপক্ষকে জানাতেন তার মোকাবিলা না করে উপায় ছিল না। নিজে কৃচ্ছসাধন করে অন্যের বিবেককে জাগ্রত করার এই প্রচেষ্টা অনশন চলতে শুরু করলে ক্রমশ লক্ষিত হত। মানুষের উদ্বেগ তখন প্রকাশ পায় যখন গান্ধীজী কেমন আছেন — এই জিজ্ঞাসা মুখে মুখে ফেরে এবং ক্রমেই জিজ্ঞাসু মানুষের সংখ্যা সামাজিক স্তর নির্বিশেষে বাড়তে থাকে। মানুষ এই নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের মহিমা বুঝতে থাকে যার চাপ তখন কারো পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব হয় না।

গান্ধী স্বয়ং প্রশ্ন করেছিলেন-অনশন কে করবে কার, করার অধিকার আছে? তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল ব্যক্তিগত কোন প্রত্যাশা নিয়ে লাভ ক্ষতির অঙ্ক কষে অনশন করা যায় না। সম্পূর্ণ অন্যের প্রতি ভালোবাসায়, তার বা তাদের কল্যাণের জন্য নিজে কৃচ্ছসাধনের মানসিকতা থাকলেই কেবল অনশন করা সম্ভব। তাই অন্যের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে, গভীর ভালোবাসা থেকে এই অনশন করা সম্ভব। নিজের উপরে প্রচণ্ড নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা এবং অন্যদের সম্পর্কে মমত্ববোধ যার থাকে না সে অনশনের অনুপযোগী।

(৩) demystifying the sytem of opression- যেকোন শাসন ব্যবস্থা, বিশেষত ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা নিজের ক্ষমতা অপ্রতিহত রাখার জন্য একটা অপ্রতিরোধ্যতার বাতাবরণ সৃষ্টি করে। শাসিতদের মনে প্রথম থেকেই একটা সম্ভ্রম এবং নিজের শক্তিহীনতা সম্পর্কে গভীর বিশ্বাস গড়ে তোলা হল এই শাসন ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য। সেকাজ সম্ভব হলেই তখন তার শাসিতদের বশে রাখার জন্য শক্তি প্রয়োগ করতে হয় না। তাদের অনুগত্য প্রায় স্বতঃসিদ্ধের মত পাওয়া যায়। সমস্ত ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা এবং সব ধরনের শোষণের মূলে রয়েছে এই ধরনের রহস্যময়তা সৃষ্টির একটি নিরন্তর কৌশল। গান্ধী উপলব্ধি করেছিলেন এই কৌশলকে ব্যর্থ করতে হলে, দুর্বল মানুষদের আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এমন এক ধরনের প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে যা নিরস্ত্র ভাবেও মানুষকে সশস্ত্র প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করতে সক্ষম করে।

গান্ধী শাসন ক্ষমতার এই বিপুল রহস্য সৃষ্টির উদ্যোগ ব্যর্থ করার জন্য সত্যাগ্রহকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। নির্যাতনের যে ক্ষমতা রহস্যে ঘেরা তাকে যদি একবার সকলের চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া যায় আসলে নিপীড়িতদের তুলনায় তার শক্তি কম, তাহলেই নিরস্ত্ররা সশস্ত্রদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠবে। গান্ধী এই দৃষ্টিকোণ থেকেই সত্যাগ্রহের অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে শাসন ক্ষমতার প্রকৃতি বা স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। তার অপর লক্ষ্য ছিল নিপীড়িতদের মন ও হৃদয়কে সেই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করা যে তারাও যত বড় চ্যালেঞ্জ আসুক না কেন তার মোকাবিলা করতে সক্ষম। সমগ্র শাসন ব্যবস্থা যে একটি Power relation বা ক্ষমতা সম্পর্ক সেই ক্ষমতার আপেক্ষিকতা বুঝিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই গান্ধী সত্যাগ্রহকে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলেন।

রাষ্ট্র সব সময় বোঝাতে চায় কেবল তার হাতেই চরম ক্ষমতা আছে। কেবল তার পক্ষেই সম্ভব সকলকে আদেশ দেওয়া, যেকোন কাজ করতে বাধ্য করা। গান্ধী বোঝাতে চেয়েছেন রাষ্ট্রের আদেশ ও নির্দেশ যেখানে মানুষের সাধারণ স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, সেগুলি মেনে চলায় যেমন কোন অন্যায় বা আত্মগ্লানি নেই। ঠিক সেইরকম শাসকদের যেকোন অন্যায় ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ানো মনুষ্যত্বের অপমান মাত্র। শাসক শক্তি এই মনুষ্যত্বকে নষ্ট করে দেয়। যার ফলে মানুষ যন্ত্রের মত হুকুম তামিল করে। গান্ধীর সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য ছিল-

(১) শাসিতরা যে ক্ষমতাহীন নয় সেই উপলব্ধি ব্যাপকভাবে সৃষ্টি করা। নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা বা চেতনা না থাকার জন্য তারা কীট পতঙ্গের মত আচরণ করে। অর্থাৎ শাসকদের চোখে নিজেদের অকিঞ্চিতকরতা প্রকট করে তোলে। শক্তি যখন একটি অপ্রতিরোধ্য ধারণা হিসাবে ঔপনিবেশিক শাসকদের মনে বদ্ধমূল হয়ে যায় তখনই তা দুঃসহ হয়ে ওঠে। তার বিরুদ্ধে মানুষের নিজস্ব শক্তিকে জাগ্রত করার জন্যই সত্যাগ্রহ প্রয়োজন।

(২) গান্ধী লক্ষ্য করেছিলেন ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা নিজের অপরিমেয় ক্ষমতার প্রভাব সৃষ্টি করে শাসিতদের কাছ থেকে সহযোগিতা আদায় করে নিচ্ছে। ফলে তার অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ হয় না। বরং অন্যদের দেখিয়ে দেওয়া যায় এই ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা টিকে আছে শাসিতদের সম্মতি ও সহযোগিতার উপর। গান্ধী তাকে বলেছেন powerlessness of the debased people, যার অর্থ হল নৈতিক অবমূল্যায়নে ক্ষমতার বোধহীন ব্যক্তিদের উপর বিদেশীদের শাসন। এর বিরুদ্ধে প্রতিকার করতে গেলে আগে সাধারণ মানুষকে অনুভব করতে হবে শাসকদের মত তারাও সমান ক্ষমতাশালী। তাই দুর্বলের ক্ষমতা চেতনা বৃদ্ধি সত্যাগ্রহের লক্ষ্য।

(৩) যেকোন শাসন ব্যবস্থা নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য নিজের চারিদিকে এমন একটি রহস্যময়তার পরিমণ্ডল গড়ে তোলে যাতে শোষিতরা মনে করতে অভ্যস্ত হয় যার প্রতিকার নেই তাকে মেনে নেওয়াই ভাল। গান্ধী বলতে চেয়েছেন এই ধরনের মানসিকতা থেকে যখন মানুষ স্বেচ্ছায় শাসিত ও শোষিত হয়, তখন শোষণ ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য তাদেরও পরোক্ষ অবদান আছে মনে করা যায়। এককথায় শাসিতরা innocent নয়। গান্ধী মানুষের মনে এই চেতনা জাগ্রত করার জন্যই সত্যাগ্রহকে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করেছিলেন।

গান্ধীজির দঃ আফ্রিকার রাজনৈতিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা তাকে এটা বুঝতে সাহায্য করেছিল যে, সেখানকার নিতান্ত সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গদের বর্ণবাদী শাসনব্যবস্থা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের উপর যে ব্যবস্থা কায়েম করেছে তা বজায় থেকেছে এই জন্যই যে, এইসব কৃষ্ণাঙ্গরা কোনদিনই ক্ষমতার স্বরূপ বুঝতে পারেন নি কিংবা হয়ত বোঝার চেষ্টাও করেননি। সত্যাগ্রহ দিয়ে গান্ধী এই মানসিক পরিমণ্ডল ভাঙতে চেয়েছিলেন।

(৪) যেকোন নিপীড়ন নিজের স্বার্থেই কালক্রমে একটি সামগ্রিক ব্যবস্থা গড়ে, যেখানে শক্তি প্রয়োগের বদলে

আনুগত্যকে অভ্যাসে পরিণত করার চেষ্টা হয়। গান্ধী চেয়েছিলেন এইসব অভ্যস্ত আচার আচরণগুলিকে সত্যাগ্রহের মাধ্যমে সম্পূর্ণত বদলে দিতে।

গান্ধী বলেছিলেন ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার মত তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও নিজেকে টিকিয়ে রাখতে একই ধরনের কৌশল প্রয়োগ করে। সেটা যেমন দঃ আফ্রিকায়, ঠিক তেমনই ভারতেও ঘটেছে। সরকারের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা, কর্মসংস্থানের সুযোগ, সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি একটি ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো খুব হিসাব করেই চালু করে যাতে শাসিতদের একাংশে এই শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে একধরনের illusion সৃষ্টি হয়। তারই ফলে এই ব্যবস্থার অনুগ্রহ পুষ্ট একদল অকিঞ্চিৎকর ক্ষমতা ভোগকারী এলিট গড়ে ওঠে, যারা এই ক্ষমতা কাঠামো বজায় রাখার জন্য সব ধরনের তত্ত্ব এবং মোহ সৃষ্টি করে থাকেন। গান্ধী বলেছেন ভারতে যে, 'Mai-Baap Syndrome' গড়ে উঠেছে, যার অর্থ হল শাসকদের অনুগ্রহেই জীবনে পরিবর্তন আসতে পারে, নিজেদের পরিবর্তনের জন্য মর্যাদাপূর্ণ আত্মবিশ্বাসী প্রচেষ্টা দরকার নেই, গান্ধী তাকে দাসসুলভ মনোভাব বলে ভাঙতে চেয়েছিলেন। Demystification কথাটিকে তাই সচেতনভাবেই প্রয়োগ করা হয়েছে শাসক সৃষ্ট এই মানসিক জড়ত্ব ভেঙে দেওয়ার জন্যে। গান্ধী সমস্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে বলেছেন মানুষকে আত্মবিশ্বাসী, আত্মসমালোচক করা। মানুষ নিজের থেকে অন্যায়ের প্রতিকারের পথ না খুঁজলে অন্যায়কারীর সক্ষমতার অবসান ঘটে না। তখন নিপীড়নটা প্রায় সহজাত ব্যবস্থা বলে মনে হয়। সামাজিক পরিবর্তনের তাগিদে শাসক ও শাসিতদের মধ্যে ক্ষমতা সম্পর্কের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য সত্যাগ্রহ গান্ধীর কাছে একটি বিশেষ কার্যকর হাতিয়ার বলেই মনে হয়েছিল। গান্ধী সত্যাগ্রহকে যখন technique বলেন তখন সেই টেকনিকের যথাযথ প্রয়োগ মানুষ ও তার সমাজকে স্বনির্ভরতার দিকে নিয়ে যায়, এটাই ছিল তাঁর বিশিষ্ট ধারণা।

Selected Readings

1. Bose, N. K. : My days with Gandhi (Bombay 1943)
2. Brown, Judith, : Gandhi's Rise to Power in Indian Politics (Cambridge 1972)
3. Brown Judith, : Gandhi and Civil Obedience, The Mahatma in Indian Politics 1928-1934 (Cambridge 1977)
4. Dwarkadas K. : Gandhiji through My Diary Leaves 1915-'48 (Bombay 1950)

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

1. What are the features of Satyagraha ?
2. Was Satyagraha a philosophy or a way of life ? Is it a mere technique ?
3. Discuss critically Gandhi's theory of Trusteeship.
4. Examine the differences between Gandhian and Marxian Socialism ?
5. Critically discuss Gandhi's theory of State.

———————

চতুর্থ পাঠ
নেহেরু ও তাঁর সমাজতন্ত্র

ভূমিকা ঃ

১৯৩৩ সালে প্রকাশিত তাঁর 'জেলখানার ডায়েরী'তে আত্মসমীক্ষা করতে গিয়ে জওহরলাল লিখেছিলেন যে, পরবর্তী বছরগুলিতে 'পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী আনুগত্যে'র বিরুদ্ধে তাঁকে কঠিন সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। তাঁর এই আত্মসমীক্ষা ছিল অর্জিত অভিজ্ঞতা ও আত্মোপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। বস্তুতঃ, 'পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী আনুগত্যে'র টানাপোড়েনে সারা জীবন তাঁকে অস্থির থাকতে হয়েছে এবং তিনি নিজের সঙ্গে নিজেই লড়াই করেছেন। কিন্তু 'ঝড়ো হাওয়া আর পোড়ো বাড়ীর ভাঙা দরজা'কে কখনও মেলানো যায় না বলেই তিনিও তা মেলাতে পারেননি। তাই তাঁর সমাজতন্ত্র-সংক্রান্ত তত্ত্বের সঙ্গে প্রয়োগের সঠিক সমন্বয় কখনই সাধিত হয়নি।

সমাজতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ ঃ

কেমব্রিজে পাঠরত অবস্থাতেই নেহরু সমাজতন্ত্র, এমনকি সাম্যবাদের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ১৯১৯ সালে বাট্রান্ড রাসেল-লিখিত 'রোড্‌স টু ফ্রিডম' গ্রন্থের পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন, "যখন সময় আসবে, তখন সাম্যবাদের কোন-না-কোন রূপই (ভারতীয়) জনগণের প্রতিভার পক্ষে উপযোগী হয়ে দেখা দেবে। ... শুধুমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র পাশ্চাত্যের সমস্যাবলী সমাধানে যেমন ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি তা ভারতের নিপীড়িত আত্মাকে শান্তি দিতে পারবে না।" এর অর্থ — ঐ সময় নেহরু উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনই ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য হতে পারে না; সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাও হোল সেই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। তাই অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাবে প্রভাবিত নেহরু ১৯২০ সাল থেকেই শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার কাজে আত্মনিয়োগ করলে কংগ্রেসের মধ্যে থাকা রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় তাঁর চিন্তা ও কর্মজগতে 'পরস্পর-বিরোধী আনুগত্যে'র দ্বন্দ্বগুলি প্রকট হয়ে ওঠে এবং সেগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টায় আত্মনিয়োগের ফলে তাঁর অবস্থানের ঘন ঘন পরিবর্তন ঘটে।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ বনাম সমাজতন্ত্র ঃ

নেহেরু ছিলেন পশ্চিমী উদারনীতিবাদের প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল। আবার, সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর ছিল প্রচণ্ড আকর্ষণ। তাঁর এই দোলাচলচিত্ততার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র বসুর কাছে লিখিত এক পত্রে। তাতে তিনি লিখেছিলেন, "আমি কি একজন সমাজতন্ত্রী নাকি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী? এই দু'টি অভিধার মধ্যে সত্যিই কি কোনও প্রয়োজনীয় বিরোধ আছে ? ... আমার মনে হয়, স্বাভাবিক প্রবণতা ও শিক্ষায় আমি হলাম একজন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী এবং বৌদ্ধিক দিক থেকে আমি একজন সমাজতন্ত্রী। ... আমি আশা করব যে, সমাজতন্ত্র ব্যক্তিত্বকে হত্যা বা দমন করবে না ... তা অসংখ্য মানুষকে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবে।"

প্রথম জীবনে ফেবিয়ান মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সমাজতন্ত্রকে দেখার পরিবর্তে তিনি তাকে দেখেছিলেন সকলের স্বার্থে সংস্কার ও সামাজিক সম্পর্কের যুক্তিপূর্ণ সংগঠন হিসেবে। কিন্তু বিশের দশকের শেষ ভাগ থেকে তিরিশের দশকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত তিনি উচ্চৈস্বরে সমাজতন্ত্রের কথা বলেছিলেন। সেই সময় সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদের বিলোপ সাধন, সমাজের আমূল পরিবর্তন, সর্বপ্রকার শোষণ থেকে মুক্তি, উৎপাদনের উপায় ও উপকরণের সামাজিকীকরণ প্রভৃতি ধারণার মাধ্যমে তিনি মার্কসবাদের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন। ১৯২৮ সালে সমাজতন্ত্র বলতে 'উৎপাদনের উপায় ও বন্টনের ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানার প্রতিষ্ঠা'কে বোঝায় বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছিলেনঙ্গ। তাঁর মতে, পুঁজিবাদের বিকল্প হিসেবে একমাত্র সমাজতন্ত্রই পারে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বিশ্বকে রক্ষা করতে। জাতীয় ক্ষেত্রে 'সমবায়ী সমাজতন্ত্রী কমনওয়েলথ' এবং

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 'সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের একটি বিশ্ব-যুক্তরাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সুতরাং বলা যায়, মার্কসবাদের বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি ও সমাজ বিশ্লেষণের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে তাঁর যেমন গভীর শ্রদ্ধা ছিল, তেমনি ছিল শ্রেণী-বৈষম্যমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিক-কৃষক শোষণ সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা। সোভিয়েত ইউনিয়নের অভূতপূর্ব অগ্রগতির নিরিখে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার ওপর তাঁর ছিল গভীর আস্থা। এইসব কারণে নেহরুর জীবনীকার মাইকেল ব্রেচার পূর্বোক্ত সময়কালকে তাঁর জীবনের 'চরমপন্থী পর্ব' বলে চিহ্নিত করেছেন।

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও ১৯৩৪ সালে মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল থেকে তিনি নিজেকে অনেকখানি দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। তাছাড়া, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সঙ্গে কোন রকম সম্পর্ক স্থাপনের তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। সর্বোপরি, ১৯৩৩ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর গান্ধীকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন যে, তাঁর কর্মসূচীর মাধ্যমে তিনি কোন শ্রেণী বা গোষ্ঠীকে আঘাত করতে চাননি। তাই বি প্রধান তাঁর 'দ্য সোশ্যালিস্ট থট্ অব জওহরলাল নেহরু' নামক গ্রন্থে নেহেরুকে পশ্চিমী অর্থে একজন 'বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী' বলে চিহ্নিত করতে চাননি। বস্তুতঃ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে নেহরু মার্কসীয় সমাজতন্ত্রকে বর্জন ক'রে বুর্জোয়া সংস্কারবাদের পথে অতি দ্রুত অগ্রসর হয়েছিলেন। তাই অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকারের নেতা হিসেবে ১৯৪৬ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর প্রদত্ত বেতার-ভাষণ কিংবা তাঁর রচিত 'অবজেক্‌টিভ রেজোলিউশন'-এ সমাজতন্ত্রের কথা ছিল অনুপস্থিত। এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে তিনি গণ-পরিষদে বলেছিলেন যে, বিতর্ক এড়াবার উদ্দেশেই তিনি 'সমাজতন্ত্র' কথাটিকে 'অবজেক্‌টিভ রেজোলিউশনে'র অন্তর্ভুক্ত করেননি। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক প্রত্যয়ের এই সোচ্চার ঘোষণা সত্ত্বেও সংবিধানের বলবৎযোগ্য মূল অংশে তাঁর সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনার কোন প্রতিফলন দেখা যায়নি। এইভাবে স্বাধীন ভারত গড়ার প্রধান রূপকার নেহরু উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও গান্ধীবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করায় তাঁর সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-ব্যঞ্জনা হারিয়ে এক ধরনের বুর্জোয়া সুবিধাবাদের রূপ পরিগ্রহ করে। এমনকি, কোন সুনির্দিষ্ট তাত্ত্বিক অর্থে সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করতে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। তার পরিবর্তে তাই 'জনকল্যাণকর রাষ্ট্র', 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থা', 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ', 'মিশ্র অর্থনীতি' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার কথা তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছিলেন। এইভাবে তাঁর চিন্তায় পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। বলা বাহুল্য, এই সমকেন্দ্রাভিমুখীনতাই হোল নেহরু-কথিত মধ্যপথ বা তৃতীয় পথ, যা কার্যক্ষেত্রে জনকল্যাণকামী পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে।

জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন ঃ

বিশের দশকের শেষ দিক থেকে নেহরু ভারতের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের সঙ্গে সমাজতন্ত্রকে সমন্বিত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি তাঁর 'আত্মজীবনী'তে বলেছেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতা এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ-কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ছাড়া দেশ বা ব্যক্তি কেউই বেশী দূর অগ্রসর হতে পারবে না। তিনি জাতীয়তাবাদকে একটি সংকীর্ণ 'নীতি' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। ১৯২৮ সালে পি স্মিটের বিখ্যাত গ্রন্থ 'দি ইম্পিরিয়েলিস্ট ডেঞ্জার'-এর ভূমিকায় এবং ১৯৩০ সালে 'লীগ এগেইন্সট ইম্পিরিয়েলিজম'-এর এডো ফাইমেনকে লেখা এক পত্রে ঐ সময় তিনি জানিয়েছিলেন যে, জাতীয় কংগ্রেসের সংগ্রামের ভিত্তি এখনও জাতীয়তাবাদ হলেও ক্রমশঃ তা সমাজতান্ত্রিক হয়ে উঠেছে।

কিন্তু কংগ্রেসের গান্ধী ও গান্ধীবাদী নেতৃত্ব তাঁর এরূপ 'সমাজতান্ত্রিক চপলতা' আদৌ পছন্দ না করায় শেষ পর্যন্ত তিনি গান্ধীবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তাছাড়া, সমাজতন্ত্র অপেক্ষা গান্ধীর প্রতি তাঁর অধিক আনুগত্যই ছিল এরূপ আত্মসমর্পণের অপর একটি কারণ। তাই সমাজতন্ত্রের প্রশ্নটিকে ভবিষ্যতের জন্য শিকেয় তুলে রেখে তিনি নির্দ্বিধায় ঘোষণা করতে পেরেছিলেন যে, ভারত রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করলেই কেবলমাত্র সমাজতন্ত্র কার্যকর হতে পারে। কিন্তু কোন্ শ্রেণীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালিত হলে সমাজতন্ত্র কার্যকর হতে

পারবে, সেই প্রশ্নটিকে তিনি কার্যতঃ উপেক্ষা করেছিলেন। এইভাবে তাঁর সমাজতান্ত্রিক চিন্তা শেষ পর্যন্ত গান্ধীর শ্রেণী-সমন্বয় ও অছি তত্ত্বের প্রবল ঘূর্ণিপাকে হারিয়ে গিয়েছিল।

সমাজতন্ত্রের ভারতীয়করণ ঃ

উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, নেহরু সমাজতন্ত্রের ভারতীয়করণ চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, দারিদ্র ও অসাম্য থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ভারতকে তার নিজের পথ খুঁজে নিতে এবং জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য হিংসা ও সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বের পথ পরিহার ক'রে গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি অনুসরণের ওপর তিনি জোর দিয়েছিলেন। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রশ্নটিকে সমাজপ্রতিষ্ঠার পূর্ব-শর্ত হিসেবে গ্রহণ করতে তিনি আদৌ রাজী ছিলেন না। কারণ, তাঁর মতে, গণতন্ত্র ছাড়া সমাজতন্ত্র স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে এবং সমাজতন্ত্র ছাড়া গণতন্ত্র অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। এইভাবে নেহরু কার্যতঃ গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রবক্তা হয়ে উঠেছিলেন। তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, ভারতের মতো পশ্চাৎপদ দেশে সমাজতন্ত্র হবে 'দারিদ্র্যের দ্বারা আক্রান্ত সমাজতন্ত্র'। তাই দারিদ্র থেকে মুক্তির জন্য তিনি ভারতকে পুঁজিবাদী বিকাশের পথে পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন। ফলে তাঁর সমাজতন্ত্র গোধূলি লগ্নের আলো-আঁধারির রহস্যময়তায় পরিণত হয়েছিল।

References :

1. P C Joshi, 'Nehru And Socialism in India, 1919-39' in B R Nanda (ed.), *Socialism in India* (1972)
2. P C Joshi, 'Nehru legacy for Socialism' in *Mainstream,* vol.3, No. 13 (1964)
3. Orest Martyshin, *Jawaharlal Nehru and his Political Views*, 1989.
4. E M S Namboodiripad, *Nehru : Ideology and Practice*, 1988.
5. Narahari Kaviraj, *Gandhi-Nehru Through Marxist Eyes*, 1988.
6. Jawaharlal Nehru, *The Unity of India*, 1941
7. V P Verma, *Modern Indian Political Thought*, 1987
8. A Appadorai, *Indian Policital Thinking*, 1971
9. V S Narvane, *Modern Indian Thought*, 1964
10. M N Das, *The Political Philosophy of Jawaharlal Nehru*, 1961
11. Sankar Ghose, *Modern Indian Political Thought*, 1984
12. D R Bali, *Modern Indian Thought : Rammohun Roy to Jayapakrash Narayan*, 1989
13. Verinder Grover (ed.), *Political Thinkers of Modern India : Jawaharlal Nehru*, vol. 10 (1990)
14. R C Pillai, 'The Political Thought of Jawaharlal Nehru' in Thomas Pantham & Kenneth L Deutsch (ed.) *Political Thought in Modern India*, 1986
15. B T Ranadive, 'Jawaharlal Nehru : A Centenary Appraisal' in *The Marxist*, vol. 7, Nos. 3-4, 1989

পঞ্চম পাঠ

মানবেন্দ্রনাথ ও নয়া মানবতাবাদ

ভূমিকা ঃ

একজন জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী হিসেবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করলেও মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর রাজনৈতিক জীবনের মধ্যভাগে একজন মার্কসবাদী হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুতির অভিযোগে ১৯২৯ সালে তাঁকে কমিন্টার্ন থেকে বহিষ্কার করা হয়। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর শুরু হয় তাঁর সুদীর্ঘ কারা-জীবন (১৯৩১-৩৬)। তার পর ভারতীয় রাজনীতির অনেক চড়াই-উতরাই অতিক্রম ক'রে শেষ পর্যন্ত ১৯৪৬ সালে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, উদারনীতিবাদ কিংবা মার্কসবাদ মানুষকে দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে মুক্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই তিনি প্রচার করেছিলেন নয়া মানবতাবাদী দর্শন।

নয়া মানবতাবাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ঃ

মানবেন্দ্রনাথ মানবতাকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন বস্তুবাদের নিরিখে এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে; আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে নয়। তিনি মনে করতেন যে, মানব সভ্যতার সামনে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে-সঙ্কট দেখা দিয়েছে, তার অবসানের জন্য মানবিক মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন। তাঁর দর্শন হোল **(১)** মানবতা, **(২)** ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও **(৩)** যুক্তি-নির্ভর নীতি তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত এক নতুন সমাজব্যবস্থার দর্শন। আধ্যাত্মিকতার প্রভাবমুক্ত স্বাভাবিক যুক্তিবাদী নৈতিকতার ওপর ভিত্তি ক'রে তাঁর নয়া মানবতাবাদী দর্শন গড়ে উঠেছিল।

বাইশটি মূল সূত্রের ভিত্তি ক'রে গড়ে ওঠা নয়া মানবতাবাদী দর্শনের প্রধান তিনটি সূত্র হোল — **(১)** যুক্তি, **(২)** নৈতিকতা এবং **(৩)** স্বাধীনতা। তিনি ঈশ্বরের নামে ব্রাহ্মণ ও রাজার একাধিপত্যকে যেমন অন্যায় বলে মনে করতেন, তেমনি নিপীড়িত শ্রেণীর নামে বিশেষ একটি দলের একনায়কত্বকে সমান অন্যায় বলে চিহ্নিত করেছিলেন। শ্রেণী, ধর্ম, ভাষা ও জাতপাতের বৈষম্যকে দূর করার জন্য প্রয়োজন যুক্তিবাদী ও নৈতিকতাসম্পন্ন শিক্ষা ও চেতনা। তাঁর মতে, যুক্তিবোধ মানুষের একটি জন্মগত গুণ এবং তার থেকে জন্মলাভ করে নৈতিকতা। মুক্তি বা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও সত্যের অনুসন্ধানকে তিনি মানব-প্রকৃতির মূল প্রেরণা বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর কাছে ব্যক্তি-মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনই ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই তিনি বলেছিলেন, "ব্যক্তির কল্যাণই সমষ্টিগত কল্যাণের একমাত্র মাপকাঠি।"

উদারনীতিবাদ ও মার্কসবাদের বিরোধিতা ঃ

মানবেন্দ্রনাথ মনে করতেন যে, উদারনৈতিক গণতন্ত্রে ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বে ব্যক্তির পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার উপেক্ষিত হয়। তাঁর চোখে পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র হোল 'বাক-সর্বস্ব' ও 'নীতিবোধহীন' লোকেদের শাসন। এরূপ শাসনে প্রজ্ঞা, সততা, জ্ঞান, নীতি প্রভৃতির কোন মূল্য নেই। উদারনীতিবাদের 'অবাধ বাণিজ্য নীতি' মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের আইনগত রূপ দেয়। অনুরূপভাবে, মার্কসবাদের সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, কমিউনিজম ও একনায়কত্ব সমার্থক। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে তিনি ফ্যাসিবাদের সমগোত্রীয় এক যূথবদ্ধ রাষ্ট্র-সর্বস্ব স্বৈরাচারী ফৌজী ব্যবস্থা হিসেবে নিন্দা করতে দ্বিধাবোধ করেননি। বস্তুতঃ, মানবেন্দ্রনাথ বস্তুবাদের প্রতি সাধারণভাবে অনুগত্য প্রদর্শন করলেও মার্কসবাদের জ্ঞান-তত্ত্ব, দ্বন্দ্ব-তত্ত্ব, শ্রেণী-তত্ত্ব, ভিত্তি ও উপরি-কাঠামোর তত্ত্ব প্রলেতারিয় পার্টির নেতৃত্বে সশস্ত্র বিদ্রোহের তত্ত্ব প্রভৃতিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। তিনি মার্কসবাদীদের বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে চেতনার উন্মেষ ও বিকাশে চিন্তনের ভূমিকাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তাঁর মতে, সংসদীয় গণতন্ত্র ও শ্রেণী-একনায়কত্ব মানুষকে এক আধ্যাত্মিক,

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কয়েদখানায় বন্দী ক'রে রেখেছে। তাই তিনি এই দু'ধরনের শাসনের পরিবর্তে 'সংহত গণতন্ত্রে'র তত্ত্ব খাড়া করেছিলেন।

নয়া মানবতাবাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ ঃ

(ক) রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ঃ নয়া মানবতাবাদী আন্দোলনের লক্ষ্য হোল মৌলিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজের সার্বিক পুনর্গঠন। মানবেন্দ্রনাথের মতে, গণতন্ত্র বলতে নিজেদের যুক্তিশীলতা ও আত্মমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন জনসমষ্টিকে বোঝায়। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক কাঠামো হবে বিকেন্দ্রীকৃত ও সমবায় ভিত্তিক। সর্বপ্রকার শ্রেণী ও দলের আধিপত্য থেকে তা থাকবে সর্বপ্রকারে মুক্ত। তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে মানবেন্দ্রনাথ 'সংহত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র' বলে বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর ভাষায়, এই সংহত গণতন্ত্রের মধ্য দিয়েই জনগণ আইন পরিষদের ওপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে এবং তার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে সক্ষম হবে। সারা দেশ জুড়ে জালের মতো ছড়ানো অসংখ্য গণ-পঞ্চায়েতের ওপর ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠবে এক পিরামিড সদৃশ রাষ্ট্র। পার্লামেন্ট হবে তারই চূড়া। গণ-পঞ্চায়েতগুলি হবে একদিকে জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষার পাঠশালা এবং অন্যদিকে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের প্রধান যন্ত্র। রাষ্ট্র-পরিচালনার ভার ন্যস্ত হবে সৎ, মুক্তি বুদ্ধি ও নীতিনিষ্ঠ নর-নারীর ওপর। পেশাদার রাজনৈতিক নেতাদের পরিবর্তে সমাজকে নেতৃত্ব দেবে আইনজীবী, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, অর্থনীতিবিদ, ঐতিহাসিক প্রমুখকে নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রীয় পরিষদ। তাঁরা জনসাধারণের বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবেন। এইভাবে সংহত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্র সমাজের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যাবে।

(খ) সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা ঃ জনগণের মধ্যে জ্ঞানের প্রসার এবং বিজ্ঞান ও অন্যান্য সৃজনমূলক কাজকর্মকে অধিক পরিমাণে উৎসাহ দানই হবে ঐ সমাজের সাংস্কৃতিক ভিত্তি। এখানে পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হবে ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা। তিনি বলেছিলেন যে, একনায়কত্বের কবল থেকে জনসাধারণকে মুক্তি দিতে হলে আধুনিক সংস্কৃতির মানবতাবাদী ঐতিহ্যকে পুনরাবিষ্কার করতে হবে এবং মানুষকে সবকিছুর মাপকাঠি বলে স্বীকার ক'রে নিতে হবে।

(গ) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঃ এরূপ সমাজের অর্থনীতির ভিত্তি হবে ব্যবহারের জন্য উৎপাদন এবং প্রয়োজন অনুসারে বন্টন। তাঁর কল্পিত আদর্শ অর্থব্যবস্থা ধনতন্ত্র নয়, তা হোল এক ধরনের সমবায় ব্যবস্থা। এখানে উৎপাদনের লক্ষ্য হোল দ্রব্যের ব্যবহার, মুনাফা অর্জন নয়। অনুরূপভাবে এখানে সমাজতন্ত্রের মতো রাষ্ট্রীয় মালিকানা কিংবা পরিকল্পিত অর্থনীতির কোন স্থান নেই। তিনি যে-বিকল্প সমবায় ব্যবস্থার কথা বলেছেন, তার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি হোল **(ক)** ভারী শিল্পায়নের পরিবর্তে কৃষি উৎপাদনের ওপর গুরুত্ব আরোপ; **(খ)** শ্রমভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার প্রবর্তন; **(গ)** স্থানীয় পর্যায়ে ভূমির একত্রীকরণ ও যৌথ কৃষিকার্যের প্রবর্তন; **(ঘ)** উৎপাদন, বিপনন, ভোগ প্রভৃতিকে সমবায়ের অধীনে আনয়ন; **(ঙ)** সর্বজনীন সরকারি সেবা ব্যবস্থার মাধ্যমে সামাজিক উদ্বৃত্তের বন্টন; **(চ)** সমবায়গুলির হাতে সমবায়িক অর্থনীতির রূপায়ন ও পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান এবং সেগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন ইত্যাদি। এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যার ভিত্তি হবে জনগণের দ্বারা পরিচালিত জনগণের সরকারের প্রতিষ্ঠা। স্বার্থশূন্য মানুষের দ্বারা পরিচালিত এরূপ রাষ্ট্র লেভিয়াথেনের রূপ পরিগ্রহ ক'রে পদে পদে জনসাধারণের মনে ভীতি ও সন্দেহের উদ্রেক ঘটাবে না। কারণ, চিন্তাশীল মানুষই হবে এই নতুন জগতের স্রষ্টা। পেশাদার রাজনৈতিক নেতাদের পরিবর্তে সমাজকে নেতৃত্ব দেবে আইনজীবী, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, অর্থনীতিবিদ, ঐতিহাসিক, শিল্পী প্রমুখকে নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রীয় পরিষদ। তাঁরা জনসাধারণের বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবেন।

(ঘ) সমাজ-বিপ্লবের প্রকৃতি ঃ এইভাবে অর্থনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতির সামগ্রিক পুনর্গঠন যে-বিপ্লবের

মাধ্যমে সম্পূর্ণ হবে মানবেন্দ্রনাথ তাকে বলেছেন 'সমাজ বিপ্লব'। দলীয় রাজনীতি ও ক্ষমতা দখলের সংকীর্ণ রাস্তা ধরে এই বিপ্লব আসবে না; তা আসবে মানুষের মননশীলতার নবজাগরণ ও মানবতাবাদের মৌল আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের মাধ্যমে। কেবলমাত্র সর্বসম্মতির ভিত্তিতেই এরূপ বিপ্লব সংঘটিত হবে। তাঁর মতে, মনন-জগতের বিপ্লবই হবে বস্তু-জগতের বিপ্লবের পূর্ব-শর্ত। অর্থাৎ সমাজ পরিবর্তনের জন্য প্রথমে প্রয়োজন চেতনার জগতে বিপ্লব। চিরায়ত ন্যায়-নীতির মাপকাঠিতে বিপ্লবের লক্ষ্য ও পদ্ধতিকে মানবেন্দ্রনাথ বিচার করার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলতেন, লক্ষ্য ভাল হলে যে-কোন পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য — একথা আদৌ সত্য নয়। তাঁর মতে, লক্ষ্যের সঙ্গে পদ্ধতিকে অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। তাই মানবেন্দ্রনাথ সংঘর্ষের পথে বিপ্লব আনতে চাননি, চেয়েছিলেন নয়া মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য সকলের অনুমোদনের পথে বিপ্লব সম্পাদন করতে।

(ঙ) বিশ্বরাষ্ট্র গঠন ঃ তিনি ছিলেন বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের পক্ষপাতী। এরূপ বিশ্বরাষ্ট্রের ভিত্তি হবে বিশ্ব-মানবতা। তবে তা কমিউনিস্টদের আন্তর্জার্তিকতার কিংবা বুর্জোয়া দার্শনিকদের বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের মতো নয়। তিনি বলেছিলেন, মুক্ত নর-নারীর সমবায়ে গঠিত বিশ্বরাষ্ট্র এমন এক আত্মিক সমাজ গড়ে তুলবে, যা ধনতান্ত্রিক, ফ্যাসিস্ট বা কমিউনিস্টদের চিন্তা-ভাবনার বিপরীত।

সমালোচনা

(১) মানবেন্দ্রনাথের নয়া মানবতাবাদী দর্শন চরম ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের নামান্তর মাত্র। তিনি বস্তুবাদের প্রবক্তা হলেও শেষ পর্যন্ত বিমূর্ত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রচার কার্যতঃ তাঁর নয়া মানবতাবাদকে ভাববাদের সমগোত্রীয় ক'রে তুলেছে।

(২) প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য মানবেন্দ্রনাথ যে-নয়া মানবতাবাদী দর্শনের কথা বলেছেন, সদিচ্ছার প্রতীক হলেও নিশ্চতভাবেই তা অবাস্তব দর্শন। কারণ, শ্রেণী-বিন্যস্ত সমাজের শ্রেণী-শোষণ ও শ্রেণী-পীড়নের অস্তিত্বকে এই দর্শনে উপেক্ষা করা হয়েছে।

(৩) নয়া মানবতাবাদের ভিত্তিতে যে-রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা তিনি বলেছেন, তা বিমূর্ত এবং ভাবাবেগ সঞ্জাত। কারণ, সমাজের মধ্যে শ্রেণীগত, জাতিগত, বর্ণগত, ধর্মীয় প্রভৃতি যে-স্তরবিন্যাস রয়েছে, সেগুলিকে উপেক্ষা ক'রে কীভাবে প্রতিটি ব্যক্তিসত্তা পূর্ণভাবে বিকশিত হবে, তার সদুত্তর নয়া মানবতাবাদী দর্শনের মধ্যে পাওয়া যায় না।

(৪) গান্ধীর ঈশ্বর-বিশ্বাসী নীতিপরায়ণতাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করলেও শেষ পর্যন্ত মানবেন্দ্রনাথ নিজেই নীতি-তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এখানেই তাঁর স্ব-বিরোধিতা।

উপসংহার

নানা প্রকার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মানবেন্দ্রনাথের নয়া মানবতাবাদী দর্শন ভারতে চিন্তা-জগতে যে-আলোড়নের সৃষ্টি করেছে, তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কবি জ্যোতির্ময় দত্ত তাই মন্তব্য করেছেন, "মানবেন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদ, জাতীয়তাবাদ ও সাম্যবাদ অতিক্রম করে অবশেষে নিজেকে পরিণত করতে পেরেছিলেন — বাঙালী নয়, ভারতীয় নয়, কমিউনিস্ট নয় — এক আধুনিক মানুষে।"

References :

1. M N Roy, *New Humanism* (1961)
2. M N Roy, *Reason, Romanticism and Revolution*, vols.1 and 2, (1952)

3. M N Roy, 'Humanism, Rationalism and Science', in *Independent India*, vol. 1, No. 49, 1947 and vol. 12, No. 1, 1948

4. V P Verma, 'Critique of Marxian Sociology' in *The Calcutta Review*, March-May 1955

5. M N Roy, *Politics, Power and Parties.*

6. Phillip Spratt, and M N Roy, *Beyond Communism*, 1947

7. B S Sharma, *The Political Philosophy of M N Roy,*, 1965

8. Sankar Ghose, *Modern Indian Political Thought*, 1984

9. D R Bali, *Modern Indian Political Thought* : *Rammohun Roy to Jayapakrash Narayan*, 1989

10. Verinder Grover (ed.), *Political Thinkers of Modern India : M N Roy*, vol. 5 (1990)

11. Sudipta Kaviraj, 'The Heteronomous Radicalism of M. N. Roy' in Thomas Pantham & Kenneth L Deutsch (ed.) *Political Thought in Modern India*, 1986

12. Tarun Kumar Banerjee & Debesh Roy Chowdhury : *Colonial India : Ideas and Movements*, 2001

13. সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, *বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা*, ২য় খণ্ড, ১৯৯০

ষষ্ঠ পাঠ

যুক্তি, সভ্যতা এবং জাতীয়তাবাদ ঃ শ্রী অরবিন্দ

শ্রী অরবিন্দ ইতিহাসে আধ্যাত্মিক নির্দেশ্যবাদে (spiritual determinism) বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে নিরর্থক ও এমনকি পরস্পরবিরোধী ঘটনার পশ্চাতেও দিব্যসত্তার ক্রিয়াশীলতা বিদ্যমান থাকে এবং ইতিহাস পরব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি। ফরাসী বিপ্লব, স্বদেশী আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদের পশ্চাতে ঐশ শক্তি তথা কালীর সক্রিয়তার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, তিনি মনে করতেন যে ঈশ্বরই জাতিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ইংরেজদের অত্যাচার, উৎপীড়ন ও শোষণ ঐশী ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ভারতীয়দের সংহতি সাধন। ফরাসী বিপ্লবের নেতৃত্ব Mirabeau, Danton, Robespierre এবং Napoleon প্রমুখ ইতিহাসে ভগবৎ ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। কিন্তু যখন তাদের মধ্যে অহংবোধের প্রতিফলন ঘটে তখন তাদের পতন হয় — ইতিহাসও তাদের বর্জন করে।

উপরোক্ত অধ্যাত্মবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই অরবিন্দ সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রভেদ প্রত্যক্ষ করেছেন। অরবিন্দের পূর্বসূরীগণের মতে, সংস্কৃতি হল মানবিক মূল্যবত্তা এবং সভ্যতা জীবনে সৌষ্ঠব সাধন করে। এককথায় সংস্কৃতি অবস্তুগত এবং সভ্যতা বস্তুগত। উপনিষদের দৃষ্টিতে অরবিন্দ সংস্কৃতি ও সভ্যতার এই পশ্চিমী বিভক্তিকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে বলেছেন — 'প্রাণ' -এর (জীবন সম্পর্কে বৈদিক ধারণা) অভিব্যক্তি হল সভ্যতা এবং মানুষের সৃজনীসত্তা তথা 'মানস' (মনের বৈদিক ধারণা) -এর পরিপূর্ণতা হল সংস্কৃতি।

'The Human Cycle' গ্রন্থে অরবিন্দ মানুষের সামাজিক-রাজনৈতিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে যুক্তিবাদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, মানুষের এই সামাজিক রাজনৈতিক বিবর্তনের সমগ্র ধারাটিকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। মানুষের বিবর্তনের প্রথম পর্যায় হল অব-যুক্তিবাদী (infra-rational), দ্বিতীয় পর্যায় হোল যুক্তিবাদী (rational) এবং তৃতীয় পর্যায় পরাযুক্তিবাদী (supra-rational)। মানুষের বিবর্তনের প্রথম পর্যায়ে সহজাত প্রবৃত্তি, প্রেরণা ও অবিন্যস্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। মূলতঃ আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে গোষ্ঠীজীবন দানা বেঁধে ওঠে। জৈব বিকাশের মত গোষ্ঠীজীবনের তাগিদে সমাজদেহ পরিপুষ্ট হয় — মনন ও চেতনার অস্তিত্ব তখন নগণ্য ছিল। ভারতীয় ইতিহাসে বৈদিক যুগকে তিনি এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং এই যুগকে 'প্রতীক যুগ' বলে অভিহিত করেছেন। এরপর আসে বিবর্তনের দ্বিতীয় পর্যায় বা যুক্তিবাদী স্তর। এই স্তরে গোষ্ঠীমন ক্রমে আরও বুদ্ধিদীপ্ত ও সচেতন হয়ে ওঠে। চিন্তাভাবনা ও যুক্তিবোধ সমাজবিকাশের সহায়ক হয়। মানুষ নিছক জৈব অস্তিত্বের দাবি অতিক্রম করে উন্নততর আদর্শ লক্ষ্যপথে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হয়। অরবিন্দের মতে, যুক্তিবাদী স্তর বেশিদিন স্থায়ী হয়না। কারণ জীবনের ভোগ্যসম্ভার মানুষকে ভুলিয়ে দেয় যে সমাজেরও একটা জৈব বিকাশ আছে, সেটা শুধুমাত্র একটা যন্ত্র নয়। যুক্তি ও বিজ্ঞানের যান্ত্রিক দাপটে মানুষের আধ্যাত্মিক মন নিষ্পেষিত হয়। যুক্তিবাদী স্তর স্বাভাবিকভাবেই মানুষকে মুক্তি দিতে পারেনি। সামাজিক বিবর্তনের তৃতীয় স্তরে যুক্তিতর্ক ও জৈব তাড়নার পরিবর্তে ঐক্যবোধ, সংবেদনশীলতা ও স্বতঃস্ফূর্ত মুক্তির চেতনায় মানুষের বৃহত্তম অন্তরাবেগ ব্যষ্টি ও গোষ্ঠীকে সুষ্ঠু ও সমন্বিত করে তোলে। পরমাত্মার অঙ্গ মানবাত্মার ক্রমবিকাশ উন্মোচিত হয়।

বিবর্তনের প্রথম পর্যায়ে তথা প্রতীক যুগে মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তাভাবনার সমস্ত উপাদানই অধ্যাত্মচিন্তার দ্বারা নির্ধারিত হত। এই পর্যায়ে সামাজিক শক্তি হিসাবে যুক্তিবাদ অপ্রকাশিত বা অন্তর্নিহিত অবস্থায় ছিল। সনাতন ভারতের জাতি-ধর্ম ও কুলধর্মের সৃষ্টি হয়েছে মানুষের আবর্তনের এই অধ্যায়ে। এই কারণে এই অধ্যায়কে প্রাকৃতিক সমাজের অধ্যায় হিসাবে অভিহিত করা যায়। এই পর্যায়কে অরবিন্দ 'Typal' বা

'Conventional' আখ্যা দিয়েছেন এবং ভারতীয় বর্ণাশ্রম প্রথা ও জাতিভেদ প্রথাকে একটি সামাজিক ধারারূপে ব্যাখ্যা করেন। আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে ধর্মীয় উপযোগিতার ধারণা শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং ধর্ম নৈতিকতা বা শৃঙ্খলার মূল প্রেরণা হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের মধ্যে ঐশ্বরিক সত্তার প্রকাশ ও অভিব্যক্তির শক্তিশালী ধারণা এই পর্যায়ে ধীরে ধীরে ধর্মীয় ও নৈতিক ভাব দ্বারা পুনরুজ্জীবিত হয়।

ধার্মিকতা, বিশুদ্ধতা, নীতিবাদিতা, সাহস, সততা, আনুগত্য, বীরত্ব ইত্যাদি আদর্শগুলি সামাজিক ধারণা হিসাবে স্থায়ীভাবে প্রচলিত হতে থাকে। মানুষের অন্তর্জীবনের পরিবর্তে মানুষের বহিঃজীবনের এইসব আদর্শগুলি ক্রমশই ঐতিহ্য ও প্রচলিত রীতি হিসাবে উদ্ভুত হয় এবং এইভাবে 'Typal' সমাজের গর্ভ থেকেই ক্রমে ক্রমে 'Conventional' সমাজের জন্ম হয়। এই সমাজে প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতি সমূহ প্রাত্যহিক জীবনে অনড় অচলায়তনের পরিণত হয় এবং জীবনের নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়। এই অনড় প্রচলিত রীতিগুলি প্রাচীনযুগের জীবনীশক্তিকে পুনরায় চেতনালব্ধ করাতে ব্যর্থ হয় এবং সমাজকে নিষ্ক্রিয় করে তোলে।

সমাজ বির্তনের দ্বিতীয় পর্যায়ে নবজাগরণ ও আলোক প্রাপ্তির ফলে 'যুক্তি' (reason) সকল কাজের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায়। ফলে যেসব অনুমিতি, আপ্তবাক্য ও পরম্পরাগত বিশ্বাস পূর্ববর্তী সমাজব্যবস্থাকে স্থায়িত্ব ও বৈধতাদান করেছিল সেগুলি জোরালো প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। যুক্তিবোধ দ্বারা পরিচালিত সমাজ ও প্রতীক যুগের নিষ্ক্রিয়, আবদ্ধ, অশ্মীভূত সমাজের মধ্যে দুরতিক্রম্য ব্যবধান মানুষের কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ আবদ্ধ, নিষ্ক্রিয়, স্তরবিভাজিত সমাজ প্রত্যাখ্যান করে।

সমাজ বিবর্তনের দ্বিতীয় পর্যায়ে মানুষের চেতনা বৌদ্ধিকভাবে ক্রমান্বয়ে অধিকতর সচেতন হতে থাকে। এসময় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মানবিক মূল্যবত্তার পুনরাবিষ্কার পরিপূর্ণ সভ্যতার নতুন যুগকে উন্মোচিত করে। যুক্তিবাদী যুগ মানুষকে দেয় স্বাধীনতার চেতনা এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে প্রগতি ও সত্যের সন্ধান। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী যুগে ব্যক্তি তার অনুভূতি ও যুক্তির সাহায্যে জীবনের প্রকৃত সত্যকে অনুসন্ধান, তার চারপাশের জগতকে জানা এবং সর্বোপরি নিজেকে জানার ক্ষেত্রে আবিষ্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সর্বপ্রথম সূচনা হয় ইউরোপে। সেখানে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের পূর্ণ ব্যবহার ও বিকাশের অনেক পরে পশ্চিমী সভ্যতার সংস্পর্শ, যুক্তিপ্রবণতা ও মুক্তিকামিতার সমন্বয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সূচনা প্রাচ্যে দেখা দেয়।

বিবর্তনের তৃতীয় পর্যায়টি ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত আছে। এই পর্যায়ে মানসিক ও অতিমানসিক সচেতনতার উপর স্বতঃলব্ধ জ্ঞানের ক্ষমতা প্রযুক্ত হয়ে ব্যক্তি মানুষের আত্মোন্নতিমূলক সংস্কার সাধন এবং সমাজের দৈবশুদ্ধিকরণ সম্পাদিত হবে।

অরবিন্দের অভিমত অনুসারে সমাজ বিবর্তনের পথে অবযুক্তিবাদের পর্যায় থেকে যুক্তিবাদের পর্যায়ে মানুষের উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র একটি মহান মাধ্যমে হিসাবে ভূমিকা পালন করে। তাঁর মতে সমাজবিবর্তনের প্রতিটি পর্বে সংস্কৃতি ও সভ্যতা, মন ও দেহ প্রতিটি ছিল স্বতন্ত্র। অরবিন্দ সমাজতন্ত্রের সমালোচনা করে বলেছেন সমাজতন্ত্র মানুষের দেহজগৎকে যতটা স্বীকৃতি দেয়, মনোজগতকে ততটা দেয়না। তাঁর মতে, সমাজতন্ত্র সর্বশক্তিমান কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের বিকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। যদিও সূচনাপর্বে সমাজতন্ত্র অনেকটাই ইতিবাচক ছিল কারণ সমাজতন্ত্র সকলের জন্য ন্যূনতম সামাজিক অর্থনৈতিক সুযোগকে সুরক্ষিত করেছিল। কিন্তু সমাজতন্ত্রে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার কোন স্থান নেই। অরবিন্দ ধনতন্ত্রবাদেরও সমালোচনা করে বলেছেন, পুঁজিবাদী সমাজে পার্থিব উন্নতির চেষ্টা আধুনিক পুঁজিবাদকে অতিরিক্ত কেন্দ্রিভবন ও কেন্দ্রিকরণের দিকে নিয়ে যায়। পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক সমাজে বৈষয়িক ক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতা, বাহ্যিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ধ্বংসাত্মক শক্তিসমূহের প্রতিকূলতার আশঙ্কা থেকে মুক্তির উপায় হিসাবে অরবিন্দ মানুষের আত্মিক-আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তাঁর মতে, স্বাধীনতার উৎস হলো আমাদের অস্তিত্বের মৌলনীতিসমূহ। মানুষের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য হল স্বাভাবিক পূর্ণতাপ্রাপ্তি এবং

বাধ্যবাধকতা ছাড়াই পরিবেশের সাথে সাযুজ্য স্থাপন। স্বীয় সত্তার এই আইন মেনে চলাই স্বাধীনতা। অরবিন্দ স্বাধীনতার পশ্চিমী ধারণাকে গ্রহণ করলেও এটিকে স্বীয় আইন ও গীতার ধারণাসঞ্জাত কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে পশ্চিমী সভ্যতা থেকে ভারত সামাজিক, রাজনৈতিক স্বাধীনতার ধারণা পেয়েছে কিন্তু ভারত থেকে আমরা আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার ধারণা অর্জন করেছি।

এই আধ্যাত্মিকতার কারণেই অরবিন্দ ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের ধারণা গ্রহণ করেননি। জাতীয়তাবাদ অরবিন্দের কাছে কোন বৌদ্ধিক জ্ঞান নয় — এ এক বোধ, চেতনার বিস্তৃতির মাধ্যমে ঈশ্বরের উপলব্ধি। তাঁর অভিমত অনুযায়ী মানুষের সামাজিক-রাজনৈতিক বিবর্তনের ধারায় যে বিভিন্ন পর্যায় পরিলক্ষিত হয় — জাতীয়তাবাদ হল সেরকমই একটি পর্যায়। তাঁর মতে, জাতীয়তাবাদ নিছক কোন স্লোগান নয়, আধ্যাত্মিক সাধনার নিগুঢ় চেতনাসঞ্জাত একটি অবিনশ্বর ধর্ম হলো জাতীয়তাবাদ। ঈশ্বরীয় শক্তিতেই জাতীয়তাবাদের অস্তিত্ব অব্যাহত। স্বাভাবিক কারণেই অরবিন্দ জাতীয়তাবাদের ধারণার মধ্যে বৌদ্ধিক ও ধর্মীয় আদর্শকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তাঁর আলোচনায় জাতীয়তাবাদ আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় রূপ ধারণ করেছে। এ ধর্ম এমন এক উপলব্ধি যা মানুষকে আত্মস্বার্থের পরিবর্তে পরহিতে কাজ করতে এবং প্রয়োজনে আত্মত্যাগ নিজেকে উৎসর্গ করতে শিক্ষা দেয়।

অরবিন্দ অধিবিদ্যা, ইতিহাসের দর্শন, সংস্কৃতি, সভ্যতা, জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা ও অধ্যাত্মবাদী সমষ্টিবাদের ধারণা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মূল্যবোধের সমন্বয়কে উপস্থাপিত করেনা এটা সত্য যে, অতিন্দ্রিয় সত্তার ধারণা (যা একাই যেকোন স্তরে স্থায়ী সমন্বয় অর্জনে সক্ষম) আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে অদ্ভুত ঠেকতে পারে। তদ্‌সত্ত্বেও তাত্ত্বিক স্তরে অরবিন্দ আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে। ঐতিহ্যবাহী ও আধুনিকতাবাদীদের মধ্যে সমন্বয়ের দাবি যারা করেন তাদের কাছে অরবিন্দের এই প্রচেষ্টা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক হতে পারে। পূর্ব ও পশ্চিমের বৌদ্ধিক ঐতিহ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য যেসব চিন্তাবিদ চেষ্টা করেছেন — অরবিন্দের চিন্তাভাবনা নিঃসন্দেহে তখন আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক শক্তি হিসাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক বিবর্তনের উপরোক্ত তত্ত্ব ছাড়াও আরও অনেক ধারণা রয়েছে যেগুলি সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার জন্ম দিতে সক্ষম এবং ঐ প্রক্রিয়ার দ্বারা মানুষ পরিবর্তিত ও প্রভাবিত হতে পারে।

সামাজিক কাঠামোর মানব উপাদানটি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা জন্মায় যখন আমরা সার্বিকভাবে সমাজের কাজ ও বিশেষে ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করি। সমাজ ও সামাজিক কাঠামো অনড়, নিশ্চল নয়। সামাজিক কাঠামোর মধ্যে দিয়েই ঐক্য, সমাজ ও গোষ্ঠীর পরিবর্তনশীল আন্তঃসম্পর্ক, বিভিন্ন সংগঠন গড়ে ওঠে। সমাজে ব্যক্তির ভূমিকা ও মর্যাদা নির্ধারিত হয় সামাজিক কাঠামোর দ্বারা। ব্যক্তি সাধারণতঃ তার গোষ্ঠী সত্তার কাঠামোগত ভিত্তিকে ধবংস করতে চায় না বরং গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে ব্যক্তি গোষ্ঠীকে কার্যকরী করে গড়ে তোলে নিজের লাভের জন্য। বস্তুতপক্ষে গোষ্ঠী সক্রিয়তা অংশত টিকে থাকে সমকেন্দ্রিকতা এবং অংশতঃ বিভিন্নতার ভিত্তিতে। ব্যক্তি মানুষ প্রাকৃতিক প্রবণতার তাগিদে জীবনের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দিককে বিকশিত করে গোষ্ঠীর সাহায্যে। গোষ্ঠীর পরিপুষ্টি সাধিত হয় ব্যক্তি মানুষ ও বৃহত্তর মানবসমাজের দ্বারা। কালক্রমে বৃহত্তর মানবসমাজের মধ্যে গোষ্ঠী বিলীন হয়ে যায়। মানবসমাজের সামগ্রিক বিকাশের পিছনে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর ভূমিকাই বর্তমান।

ব্যক্তি ও গোষ্ঠী ভূমিকার বিরোধী সত্তা হিসাবে এবং মানুষের অনৈক্যের পরিণতি হিসাবে রাষ্ট্রের উত্থান এমন ধারণার সঙ্গে সহমত না হয়েও অরবিন্দ রাষ্ট্রের উপর অধিক নির্ভরশীলতার পরিবর্তে ব্যক্তির উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও সামাজিক উদ্যোগের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা বাস্তব ও যৌক্তিক হয় তখনই যখন এর ক্ষমতার ভিত্তিভূমি বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সদস্য নিয়ে গঠিত হয় এবং তারা রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারে।

অরবিন্দ মানবঐক্যের তিনটি সম্ভাব্য পথের উল্লেখ করেছেন যথা ঃ (ক) প্রথমটি হোল কেন্দ্রিভূত বিশ্বব্যবস্থা যেখানে যান্ত্রিক ঐক্য ও জাতিসমূহের স্বতন্ত্র সত্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং প্রতিষ্ঠিত হয় এক অবাঞ্ছিত সমরূপতা; (খ) দ্বিতীয় পথটি হোল, এক শিথিল সমবায়, যা হল অস্থায়ী এবং এর পরিণতি হোল বিচ্ছিন্নতা ও কঠোর কেন্দ্রিভবন। (গ) এরজন্যই অরবিন্দ মনে করেছিলেন এক ধরনের বিশ্বব্যাপী ঐক্য প্রয়োজন ও অবশ্যম্ভাবী। তিনি বিশ্বঐক্যের জন্য মনস্তাত্ত্বিক উপাদান তথা ঐক্য; ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্যের জন্য অন্তর্জগতের প্রকৃত উপলব্ধির কথা বলেছেন। এই উপলব্ধি মানুষকে শিক্ষা দেয় যে, অন্যের জীবনের মধ্যেই সে পূর্ণতা ও সার্থকতা লাভ করে এবং পূর্ণাঙ্গ জীবনই সামগ্রিকের স্থায়ী শান্তির ভিত্তি।

ব্যক্তি ও সমাজের সমন্বয়ের দার্শনিক প্রতীতির ফলে সমাজের বিচ্ছিন্ন কোন সংগঠিত রাষ্ট্রশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা অরবিন্দের ছিলনা। জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা মানব প্রগতির সেরা মাধ্যম এমন দাবিকে অরবিন্দ আজগুবি বলে মনে করেছেন। রাষ্ট্র সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রতিনিধিত্ব করে এমন তাত্ত্বিক দর্শনের বিরোধিতা করে অরবিন্দ বলেছেন বাস্তবে রাষ্ট্রের মধ্যে অন্তরাত্মার কোন স্থান নেই। তাঁর মতে সচ্চিদানন্দের সঠিক জ্ঞান ও পূর্ণশক্তির উপলব্ধির সাহায্যে অতিমানস পর্যায়ে জগৎ ও জীবনের ইপ্সিত পরিবর্তন সাধন করা যায়। মানবমনের স্বভাবগত অহংবোধ ও ভেদবুদ্ধি'র উর্দ্ধে তথা মানসস্তর থেকে অতিমানস স্তরে উন্নীত হলেই মনুষ্য স্বভাবের পরিবর্তন সম্ভব। চৈত্যসত্তার অস্তিত্বের জন্য নিজেকে অতিক্রম করার এই প্রক্রিয়ায় মানুষ নিজেই অংশগ্রহণ করে। মানুষের এই অংশগ্রহণের মাধ্যমে সৃষ্ট দিব্যমানব দেহ-প্রাণ-মনের উন্নতি ঘটায় ও জাগতিক অজ্ঞানতা থেকে মুক্তি দেয়। এইভাবে মানুষ যত আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভ করে ততই সে অন্যের ভিতরেও একই পরমাত্মার উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়। আত্মশুদ্ধি'র এই প্রক্রিয়াতেই সামগ্রিকের সাথে সংহতি গড়ে ওঠে।

আধ্যাত্মিক নির্দেশ্যবাদের বিরুদ্ধে মার্কসীয় ও অমার্কসীয়দের সমালোচনা সম্পর্কে অরবিন্দ সর্বদা সচেতন ছিলেন। তাই তিনি বলেছেন — অতিন্দ্রিয় সত্তা সৌন্দর্য্যের উৎস হতে পারে কিন্তু যুক্তির চাহিদাকে মেটাতে পারে না। যুক্তির দ্বারা যেমন সমালোচনা, তুলনা ও বৈষম্যকরণ করা যায় — আধ্যাত্মিকতার দ্বারা তা সম্ভব নয়। অরবিন্দের মতে, যুক্তি আমাদের অভিজ্ঞতা ও বাস্তব জীবনের বিভিন্ন উপাদানগুলিকে সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত করতে পারে। অতীত বা বর্তমান মানসিক স্তরের উপর ভিত্তি করে মানুষের বাস্তব সমস্যাগুলির সমাধান আধ্যাত্মিকতার লক্ষ্য নয়। আধ্যাত্মিকতার উদ্দেশ্য বরং আমাদের জীবন, সত্তা ও জ্ঞানের এক নতুন ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা — যে গুণগত পরিবর্তন ছাড়া সমাজের স্থায়ী উন্নতি সম্ভব নয়। মানুষের যুক্তিবোধ সামগ্রিকভাবে জগতের গতিশীলতা ও ক্রিয়া সম্বন্ধে অচেতন, সামগ্রিক জীবনের উদ্দেশ্যে একটা অংশমাত্র যুক্তি আমাদের অর্ধসচেতন করে রাখে। এই খণ্ড সচেতনতা জীবনের সমস্ত বাধাকে দূর করতে অক্ষম।

আধুনিক সভ্যতা মানুষের সমস্ত বস্তুগত চাহিদার ব্যবস্থা করে এবং এটা সম্ভব হয় যুক্তির দ্বারা — আধ্যাত্মিকতার দ্বারা নয়। যদিও বস্তুগত সুখ ও চাহিদা মানুষকে অর্থনৈতিক বর্বরতায় পৌঁছে দেয়, যার প্রধান লক্ষ্যই হল অহংসর্বস্ব ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য। বর্তমানে আধুনিক মানুষ জীবন সম্পর্কে যে অহংবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে তার সম্মুখে থাকে দুই ভগবান — ১। ভোগসর্বস্ব জীবন এবং ২। বাস্তব যুক্তি। স্বাভাবিকভাবেই আত্মসুখ, আত্মসর্বস্বতা, আত্মতৃপ্তি দ্বারা ব্যক্তিজীবন আচ্ছন্ন হয়। বাস্তব যুক্তি হল যার মাধ্যমে আধুনিক মানুষ সমবায়িক প্রবণতায় প্রশিক্ষিত হয়, যাতে করে সমষ্টিগত চেতনার দ্বারা ব্যক্তি অহং ও গোষ্ঠী দ্বন্দ্বকে কমানো যায়। কিন্তু সমস্যার সম্যক সমাধান সম্ভব নয়। কারণ আমরা সবাই বর্তমান সভ্যতার থেকে উদ্ভুত বাস্তব যুক্তি ও অহংসর্বস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত হই। এই সভ্যতা মূলতঃ বাণিজ্যিক সভ্যতা — যার মূল লক্ষ্যই হলো সম্পদ আহরণ ও সম্পদের উপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপন।

এই ধরনের আত্মকেন্দ্রিক সভ্যতায় মানবতার ঐক্য সন্ধান অরণ্যে রোদনমাত্র। একথা অনস্বীকার্য যে, আধুনিক সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প, দর্শন সবই হল আন্তর্জাতিকতাবাদের মূল শক্তি। এগুলির ভূমিকার মধ্যেই নিহিত রয়েছে

প্রচুর প্রতিবন্ধকতা যা আত্মকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয় এবং এই আত্মসর্বস্ব জাতীয়তাবাদ বিভেদ ও দ্বন্দ্বের জন্ম দেয়। তাই অরবিন্দ এমন এক অধ্যাত্মবাদী সমাজের কথা বলেছেন যা আত্মস্বার্থের পরিবর্তে পরিহিতে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এই অধ্যাত্মবাদী সমাজে সমষ্টিগত অহং-এর পরিবর্তে সমষ্টিগত আত্মার সন্ধান পাওয়া যাবে। তাঁর মতে মানুষের সার্বজনীন পরমাত্মার প্রতি ভালবাসার মধ্য দিয়েই অহংবোধের উচ্ছেদ সম্ভব। অরবিন্দ বলেছেন — মানব ঐক্যের জন্য পরমাত্মার সন্ধান একান্ত জরুরী। এটাই মানুষের সমস্ত কাজকর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া উচিত।

যখন আমরা মানব ঐক্যের আদর্শকে বর্তমান ভারতীয় প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করতে যাই আমরা দুটি বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। প্রথমতঃ মানব গোষ্ঠীগুলি প্রতিনিয়ত সমকেন্দ্রিকতার প্রেরণা থেকে পিছিয়ে পড়ছে। একটি বিশেষ গোষ্ঠী কর্তৃক হিন্দুত্বের বড়াই আবার অন্য গোষ্ঠী কর্তৃক ইসলাম বা খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই ক্রমশই ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে দুটি বিপরীত মেরুতে বিছিন্ন করে দিচ্ছে। যখন কোন গোষ্ঠী এই ধরনের কাজে লিপ্ত হচ্ছে তখন সেই গোষ্ঠী তার স্বগোষ্ঠীভুক্ত অপরাপর ব্যক্তির মৌল স্বার্থের কথা ভাবছে না। গুজরাতে যখন গোষ্ঠীগুলি সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার আগুন ছড়াতে ব্যস্ত ছিল — তখন কেবলমাত্র শান্তি ও আশ্রয়ের জন্য গোষ্ঠীর ব্যক্তিমানুষ হাহাকার করেছে।

দ্বিতীয় বিভ্রান্তি রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে। অরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ভারতীয় জাতীয় রাষ্ট্র যুক্তিবাদের স্তরে অবস্থান করছে। কিন্তু যুক্তিবাদিতার প্রতীকগুলি কালিমালিপ্ত হচ্ছে। ভারত গণতান্ত্রিক দেশ হলেও এখানে গণতন্ত্রের উপর ফ্যাসিবাদের পচনশীল পোশাক পড়ানো হয়েছে। এখানে ক্ষমতার বৈধতার ও নির্বাচনের প্রক্রিয়া তার বৈধতা হারাচ্ছে। স্বাভাবিক কারণে অন্যরূপ সম্পর্কে ভাবনা চিন্তার সময় এসেছে।

এতদ্‌সত্ত্বেও আমরা নিশ্চিত যে, বিভ্রান্তি ও ব্যর্থতা দূর হবে এবং ভারতীয় সামাজিক কাঠামো মানব ঐক্যের প্রতীক হিসাবে আবির্ভূত হবে — যেমনটা অরবিন্দ ভেবেছিলেন।

প্রশ্ন

১. জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে অরবিন্দের ধারণা আলোচনা কর।

২. মানব ঐক্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অরবিন্দ কীরূপ চিত্র দিয়েছেন ?

৩. অরবিন্দ মানব বিবর্তনের স্তরগুলিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা বিশ্লেষণ কর।

গ্রন্থাবলী ঃ

1. V. P. Varma – Modern Indian Political Thought.
2. D. Chattopadhyay – State, Society and Civilization.
3. P. S. Anand – Readings in the Philosophy of Sri Aurobindo.

সপ্তম পাঠ

কৌটিল্যের রাষ্ট্রপরিচালন তত্ত্ব

ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে কৌটিল্য এক অসামান্য ব্যক্তিত্ব। তাঁকে প্রাচীন ভারতের অ্যারিস্টটল বলা হয়ে থাকে। কিন্তু কৌটিল্য অ্যারিস্টটলের মতো রাষ্ট্রদার্শনিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন রাষ্ট্রপরিচালনা বিদ্যার বিজ্ঞানী। প্রাচীন কৌটিল্যের সঙ্গে তুলনা হতে পারে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ইতালির নবজাগৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নিকোলো ম্যাকিয়াভেলীর সঙ্গে। বিষ্ণুগুপ্ত বা চাণক্য নামে পরিচিত কোটিল্য ছিলেন চন্দ্রগুপ্তের মহামন্ত্রী এবং রাজনৈতিক পরামর্শদাতা। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যশাসন ব্যাপারে তিনি যে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তার ভিত্তিতেই তাঁর **অর্থশাস্ত্র** রচনা। এই গ্রন্থে তিনি রাজ্য পরিচালন বিদ্যার নানা বিষয়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত টেনেছেন। **রাজ্য পরিচালনা বিদ্যার ক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবশ্যই রাষ্ট্র সম্পর্কে সপ্তাঙ্গ নীতি ও দন্ডনীতি।** তাঁর সব চিন্তাভাবনার কেন্দ্রে ছিল কিভাবে রাজতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি করা যায় ও রাষ্ট্রকে সুবিন্যস্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। আধুনিক বিচারে, কৌটিল্য প্রকৃতপক্ষে বাস্তববাদী, ধর্মনিরপেক্ষ প্রায়োগিক রাষ্ট্রচিন্তাবিদ ছিলেন। রাষ্ট্র ও রাজকর্তৃপক্ষকে তিনি ভাববাদী ও ধর্মীয় সংস্কারের মোহজাল থেকে মুক্ত করে, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। রাষ্ট্রস্বার্থকে তিনি ধর্মীয় স্বার্থের ওপরে স্থান দিয়েছেন। যদিও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিকাশ ও উন্নয়নের স্বার্থে জনগণের ধর্মীয় আবেগ ও অনুভূতির সার্থক ব্যবহারের কথাও তিনি বলেছেন।

ওপরের আলোচনার সূত্র ধরে আমরা কৌটিল্যের রাজ্য পরিচালনাবিদ্যার মূল বিষয়ের আলোচনা করতে পারি।

প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাবিদদের মতে, রাষ্ট্র চিরকাল ছিল না, রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছিল তখনই যখন মানুষের মধ্যে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালীরা বড় মাছের মতো ছোট মাছকে ভক্ষণ করতে শুরু করল। এই ধরণের মাৎস্যন্যায়ের অবস্থা থেকে মানুষকে আইন ও শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসা প্রয়োজন হয়ে পড়ল। অর্থশাস্ত্রের রচয়িতা কৌটিল্য মনে করেন যে রাষ্ট্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল সামাজিক বৈষম্যকে অর্থাৎ চর্তুবর্ণভিত্তিক সামাজিক স্তরভেদকে (Social Stratification) টিকিয়ে রাখতে হবে। রাজাকে প্রজাবর্গের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দোষীর শাস্তিবিধান করতে হবে। **বস্তুত, রাষ্ট্রশাসনের বিজ্ঞানই হ'ল শাস্তিদানের বিজ্ঞান। মানুষকে ও রাষ্ট্রপরিচালনার সর্বোত্তম উপায় হল শাস্তি দান।**

কৌটিল্য মনে করতেন, রাষ্ট্রের সব থেকে বিপদ্‌জনক অশান্তি হ'ল অভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ এবং এই কারণেই কৌটিল্য রাজাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন ঃ অভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ বাইরে থেকে আবির্ভূত বিপদ/অশান্তির থেকে অনেক বেশী ভয়ঙ্কর কেননা এর ফলে রাজসভায় ও রাজার অনুচরদের মধ্যে একটা অবিশ্বাসের মনোভাব গড়ে ওঠে। রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে এই ধরণের বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য গোয়েন্দাবিভাগ গড়ে তোলা ও রাজনীতিতে গোপন কূটকৌশল প্রয়োগের ব্যবস্থা করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। তিনি উল্লেখ করেছেন যে রাজকর্মচারিদের ঘুষ দেবার ব্যবস্থা করা এবং তাদের পেছনে গুপ্তচর নিযুক্ত করে রাজকর্মচারিদের পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি করে তাদের আসল উদ্দেশ্য জেনে নেয়া অত্যন্ত জরুরী। তাছাড়া, রাজার সমর্থক ও শত্রুদের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে, এবং গোপনে ও শাস্তিদানের, এমন কী গুপ্তহত্যার প্রচলন করতে হবে, যদি তা রাষ্ট্রের হিত ও সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন হয়।

বাস্তব বৈষয়িক স্বার্থকেই সবার ওপরে স্থান দিয়েছেন কৌটিল্য। রাষ্ট্রের স্বার্থের খাতিরে শাস্ত্রসম্মত বিধিবিধানের এক আধটুকু বিচ্যুতি মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন তিনি। তাঁর মতে, যদি সরকারী কোন নির্দেশ বিধিবদ্ধ আইনের সীমা লঙ্ঘন করে তাহলে সেক্ষেত্রে ঐ বে-আইনী সরকারী নির্দেশকেই প্রাধান্য দেয়া উচিত।

রাজা যখন অর্থনৈতিক দিক থেকে সংকটের সম্মুখীন হবেন তখন কৌটিল্য তাঁকে পরামর্শ দিয়েছেন যে, মন্দিরগুলোর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সেই অর্থে রাজকোষ পূর্ণ করতে ও প্রজাবিশেষের কাছ থেকে অসদুপায়ে এবং বলপ্রয়োগে অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন, কিন্তু একবারের বেশী তা করা উচিত নয়। কৌটিল্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যারা দুষ্টুপ্রকৃতির এবং অত্যন্ত অধার্মিক, কেবল তাদের ওপরই যেন রাজকোষের এবংবিধ ব্যবস্থা করা হয়, নিরাপরাধ বা ধার্মিক ব্যক্তির ওপর নয়। যেমন বাগান থেকে পাকা ফল সংগ্রহ করাই বিধেয়, কাঁচা ফল নয়, তেমনি দোষপরিপাকযুক্ত দুষ্ট ব্যক্তির থেকেই ধনসংগ্রহ করা উচিত, অন্যথায়, প্রজারা ক্রুদ্ধ হবে এবং রাজারাও নাশ হতে পারে (৫/২ অর্থশাস্ত্র)। এছাড়া, রাজাকে নিজস্বার্থে এবং রাষ্ট্রপরিচালনার স্বার্থে প্রজাদের ধর্মীয় কুসংস্কারকে কাজে লাগাতে হবে তাদের মনে যেন এই বিশ্বাস স্থায়ী হয় যে রাজা প্রকৃতই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী।

কৌটিল্যের রাষ্ট্রপরিচালনার অন্যতম নীতি হল প্রজাবর্গের হিত বা কল্যাণ। "প্রজার সুখ হলেই রাজার সুখ এবং প্রজার হিত হলেই তা রাজার হিত ; যেটা রাজার নিজের হিত, সেটা তার হিত নয়।" (১/১৯)। অর্থাৎ কৌটিল্য রাজ্য পরিচালনার সঙ্গে প্রজাকল্যাণের বিষয়টিকে যুক্ত করেছেন। কৌটিল্য লিখেছেন ঃ সবধরণের ভয় উপস্থিত হলে উপহত বা ভয়পীড়িত প্রজাবর্গকে রাজা/শাসক পিতার মত রক্ষা করবেন। (৪/৩ অর্থশাস্ত্র)

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়। অর্থশাস্ত্রে পররাষ্ট্র বিষয়ক ছয়টি প্রধান পদ্ধতি বিবৃত হয়েছে, (ক) সন্ধি বা শান্তি ; (খ) বিগ্রহ বা যুদ্ধ; (গ) যান ; (৪) আসন ; (৫) দ্বৈধীভাব ; (৬) সংশ্রয়।

পররাষ্ট্র বিষয়ে কৌটিল্য সবথেকে গুরুত্ব দিয়েছেন রাষ্ট্রদূত এবং কূটনীতিবিদদের সফল কর্মকাণ্ডের উপর। রাষ্ট্রীয় চুক্তির শর্তাদি প্রতিপালন ও নিজ রাষ্ট্রের মর্যাদা রক্ষা ও বৃদ্ধি করা ছাড়াও, রাষ্ট্রদূতদের কাজ হল বন্ধুরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে দেয়া, গোপন ষড়যন্ত্র ইত্যাদির অনুষ্ঠান করা, মোতায়েন সৈন্যদলকে গোপনে স্থানান্তরিত করা অর্থাৎ সম্ভব হলে সবরকমের দুষ্কর্মই সাধন করা।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোকে অবশ্যই শত্রু বলে গণ্য করতে হবে। তবে প্রতিবেশীর প্রতিবেশীকে অবশ্যই বন্ধু হিসেবে গণ্য করতে হয়, তবে সেই বন্ধুর প্রতিবেশী আবার গণ্য হবে অপর এক শত্রু বলে। অর্থাৎ কেউ বন্ধু কেউ শত্রু এরকম কিছু নেই, কেউ কারও শত্রু, অপরের বন্ধু, অপরের বন্ধু, অন্যের শত্রু। এভাবেই কৌটিল্য গড়ে তুলেছেন এক ভৌগলিক আন্তর্জাতিক রাজমন্ডলের ব্যবস্থা।

কৌটিল্যের রাষ্ট্রপরিচালনার বিষয়গুলোর সারাংশ ঃ

(ক) প্রাচীন চারটি মৌলিক মূল্য যেমন ধর্ম, অর্থ বা সম্পদ, কাম ও মোক্ষগুলোর মধ্যে কৌটিল্য প্রথম তিনটির গুরুত্ব দিয়েছেন কারণ রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে চতুর্থটি মূল্যহীন। সীমাহীন সুখবাদ ও নির্বিচার কৃচ্ছতাবাদ, তাঁর মতে, বর্জনীয়।

(খ) রাষ্ট্র পরিচালনায় দার্শনিক প্রত্যয় থাকবে না তা নয়, কিন্তু দর্শন হবে যৌক্তিক বা যুক্তিগ্রাহ্য। জ্ঞানের চারটি শাখা হল দর্শনশাস্ত্র, (অন্বীক্ষিকা), বেদ, অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রশাসন সম্পর্কিত পাঠ (দণ্ডনীতি) ; প্রধান প্রধান জ্ঞানবিজ্ঞানের মধ্যে দর্শনশাস্ত্রকেই প্রথম স্থান দিয়েছেন তিনি। এটা, নিছক আকস্মিক ব্যাপার নয়। লোকায়ত, সাংখ্য ও যোগ এই তিনটি দর্শনের উল্লেখ করে কৌটিল্য প্রাচীনকালের গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর মতই বলেছেন যে দর্শনশাস্ত্রের অধিকার থাকলে রাষ্ট্রপরিচালনার কাজে সাফল্য আসে, রাষ্ট্রপরিচালনায় নানা সমস্যার সমাধান সহজ হয়।

(গ) কৌটিল্যের মতে, রাজার থাকবে উন্নতমানের বুদ্ধিবৃত্তি, সুউন্নত চরিত্র ; অর্থনীতি প্রসঙ্গে তার গভীর জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যৌক্তিক বুদ্ধি প্রয়োগ করেই তিনি রাষ্ট্রপরিচালনা করবেন।

(ঘ) শাসক/রাজা নিজ নিরাপত্তার সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করবেন কেননা রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণ তাঁর ওপরে নির্ভরশীল। শাসক হিসেবে তিনি তাঁর কর্মচারিদের এবং তাঁর শত্রুদের ওপর কড়া নজর রাখবেন 'গুপ্তচরব্যবস্থা'র বিকাশ সাধন করে। নিজ আত্মীয়দের হাত থেকেও নিজেকে রক্ষা করতে হবে কারণ কৌটিল্যের মতে, 'রাজার সন্তানই রাজাকে হত্যা' করতে পারে।

(ঙ) আত্মস্বার্থের কারণে তিনি প্রজাদের ধর্মীয় আবেগকে যথাযথভাবে ব্যবহার করবেন।

(চ) শাসক তাঁর প্রজাবৃন্দের মঙ্গলার্থে তাঁর অনুগামী ও বিরোধী উভয়ের স্বার্থই রক্ষা করবেন যাতে তিনি বিরোধীদের হৃদয় জয় করতে পারেন কিন্তু শত্রুদের সর্বদা ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করবেন।

(ছ) তিনি সম, দম, ভেদ ও দণ্ডর মাধ্যমে তাঁর প্রতিযোগী ও শত্রুকে নিয়ন্ত্রণে রাখবেন। রাষ্ট্রপরিচালনার অপরিহার্য এই চারটি নীতির মধ্যে দণ্ডনীতিই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ রাষ্ট্রশাসনের বিষয়টি এর সঙ্গেই প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এটা আরো গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে দণ্ড খুব বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের সঙ্গে ব্যবহার করলে জনগণ সরকারের প্রতি তাদের আস্থা জ্ঞাপন করে। দণ্ড কখনই খুব সুকঠোর বা খুব কোমল হবে না। লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড বা গুরু অপরাধে লঘুদণ্ড দিলে প্রথম ক্ষেত্রে রাজা অত্যাচারী এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দুর্বল চরিত্র বলে চিহ্নিত হবেন। যোগ্য বা উচিত দণ্ড দিলে জনগণ রাজাকে অনুসরণ করবে, মান্য করবে ও রাজ্যেরও মঙ্গ ল হবে। রাজাকে ''জনমনস্তত্ত্ব'' ব্যবহার করে জনগণকে নিজের বশে নিয়ে আসতে হবে। রাজাকে অপরাধীদের প্রসঙ্গে বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভুলত্রুটি বা দূর্নীতি সংশোধনের ক্ষেত্রে নির্মম হতে হবে।

(জ) প্রকৃত অসন্তুষ্ট ব্যক্তিদের রাজা অর্থ দ্বারা অনুগৃহীত করবেন, কিন্তু বিনা কারণে অসন্তুষ্ট ব্যক্তিদের বা রাজার বিরুদ্ধে যারা গোপনে বা প্রকাশ্যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাদের শাস্তিদানের ব্যবস্থা করবেন।

(ঝ) রাজাকে ক্ষমতাবৃদ্ধি, সম্পদবৃদ্ধি এবং মন্ত্রিদের সুপরামর্শ অর্জনে তৎপর হতে হবে। আপদকালে বা সংকটের মোকাবিলা করতে গিয়ে প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করেও রাষ্ট্রের স্বার্থে অর্থসংগ্রহ করে কোষাগার পূর্ণ করতে হবে। রাষ্ট্রের যুক্তি যে কোন ধরণের নৈতিকতা বা ধর্মীয় বিধির চেয়ে অনেক বড়। এক্ষেত্রে কৌটিল্যের সঙ্গে ম্যাকিয়াভেলীর সাযুজ্য লক্ষ্যণীয়। রাষ্ট্র পরিচালনাবিদ্যাকে স্বাধীন ও ধর্মনিরপেক্ষ এলাকা হিসেবে তুলে ধরে কৌটিল্য আধুনিক মননের সূত্রপাত করেছেন।

(ঞ) কৌটিল্যের রাষ্ট্রপরিচালনবিদ্যা বৈদেশিক নীতির সাথে গভীর সম্পর্কে সম্পৃক্ত। কৌটিল্যের সঙ্গে এক্ষেত্রেই ম্যাকিয়াভেলীর সাদৃশ্য। কৌটিল্য প্রদত্ত সূত্র এখনও রাষ্ট্রশাসকগণ পররাষ্ট্রক্ষেত্রে ব্যবহার করেন।

(i) কোন শাসক তাঁর শত্রুকে আক্রমণ করবেন তখন যখন তাঁর শত্রু অসুবিধার মধ্যে থাকবে বা জনগণের অভাব অভিযোগের সীমা থাকবে না।

(ii) একজন শক্তিশালী রাজা দুর্বল শাসকের সঙ্গে সন্ধি বা শান্তিস্থাপন করবেন ; যুদ্ধে লাভ না হলে নিরপেক্ষতা গ্রহণ করবেন ; দুটি শক্তিশালী রাজার মধ্যে শক্তিশালী কিন্তু অন্যায়কারী শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, দুর্বল কিন্তু ন্যায়পরায়ণ শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না। সবল শত্রুর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন কিন্তু দুবর্লশত্রুর সঙ্গে উদার ব্যবহার করবেন।

(iii) শাসক সব সময় তাঁর গুপ্তচরবাহিনী ও কূটনীতিবিদদের দিয়ে দুই শত্রুরাজ্যের মধ্যে তিক্ততা বৃদ্ধির চেষ্টা করবেন, শত্রু রাজ্যের মধ্যে অশান্তি বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতেও তিনি দ্বিধাহীন।

(iv) সময় ও পরিস্থিতি অনুসারে শাসককে ছয় ধরণের নীতি অনুসরণ করতে হয়। বিদেশনীতির ক্ষেত্রে 'তত্ত্বের' থেকে 'বাস্তবতার' প্রতিই রাজা একনিষ্ঠ থাকবেন। কৌটিল্য তাঁর শিক্ষক বাতব্যাধির দুই ধরণের কৌশলের পরিবর্তে বিদেশ নীতির ছয়টি কৌশলের উল্লেখ করেছেন ঃ (অ) সন্ধি বা শান্তি ; (আ) যুদ্ধ বা বিগ্রহ; (ই) যান ; (ঈ) আসান ; (উ) দ্বৈধীভাব ; (ঊ) সংশ্রয়। এই নীতিগুলোকে কৌটিল্য **ষাঢ়গুণ্য** নাম দিয়েছেন। তবে শাসক একই সঙ্গে একাধিক নীতি গ্রহণ করতে পারেন।

একটা বিষয় স্মরণীয় যে কৌটিল্যের রাষ্ট্র পরিচালন বিদ্যার মূল কথাটি হল রাষ্ট্রের হিত বা মঙ্গল। আবার আধুনিক ম্যাকিয়াভেলীর বিপরীতে তিনি বলেন যে রাষ্ট্রের হিতের সঙ্গে জনগণের হিতকে মর্যাদা দেয়া দরকার, তাকে উপেক্ষা করা বাঞ্ছনীয় নয়।

১.২ রাষ্ট্রপরিচালনা ও সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব ঃ

কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্রকে একটি আঙ্গিক সংস্থা (organic institution) বলে বর্ণনা করেছেন। **কৌটিল্যের রাষ্ট্রপরিচালনাবিদ্যার (Statecraft) অন্যতম আলোচ্য বিষয় হল সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব।** কৌটিল্য মনুর মতই রাষ্ট্রকে কতকগুলো অংশের বিচ্ছিন্ন যোগফল হিসেবে না দেখে আঙ্গিক ঐক্য হিসেবে দেখেছেন। প্রত্যেক অঙ্গ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী বলার অর্থ রাষ্ট্রীয় ঐক্য বিনষ্ট করা। কৌটিল্যের মতে রাষ্ট্রের যে সাতটি অঙ্গ আছে, তারা সমগ্রর সাথে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ। কৌটিল্যের মতে, এই সাতটি অঙ্গ হল, (১) স্বামী; (২) মন্ত্রী/অমাত্য; (৩) জনপদ; (৪) দূর্গ; (৫) কোশ বা কোষাগার;(৬) দণ্ড;(৭) মিত্র।

বিচ্ছিন্ন হিসেবে দেখলে এগুলো মূল্যহীন কিন্তু রাষ্ট্রের পক্ষে প্রত্যেকের কার্যাবলী গুরুত্বপূর্ণ, অপরিহার্য। যদি প্রতিটি অঙ্গ পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে ও দৃঢ়বদ্ধ থাকে তবে রাষ্ট্রের কার্যকলাপ সুচারুরূপে সম্ভব হবে। এবার অঙ্গগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক।

(১) **স্বামী ঃ** স্বামী বলতে বোঝায় প্রধান বা প্রভু। সম্ভবতঃ স্বামী বলতে রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র উভয়ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপ্রধানকে বোঝায়। কৌটিল্যের মতে, রাষ্ট্রকাঠামোর প্রধান অঙ্গ হলেন রাজা বা স্বামী। রাজাকে উচ্চবংশজাত, সুভদ্র, সৎ ও সংস্কৃতিবান হতে হবে। অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্যের মন্তব্য ঃ কোন দুর্বল অথচ সুবংশজাত রাজা অবশ্যই কোন শক্তিশালী নিচবংশজাত রাজার থেকে শ্রেষ্ঠতর (অর্থশাস্ত্র ৮/২)। রাজা কাম, ক্রোধ, লিপসা ও মোহ মুক্ত, সুসংযত, সুশিক্ষায় শিক্ষিত, দণ্ডনীতি ও অর্থশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে প্রজাদের মঙ্গলার্থে আত্মনিয়োগ করবেন। **রাজাই হলেন রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় শক্তি।**

(২) **অমাত্য ঃ** অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে ঃ "একটি চক্রের মত রাজত্বও সাহায্য ব্যতিরেকে আবর্তিত বা পরিচালিত হতে পারে না। সেই কারণে রাজা অবশ্যই মন্ত্রীদের নিয়োগ করবেন এবং তাদের মতামত শুনবেন"। (অর্থশাস্ত্র ১/৭) কৌটিল্যের রাজ্য পরিচালনায় রাজার স্বেচ্ছাচারিতার কোন স্থান নেই। এটা একধরণের সচিবায়ত্ত রাজতন্ত্র। অমাত্যগুণ ও সম্পদের বিচার করে, রাজা ধী-সচিব ও কর্মসচিব নিযুক্ত করেন। ধর্ম্মোপধা, অর্থোপধা, কামোপধা ও ভয়োপধা এই চার ধরণের উপধা দ্বারা রাজা সচিবগণের শৌচাশৌচ (ভালোমন্দ) পরীক্ষা করে তাদের বিভিন্ন শাসনবিভাগের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করেন। কৌটিল্য অমাত্য বলতে মূলতঃ সুপ্রশিক্ষিত, সুসংগঠিত ও সুদক্ষ প্রশাসনকর্মীদের বুঝিয়েছেন।

অমাত্যসভা সম্পর্কে বলতে গিয়ে কৌটিল্য মন্ত্রিগণ ও অমাত্যের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। মন্ত্রিদের সংখ্যা তিন চারজনের বেশী হবে না ; অমাত্যদের সংখ্যা নির্ভর করে সরকারের তাদের নিযুক্ত করার ক্ষমতার ওপর । অমাত্যদের সকলকেই সময়, স্থান ও কার্য অনুসারে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, কিন্তু এই নিয়ম 'মন্ত্রি' দের সম্পর্কে প্রযোজ্য হতে পারে না। অমাত্যগণের হাতে থাকে কৃষি উন্নয়ণ, ভূখণ্ডের উন্নতি, দুঃখকষ্ট দূর করা, অপরাধীদের শাস্তি দেয়া ইত্যাদির মত দায়িত্ব। অমাত্যদের হাতে রয়েছে সরকারী ব্যবস্থাপনার ভার, অপরদিকে মন্ত্রীদের দায়িত্ব হল রাজাকে পরামর্শ দেয়া, 'মন্ত্র' কে রক্ষা করা, রাজাকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত করাও মন্ত্রীদের কাজের মধ্যে পড়ে।

(৩) **জনপদ ঃ** জনপদ বলতে অর্থশাস্ত্রে জনগণ ও ভূখণ্ড উভয়কেই বোঝানো হয়েছে। জনপদের থাকবে সুন্দর জলবায়ু এবং গোচারণভূমি এবং কৃষকশ্রেণী স্বল্প পরিশ্রমে শস্য উৎপাদন করতে পারবে। কৃষকশ্রেণী 'করভার' ও 'শাস্তিভার' বহন করবে; থাকবে শিক্ষিত প্রভুভক্তশ্রেণী ও বেশীসংখ্যক নিম্নশ্রেণীর লোক যারা আনুগত্য প্রিয়, রাজভক্ত এবং 'উৎপাদনকারী'।

কৌটিল্য জনপদের আয়তন বা লোকসংখ্যা সম্পর্কে কোন শেষ কথা বলেননি। একটি গ্রামে অন্ততঃ একশত থেকে পাঁচশত পরিবার থাকবে এবং প্রতিটি '**স্থানীয়**'তে থাকবে অন্ততঃ আটশত গ্রাম। জনপদ মূলতঃ কৃষিভিত্তিক, স্বয়ংসমৃদ্ধ সীমাবদ্ধ এলাকাই কৌটিল্যের রাষ্ট্রকাঠামোর এক অন্যতম অঙ্গ।

(৪) **দুর্গ ঃ** কৌটিল্য রাষ্ট্রের অধিবাসীদের নিরাপত্তার কারণে রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে ও চারদিকে দুর্গ নির্মাণের কথা বলেছেন। দুর্গের আর একটি নাম পুর। দুর্গ বলতে দুর্গ ও পুর দুটোকেই বোঝায়। দুর্গকে সংরক্ষিত রাজধানীও বোঝায়।

(৫) **কোশ ঃ** কোশ হ'ল রাষ্ট্রের পঞ্চম উপাদান ; সঠিক ও বৈধ পথেই রাজাকে রাজস্ব সংগ্রহ করতে হবে এবং এই ক্ষমতা রাজার হাতেই থাকবে। খাজাঞ্চীখানা স্বর্ণে, রৌপ্যে ও মূল্যবান অলংকারে ভর্তি থাকবে যাতে করে দুর্দিনে দুর্ভিক্ষে সেগুলোর ব্যবহার হবে। কোষাগার না থাকলে সেনাবাহিনী রাখা যাবে না। কৌটিল্য সঠিকভাবেই বলেছেন অর্থের সঙ্গে রাজনীতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে।

(৬) **দণ্ড ঃ** দণ্ড হ'ল বলপ্রয়োগকারী শক্তি বা ক্ষমতা। সেনাবাহিনীর মধ্য দিয়ে এটা প্রকাশিত। কোষের সঙ্গে কখন কখনো একে যুক্ত করা হয়। শক্তিশালী সেনাবাহিনী রাষ্ট্রের সুদৃঢ় অস্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্য। সৈন্যদল হবে পুরুষানুক্রমিক রাজভক্ত, অজেয়, যুদ্ধে স্থিতধী, ধৈর্যশীল, পরিশ্রমী, কার্য দক্ষ, ক্ষতি ও লাভে সমদর্শী। রাজার আজ্ঞা দ্বিধাহীনভাবে মান্য করাই সেনাবাহিনীর মৌলিক কর্তব্য। একমাত্র ক্ষত্রিয়রাই চমৎকার সেনাবাহিনী হবার যোগ্য ; জরুরী অবস্থায় ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যদের সৈন্য হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে কিন্তু শূদ্রকে কখনই নয়। **শূদ্র বলপ্রয়োগকারী শক্তি হবে তা কৌটিল্য মেনে নিতে পারেন নি ; এখানেই হবে কৌটিল্যের শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা, রাজনীতির ক্ষেত্রে স্ববিরোধীতা।** তবে অর্থশাস্ত্রে শূদ্রকে নেবার কথাও আছে।

(৭) **মিত্র ঃ** রাষ্ট্রের সপ্তম উপাদান হ'ল মিত্র। অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে মিত্রকে বলা হয়েছে সুহৃৎ। কৌটিল্যের মতে, মিত্রকেও বংশানুক্রমিক হতে হবে এবং তাকে কৃত্রিম বন্ধু হলে চলবে না। বন্ধুত্ব সেখানেই সম্ভব যেখানে একজন অপরজনকে ত্যাগ করে না, সব সময়ে মিত্র সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়,

প্রতিদানের আশায় থাকে না। মিত্র হল যথার্থ উৎসাহদাতা, প্রেরণাদাতা, আন্তরিক ও বিভেদবিমুখ। কৌটিল্য মিত্র বলতে যেমন আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে, তেমনি পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে মিত্ররাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগুলোকেও বুঝেছেন।

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেনসার, গ্লামপ্লুইজ ব্লুন্টস্‌লী প্রমুখ ব্যক্তিগণ রাষ্ট্রের যে আঙ্গিক চরিত্র নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে প্রাচীনকালে কৌটিল্য রাষ্ট্রকে সপ্তঅঙ্গ বিশিষ্ট একটা জৈবিক সত্ত্বা বলে মেনে নিয়েছেন। প্রতিটি অঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ এবং এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ।

রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে কৌটিল্যের অন্যতম অবদান হল বিভিন্ন অঙ্গগুলো দুর্যোগে, দুর্বিপাকে কীভাবে প্রভাবিত হয় তার ব্যাখ্যা দেয়া। এক্ষেত্রে কৌটিল্য রাজার কথাই উল্লেখ করেছেন বেশী। রাজা যদি তার স্বধর্ম থেকে সরে এসে মদ্যাসক্ত হন, জুয়া খেলেন ও বহুবল্লভ হয়ে পড়েন তাহলে তিনি নৈতিকভাবে রোগগ্রস্থ হয়ে পড়বেন এবং রাজধর্ম পালনে ব্যর্থ হবেন। আর তাঁর নৈতিক অধঃপতন প্রজাসাধারণের মধ্যেও সংক্রমণ ঘটবে। রাজা ও প্রজা উভয়েই অধঃপতিত হলে রাষ্ট্রব্যবস্থা নৈরাজ্যের মধ্যে অধঃপতিত হবে।

সেই জনপদ দুর্বল যেখানে প্রজাসাধারণের সকলেই অস্ত্রসজ্জিত ; রাজধানী সম্পূর্ণ কৃষক পরিবৃত হলে সেটাও বড় ধরণের দুর্বলতার চিহ্ন। এছাড়া জনসাধারণের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ, খরা, বন্যা দুর্ভিক্ষজনিত কারণে অর্থব্যবস্থায় সংকট, রাজকর্মচারীদের উৎকোচ গ্রহণ, কর সংগ্রাহকদের অত্যাচার, উচ্চপদস্থ অমাত্যগণের অসততা রাষ্ট্রকাঠামোকে দুর্বল করে দেয়।

সেনাবাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে তাদের আনুগত্যহীনতা ও বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে।

এসব ত্রুটি দূর করার জন্য কৌটিল্য নানা প্রতিকারের ব্যবস্থা দিয়েছেন।

(ক) রাজা তার সতর্কতা, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে জ্ঞান, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও নিজস্ব বিচার ধারা প্রয়োগ করে রাষ্ট্রকাঠামোর অঙ্গগুলোর দুর্বলতা দূর করতে পারেন।

(খ) অমাত্য বা রাজকর্মচারী যাতে রাষ্ট্রীয় অর্থ আত্মসাৎ করতে না পারে তার জন্য কোন অধিকরণে বা কার্যদপ্তরে কোন কর্মচারীকে বহুদিন ধরে রাখা চলবে না।

(গ) রাষ্ট্রের কোন অঙ্গই অপর অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র থাকতে পারে না ; প্রতিটি উপাদান প্রতিটির সঙ্গে গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ।

(ঘ) কৌটিল্য অমাত্য বা মন্ত্রীদের কাজের গুরুত্ব স্বীকার করলেও রাষ্ট্রীয় অঙ্গগুলোর মধ্যে রাজাই গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। রাজার গুণ থাকলে তিনি সব উপাদানকে গুণান্বিত করতে পারেন। রাজা ক্ষমতাহীন হলেও তিনি রাষ্ট্রের ক্ষমতার প্রতীক।

(ঙ) রাজা হলেন সবথেকে সক্রিয় উপাদান ; দণ্ড বা অমাত্য সকলেই সক্রিয় কিন্তু রাজাই সকলকে সক্রিয় রাখেন, রাজা সংরক্ষিত হলেই অপর অঙ্গগুলো সংরক্ষিত হবে।

কৌটিল্যের সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব নানা সমালোচনার সম্মুখীন। প্রথমত, এই তত্ত্ব সব অঙ্গগুলোকে সমান গুরুত্ব দেয়নি। দ্বিতীয়ত, কৌটিল্যের সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব গণতন্ত্রবিরোধী ; গণতন্ত্রে জনগণই সার্বভৌম এখানে কৌটিল্য রাজার হাতেই সার্বভৌমিকতা ন্যস্ত করেছেন। তৃতীয়ত, সপ্তাঙ্গ তত্ত্বে রাজার অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার কথা বলে কৌটিল্য স্বেচ্ছাতারতন্ত্রের

পথ উন্মুক্ত করেছেন। চতুর্থত, দ্বিধাহীন আনুগত্যই কৌটিল্যের সপ্তাঙ্গতত্ত্বের মূলকথা। এমনকী স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহ করার অধিকার কৌটিল্য স্বীকার করেন নি। পঞ্চমত, সকল আঙ্গিক মতবাদের মতই কৌটিল্যের সপ্তাঙ্গ তত্ত্বেও ব্যক্তি উপেক্ষিত, ব্যক্তি যেন সমগ্রের চাপে পিষ্ট ও ক্লিষ্ট। ষষ্ঠতঃ, রাজার যেসব গুণের কথা কৌটিল্য বর্ণনা করেছেন, তা বাস্তব জগতে খুঁজে পাওয়া যাবে না ; এটা কৌটিল্যের আদর্শায়ন ছাড়া আর কিছু নয়। সপ্তমত, সৎ ও সুদক্ষ মন্ত্রী বা অমাত্য পাওয়া সবসময় সম্ভব নয়। এছাড়াও মার্কসবাদীগণ মন্তব্য করেছেন যে কৌটিল্য সপ্তাঙ্গ রাষ্ট্রতত্ত্বও আসলে এক শোষণমূলক অনৈতিক ভণ্ড (pseudo) রাষ্ট্র।

কৌটিল্যের সপ্তাঙ্গ তত্ত্বের সমালোচনা করেও বলা চলে যে কৌটিল্য রাজাকে কখনই সর্বগ্রাসী করে তোলেন নি। রাজাকে কখনই তিনি সর্বশক্তিমান ও জনকল্যানবিরোধী শক্তি হিসেবে গড়ে তোলেন নি। ভারতে কৌটিল্যই প্রথম রাষ্ট্রচিন্তাবিদ যিনি রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার কথা ভেবেছিলেন, তার প্রকৃতি নিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। আধুনিক কালের রাষ্ট্রের প্রশাসনযন্ত্রে আমলাতন্ত্রের গুরুত্বকে তিনিই প্রাচীনকালে উপলব্ধি করেছেন। প্লেটো, অ্যারিস্টটল বা পরবর্তীকালের ম্যাকেয়াভেলী বা বোদাঁ কেউই রাষ্ট্রের প্রকৃত চরিত্র এবং তার উপাদান সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। কৌটিল্য এক্ষেত্রে কৃতিত্ব দাবি করতেই পারেন।

১.৩ রাষ্ট্র পরিচালনা ও দণ্ডনীতি ঃ

কৌটিল্য রাষ্ট্রচিন্তার বিশেষ করে রাষ্ট্র পরিচালনা বিদ্যার অন্যতম মূল নীতি হল দণ্ডনীতি। তাঁর মতে, **দণ্ডনীতি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার চালিকাশক্তি।** সেজন্য তিনি দণ্ডনীতিকে রাজনীতি বা রাজনীতির বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন। দণ্ডনীতি শাসকের হাতে সব থেকে বড় অস্ত্র যার সাহায্যে তিনি সমাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনকে রক্ষা করেন এবং অপরাধমূলক কার্যকলাপকে শাস্তিপ্রদান বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিহত করেন।

কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ করেছেন, জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় অর্থ। অর্থ হল ভূমি। ভূমি অর্জন ও পালন করার বিজ্ঞান হ'ল অর্থশাস্ত্র। মানুষের আশ্রয়দাতা হ'ল ভূমি আর রাজা হলেন ভূমির রক্ষক এবং দণ্ডপ্রদানের মাধ্যমেই রাজা তা রক্ষা করেন। **সেদিক থেকে বিচার করলে দণ্ডনীতি হ'ল রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলার প্রতীক, এটা একদিকে রাজার বৈধক্ষমতা, অপরদিকে অপরাধমূলক কার্যকলাপের বাধাদানকারী শক্তি।**

দণ্ড হল প্রাধান্যসূচক শব্দ ; এটা হল অসীম ক্ষমতা, যার ওপরে আর কোন ক্ষমতা নেই, **দণ্ড হল রাষ্ট্রের যুক্তি, ক্ষমতার রাজনীতি।** দণ্ডের দুদিকেই ধার, একদিকে দণ্ড জনগণের মনে ভীতি উৎপাদন করে, অপরদিকে সামাজিক ন্যায় ও অবিচারের সংশোধন করে থাকে। দণ্ডের মাধ্যমেই সামাজিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ও জনসাধারণ সঠিক পথে চলে।

দণ্ড আছে বলে নিষ্ঠুর ব্যক্তিও 'ভদ্রজনে' পরিণত হয়, অপরাধী তার অপরাধমূলক কার্যকলাপ থেকে সরে আসে।

প্রশ্ন হ'ল দণ্ডনীতি বলতে কি বোঝায় ? কৌটিল্য বলেন, আন্বীক্ষিকা, ত্রয়ী ও বার্তা এ তিনবিদ্যার যোগ ও ক্ষেম অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর লাভ ও লব্ধবস্তুর পরিপালন সাধন করে যে দণ্ড তার প্রয়োগের নীতিকেই দণ্ড বলে। এই দণ্ডনীতির দ্বারা অলব্ধবস্তু লাভ হয়, লব্ধ বস্তু রক্ষা করা যায়, রক্ষিত বস্তু বর্ধিত করা সম্ভব হয় এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত বস্তুকে উপযুক্ত পাত্রে নিয়োজিত করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ দণ্ডনীতির সঙ্গে ন্যায়নীতির প্রশ্নও যুক্ত। **বৃদ্ধিপ্রাপ্ত**

বস্তুর অর্থ উদ্বৃত্ত বস্তু এবং তা উপযুক্ত পাত্রে প্রদান করার অর্থই হ'ল বণ্টনমূলক ন্যায়বিচার।

দণ্ডনীতির মাধ্যমেই লোকযাত্রা সফল হয়। লোকসমাজে প্রচলিত আচার, আচরণ, ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায়বোধ সবই দণ্ডনীতির ওপর নির্ভরশীল। যে রাজা লোকযাত্রার সম্যক অনুষ্ঠানে তৎপর তিনি **'নিত্যই উদ্যতদণ্ড'** অর্থাৎ দণ্ড প্রনয়ণে ও প্রয়োগে উদ্যোগী।

প্রাচীন আচার্যগণের মত হ'ল, প্রানিগণকে বশীভূত করার জন্য দণ্ডের মত উপযোগী আর কোন উপায় নেই ; কৌটিল্য এইমত সবদিক থেকে স্বীকার করেন না। কারণ যে রাজা **'তীক্ষ্নদণ্ড'** অর্থাৎ লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড দান করেন, তিনি সকল প্রাণীর পক্ষেই উদ্বেগজনক। আবার যে রাজা **'মৃদুদণ্ড'**, যিনি গুরু অপরাধে লঘুদণ্ড দান করেন তিনি অন্যের কাছে পরাভব প্রাপ্ত হন। কেউ তাকে মান্য করতে চায় না। উভয়ক্ষেত্রেই দণ্ডের অপপ্রয়োগ হয়েছে। রাজা যদি যথার্থদণ্ড হন অর্থাৎ যে যেমন দণ্ড পাবার যোগ্য তার প্রতি তেমন দণ্ড দেন তাহলে তিনি সর্বপূজ্য হন। প্রকৃত দণ্ড প্রজাবর্গকে ধর্ম, অর্থ ও কামের সঙ্গে যুক্ত করে। আবার কাম, ক্রোধ বা অজ্ঞানতাবশতঃ যদি দণ্ড দুষ্প্রণীত হয়, তাহলে সে দণ্ড বাণপ্রস্থ ও পরিব্রাজকদেরও কোপযুক্ত করে, গৃহস্থের তো কথাই নেই।

যার দণ্ড পাওয়া উচিত তাকে দণ্ড না দিলে কালক্রমে সমাজ 'মাৎস্যন্যায়ে' মধ্যে পরে যাবে এবং অরাজকতা দেখা দেবে। বড়মাছ ছোটমাছকে গিলে খাবে। দণ্ডধরকারী রাজার অভাবে বলবান ব্যক্তি বলহীনকে, সবলব্যক্তি দুর্বলব্যক্তিকে গ্রাস করবে। অর্থাৎ অবাধে অত্যাচার, নিপীড়ণ ও শোষণ চালাবে। দণ্ডই এসব রোগের নিরাময় করতে পারে। কৌটিল্য বলেছেন, দণ্ড আছে বলেই চারবর্ণ ও চার আশ্রমের লোকেরা নিজ নিজ ধর্ম ও কর্ম পালন করে সুখে জীবনযাপন করতে পারে। **দণ্ডনীতি শুধু ব্যক্তির জীবন নয়, সমাজ ও রাজ্যের সার্বিক মঙ্গলের ও সুস্থতার জন্য অপরিহার্য।**

কৌটিল্য রাজাকে অযথা দণ্ডধর বলেন নি ; তিনি শক্তিশালী ও দণ্ডধর হবেন এজন্য যে প্রজাপালনই তার মৌলিক উদ্দেশ্য। প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতিশাস্ত্রে দুটি মূল বিষয় হল (ক) সম্পত্তি সংরক্ষণ ও (খ) ধর্মরক্ষা। কিন্তু এই দুটি বিষয়ই নির্ভর করে রাজার দণ্ডশক্তি বা সার্বভৌম ক্ষমতার ওপর। প্রজা-সাধারণের হিত ও লোকহিত এবং শৃঙ্খলা ব্যবস্থিত রাখা।

দণ্ডনীতি রাজার হাতের দণ্ডস্বরূপ। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে রাজাকে কৌটিল্য সর্বশক্তিমান করে তুলতে চেয়েছেন। রাজা দণ্ডেশ্বর ঠিকই, কিন্তু তিনি সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী নন। প্লেটোর দার্শনিক রাজার মত তিনি সর্বজ্ঞ নন ; আবার হবসের সার্বভৌম কর্তৃত্ববাদী নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারীও তিনি নন। কৌটিল্যের রাজা ধর্মসূত্র, ন্যায়নীতি ও আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ। তাঁকে অমাত্য ও মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে। ম্যাকিয়াভেলীর শাসক সিংহ ও শিয়ালের সংম্রিশন কিন্তু কৌটিল্যের রাজা হলেন দণ্ড ও ভদ্রতার সমন্বয়কারী। সম্পত্তি সংরক্ষক হিসেবে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে কৌটিল্য আধুনিক রাজনীতির জন্ম দিয়েছেন। আধুনিক কালের রাষ্ট্রও (সবযুগের রাষ্ট্রও) ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও সামাজিক স্তরবিভাজনকে সংরক্ষণ করে আর এই সংরক্ষণের জন্যই রাজার দণ্ডশক্তি। এটাই কৌটিল্যের রাজনীতির আলোকবর্তিকা, রাষ্ট্র-পরিচালনাবিদ্যা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মৌলিক অবদান।

SUGGESTED QUESTIONS

1. What do you mean by the 'Saptanga" or Seven elements of the state ?
2. Write a short note on the concept of Dandaniti as enunciated by Kautilya.
3. Write a brief note on the concept of Statecraft as given by Kautilya.
4. What are the main responsibilities of King according to Kautilya ?
5. Do you think that Kautilya's Statecraft is connected with foreign relation ? Give reasons.
6. What are the criticisms against 'Saptanga' concept of Kautilya.
7. Do you think that Kautilya had made the King more powerful in his 'Saptanga' concept ?

———————

অষ্টম পাঠ

স্বামী বিবেকানন্দ

বৈদান্তিক সন্ন্যাসী হিসাবেই স্বামী বিবেকানন্দের প্রধানত পরিচয় ; কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে এটুকু বললেই যথেষ্ট নয়। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ও বৈপ্লবিক স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল। ১৮৬৩ সালে তাঁর জন্ম। ১৮৯৩ সালে মাত্র ৩০ বছর বয়সে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে ধর্ম সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়ে তিনি পাদপ্রদীপের আলোয় আসেন। এই বিখ্যাত শিকাগো বক্তৃতায় বিবেকানন্দ বিভিন্ন ধর্মমতের সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে বলেছিলেন। এই সময়ই পিতৃদত্ত নাম নরেন্দ্রনাথ ত্যাগ করে তিনি বিবেকানন্দ নামটি গ্রহণ করেন। তখন থেকে মাত্র ৯ বছর ছিল তার কর্মজীবন। ৩৯বছর বয়সে, ১৯০২ সালে, তিনি প্রয়াত হন।

স্বামীজির জীবনে দুটি প্রভাব —

অধ্যাপক তপন রায়চৌধুরী তাঁর 'ইউরোপ রিকনসিডার্ড' বই এ বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা ও কর্মের ওপর প্রভাবের দুটি উৎস ছিল। প্রথমটি তাঁর আধ্যাত্মিকতা, যেটি তাঁর জীবন জুড়েই প্রধান হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয়টি, জাতীয়তাবাদের আবেগ এবং তার থেকে উদ্ভুত দেশপ্রেম। অধ্যাপক রায়চৌধুরীর মতে, স্বামী বিবেকানন্দের চেতনায় এই দুই প্রেরণা এমনভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়েছিল যে এদের আলাদা করা সম্ভব ছিল না। স্বামীজি পশ্চিমের দেশগুলিতে ঘুরেছিলেন ভারতের দরিদ্র মানুষের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্য নিয়ে। আবার তিনি বছরের পর বছর পশ্চিমের দেশগুলিতে থেকেছেন ভবিষ্যৎ একটি বিশ্বজনীন ধর্মমতের ভিত্তি হিসেবে বেদান্তের কথা প্রচার করতে। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা 'আনন্দমঠ' এর সন্ন্যাসীদের মতো তিনিও মনে করেছিলেন মাতৃভূমির প্রকৃত সেবা করতে হলে সর্বত্যাগী হওয়া প্রয়োজন।

বিবেকানন্দের ছেলেবেলায় তাঁর পরিবেশে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রভাব ছিল। খুব অল্প বয়সেই তিনি ইংরেজি শেখার বিরুদ্ধে অনমনীয় হয়েছিলেন কারণ ইংরেজি ভাষা ছিল বিদেশি শাসকদের ভাষা। শেষ পর্যন্ত তাঁর মা অনেক চেষ্টায় তাঁকে ইংরেজি শিখতে রাজি করান। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৮। স্কুলের ছাত্রাবস্থাতেই তিনি দেহচর্চার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কারণ জাতীয় পুনর্জাগরণের জন্য সেটা ছিল আবশ্যক। এই সময়েই তিনি 'ন্যাশানাল নবগোপাল' এর শরীরচর্চা কেন্দ্রের একজন উৎসাহী সদস্য। কুস্তি, লাঠিখেলা, তরোয়াল খেলা ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। এই জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ দেখা গেছে তাঁর জীবনভর।

নরেন্দ্রনাথ ছিলেন ভালো ছাত্র। ১৬ বছর বয়সে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ভালোভাবে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কোলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। মাত্র ১ বছর পরেই অসুস্থ হয়ে তাঁকে বুদ্ধগয়ায় গিয়ে থাকতে হয়েছিল। ১৮৮১ সালে তিনি ফিরে আসেন এবং স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকেই দর্শনশাস্ত্র নিয়ে তিনি বি.এ. পাশ করেছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময়ই নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যোগাযোগ হয়েছিল। তাঁর জীবনে এই যোগাযোগ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ব্রাহ্মসমাজ তখন দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতা ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ। এঁরা ধর্মমত প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সংস্কারের কাজকর্ম সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। ডেভিড কফ ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে সেই সময় ব্রাহ্মসমাজ ছিল তিন ধরনের বৈপ্লবিক ভাবনাচিন্তার প্রতীক। প্রথমত, ব্রাহ্মরা বিশ্বাস করতেন যুক্তিবাদে এবং তাঁরা সবধরণের

কু-সংস্কারের বিরোধী ছিলেন। দ্বিতীয়ত, তাঁরা সমাজ সংস্কারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। সমাজ সংস্কার বলতে বুঝতেন শ্রমিক, কৃষক এবং মেয়েদের মুক্তি। তৃতীয়ত, ব্রাহ্মরা বিশ্বাস করতেন যে আস্তিক্যবাদের প্রভাব বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে। এবং সমাজ সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম-সংস্কারের মধ্য দিয়ে মানুষ ক্রমাগত উৎকর্ষের সন্ধান পাবে। কফ ছাড়া স্পেনসার লাভাল ও ব্রাহ্ম আন্দোলন নিয়ে গবেষণা করেছেন, তাঁর গবেষণার মূল বিষয় ছিল এই আন্দোলনের ওপর একেশ্বরবাদের প্রভাব। তিনি দেখিয়েছেন একেশ্বরবাদের প্রভাবের একটি দিক ছিল যুক্তির ভিত্তিতে বিশ্বাসের ওপর আস্থা জ্ঞাপন এবং অন্যটি সামাজিক ও মানবিক সংস্কারের ওপর গুরুত্ব আরোপ। এর ফলে, স্বাভাবিকভাবেই, ব্রাহ্ম আন্দোলনের অনেকেই এদেশের সমাজ ও ধর্মের বিভিন্ন দিকে সংস্কার সাধনের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। রামমোহন রায় এক সময় বলেছিলেন, "ঈশ্বরের সেবা করার প্রকৃত পথ হলো মানুষের উপকার করা।" শিবনাথ শাস্ত্রীরা রামমোহনের এই উক্তিকে সর্বদাই স্মরণ করতেন। সেজন্য ভারতের সমাজের পরিবর্তনকে তাঁদের প্রধান লক্ষ্য বলে চিহ্নিত করেছিলেন। সবে কৈশোরোত্তীর্ণ নরেন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের সংস্পর্শে এসে সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশেষ করে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। ১৮ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্য হওয়া যেত না। ফলে নরেন্দ্রনাথকে তখন সহযোগী সদস্য হয়েই থাকতে হয়েছিল।

নরেন্দ্রনাথ বুদ্ধগয়ায় একবছর ছিলেন মানসিক অসুস্থতার জন্য। ফিরে আসার পর তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ছেড়ে কেশব সেনের নেতৃত্বে 'আদি ব্রহ্মসমাজ'-এ যোগ দেন। কেশব চন্দ্র সেন প্রথম জীবনে হিন্দুদের নানারকম কু-সংস্কারের এবং পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। কিন্তু ১৮৭৬ সালের পর থেকে তাঁর মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে। মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের লেখা 'রামকৃষ্ণ কথামৃত ' থেকে দেখা যায় এই সময় তিনি একাধিকাবার রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ যখন ভারতীয় সমাজের পরিবর্তন করাকে প্রধান লক্ষ্য হিসেবে নিয়েছিল, ঠিক তখনই কেশব সেনের আদি ব্রাহ্ম সমাজ ডেভিড কফ এর ভাষায় প্রগতির পথ ছেড়ে ও সমাজ সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা ত্যাগ করে ব্যক্তিগত অধ্যাত্মিক মুক্তির পথ খুঁজছিলেন। কেশব সেন এবং তাঁর অনুগামীরা তখন ক্রমাগত ব্যক্তিগত ভাবে প্রার্থনা ও ভক্তির ওপর জোর দিচ্ছিলেন। এই সময়, অর্থাৎ ১৮৮১ সাল থেকে শুরু করে ১৮৮৪ সালে কেশব সেনের মৃত্যুর সময় পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথ এই আদি ব্রাহ্মসমাজে সক্রিয় ছিলেন। অধ্যাত্মবাদের উন্মোচনের উদ্দেশ্যে লেখা একটি নাটকের অভিনয়ে তিনি অংশ ও নিয়েছিলেন। তাঁর ছোট ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা জীবনীতে ভূপেন্দ্রনাথ এই ঘটনার উল্লেখ করে তাঁর দাদার একটি উক্তি স্মরণ করেছেন। নরেন্দ্রনাথ তখন স্বামী বিবেকানন্দ, তিনি বলেছিলেন, "রামকৃষ্ণকে না পেলে আমি ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক হতাম।" এই ব্রাহ্মধর্ম আদি ব্রাহ্ম সমাজের ধর্ম। আদি ব্রাহ্ম সমাজ তখন প্রাচীন হিন্দুদের অনেক ধ্যানধারণাই মেনে চলছিল। যেমন, কেশব সেন তাঁর জীবনের উপান্তে এসে নারী সৎসর্গ পরিহার করা এবং ব্রহ্মচর্য পালনের কথা বলা শুরু করেছিলেন। রামকৃষ্ণ ও একই রকম বলতেন। এটাও নরেনকে অনেকটা পরিমানে প্রভাবিত করেছিল।

কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর মাত্র একমাস পরেই নরেন্দ্রনাথের বাবার মৃত্যু হয়। পরপর এই দুই ঘনিষ্ঠ জনের মৃত্যুর ঘটনা নরেন্দ্রনাথকে গভীরভাবে বিচলিত করেছিল। বাবার মৃত্যুর পরে দত্ত পরিবারে আর্থিক দুরবস্থা দেখা দেয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সে সময় নরেনের জন্য একটি চাকরির ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু তা একমাসের বেশি স্থায়ী হয়নি। ফলে, ১৮৮৪ ও ১৮৮৫ সালের শুরুর দিকে নরেনকে বেকারি এবং আর্থিক দুরবস্থার বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছে। এইসময়ই ভবিষ্যৎ পথ ও পন্থা সম্পর্কে সংশয় এবং অন্যদিকে ব্যক্তিগত জীবনে হতাশা তাকে গ্রাস করে। নরেন্দ্রনাথ তখন রামকৃষ্ণের কাছে যাওয়া শুরু করেন। তাঁর ওপর আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের প্রভাব ছিল। রামকৃষ্ণের রহস্যময় অতীন্দ্রিয়বাদ তাঁকে আকর্ষণ করল।

অধ্যাপক বিনয় সরকার একসময় যাকে রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্য বলে অভিহিত করেছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সেই সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। পরিব্রাজক হিসেবে তিনি দেশে বিদেশে গেছেন। ভারতের নানা জায়গায় গিয়ে

দরিদ্র সাধারন মানুষের জীবনযাত্রা দেখেছেন, তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে পরিচিত হয়েছেন। ইউরোপ আমেরিকায় বিভিন্ন দেশে গিয়ে বৈদান্তিক ধর্ম প্রচার করেছেন। ১৮৯৩ - ১৮৯৭ সাল পর্যন্ত বিদেশে কাটিয়ে দেশে ফেরার পর তিনি রামকৃষ্ণ মিশন তৈরী করেন। ১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দ প্রয়াত হন। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি ভারতের জাতীয়তাবাদের একজন প্রধান উদগাতা এবং বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম প্রেরণাদাতা হয়ে ওঠেন।

বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদ —

স্বামী বিবেকানন্দ 'দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী' নামে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তাঁকে 'দেশপ্রেমিক' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল যদি ও তিনি কখনই রাজনীতি করেননি, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বক্তৃতা দেননি কিংবা ভারতকে স্বাধীন করার জন্য বিদ্রোহের আহ্বান জানাননি। স্বামী বিবেকানন্দ যে সময়টা জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং যে সময়টা ধরে তাঁর জীবৎকাল তখন ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বলতে বোঝাতো ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন। বিশ শতকের শুরুতে মাত্র দু বছর তিনি জীবিত ছিলেন, তখনও পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপিত হয়নি কিংবা ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনও শুরু হয়নি। এই সময়কালে স্বামী বিবেকানন্দের সবচেয়ে বড় অবদান ছিল তিনি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে প্রস্তুতির কাজ করেছেন। ড. ভি. কে. আর. ভি. রাও এর মতে স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের এবং হিন্দুধর্মের নতুন ব্যাখ্যা উপস্থিত করে এবং সাধারণ মানুষের জীবনের বাস্তব অবস্থার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভারতবাসীর সামনে একটি নতুন রাজনৈতিক মতাদর্শ তুলে ধরেছিলেন। তিনি যে দেশপ্রেমের কথা বলেছেন তা তাঁর বেদান্ত দর্শনের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিঃসন্দেহে দেশের যুবসম্প্রদায়কে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করেছিল। ড. রাও বলেছেন, বিশেষ করে এটা দেখা গেছে বাংলায় এবং দক্ষিণ ভারতে।

স্বামী বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদের চেতনায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল দরিদ্র নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের সঙ্গে তাঁর একাত্মবোধ। বিবেকানন্দের লেখায় ও বক্তৃতায় এটাই বারবার এসেছে। স্বামীজি নিঃসংশয় ছিলেন যে, শ্রমজীবী শ্রেণীগুলি সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাঁর ভাষায়, "একমাত্র আশার স্থল।" কেননা, ভারতের মত দেশে "সব উচ্চ শ্রেণী দৈহিক ও নৈতিকভাবে মৃত।" তিনি তাঁর 'বর্তমান ভারত' নামে বই - এ সমাজের ইতিহাসের পর্ববিভাগ করে দেখিয়েছিলেন যে, সমাজ বিকাশের ধারায় দেখা গেছে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব একবর্ণের থেকে অন্য বর্ণে হস্তান্তরিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য যুগ ও ক্ষাত্র যুগের পর এসেছে বৈশ্য যুগ। পরবর্তী স্তরই হল শূদ্র যুগ। ভবিষ্যতে একদিন এরাই হবে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ে উন্নীত হয়ে নয়, শূদ্র অর্থাৎ শ্রমজীবী হিসেবেই। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অসামান্য ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন শূদ্ররা ক্ষমতা প্রথম অধিষ্ঠিত হবে রাশিয়া ও চীনে।

রবীন্দ্রনাথ যাদের 'সভ্যতার পিলসুজ' বলেছিলেন সেই সব মানুষের উপরে যুগ যুগ ধরে যে অন্যায় অত্যাচার করা হয়েছে স্বামীজি তার বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। এইসব মানুষের প্রতি সহানুভুতি সেই সময় বা তার আগেও অন্য কারো কারো লেখাতে দেখা গেছে। যেমন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখাতে যিনি 'বঙ্গ দেশের কৃষক' নামে বড় প্রবন্ধে এদের দুর্দশার ছবি এঁকেছিলেন। তবে স্বামী বিবেকানন্দর মত কেউই এই সহানুভুতিকে সমাজ সংস্কারের কর্মসূচীর রূপ দেয়নি। বিবেকানন্দ প্রথম ভারতীয় যিনি ঘোষণা করেছিলেন যে ভবিষ্যতে যে বিপ্লব হবে তার নেতৃত্ব দেবে শূদ্ররা। তাঁর ঘোষণা ছিল, "আমি চাই নিঃস্বার্থ কিছু কর্মীকে যারা ঐসব মানুষকে শিক্ষিত এবং উন্নত করে তুলবে। জাতি বলতে বিবেকানন্দ দেশের এইসব নিপীড়িত মানুষকেও বুঝতেন। তাঁর

বিখ্যাত উক্তি একসময় সর্বত্র শোনা যেত "হে ভারত ভুলিও না, দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী, চন্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।" সাধারন মানুষের কথা তুলে ধরে বিবেকানন্দ ভারতের জাতীয়তাবাদে নতুন চেতনা সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল সেই সময় অন্যান্যদের থেকে অনেক এগিয়ে।

স্বামী বিবেকানন্দ যে জাতীয় পুনর্জাগরণের স্বপ্ন দেখেছিলেন তার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল হিন্দু মুসলমানের ঐক্য। তিনি ছিলেন হিন্দু সন্ন্যাসী। কিন্তু তিনি যে জাতীয়তাবাদের ধারণাটিকে প্রচার করেছেন সেটি সংকীর্ণ শ্রেণীচরিত্র এবং ধর্মীয় গন্ডীকে অতিক্রম করে গড়ে তোলে একটি মহত্তর জাতীয় সংহতির ধারণা। তিনি 'হিন্দু জাতীয়তাবাদ' - এর কথা বলেন নি। সম্ভবত তিনিই ছিলেন প্রথম হিন্দু মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়কে একসঙ্গে নিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা। তাঁর আগে "উদার মুক্ত এবং অচঞ্চল ভারতীয়ত্বের বাণী" আর কারো কণ্ঠে এভাবে শোনা যায়নি। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে হিন্দু মুসলমান ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন ঃ "আমি মানসচক্ষে দেখিতেছি, ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া বিবাদ বিশৃঙ্খলা ভেদপূর্বক মহামহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছে।" অনেকে বিবেকানন্দকে "হিন্দু জাগরণের" প্রবক্তা বলে অভিহিত করেছেন। বিশেষ করে সাম্প্রতিক কালে। কিন্তু এই ধরণের বক্তব্যের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। স্বামী বিবেকানন্দ সর্বদাই 'ভারত' শব্দটি ব্যবহার করতেন। ভারতের জনসংখ্যার হিসেবে দিতে গিয়েও তিনি মুসলমান, খ্রিস্টান প্রভৃতি অন্যান্য ধর্মমতকে বাদ দিয়ে বলেননি। তিনি যে ধর্মমত প্রচার করেছিলেন সেটি মানবধর্ম। স্বামীজির সারা জীবনের একটি প্রধান ব্রতই ছিল ভারতের পুনর্জাগরণ।

একদিকে দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া মানুষ, বিশেষ করে মেয়েদের জীবনের উন্নতি ঘটিয়ে তাদের উন্নীত করে তোলার আহ্বান অন্য দিকে ভারতবর্ষকে গোঁড়ামি, ধর্মান্ধতা ও আচার-সর্বস্বতা থেকে মুক্ত করে আধুনিক পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞানের শরিক করে তোলার লক্ষ্য ছিল ভারতীয় গণ-জাগরণের প্রধান ভিত্তি, সব ধর্মমতের মানুষকে নিয়েই। স্বামীজির এই দেশপ্রেমকে ভি.কে. আর. ভি. রাও 'দেশপ্রেমের একটি নতুন ধারনা' বলে অভিহিত করেছেন। দেশের সামনে এই ধারনা উপস্থিত করে স্বামীজি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সামনে নতুন মতাদর্শ যুগিয়েছিলেন। ভারতবাসী বলতে স্বামীজি বুঝেছেন স্ত্রী-পুরুষ ও ধর্ম নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণকে। তিনি শুধুমাত্র ইংরেজি শিক্ষিত শ্রেণীকেই এগিয়ে আসতে আহ্বান করেননি, তাদের তিনি বলেছিলেন — "তোমরা শূণ্যে বিলীন হও, আর নতুন ভারত বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালো, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে, বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুজাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোপ-জঙ্গল-পাহাড়-পর্বত থেকে।" তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্বকে তিনি জানিয়েছিলেন, "এটা দাও, ওটা দাও বলে চিৎকার করলে কিছু হবে না" সামান্য কিছু লোককে সিভিল সার্ভিসে ঢুকিয়ে দিলে কিংবা আবেদন-নিবেদন করে অল্প স্বল্প কিছু রাজনৈতিক অধিকার পেলেই স্বাধীনতা আসবে না।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয়দের জাগরণের ধারনা বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য বিশেষ করে জোর দিয়েছিলেন শিক্ষার প্রসারের উপর। বিশেষ করে মেয়েদের জীবনে উন্নয়ন ছিল তাঁর জীবনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। তাঁর ধ্যান-ধারণা, তাঁর বক্তব্য, তাঁর বলিষ্ঠ প্রত্যয় যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বিশিষ্ট ফরাসী লেখক রোমা রোঁল্যা স্বামীজি সম্পর্কে তাঁর লেখায় মন্তব্য করেছিলেন, "ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভস্মস্তুপ থেকে বহুকাল ধরেই ধুঁয়ো বেরোচ্ছিল যতদিন না বিবেকানন্দর প্রশ্বাসে সেই ছাই আগুন হয়ে জ্বলে ওঠে। তার মৃত্যুর তিনবছর পরে ১৯০৫ সালে তা চারিদিক প্রকম্পিত করে দেয়।" ১৯০৫-এর পর থেকে ভারতের যে যুবসম্প্রদায় স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে এগিয়ে এসেছিলো রঁলা মতে স্বামী বিবেকানন্দের নয়া বেদান্তবাদ

তাদের শিরায় আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত উল্লেখ করেছেন যে ভারতীয় বিপ্লবীরা স্বামীজির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। তাঁর শিষ্যা সিস্টার নিবেদিতা নানাভাবে এঁদের সাহায্য করেছেন। অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীরা রঁলার মতে স্বামীজির বৌদ্ধিক উত্তরসূরী। স্বামীজি বিদেশ থেকে ফিরে এদেশের যুবসম্প্রদায়কে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে। বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখার্জী বলেছিলেন যে, "স্বামীজির সঙ্গে তুলনায় অন্য কেউই দাঁড়াতে পারেনা।" ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত উল্লেখ করেছেন যে সেইসময় গুপ্তচর বিভাগের একজন অফিসার ডানহাম মিস ম্যাকলিয়টকে বলেছিলেন যে যখনই পুলিশ বাংলার কোন বাড়ি তল্লাশি করতে গেছে তখনই তারা বিবেকানন্দর লেখা বই সেখানে পেয়েছে যার জন্য একসময় গুপ্তচর বাহিনী দাবি করেছিল রামকৃষ্ণ মিশনকে বে-আইনি ঘোষণা করার জন্য।

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের থেকে মাত্র দুবছরের ছোট। একসময় ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ হয়েছিল। কিন্তু যখন তিনি জীবিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে প্রায় কিছুই বলেননি। তাঁর মৃত্যুর পর কবি লেখেন, "যদি তুমি ভারতকে জানতে চাও, বিবেকানন্দকে জান।" এবং "তিনি (বিবেকানন্দ) দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন তোমাদের সকলেরই মধ্যে রয়েছে ব্রহ্মের শক্তি। দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটি যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েছে।" বিবেকানন্দর জীবনীকার ও প্রধান শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন, "মাতৃভূমিই ছিল তাঁর আরাধ্যা দেবী। দেশের এমন কোন আন্দোলন ছিল না যা তাঁর মনে সাড়া জাগায়নি। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু প্রথম জীবনে স্বামীজীর লেখা পড়ে উদ্বুদ্ধ হন। স্বামীজীর প্রেরণাতেই তিনি বুঝেছিলেন যে ভারতবর্ষকে যদি স্বাধীন হতে হয়, তবে হিন্দু ধর্ম বা ইসলামের বিশেষ আবাসভূমি হলে হবে না, তাকে জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের একত্র বাসভূমি হতে হবে। তাঁর মন্ত্রই ছিল অখন্ড স্বাধীনতার মন্ত্র। স্বামীজি বলেছিলেন, "ফ্রিডম, ফ্রিডম ইস্ দ্য সঙ অব দ্য সোল।" একবার বকধার্মিকদের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ করে তিনি বলেছিলেন যে স্বাধীনতা বা মুক্তি ফুটবল খেলে আসবে, গীতা পড়ে নয়। আর্য সমাজীরা তখন উত্তর ভারতে গো-হত্যা নিবারণ আন্দোলন শুরু করেছিল কারণ গরু মাতা। স্বামীজি তাঁদের ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন যেমন মা, তার তেমনি ছেলে।

ঐতিহাসিক আর. জি প্রধান দেশের পুর্ণজাগরণে স্বামীজির ভূমিকা আলোচনা করে তাঁকে 'আধুনিক জাতীয়তাবাদের জনক' বলে অভিহিত করেছেন। জওহরলাল নেহেরু বলেছেন, "সাধারণ অর্থে রাজনীতিজ্ঞ বলতে যা বোঝায়, তিনি (স্বামী বিবেকানন্দ) তা ছিলেন না বটে, তথাপি আমি মনে করি তিনি ভারতের বর্তমান জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম মহান প্রবর্তক।" স্বামীজির মৃত্যুর কয়েক বছর পর থেকেই যে স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে, সেই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী অনেকেই তাঁর কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিল। বৈপ্লবিক পন্থায় বিশ্বাসী শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে 'ভারতের বিরাট প্রাণ পুরুষ' আখ্যা দিয়েছিলেন। অন্যদিকে অহিংস পদ্ধতিতে আন্দোলন শুরু করেছিলেন যে গান্ধীজি তিনিও এগিয়েছিলেন বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথেই গণজাগরণের ব্রত পালন করতে। অসামান্য দেশপ্রেমিক সুভাষচন্দ্রের জীবন জুড়েও ছিল স্বামীজির পূর্ণ প্রভাব।

উপসংহারে বলা যায়, স্বামী বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদী চেতনার তিনটে বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমত, তিনি প্রথম পিছিয়ে পড়া দরিদ্র, নিপীড়িত ও শোষিত মানুষকে নিয়েই জাতীয় জাগরণের কথা ভেবেছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি বৃহত্তর নারীসমাজকে জাতীয় জাগরণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলেছেন। তাঁর ভাষায়, "স্ত্রী জাতির অভ্যুদয় না হইলে ভারতের কল্যাণের সম্ভবনা নাই।" এবং তৃতীয়ত, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তিতেই যে ভারতের নবজাগরণ সম্ভব এটা স্বামীজিই প্রথম উপলব্ধি করেছেন।

দেশবাসীকে মানুষ হওয়ার আহ্বান

স্বামী বিবেকানন্দ পশ্চিম দেশ থেকে ফিরে এসে দেশের যুবসম্প্রদায়কে মানুষ হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। স্বামীজি দেশ বলতে বুঝেছেন দেশের মানুষকে। উচ্চবিত্ত বা সমাজের উচ্চশ্রেণীকে নয়, সাধারণ মানুষকে তাদের দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা থেকে মুক্ত করা করা, মানুষ হিসেবে তাদের সম্মান প্রতিষ্ঠা করা, ভয় থেকে মুক্ত করা ছিল তাঁর লক্ষ্য। তিনি জাত-পাত, শ্রেণী এবং ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের কথা বলেছেন। ভারতবাসীকে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, "হাজার বছরের ক্রমবর্ধমান জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বসে আছো, হাজার বছর ধরে খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধতা বিচার করে শক্তিক্ষয় করছ ! পৌরহিত্য রূপ আহাম্মকির গভীর ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খাচ্ছ ! শত শত যুগের অবিরাম সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্ব একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে — তোমরা কি বলো দেখি !" তাঁর মূল কথা ছিল, "এসো, মানুষ হও, নিজেদের সংকীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখ সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে।"

স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ঘুরে ভারতবাসীর পশ্চাপদতা অনুভব করেছেন। তিনি বুঝেছিলেন যে নানাধরণের সংস্কার এবং সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হতে না পারলে ভারতবাসী সভ্য দেশের মানুষের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে যেতে পারবে না। মাদ্রাজে যুবকদের কাছে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, "ভারতমাতা অন্তত সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো — মানুষ চাই, পশু নয়।"

মানুষ বলতে তিনি কী বুঝেছিলেন সেটাও তিনি বলেছেন ইউরোপ থেকে লেখা তাঁর বিভিন্ন চিঠিপত্রে এবং তাঁর কিছু বক্তৃতায়। তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা ছিল, "সাহসী লোকেরাই কেবল বড় বড় কাজ করতে পারে — কাপুরুষেরা পারে না।" স্বদেশ ও স্বজাতিকে বড় হতে হলে অন্তত তিনটি জিনিস প্রয়োজন — (১) সাধুতার শক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস ; (২) হিংসা ও সন্দেহের মানসিকতার অভাব; এবং (৩) যারা সৎ থেকে সৎ কাজ করতে চায় তাদের সবরকমের সাহায্য করা। তিনি বিশেষ করে গুরুত্ব দিয়েছিলেন দেশের আপামর মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার ওপর। কারণ তিনি মনে করতেন শিক্ষা মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই থাকে, তাকেই প্রকাশ করে এবং উন্নত করে তোলে। অন্তর থেকে তিনি অনুভব করেছেন যে ভারতের সব দূর্দশার মূলে রয়েছে জনসাধারণের দারিদ্র্য এবং শিক্ষার অভাব, সেজন্য তিনি বারবার বলেছেন আমাদের কর্তব্য হবে দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা ও তাদের ব্যক্তিত্ববোধকে জাগিয়ে তোলা। তবেই তারা মানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে। তাদের চোখ খুলে যাবে। তারা নিজেরাই নিজেদের উদ্ধার করতে পারবে। এমনকি স্বাধীনভাবে চিন্তাও করতে শিখবে।

First Paper

প্রথম পত্র

Secend Half

দ্বিতীয় অর্ধ

প্রথম পাঠ

(Plato's Theory of the Ideal State)

প্লেটোই প্রথম যথার্থ রাষ্ট্রদার্শনিক, যেহেতু তিনি রাষ্ট্রতত্ত্বের ফসল তুলতে চেয়েছিলেন দর্শনের উর্বর জমি থেকে। সুচিন্তিত এক দর্শনতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা বিচারের এবং এই ব্যবস্থাকে অধিকতর শক্তিশালী ও সুন্দর করে তোলার উপায় নির্দেশ করেন। তিনি খাঁটি রাষ্ট্রদার্শনিক আরও এই কারণে যে, তিনি দর্শনকে চিহ্নিত করেছিলেন রাষ্ট্রশক্তির উৎস হিসাবে।

প্লেটোর দর্শনভাবনা এমন একটি বাণী বহন করছে যাকে অনায়াসেই তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বের ভূমিকা হিসাবে গ্রহণ করা যায়। এই বাণীটি হল এই যে, পারিপার্শ্বের দৃশ্যমান খন্ড, বিক্ষিপ্ত বাস্তব ঘটনা ও বিষয়ের ভিত্তিতে কোনও সত্যনির্ভর সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে গেলে এইসব তথাকথিত বাস্তবের সীমানা পার হয়ে বিমূর্ত মননের সাহায্যে এক সর্বজনীন ভাবসূত্র নির্মাণের প্রয়োজন। প্লেটোর সমকালীন সমাজে সফিষ্ট দার্শনিকেরা অসাম্যে পীড়িত সমাজব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন এবং প্লেটোর অন্যতম লক্ষ্য ছিল সফিষ্ট চিন্তাকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করা;তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে, সমকালীন সমাজের সুষ্ঠ বিন্যাসের মধ্য দিয়েই সুবিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কিন্তু এই কাজে উদ্যোগী হয়ে প্লেটো সমাজ-বাস্তবের কোনও চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করেননি, তিনি সুবিচারের এক ভাবসূত্র রচনা করেছিলেন তাঁর নিজস্ব চিন্তার ভিত্তিতে। অর্থাৎ সফিষ্টদের বাস্তবানুগ সমাজ বিশ্লেষণকে পরিহার করে প্লেটো সামাজিক সুবিচারের এক আদর্শ মানদন্ড নির্মাণ করেন এবং এ ই মানদন্ডপ্রয়োগ করে তিনি সমকালীন সমাজব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার সপক্ষে রায় দেন। প্লেটোর এই দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই অনুপ্রাণিত হয়েছিল তাঁর দর্শন ভাবনার দ্বারা।

রাষ্ট্রজীবনে আদর্শ ন্যায়ধর্মের এক তর্কাতীত সর্বজনীন সূত্র নিরূপণই ছিল প্লেটোর রাষ্ট্রদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রের চরিত্র, তার সাংগঠনিক বিন্যাস এবং তার মানবিক উপাদানের যে বিচার বিশ্লেষণ প্লেটো করেছিলেন তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বে তার সবকিছুরই উদ্ভব হয় মূলত তাঁর এক নৈতিক জিজ্ঞাসা থেকে। যে ন্যায়পরায়ণতা ব্যক্তি জীবনকে সাধু ও সুন্দর করে তোলে সেই ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তি কী ? এই ছিল তাঁর নৈতিক জিজ্ঞাসা।

কোন্ কোন্ উপাদানের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের জীবনে ন্যায়পরায়ণতা গড়ে ওঠে এবং কী ধরনের সাংগঠনিক বিন্যাসের মাধ্যমে এই ন্যায়ধর্ম প্রতিফলিত হয় সামাজিক সুবিচারে- এই ছিল প্লেটোর রাষ্ট্রচিন্তার মূল উপজীব্য বিষয়।

প্লেটোর মতে, জীবনধারণের জন্য মানুষকে অসংখ্য বিষয়গত প্রয়োজন মেটাতে হয়। যেহেতু মানুষ স্বয়ম্ভর নয় সেইহেতু এইসব প্রয়োজন ব্যক্তি মানুষ একা তার ব্যক্তিগত উদ্যোগে মেটাতে পারে না। তাকে অনিবার্যভাবে নির্ভর করতে হয় অন্যের সাহায্যের ওপর।

এইভাবে রাষ্ট্রের জীবন প্রতিফলিত হয় শ্রমবিভাগের সূত্রে গাঁথা বিভিন্ন বৃত্তিজীবী মানুষের কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে। এইসব নানা কর্মে রত মানুষের দল সম্মিলিতভাবে জন্ম দেয় একটি শ্রেণীর। এই শ্রেণী হল উৎপাদক বা কারিগর শ্রেণী। এই শ্রেণীর মানুষদের মূল লক্ষ্য হল জীবনের জৈবিক প্রয়োজন মেটানোর কাজে আত্মনিয়োগ করা। কিন্তু কেবলমাত্র জীবনের জৈবিক প্রয়োজনগুলি মিটিয়ে ফেললেই জীবন সার্থক হয়ে উঠবে — একথা মেনে নিতে প্লেটো রাজী নন। তাঁর মতে, দৈনন্দিন মানবজীবনের স্থূল দিকটিকে যেমন অস্বীকার করা যায় না,

তেমনই জীবনের সৌন্দর্যময় সূক্ষ্ম দিকটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সূক্ষ্ম জীবন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে নানা শৈল্পিক ও সাংস্কৃতিক কর্মধারার মধ্য দিয়ে। কাজেই জৈবিক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের উদ্ভব হলেও রাষ্ট্র কখনই এই তথাকথিত প্রাণীসমাজের (প্লেটো একে বলেছেন, 'a city of pigs') সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। রাষ্ট্রজীবনে অনিবার্যভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়ে নতুন নতুন শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ক কর্মোদ্যমের। এই কাজগুলি নিষ্পন্ন করার জন্য নতুন নতুন বৃত্তিজীবী গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে এবং তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রের জনসংখ্যায় দেয় প্রবল স্ফীতি। এই অতিরিক্ত জনগোষ্ঠীর আশ্রয়ের জন্য অতিরিক্ত ভূখন্ডের প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং অতিরিক্ত ভূখন্ড করায়ত্ত করার জন্য এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়। যেহেতু যুদ্ধক্রিয়া এমন ধরনের একটি কাজ যাতে প্রয়োজন হয় এক বিশেষ নৈপুণ্যের সেই হেতু রাষ্ট্রজীবনে অনিবার্যভাবে উদ্ভব হয় এক নতুন শ্রেণীর। এই শ্রেণী হল যোদ্ধৃ শ্রেণী। এই শ্রেণী রাষ্ট্রের সুরক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকে। স্বভাবতই এই শ্রেণী রাষ্ট্রের রক্ষক এবং সেই কারণে শাসক বলেও পরিগণিত হতে পারে। এই যোদ্ধৃ শ্রেণীর আছে সাহস, শক্তি ও যুদ্ধনৈপুণ্য। রাষ্ট্রের সুরক্ষার কাজে এইসব গুণ সবিশেষ কাজে লাগলেও রাষ্ট্রশাসনের পক্ষে এই যোগ্যতা ও গুণ যথেষ্ট নয়।

উচ্চতর শারীরিক শক্তির সঙ্গে উচ্চতর মানসিক শক্তি ও নৈপুণ্যের সমন্বয় না ঘটলে কখনই দক্ষ রাষ্ট্রশাসন সম্ভব নয়। বরং এই ধরনের অবস্থা রাষ্ট্রের শান্তির পক্ষে প্রতিকূল হয়ে উঠতে পারে। কারণ কেবলমাত্র শারীরিক শক্তি ও সাহসের ওপর নির্ভরশীল যোদ্ধৃ শ্রেণী যথার্থ জ্ঞানের অভাবে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধকলহে লিপ্ত হতে পারে অথবা নিজরাষ্ট্রের নাগরিকদের ওপর তাদের শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করে রাষ্ট্রের শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে। তাই রাষ্ট্রশাসনের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে যোদ্ধৃ শ্রেণী থেকেই উদ্ভুত এক নতুন শ্রেণীর, যে শ্রেণী জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় শক্তিশালী। এই শ্রেণীই হল প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের তৃতীয় শ্রেণী যাকে তিনি অভিহিত করেছেন, পালক অথবা শাসকশ্রেণী হিসাবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, প্লেটো তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে তিনটি শ্রেণীর সহাবস্থানের কথা বলেছেন, এই তিনটি শ্রেণী হল কারিগর শ্রেণী, যোদ্ধৃ শ্রেণী ও শাসক শ্রেণী এবং ওপরে উল্লেখিত যুক্তির ভিত্তিতে তিনি দাবী করেন যে, মানুষের জীবনধারার স্বাভাবিক গতিতেই উদ্ভব হয় এই তিন শ্রেণীর।

কিন্তু এই তিন শ্রেণীর উদ্ভব শুধুমাত্র স্বাভাবিক নয়, প্লেটো দেখাতে চেয়েছেন যে, বিশেষ এক নৈতিক বিচারেও এই তিন শ্রেণীর উদ্ভব ও সহাবস্থান একান্ত প্রয়োজনীয়। প্লেটোর মতে, যে যে নৈতিকগুণের ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র সৎ ও সুন্দর হয়ে উঠতে পারে সেগুলি হল প্রজ্ঞা, (Wisdom) সাহস, (Courage) মিতাচার, (Temperance) এবং ন্যায়পরায়ণতা (Justice)। রাষ্ট্রের নৈতিক গুণ বা ধর্ম কোন একটি বিমূর্ত ভাবনা নয়, এটি অবশ্যই প্রতিভাত হয় রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবনচর্যার মধ্য দিয়ে। অতএব যে গুণগুলির সমন্বয়ে সৎ রাষ্ট্রের চরিত্র গড়ে ওঠে সেগুলিকে অবশ্যই অন্বেষণ করতে হবে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের গুণগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে।

প্লেটো মনে করেন যে, ন্যায়পরায়ণতা এমনই একটি গুণ যাকে প্রজ্ঞা, সাহস ও মিতাচার থেকে পৃথক করে বিশ্লেষণ করা যায় না। এই তিনটি গুণের মধ্যেই অন্তর্লীন হয়ে রয়েছে ন্যায়পরায়ণতা এবং একমাত্র ন্যায়পরায়ণতার প্রেক্ষাপক্ষেই এই তিনটি গুণের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব। এই তিনটি গুণ যে তিনটি শ্রেণীর শ্রেণীগত ধর্ম তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে এক সার্থক সমন্বয় সাধিত হয় ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমে। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের জীবনে তখনই ন্যায়পরায়ণতার গুণ বিকশিত হয়ে ওঠে যখন তিনটি শ্রেণী নিজ নিজ শ্রেণীগত কর্মে নিযুক্ত থাকে, নিজের অবস্থান মেনে নেয় অকুণ্ঠচিত্তে এবং কখনই অন্য শ্রেণীর কর্মে হস্তক্ষেপ করে না। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, প্লেটোর মতে, রাষ্ট্রের জীবনে ন্যায়ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজকর্মে শ্রমবিভাগের সূত্র প্রয়োগ করে। আরও বিশদ

করে বলা যেতে পারে যে, প্লেটোর মতে, সামাজিক সুবিচার নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সেই আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থায় যেখানে জনমন্ডলী শাসকশ্রেণী, যোদ্ধৃশ্রেণী এবং কারিগরশ্রেণীতে বিভক্ত এবং যেখানে শাসকশ্রেণী চিরকালের জন্য ভোগ করে বাধামুক্ত শাসনাধিকার, যোদ্ধৃ শ্রেণী ব্যাপৃত থাকে কেবলমাত্র যুদ্ধকর্মে এবং কারিগরশ্রেণী নিযুক্ত থাকে জীবনের প্রয়োজনানুগ নানা সামগ্রীর উৎপাদনে। এক কথায়, প্লেটোর দৃষ্টিতে, সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সমন্বয় রক্ষায় এবং এই সমন্বয় সাধিত হয় কঠোরভাবে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার মধ্য দিয়ে।

এইভাবে স্থিতাবস্থা রক্ষাকে সামাজিক সুবিচারের আবশ্যিক শর্ত হিসাবে গ্রহণ করে প্লেটো নিঃসন্দেহে শাসকশ্রেণীর প্রতি তাঁর পক্ষপাতের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর শ্রেণী-সমন্বয়ের সূত্র দিয়ে তিনি প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীবৈষম্য ও শাসকশ্রেণীর প্রাধান্যের সপক্ষে এক দৃঢ় নৈতিক সমর্থন গড়ে তুলতে চেয়েছেন। মনে রাখতে হবে যে, তাঁর সামাজিক সুবিচারের তত্ত্ব মূলতঃ শাসকশ্রেণীর শাসনাধিকারকে নিরঙ্কুশ ও অব্যাহত রাখারই এক আন্তরিক প্রয়াস। শাসকশ্রেণীর হাতে সমাজ পালন ও পরিচালনার গুরুদায়িত্ব দিয়েই তিনি নিশ্চিন্ত নন, তাদের এই কাজে যোগ্য করে তোলার ব্যাপারেও তিনি অতীব সচেতন।

প্লেটো শাসকশ্রেণীর জন্য এক দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা পরিকল্পনা পেশ করেছেন। তাঁর এই পরিকল্পনা অনুযায়ী শাসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সকল স্ত্রী ও পুরুষকে প্রায় সারাজীবন ধরে এক সুশৃঙ্খল শিক্ষাক্রমের মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

শাসকশ্রেণীকে যথার্থভাবে যোগ্য করে তোলার জন্য প্লেটো শুধু তাদের জন্য এক ব্যাপক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন করেই ক্ষান্ত হতে চান না, তিনি তাদের ব্যক্তিগত জীবনকেও এক বিশেষ নিয়ন্ত্রণে আবদ্ধ রেখে তাদের উন্নীত করতে চান পরহিতব্রতী আদর্শ মানুষের পর্যায়ে। এই কারণে তিনি শাসকশ্রেণীর জন্য এক বিশেষ জীবনধারার প্রচলন করতে চান। এই জীবনধারার মূল বৈশিষ্ট্য হল এই যে, শাসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নারীপুরুষেরা তাদের জীবনযাত্রায় সযত্নে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রবণতা পরিত্যাগ করে নিজেদের মধ্যে গড়ে তুলবে এক ঐক্যবদ্ধ যৌথ জীবন। তারা সম্পূর্ণভাবে এক শিবির জীবন যাপন করবে। তারা বাস করবে এজমালী আবাসে, সাধারণ ভোজনশালায় সম্মিলিতভাবে আহার্য গ্রহণ করবে এবং তাদের কোনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না। অর্থাৎ, তাদের থাকবে না কোনও ব্যক্তিগত জমি, নিজস্ব কোনও গৃহ এবং তাদের ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকবে না কোনরকম ধনসম্পদ। এমনকি ব্যক্তিগত পরিবারপ্রথাও তারা বর্জন করবে। তাদের নিজেদের মধ্যে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি সর্বসাধারণের বলে পরিগণিত হবে অর্থাৎ প্রত্যেকের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা সকলের বলে স্বীকৃতি লাভ করবে। এইভাবে সবরকমের ব্যক্তিগত স্বার্থ থেকে মুক্ত হয়ে শাসকশ্রেণীর সদস্যেরা তাদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখকে দিয়ে যাবে সর্বজীবন সুখ-দুঃখের স্তরে এবং এইভাবে তাদের মধ্যে দেখা দেবে মহত্তর এক পরার্থবাদ যার ভিত্তিতে শাসকশ্রেণী তাদের শাসনকর্মকে মেনে নিতে পারবে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণে সঙ্কল্পিত এক সেবাধর্ম হিসাবে।

প্লেটো এই তত্ত্বের মাধ্যমে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ (totalitarianism)-কে দিয়েছিলেন এক ব্যাপক নৈতিক সমর্থন। প্লেটোর সমালোচকেরা উল্লেখ করে থাকেন যে, তাঁর কল্পরাষ্ট্রে সাধারণ মানুষের কর্মজীবনের প্রতিটি দিক রাষ্ট্রের কঠোর নিয়ন্ত্রণের অধীন; শ্রেণীগত কর্মধারার উৎকর্ষ ও সাফল্যের ভিত্তিতে ব্যক্তি-মানুষের মূল্যায়ন হওয়ার ফলে মানুষের ব্যক্তিসত্তা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত। এছাড়া আরও অভিযোগ করা হয়ে থাকে যে, প্লেটো রাষ্ট্রের গুণাগুণকে সম্পূর্ণভাবে শাসকশ্রেণীর চরিত্রগত গুণাগুণের ওপর নির্ভরশীল করে তুলে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠজনকে উপেক্ষা করেছিলেন এবং এর ফলে তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বে সমর্থিত হয়েছিল নির্মম এক প্রবরশাসন (elite rule)। আরও বলা হয়ে থাকে যে, প্লেটো তাঁর প্রস্তাবিত ব্যবস্থাদি এত উচ্চ কল্পনার স্বরগ্রামে বাঁধা যে কখনও কখনও সেগুলিকে প্রস্তাবিত

পারিবারিক সাম্যবাদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই পারিবারিক সাম্যবাদের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করেছিলেন স্বয়ং অ্যারিস্টটল যিনি ছিলেন প্লেটোরই এক যোগ্য শিষ্য এবং পরবর্তী সময়ের সব সমালোচকই একযোগে উল্লেখ করেছেন যে, নরনারীর সম্পর্কে প্লেটো যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন তা বাস্তব জীবনে প্রবর্তন করা কখনই সম্ভব নয়। সমালোচকেরা আরও অভিযোগ করে থাকেন যে, নৈতিক মূল্যের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে এবং রাষ্ট্রশাসনকর্মের সাফল্যকে সম্পূর্ণরূপে নৈতিক মূল্যের মাপকাঠিতে বিচারের চেষ্টা করে প্লেটো রাষ্ট্রজীবনের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যকে উপেক্ষা করেছিলেন, এর ফলে তিনি যে রাষ্ট্রতত্ত্ব রচনা করেছিলেন তা কখনই নীতিশাস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেনি। তাছাড়া, এই নৈতিক মূল্যের দোহাই দিয়ে তিনি এক অনৈতিক ও অন্যায় সমাজব্যবস্থাকে সমর্থন করতে চেয়েছিলেন যেহেতু তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, শ্রেণীবিভক্ত ও স্তরায়িত সমাজই হল জনজীবনে ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার ইত্যাদি নৈতিক ধর্ম বিকশিত হয়ে ওঠার একমাত্র মাধ্যম।

প্লেটো মূলতঃ ছিলেন গ্রীক নগররাষ্ট্রের রাজনৈতিক ভাষ্যকার। এই নগররাষ্ট্র ও তার সামাজিক পটভূমির সীমাবদ্ধতা থেকে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা মুক্তি লাভ করতে পারেনি। সমস্যাবিক্ষুব্ধ সমসাময়িক সমাজজীবনকে ত্রুটিমুক্ত করে তাতে নতুন করে প্রাণসঞ্চার করাই ছিল তার রাষ্ট্রদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সমাজচরিত্রের মৌলিক পরিবর্তনে অবশ্যই তাঁর কোনও আগ্রহ ছিল না। তিনি ভেবেছিলেন যে, কিছু কিছু সাংগঠনিক পুনর্বিন্যাস ও সামাজিক পরিবেশের অনুকূল এক নৈতিক মূল্যবোধের আবহাওয়া গড়ে তুলতে পারলেই সমসাময়িক সমাজের ভিত্তি নতুন করে সবল হয়ে উঠবে।

কিন্তু প্লেটোর এই আশা ফলবতী হয়নি। ইতিহাসের অমোঘতা গ্রীক নগররাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে গিয়েছিল তাদের অনিবার্য পরিণতিতে। দাসভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার সংকীর্ণতা ক্রমশই গ্রীক নগররাষ্ট্রগুলির জীবনীশক্তিকে নিঃশেষ করে ফেলে। এর ফলে, প্রথম পর্যায়ে প্লেটোর মৃত্যুর এক দশকের মধ্যেই গ্রীক নগররাষ্ট্রগুলি তাদের স্বকীয়তা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারিয়ে ম্যাসিডোনিয়ার কর্তৃত্বাধীন হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে, রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে চূড়ান্তভাবে বিলীন হয়ে যায় দ্বিতীয় খ্রীষ্টপূর্বাব্দে।

———————

দ্বিতীয় পাঠ

(Aristotle's Teleological theory of the State)

গ্রীক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অ্যারিস্টটল বিশ্বাস করতেন যে, বিশ্বচরাচরের প্রতিটি সজীব পদার্থের ভিতর পূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনা (Potentiality) থাকে এবং সেই অনুযায়ী ঐ পদার্থের পরিবর্তন বা বিবর্তন ঘটে। সজীবতার বা জীবনের ধর্মই হল, আজ যা আছে কাল তা না থাকা বা পরিবর্তিত হওয়া। একটি বীজ যখন মাটিতে রোপণ করা হয় তখন তাকে বলা যায় Matter এবং তার ভিতর তখন পূর্ণ বৃক্ষে পরিণতি লাভ করার সব সম্ভাবনাই থাকে। ধীরে ধীরে বীজটি শাখা প্রশাখায়, লতা-পাতায়, ফলে-ফুলে পরিপূর্ণ হয়। অর্থাৎ যখন বীজটির সম্ভাবনা পূর্ণভাবে বিকশিত হয় তখন তাকে বলা যায় Form, সুতরাং Matter-এর পরিণতি Form. ঠিক তেমনি একখন্ড ব্রোঞ্জ হল matter যখন তা নির্দিষ্ট মূর্তিতে দেখা দেয় তখন সেই ব্রোঞ্জটি হল Form. সুতরাং প্রতিটি পদার্থের ধর্মই হল নির্দিষ্ট বিকাশের পথে অগ্রসর হওয়া, যাকে বলা হয় পদার্থের (Becoming — "It becomes what it is not at present."

অ্যারিস্টটলের রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তি হল Becoming-য়ের তত্ত্ব। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, প্রতিটি চিন্তার বা idea-র একটি চরম লক্ষ্য বা goal থাকে। ঠিক তেমনি বিশ্বচরাচরের প্রতিটি পদার্থের একটি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য বা চরম পরিণত থাকে। এই লক্ষ্য বা পরিণতিকে বলা যায় Telos. সুতরাং প্রতিটি পদার্থ বা প্রতিটি idea-র সার্থকতা বা মূল্য বা গুরুত্ব বিচার করতে হবে এই Telos বা চরম পরিণতির মাপকাঠিতে। যত কাছাকাছি চরম লক্ষ্য থাকবে ততই সেই পদার্থ বা idea-টি সার্থক হবে। তাঁর ভাষায়, "Before everything there is a telos or a final goal .... the merit and attainment of a thing is to be tested in terms of its telos" প্রতিটি পদার্থ বা idea-র ভিতরেই থাকে এই telos এবং telos হচ্ছে চরম লক্ষ্য বা পরিণতি। প্লেটোর মত অ্যারিস্টটল একইভাবে বিশ্বাস করতেন যে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি Forward movement থাকে এবং এই movement telos-য়ের দিকে বলে এই telos-টি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, movement-টি তেমনি মূল্যবান, কারণ movement-য়ের সার্থকতা বা ব্যর্থতা উভয়েরই বিচার হবে telos-য়ের মাপকাঠিতে।

অ্যারিস্টটলের সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তি হল এই telos বা teleological তত্ত্ব বা theory. প্রথমেই তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বের প্রসঙ্গ তোলা যেতে পারে। রাষ্ট্রকে বিচার করে এই সিদ্ধান্তে তিনি পৌঁছেছেন যে, রাষ্ট্র হল এর চরম লক্ষ্য বা পরিণতির বা telos-য়ের পূর্ণ পরিণত স্তর। রাষ্ট্রের telos বা পরিণতি কি ? অ্যারিস্টটলের উত্তর হল, good life বা virtuous life এখানে অ্যারিস্টটলের রাজনৈতিক দর্শনের নৈতিক বা ethical ভিত্তি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর মতে good life-য়ের অর্থ হল নৈতিক জীবন লাভ করা। জীবনের পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ একান্ত প্রয়োজনীয়, কারণ তার ব্যবস্থা না হলে ব্যক্তিজীবন সম্ভব নয়, আর তা সম্ভব না হলে পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠতে বা স্থিতিশীল হতে পারে না। ব্যক্তিজীবনের telos হল good life আর এই telos নিহিত রয়েছে রাষ্ট্রের মধ্যে। সুতরাং রাষ্ট্রের মধ্যে পরিণতি লাভ করার জন্য প্রতিটি উপকরণ telos-য়ের দিক থেকে প্রয়োজনীয়। তাই রাষ্ট্রে পৌঁছতে গেলে যেসব ধাপ প্রয়োজনীয় এবং প্রতিটি ধাপের জন্য যেসব পার্থিব ও জীবন্ত এবং প্রাণহীন পদার্থ প্রয়োজনীয় তার প্রত্যেকটিকে বিচার করতে হবে good life-য়ের বা রাষ্ট্রে পৌঁছতে তাদের অবদানের মাপকাঠিতে।

এইভাবে অ্যারিস্টটলের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, দাসপ্রথা, রাষ্ট্রের চরম ও সার্বভৌম ক্ষমতা, ন্যায়বিচার, নাগরিকতা, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন, সরকারের বিভিন্ন রূপ, বিপ্লবের পটভূমিকা ও কারণসমূহ, আদর্শ সরকার, আইনের প্রকৃতি ও আইন রচনার পদ্ধতি — একথায় সমস্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সংগঠন এবং

রাষ্ট্রের প্রতিটি বিভাগ এই good life-য়ের telos বা লক্ষ্য দিয়ে বিচার করতে হবে। যে প্রতিষ্ঠানটি এই telos-য়ে পৌঁছতে সাহায্য করছে তা ইতিবাচক এবং যেটি প্রতিকূলতা সৃষ্টি করছে তা নেতিবাচক। যে প্রতিষ্ঠানটি telos-য়ের অর্থাৎ good life-এর অর্থাৎ রাষ্ট্রের মূল প্রকৃতির যত কাছাকাছি সেটি তত সার্থক ও গুরুত্বপূর্ণ।

অ্যারিস্টটলের এই teleological তত্ত্বের ভিত্তি হল তৎকালীন গ্রীসের প্রচলিত Nichomachean ethics. এই নীতিশাস্ত্রের মূল বক্তব্য হল ঃ আমরা যা বলি, যা ভাবি এবং যা করি তার পেছনে একটি মহৎ বা উন্নত আদর্শ বা লক্ষ্য থাকা উচিত। মানুষ হল একটি রাজনৈতিক জীব। এখানে রাজনৈতিক বলতে অ্যারিস্টটল সমাজবদ্ধ জীব মনে করেছেন, কারণ গ্রীসে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হত না। সুতরাং ব্যক্তিমানুষের প্রতিটি কাজের ভিতরে একটি চিরন্তন লক্ষ্য বা আদর্শ খুঁজে পাওয়া যাবে।

ব্যক্তির সমাজবদ্ধ হওয়ার প্রথম স্তর হল পরিবার। নারী ও পুরুষ দৈহিক মিলন ঘটায় সন্তানের মাধ্যমে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য। পরিবারের স্থিতিশীলতা নির্ভর করে প্রয়োজনীয় বাসন-কোসণ, জমিজমা ও দাসপ্রথার ওপর। এগুলি সবই রাষ্ট্রে পৌঁছবার অন্যতম শর্ত এবং সেজন্য গুরুত্বপূর্ণ। অ্যারিস্টটল তাই বলেছেন যে, "State is prior to the individual" কারণ ব্যক্তির দর্শনের ভিতরেই রাষ্ট্র রয়েছে। ব্যক্তি যেসব প্রতিষ্ঠান তৈরী করে তা সবই রাষ্ট্রে পৌঁছবার তাগিদে। এই অর্থে রাষ্ট্র ব্যক্তির পূর্ববর্সূরী।

এখানে রাষ্ট্রের ভিত্তি হল ব্যক্তির উপর। ব্যক্তির ভিত্তি হল Nichomachean ethics অর্থাৎ telos বা পূর্ণ বিকাশের উপর। অ্যারিস্টটল ধীরে ধীরে তার পদ্ধতিগত আলোচনার দ্বারা রাষ্ট্রের উৎপত্তি বা উৎস আলোচনা করতে এগিয়ে এসেছেন। তাঁর মতে রাষ্ট্র হচ্ছে form এবং ব্যক্তি, পরিবার, গ্রাম বা সমাজ (Community) হচ্ছে Matter. তিনি ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে, রাষ্ট্রের উৎপত্তি বা Origin হল দুটি মানবিক প্রবণতা ঃ প্রথমত, নারী-পুরুষের স্বাভাবিক মিলন এবং দ্বিতীয়ত, প্রভু ও ভৃত্যের সম্পর্ক। এই দুটি সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় রাষ্ট্র। কিন্তু চরম পরিণতি বা রাষ্ট্রের স্তরে পৌঁছবার পূর্বের্ব কতকগুলি পরিবার নিয়ে সৃষ্টি হয় গ্রাম। কিন্তু ব্যক্তির সব প্রয়োজন গ্রামের দ্বারা পরিপূর্ণ হয় না বলে ব্যক্তি তখন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। এইভাবে বিবর্তনের মাধ্যমে বা লক্ষ্যে পৌঁছবার তাগিদে ব্যক্তি রাষ্ট্রের স্তরে পৌঁছায় এবং তার good life করায়ত্ত হয়।

অ্যারিস্টটলের এই teleological method থেকে একাধিক সিদ্ধান্ত সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমত, রাষ্ট্র একটি স্বাভাবিক বা Natural প্রতিষ্ঠান, কারণ ব্যক্তিচরিত্রের স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে এর উদ্ভব এবং স্বাভাবিক বিবর্তনের দ্বারা এর পরিপূর্ণ বিকাশ। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র একটি *Form*, কারণ রাষ্ট্রের স্তরে এসে ব্যক্তির পূর্ণ পরিণতি অর্থাৎ Good life লাভ হয়। এদিক থেকেও এটি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান, কারণ একটি পদার্থ তার লক্ষ্যে পৌঁছালেই তাকে স্বাভাবিক বলা যাবে। রাষ্ট্র ব্যক্তি মানুষের পরিণতি, তাই স্বাভাবিক। রাষ্ট্রের বাইরে থেকে ব্যক্তিমানুষ তার প্রবৃত্তি ও গুণাবলীকে বিকশিত করতে পারে না, Good life অর্জন করতে পারে না এবং সর্বশেষে তার জীবনের পরম লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। তৃতীয়ত, মানবদেহের মতই রাষ্ট্র একটি Organ. একটি হাত, একটি পা যেমন অপূর্ণ ও অর্থহীন এবং একটি অংশের পেছনে আছে দেহের সম্পূর্ণ রূপ তেমনি ব্যক্তিসমূহের পেছনে আছে রাষ্ট্র। সময়ের দিক থেকে ব্যক্তি আগে, রাষ্ট্র পরে। গঠনের দিক থেকে একটি অংশ আগে, সম্পূর্ণ দেহ পরে, কিন্তু গুরুত্বের ও চিন্তাভাবনার দিক থেকে রাষ্ট্র আগে, ব্যক্তি পরে, দেহ আগে, তার একটি অংশ পরে। সম্পূর্ণ বা whole আগে, part বা অংশ পরে। রাষ্ট্র whole, ব্যক্তি তার part.

অ্যারিস্টটলের এই তত্ত্ব পরবর্তীকালে ভাববাদী রাষ্ট্রদর্শনের মূল ভিত্তি রচনা করেছিল এবং জার্মান দার্শনিক হেগেলের রচনায় পূর্ণতা পেয়েছিল। গ্রীক নগররাষ্ট্রের পটভূমিকা থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করে দেখলে এই তত্ত্বের মধ্যে অগণতান্ত্রিক চরমতাবাদের (totalitarianism) চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। কারণ এখানে ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের মধ্যেই পরিপূর্ণতা দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় পাঠ

(Machiavelli on Power, Morality & Religion)

যদিও ম্যাকিয়াভেলি প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্রতাত্ত্বিক ছিলেন না, যদিও তাঁর বাস্তবের প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল এবং রাষ্ট্রতত্ত্ব অপেক্ষা সরকারের যান্ত্রিক দিকগুলি তাঁর লেখায় অত্যন্ত স্পষ্ট আকারে প্রতিফলিত হয়েছিল, তবুও তিনি রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে এক স্থায়ী স্থান লাভ করে গিয়েছেন।

অ্যারিস্টটলের সময় হতে, ম্যাকিয়াভেলিই ছিলেন প্রথম রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, যিনি আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্বের জনক ছিলেন। তিনিই একমাত্র রাষ্ট্রচিন্তাবিদ্, যিনি সর্বপ্রথম আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্বের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে গিয়েছিলেন মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা হতে তার চূড়ান্ত বিরতি কার্যকর করে। মৌল প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রচিন্তার উপাদান সংগ্রহ করে তিনি রাষ্ট্রচিন্তাকে বাস্তবমুখী ও ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী করে তুলেছিলেন। ম্যাকিয়াভেলি স্বশাসিত সত্তা বা অস্তিত্বের ক্রমোচ্চার মধ্যযুগীয় ধারণা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং স্থানিক, জাতীয় ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের ধারণা প্রবর্তন করেছিলেন যা সমাজের সকল প্রতিষ্ঠানের উপরই চরম ক্ষমতা ভোগ করবে।

ইউরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে ম্যাকিয়াভেলির আর একটি ক্ষেত্রে অবদান অবিস্মরণীয়। তিনিই প্রথম চিন্তাবিদ্ যিনি রাজনীতিকে ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের কবল হতে মুক্ত করার কৃতিত্ব দাবী করে থাকেন। তিনি রাজনীতিকে তাঁর পূর্বসূরীদের সমস্ত দাবী অস্বীকার করে ধর্ম এবং নীতিশাস্ত্র হতে পৃথক বা বিভাজিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। পূর্বে রাজনীতিকে নীতিশাস্ত্রের সেবিকা বা সহচরী বলা হোত। কিন্তু একমাত্র তিনিই নিশ্চিত করে বলেছিলেন যে, নীতিশাস্ত্রের দুটি স্বতন্ত্র মান বা শ্রেণী আছে— একটি রাষ্ট্রের জন্য এবং অপরটি ব্যক্তি নাগরিকদের জন্য। এইভাবে ম্যাকিয়াভেলি রাষ্ট্রকে নৈতিক নীতিসমূহের শিকল বা বেড়ী হতে মুক্ত করে গিয়েছিলেন। তিনি অবশ্য ব্যক্তি বা প্রজাবর্গকে নৈতিক নীতিসমূহ অনুসরণ করার পরামর্শ দিয়ে গিয়েছিলেন। ম্যাকিয়াভেলির এই ধরণের চিন্তাধারা যে পরবর্তীকালের রাষ্ট্রচিন্তাবিদ্দের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

আরও একটি ক্ষেত্রে ম্যাকিয়াভেলির অবদান রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে তাঁকে চিরস্মরণীয় করে দিয়েছে ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রদান করেছে, তা হল চার্চের প্রাধিকারকে উপেক্ষা। ম্যাকিয়াভেলিই ছিলেন প্রথম চিন্তাবিদ্, যিনি জোরাল ভাষায় চার্চের দীর্ঘকালের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাধিকারকে নিন্দা ও উপেক্ষা করেছিলেন এবং চার্চের সেই প্রতিষ্ঠিত প্রাধিকারকে হ্রাস করে সরকারের অধীনে আনার চেষ্টা করেছিলেন। অধ্যাপক অ্যালেনের ভাষায় ম্যাকিয়াভেলি রাষ্ট্রকে চার্চ হতে বিচ্ছিন্ন করে কেবলমাত্র পার্থিব লক্ষ্য সাধনের জন্য শক্তির বা বলপ্রয়োগের সংগঠনে পরিণত করেছিলেন। ম্যাকিয়াভেলি ছিলেন প্রথম ইউরোপীয়ান রাষ্ট্রচিন্তাবিদ্, যিনি পূর্বোক্ত অন্যসকল বিষয়গুলির মত সর্বপ্রথম রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যার বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন এবং আধিবিদ্যক বা অতিপ্রাকৃত উপাদানগুলিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছিলেন। ম্যাকিয়াভেলি তাঁর এক বাস্তববাদী রাষ্ট্রদর্শন গড়ে তুলেছিলেন মূলতঃ ইতিহাসকে আশ্রয় করে। আবার ইতিহাসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার বৈজ্ঞানিকতার সূত্রপাত করেছিলেন। তিনি তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার উপাদানগুলিকে সকল সময়ই বাস্তব তথ্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন।

কার্ল মার্কস্ অন্ততঃ ম্যাকিয়াভেলির নিকট হতে একটা বিষয় শিক্ষালাভ করেছিলেন তা হোল, মানুষ ও বিশ্বচরাচরের জন্য কোন ঐশ্বরিক বিধান বা ব্যবস্থা নাই। মানুষের কামনা, লিপ্সা ও ক্ষুধার ভিত্তিতেই কেবলমাত্র রাষ্ট্রকে অনুধাবন করা বা বোঝা উচিত।

ম্যাকিয়াভেলি 'ক্ষমতা রাজনীতির' নীতির প্রথম ব্যাখ্যাকার বা প্রবক্তা ছিলেন এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি'র তত্ত্ব বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করেছিলেন যার মূল বক্তব্য ছিল রাষ্ট্র অবশ্যই হয় সম্প্রসারিত হবে অথবা ধবংসপ্রাপ্ত হবে বা ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। এই তত্ত্ব আজও আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলির দ্বারা অনুসৃত হচ্ছে। এর লঙঘন স্বাভাবিকভাবেই আত্মঘাতি প্রমাণ করেছে এবং মানবজাতির নিকট দুর্ভোগের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। উদাহরণ হিসাবে অধ্যাপক জোনস উল্লেখ করেছিলেন যে, যদি চেম্বারলেন ও উইলসনের মত রাজনৈতিক নেতারা ম্যাকিয়াভেলির নীতি অনুসরণ করতেন, তাহলে ভার্সাই-এর আকস্মিক দুর্ঘটনার মত ক্ষতি হোত না।

ম্যাকিয়াভেলি ছিলেন, একজন বিখ্যাত প্রয়োগবাদী চিন্তাবিদ্। অধ্যাপক ম্যাকসের ভাষায়, ম্যাকিয়াভেলির তত্ত্বের চেয়ে বাস্তবের প্রতি গভীর অনুরাগ বা প্রবল বাসনা, নিঃসন্দেহে মধ্যযুগীয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্কার বিরোধিতাবাদ হতে রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে উদ্ধারের বা ত্রাণের ক্ষেত্রে অনেক কিছু করেছিল এবং তাঁকে প্রয়োগবাদীদের মধ্যে সর্বপ্রথম হিসাবে চিহ্নিত করার উপযোগী করেছিল।

শাসককে পরামর্শ দানের ক্ষেত্রেও ম্যাকিয়াভেলির অবদান উল্লেখযোগ্য। তিনি মানবিক মনস্তত্ত্বের আলোচনার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে গিয়েছিলেন এবং জনগণের ভাবপ্রবণতা ও ইচ্ছার কথা মনে রেখে শাসককে তাঁর নীতি ও উদ্দেশ্য রচনার পরামর্শ দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে, শাসক সকল সময়েই জনমতকে নিজের মনে স্থান দিয়ে থাকবেন। এমনকি তাঁর নীতিসমূহ কার্যকরণের স্তর পর্যন্ত স্মরণ রাখবেন। এটি সত্যিই একটি বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ছিল, যা আমাদের সময়ে সর্বত্র গৃহীত হয়েছে।

আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা জাতীয় রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। জাতীয় রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হোল তার সার্বভৌমত্ব। আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তাবিদ্রা সার্বভৌমত্বের নানাবিধ সমস্যা, ব্যাখ্যা, সীমাবদ্ধতা ও প্রত্যাখ্যান ইত্যাদি বিষয়ের সাথে মূলতঃ প্রাথমিকভাবে জড়িত। যদিও ম্যাকিয়াভেলি সার্বভৌমত্বের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সুন্দরভাবে করতে পারেন নাই, বোঁদা ও হব্স তাঁর পরে সুন্দরভাবে ও সুবিন্যস্ত উপায়ে উক্ত কার্য সম্পন্ন করেছিলেন, তাহলেও তিনি অধীর আগ্রহে তাঁর প্রতীক্ষা করেছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি, ম্যাকিয়াভেলি ছিলেন জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণার অগ্রদূত।

অবশেষে আমরা রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে ম্যাকিয়াভেলির গুরুত্ব বা অবদানের শেষ বিষয়টি স্মরণ করতে পারি, তা হোল পদ্ধতিবিদ্যা। ম্যাকিয়াভেলি তাঁর আলোচনায় আরোহপদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। তাছাড়া, একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে, ম্যাকিয়াভেলি ছিলেন মানব ইতিহাসের শক্তিশালী আন্দোলনের একজন গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বক্তা। তিনি ছিলেন জাতি ও স্বদেশ প্রেমের ধারণার সর্বপ্রথম সচেতন ব্যাখ্যাকারক। তিনি না ছিলেন তাত্ত্বিক, না ছিলেন সুবিন্যস্ত চিন্তাবিদ্, ছিলেন অভিজ্ঞানমূলক প্রগাঢ় মনস্তাত্ত্বিক, যিনি তাঁর সময়কার প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ্দের মৌলিক অভিপ্রায় বা প্রাথমিক উদ্দেশ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতেন এবং সময়ের প্রয়োজন বুঝতেন। এককথায়, তিনি ইউরোপে বৈপ্লবিক শক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন, পরিণত হয়েছিলেন ইউরোপীয় নবজাগরণের এক সার্থক প্রতিনিধিতে।

ম্যাকিয়াভেলির মূল্যায়নে অধ্যাপক বার্ড-এর মন্তব্যটি আরও প্রশংসনীয়। তাঁর মতে, ম্যাকিয়াভেলি ছিলেন সেই সময়কার ব্যক্তি যখন ইউরোপের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল এবং তিনি রাষ্ট্র ও সমাজের ক্ষেত্রে নূতন নূতন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেবার, অনিবার্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করবার, গুপ্ত বিষয় টেনে বার করবার ও নিয়মকানুন প্রস্তুত করবার চেষ্টা করেছিলেন, যা মূলতঃ রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করার লক্ষে স্থির ছিল।

———————

চতুর্থ পাঠ

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার ধারা

জন লক

ভূমিকা ঃ

বুর্জোয়া সম্প্রদায় বিশেষতঃ ইউরোপীয় বুর্জোয়া সম্প্রদায়, যতদিন শুধুমাত্র টিকে থাকার লড়াই করছিল ; ততদিন তারা জাতীয় রাজাদের মিত্র হিসেবে পরিগনিত ছিল। কারণ এর ফলে বুর্জোয়া সম্প্রদায় যেমন টিকে থাকার মাধ্যমে তাদের লক্ষ্য অব্যাহত রেখেছিল, ঠিক তেমনিভাবে রাজারা তাদের সমৃদ্ধির বাড়বাড়ন্তে সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু যখন বুর্জোয়া সম্প্রদায় যথেষ্ট বিত্ত ও প্রভাবের অধিকারী হয়ে পরিষ্কারভাবে ধনতান্ত্রিক শ্রেণীর ভূমিকা গ্রহণ করল তখন জাতীয় রাজাদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল।

রাষ্ট্রনীতিক ক্ষমতা দখলের এই প্রচেষ্টা বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থনীতিক স্বার্থপ্রসূত। বুর্জোয়া শ্রেণীর এই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দখলের প্রয়াস, সমগ্র রাষ্ট্রীয় শক্তিকে ধনতন্ত্রের স্বার্থে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। অবশিষ্ট সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে জোর ধাক্কা দেওয়ার প্রয়াস দিয়ে এর শুরু হলেও, প্রয়োজনবোধে রাজাদের ক্ষমতাচ্যুত অথবা সীমিত ক্ষমতাদানই এর মূল উদ্দেশ্য ছিল।

প্রকৃতপক্ষে ১৬৪১ সাল থেকে শুরু করে প্রায় ৫০ বৎসর কাল ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে ঘটে যাওয়া দুটি বিপ্লব পিউরিটান বিপ্লব ও গৌরবময় বিপ্লব পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতিক চিন্তাবিদ্ ও চিন্তাধারার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত রচনা করেছে। প্রকৃতপক্ষে পিউরিটান বিপ্লব ও গৌরবময় বিপ্লব হলো দুটি অতি গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠির মত— যার সাহায্যে কিছু অসাধারণ রাষ্ট্রনীতিক তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিত এবং একই সঙ্গে কিছু রাষ্ট্রনীতিকের চিন্তাধারার পটভূমিকা বোঝা যায়। জন লক এবং হবসের রাষ্ট্রনীতিক ধ্যান-ধারণার পরিপ্রেক্ষিত রচনায় এই দুই বিপ্লবের প্রভাব অপরিসীম।

অ্যারিস্টটলের পর রাজনীতির মৌল বিষয় নিয়ে আলোচনার ঐতিহ্য অনেকদিন ধরে বন্ধ ছিল। হবসই আবার সেই ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটালেন। প্রকৃতপক্ষে হবসই আধুনিক যুগের সুশৃঙ্খল রাজনীতিক তত্ত্বের স্রষ্টা। রাষ্ট্র এবং সরকার কী কারণে মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয়, কোন ভিত্তির উপর তারা ক্রিয়াশীল এবং রাষ্ট্র সরকারের তত্ত্বাবধানে বাস করে মানুষকে কেন আনুগত্য প্রদর্শন করতে হয়— এই তিনটি মৌল সমস্যাই হবসের তত্ত্বের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এই সমস্যাগুলির উত্তরদানকালে তিনি দেবতত্ত্ব বা ইতিহাসের উপর নির্ভর না করে উপাত্ত অনুমান (hypothesis) এর উপর নির্ভর করেন এবং তিনি অনুমান করেন যে, প্রকৃতির রাজত্ব হচ্ছে একমাত্র শর্ত যা তাঁর বিবেচনায় পুরসমাজ এবং সরকারের আবির্ভাব ও তাদের ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি ব্যাখ্যা করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে হবস তাঁর রাষ্ট্রনীতিক তত্ত্বের সাহায্যে সমসাময়িক বুর্জোয়া সমাজকে পথ নির্দেশ করেছেন, তাঁদের সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়েছেন। বুর্জোয়া সমাজ যেহেতু আইনহীন (lawless) নৈরাজ্যে কোনক্রমেই পরিপুষ্ট হতে পারে না, সেজন্য তাকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠতে দেওয়া উচিত। অন্যভাবে বলা যায় যে, বুর্জোয়া সমাজের স্থিতি এবং বিদ্যমানতা সুনিশ্চিতকরণের জন্য বুর্জোয়া সমাজকে রাষ্ট্রনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মূল্য অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। তবে রাষ্ট্রনৈতিক নিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্ব আরোপ করলেও, কীভাবে রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃক প্রয়োগ করবে এ সবের উত্তর তিনি দিতে পারেননি।

জন লক ঃ

এই সব প্রশ্নের উত্তর দেবার কাজে যিনি আত্মনিয়োগ করলেন, তিনি পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতির প্রাণপুরুষ জন লক। বস্তুতঃপক্ষে হবস যেখানে তাঁর চিন্তাভাবনা শেষ করেছেন; জন লক সেখান থেকেই শুরু করেছেন। অন্যভাবে

বলা যায় হবসের জড়বাদী দর্শন লকের starting point । প্রকৃতপক্ষে হবসের জড়বাদী দর্শনের উপর নির্ভর লক এক প্রমাতত্ত্ব নির্মাণ করেন যা ইন্দ্রিয়োপাত্তবাদ (Empiricism) নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে লক তাঁর যে রাষ্ট্রনীতিক চিন্তাধারা প্রচার করেন তাকে বুঝতে গেলে ইন্দ্রিয়োপাত্তবাদকে ভালোভাবে বুঝতে হবে— কেননা এটা তাঁর রাষ্ট্রদর্শন বোঝার চাবিকাঠি।

ইন্দ্রিয়োপাত্তবাদ ঃ

এই প্রমাতত্ত্বের মূল বক্তব্য হল যে, মানবীয় জ্ঞান যেমন মনের বিষয়ীগত ক্রিয়ার ফলশ্রুতি নয়, তেমনিভাবে তা আধ্যাত্মিক বা অতিমানবিক দৈবোদ্ভাসনও নয়। লক তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা দিয়ে প্রমাণ করতে চান যে, মানবমন জন্মমুহূর্তে পরিষ্কার শ্লেটের মতো— অর্থাৎ মন আপনা থেকেই জ্ঞান অর্জনে সক্ষম নয়। জ্ঞান প্রত্যক্ষ সংবেদনের ফলশ্রুতি। তা ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে বাইরের জগৎ থেকে মনে অনুপ্রবেশ করে। মন সেগুলিকে শুধুমাত্র সুশৃঙ্খল রূপ দিয়ে কোন বস্তু সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানলাভে সাহায্য করে। মানুষের কোন স্বতঃলব্ধ জ্ঞান থাকতে পারে না। আমরা যা কিছু জানি তা পর্যবেক্ষণ এবং মননের মাধ্যমে অর্থাৎ অভিজ্ঞতা মারফৎ জানি। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই ইন্দ্রিয়োপাত্তবাদই রাষ্ট্রনীতিক প্রশ্নাবলী সম্পর্কে লকের দৃষ্টিভঙ্গীর নিয়ামক। তাঁর মতে রাজনীতিকে বিমূর্ত দেবতত্ত্ব অথবা অধিবিদ্যা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে না পারলে, সে সম্পর্কে কিছু জানা সম্ভব নয়। লকের মতে মানুষের সমাজ এবং রাষ্ট্র সম্পর্কে পূর্বনির্ধারিত জ্ঞান থাকতে পারে না। তাদের স্বরূপ বা প্রকৃতি কোন ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস বা মরমীয়া বিশ্বাসের আলোকে বিশ্লেষণ করলে চলবে না। ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার অধীন জীবনের তথ্যের সঙ্গে তাদের মেলাতে হবে। তাই দেখা যায়, লক রাষ্ট্রনীতিক আনুগত্যের ভিত্তি বিশ্লেষণের সমগ্র আনুগত্যকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নেননি। বরং এর ন্যায়সংগত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব এমন বিষয় হিসাবে ধরেছেন। আর এই ব্যাখ্যা দেবার জন্যই তিনি 'প্রকৃতির রাজত্বের' মডেলটিকে গ্রহণ করেছেন।

১৬৮১ সালে লক প্রণীত 'Two Treaties of Government' গ্রন্থে তাঁর রাষ্ট্রনীতিক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থেই তাঁর প্রকৃতির রাজত্বের মডেলটি পাওয়া যায়। লক বর্ণিত প্রকৃতির রাজত্ব হবসীয় প্রকৃতির রাজত্বের থেকে পৃথক। লকীয় প্রকৃতির রাজত্ব অনেকটা সভ্যজগতের মতো এই প্রকৃতির রাজত্বে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সাম্য বিদ্যমান। লকের প্রকৃতির রাজত্বে প্রত্যেক মানুষের পক্ষে তার স্বাভাবিক অধিকারসমূহ— যথা জীবন রক্ষা, স্বাধীনতা এবং সম্পত্তিরক্ষার ভোগ করা সম্ভব ছিল। প্রকৃতির রাজত্বে স্বাভাবিক আইনেরই প্রাধান্য — যা যুক্তির শাসন (rule of reason) এর প্রতীকস্বরূপ এবং এই স্বাভাবিক আইন সবাই মেনে চলে।

তবুও এরকম প্রকৃতির রাজত্বের অধিবাসী মানুষ সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে একটি সাধারণ শক্তির প্রতিষ্ঠা করে এই অবস্থার অবসান ঘটালো। এখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে প্রাকৃতিক রাজত্বের মানুষ যদি স্বাভাবিক আইনের সাহায্যে সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করছিল তবে আবার চুক্তির প্রয়োজন হল কেন? এটা ঠিক যে প্রকৃতির রাজত্ব মানুষের কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠেনি, তবে অসুবিধাজনক হয়ে উঠল। কেননা প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক বলতে কি বোঝায় তা বিভিন্নক্ষেত্রে বিশেষ করে আইন নির্ধারণ ও বিবাদ নিস্পত্তির ক্ষেত্রে ঠিক করার কোন প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃপক্ষ নেই— এটা বুঝবার সঙ্গে সঙ্গে এই অসুবিধা বোধ জন্মাল। কারণ এইরকম একটি সাধারণ কর্তৃপক্ষ না থাকায় প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজেকে স্বাভাবিক আইনের ব্যাখ্যাকর্ত্তা মনে করত এবং তার ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধির সাহায্যে অন্যদের শাস্তির ব্যবস্থা করত। এর ফলে প্রকৃতির রাজত্ব শেষ পর্যন্ত বিশৃঙ্খল অবস্থায় পৌঁছাল আর এই সমস্ত অসুবিধা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য প্রকৃতির রাজত্বের মানুষেরা একটি চুক্তির মাধ্যমে পুর সমাজে প্রবেশ করল। আর এই পুরসমাজের সর্বোচ্চস্তরে রইলেন একজন সাধারণ সার্বভৌম শক্তি বা কর্তৃপক্ষ।

এইভাবে পুরসমাজে প্রবেশ করে মানুষ শুধুমাত্র আইন ব্যাখ্যা করার এবং তা প্রয়োগ করার অধিকারটুকু সার্বভৌম শক্তি বা কর্তৃপক্ষের নিকট সমর্পণ করলো। এর ফলে ব্যক্তি তার স্ব-কৃত কর্মের বিচারক রইল না।

আবার এর ফলে আইন নির্ণয় করা এবং তাদের নিজেদের মত করে শাস্তিবিধানের ক্ষমতাও রইল না। কিন্তু জীবনধারণের অধিকার স্বাধীনতার অধিকার এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত প্রকৃতিদত্ত অধিকার তার নিজেদের হাতে রেখে দিল। এই সমস্ত অধিকার রক্ষার দায় বর্তালো সার্বভৌম শক্তির উপর।

তাহলে লকের মডেল অনুযায়ী সরকারকে শক্তিশালী করা হলো কিন্তু তাকে অনিয়ন্ত্রিত শক্তি দিয়ে চরম শক্তিশালী করা হলোনা। সরকার শক্তিশালী হলো সর্তসাপেক্ষে।

সুতরাং লক পরিকল্পিত সরকার মূলতঃ সীমাবদ্ধ সরকার। আর এই সীমা আরোপিত হলো এই শর্তদ্বারা যে, রাষ্ট্রনীতিক কর্তৃপক্ষকে মানুষের জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার এবং সম্পত্তির অধিকার— এই স্বাভাবিক অধিকারগুলি রক্ষা করবে। অর্থাৎ অন্যভাবে বলা যায় যে, সরকার একটি লক্ষ্য নয়, মাধ্যম মাত্র। সরকার যদি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয় তবে মানুষের চুক্তি ভঙ্গ করার অধিকার আছে। তবে এই চুক্তি ভঙ্গের অর্থ এই নয় যে, তার ফলে সভ্য জীবনযাপনের শর্তাবলীর ধবংস। লকের মতে চুক্তি কেবলমাত্র রাষ্ট্রনীতিক অংশকে স্পর্শ করে, কেননা এর ফলে শুধু সরকারের পরিবর্তন আসে। চুক্তির ফলে সামাজিক অংশে কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। অর্থাৎ মানুষ যখন দেখে যে, সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ জীবনের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার স্বাধীনতার অধিকারের মত স্বাভাবিক অধিকারগুলি রক্ষায় যত্নশীল নয়, তখন ঐ সরকারকে অপসারণ করে অন্য একটি নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার অধিকার জনগণের থাকবে। তবে এই পরিবর্তন কোন মতেই সামাজিক পরিবর্তন নয়। তাহলে বোঝা যাচ্ছে চুক্তি একটি হয়নি। চুক্তি দুটি হয়েছিল— একটি সামাজিক এবং অন্যটি রাষ্ট্রনীতিক। অন্যকথায় রাষ্ট্র ও সরকারের পার্থক্য বিষয়ে লক ওয়াকিবহাল ছিলেন বলেই মনে হয়।

উদারনীতিবাদ ঃ

লক তাঁর সামাজিক চুক্তিকে এইভাবে ব্যক্ত করে প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয় উদারনীতির সূচনা করলেন। উদারনীতিবাদের মূল যে তিনটি উপাদান যথা, সরকারের প্রতি সম্মতি, সরকারের কোনক্রমেই অনিয়ন্ত্রিত কর্তৃত্বের অধিকারী না হওয়া এবং ব্যক্তিমানুষের অধিকার রক্ষা, লকের তত্ত্বে সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান।

সম্মতির উপর গুরুত্ব আরোপ লকের তত্ত্বের প্রথম উপাদান, যদিও হবসের মতানুযায়ী সরকার প্রতিষ্ঠাতাদের সম্মতির দিকে নজর দেবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু লকের মতানুযায়ী সম্মতির একটি ব্যাপক ভূমিকা আছে। তাঁর বিবেচনায় সম্মতি শুধুমাত্র মূল সরকার প্রতিষ্ঠার সময় একটি প্রয়োজনীয় শর্ত নয়, এটি একটি স্থায়ী শর্তও বটে। সরকারের প্রতি আনুগত্যের সূচক এই সম্মতি মানুষ প্রত্যাহার করে নিতে পারে যদি মানুষ মনে করে যে, সরকার তার প্রকৃতিদত্ত অধিকারসমূহের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে ভূমিকা পালন করছে না। আর এইভাবেই চুক্তির অবসান হয়। দ্বিতীয় উপাদান হিসাবে লক উল্লেখ করেছেন যে, সরকার কোনক্রমেই অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার অধিকারী নয়। তাঁর মতে রাষ্ট্রনীতিক ক্ষমতা সর্বদাই কতকগুলি সুস্পষ্ট নীতিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। প্রকৃতপক্ষে সরকার এই নীতিগুলি বা উদ্দেশ্যাবলী মেনে চলে ততক্ষণ পর্যন্ত তার আনুগত্য পাবার অধিকার আছে। তৃতীয় উপাদান হিসাবে লক ব্যক্তিমানুষের স্বাভাবিক অধিকার রক্ষার উপর জোর দিয়েছেন। প্রকৃতিদত্ত অধিকার রক্ষার উপর জোর দিয়েছেন। প্রকৃতিদত্ত অধিকারসমূহ রক্ষা তার রাষ্ট্রনীতিক তত্ত্বের মর্মবস্তু (Keynote)। তাঁর মতে সরকারের প্রয়োজন শুধু ব্যক্তির অধিকার রক্ষার জন্যই। রাষ্ট্রনীতিক কর্তৃত্ব এবং তার বৈধতা বিশ্লেষণের সময় তিনি ব্যক্তির কথা ভোলেননি। বরং ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্রীয় সীমার মধ্যে একটি আলাদা ক্ষেত্র তিনি নির্মাণ করে দিয়েছেন। রাষ্ট্রের মূল্য অবশ্যই আছে কিন্তু তা কোনক্রমেই ব্যক্তির স্বাধীনতার মূল্যে সুনিশ্চিতকরণ উচিত নয়। এইভাবে লক তাঁর সামাজিক চুক্তির উপর উদারনীতিবাদের দুর্গপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। প্রকৃতপক্ষে লক যে তিনটি অধিকারের কথা বলেছেন — জীবনধারণের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার এবং সম্পত্তির অধিকার, তাদের প্রকৃতি যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে

আমরা দেখব যে লক উদারনীতিবাদের কত বড় প্রবক্তা ছিলেন। লকের মতে এই অধিকার মৌলিক অধিকার। অর্থাৎ এই অধিকারগুলি সমাজ ও সরকারঞ্জাত নয়। মানুষ এইগুলি নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। লক তিনটি অধিকারের মধ্যে সম্পত্তির অধিকারকে সর্বোত্তম মনে করেন। কারণ সম্পত্তির অধিকার না থাকলে অপর দুইটি অধিকার সুষ্ঠুভাবে ভোগ করা যায় না। তাঁর মতে মানুষ সম্পত্তির অধিকার সংরক্ষণের জন্যই সমাজ, সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে এবং স্বেচ্ছায় আরোপিত সর্তাদি মেনে নিয়েছে।

বস্তুতঃপক্ষে লকের সম্পত্তির অধিকারের যতই বিশ্লেষণ করা যায় ততই তার মধ্যে ইউরোপীয় পুঁজিবাদের মূল ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়। কেননা লক সম্পত্তির অধিকারকে স্বাভাবিক মনে করেন। কেননা পৃথিবীর যাবতীয় সম্পত্তি মানুষের ব্যবহারের জন্য। কিন্তু মানুষ যাতে তা ভালভাবে ভোগ করতে পারে তার জন্য দখলের অধিকার থাকা দরকার, আবার দখলের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে লক আরো স্বাভাবিক অধিকারের কথা বলেছেন। প্রত্যেক মানুষের দেহ হচ্ছে সম্পত্তির আধার। মানুষ দৈহিক বা কায়িক শ্রমের দ্বারা যা অর্জন করে তা অবশ্যই তার নিজস্ব। আবার প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারোপোযোগী হয় মানুষের শ্রমের এবং স্বেদের মিশ্রণে। নিজের শ্রমের ফল হিসেবে পৌঁছানো সম্পদ তাঁর নিজস্ব। এইভাবে লকের মতে সম্পত্তির উৎস যেহেতু শ্রম এবং মানুষ যেহেতু এইভাবে তার শ্রমের দ্বারা প্রাকৃতিক সম্পদকে ভোগ করে এবং এটাকেই সম্পত্তি বলা যায় সেইজন্য সম্পত্তির অধিকার স্বাভাবিক ন্যায়সংগত অধিকার। এখন এই সম্পত্তির অধিকার কি অনিয়ন্ত্রিত হবে ? লক অবশ্য প্রথমে পরিমিত বিত্তের কথাই বলেছেন। কারণ মানুষ যেটুকু বিত্ত ব্যবহার করবে সেইটুকুই তার অধিকারে থাকবে। কিন্তু মুদ্রা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে লককে অপরিমিত বিত্তসঞ্চয়ের সমর্থনকারী হিসাবে পাই। কেননা মুদ্রা বা অর্থ এমন এক বস্তু যা কাছে রেখে দিলেও নষ্ট হয় না। তাঁর 'Second Treatise'-এ কিছুটা পরোক্ষভাবে এবং 'Some consideration of the consequence of the lowering of interest and raising of the value of money' নামক রচনায় তাঁকে ব্যবসার জন্য অপরিমিত অর্থ সঞ্চয় সমর্থনকারী হিসাবে দেখা যায়। এইভাবে লক তাঁর সম্পত্তির পুঁজিবাদী ব্যবহারের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। বস্তুতঃপক্ষে সম্পত্তির প্রয়োজনের ভিত্তিতে সামাজিক ও রাষ্ট্রনীতিক ব্যবস্থা মূল্যায়নের প্রচেষ্টা লকের সমসাময়িক বুর্জোয়া শ্রেণীর পুঁজিতান্ত্রিক স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি রাষ্ট্রনীতিক পরিকাঠামো উদ্‌ভাবনের ইঙ্গিতই দেয়।

লকের উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গিটি মনে রাখলে তাঁর উদারনীতিবাদের শ্রেণী চরিত্র বুঝতে অসুবিধা হয় না। তাছাড়া লক তাঁর রাষ্ট্রনীতিক তত্ত্বে আসলে ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লবের বাস্তবতাকে দর্শনাশ্রিত করেছেন। গৌরবময় বিপ্লবের ফলে ইংলন্ডে পুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষাকারী একটি রাষ্ট্রযন্ত্র স্থাপিত হয়েছে। বিপ্লবের ফলে এমন একটি সরকার স্থাপিত হয়েছে যা মূলতঃ সীমাবদ্ধ সরকার। এই সরকারের সীমা আবার বুর্জোয়াগণ কর্তৃক নির্ধারিত। প্রকৃতপক্ষে লক উদারনীতিবাদের খোলসে ব্যক্তি স্বাধীনতার নিরাপত্তা বিধানের কথা বললেও তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল পুঁজির অবাধ সঞ্চালনে সহায়তাকারী একটি অসম সমাজব্যবস্থার সূচনা করা।

অবশ্য এটা ঠিক যে, লক প্রজাবৃন্দ কর্তৃক সরকারের অবসান ঘটানোর কথা বলেছেন। কিন্তু সরকারের অবসান ঘটানোর অর্থ রাষ্ট্রনীতিক কর্তৃত্বের অবসান মাত্র — সমাজের অবসান নয়। একমাত্র মানুষের স্বাভাবিক অধিকারসমূহ যখন রক্ষিত হয় না তখনই এই অবস্থার উদ্ভব হয়। আর এর উদ্ভবের ফলে শুধুমাত্র সরকারের পরিবর্তন হয়। এর আবার একটি নিহিতার্থ রয়েছে। ভবিষ্যতে যদি কোন সরকার বুর্জোয়াদের স্বার্থরক্ষা করতে অপারগ হয় তবে তাকে পত্রপাঠ বিদায় নিতে হবে। লকের উদারনীতিবাদ ব্যক্তির বিদ্রোহের ফলে সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের সুযোগ দেয় না শুধুমাত্র শ্রেণীকে উপযুক্ত রক্ষাকবচে সুসজ্জিত করে যাতে নিজেদের স্বার্থক্ষুণ্ণ হলে ন্যায়সংগতভাবে তার সরকারকে উচ্ছেদ করতে পারে। তাই লকের রাষ্ট্রনীতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে জর্জ এইচ, স্যাবাইন তাঁর "এ হিষ্ট্রি অব পলিটিক্যাল থিয়োরী" গ্রন্থে ঠিকই বলেছেন যে তিনি অত্যন্ত সতর্ক প্রকৃতির ও স্থিরচিত্তের লোক ছিলেন। বিপ্লবকে

তিনি সমর্থন করেছিলেন বটে, কিন্তু যথেচ্ছাচারকে তিনি কোনদিন উৎসাহ দান করেননি। প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘ পার্লামেন্টের (Long Parliament) অবাঞ্ছিত আচরণের স্মৃতি তাঁর মনে থাকায় তিনি আইনসভাকে অবাধ স্বাধীনতা দানে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাছাড়া জর্জ এইচ স্যাবাইন উল্লিখিত গ্রন্থে আরও বলেন যে, অবস্থার চাপে পড়ে তিনি বিপ্লবকে সমর্থন করেন। কিন্তু তিনি কোন দিনই আমূল সংস্কারবাদী ছিলেন না। বৌদ্ধিক দিক থেকে তিনি দার্শনিকদের মধ্যে কম গোঁড়া নীতিবাদী ছিলেন। একথা সত্য যে যাঁরা রাজনৈতিক দর্শনে মনোনিবেশ করেন তাঁদের মধ্যে লক ছিলেন বিশেষভাবে পরিচিত। তাঁর সততা, ব্যাপক নৈতিক প্রত্যয়, স্বাধীনতা ও মানবিক অধিকারের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং তাঁর শান্তস্বভাব তাঁকে মধ্যবিত্তশ্রেণীর বৈপ্লবিক আদর্শের মুখপাত্রে পরিণত করে এবং আমূলসংস্কারক নয়, উদার মতাদর্শের প্রচারক হিসেবে তাঁর স্থান ছিল সবার উপরে।

লকের রাষ্ট্রনীতিক চিন্তাধারা সম্বন্ধে সর্বশেষ যে কথাটি বলা যায় তা হল লকের হাতে বুর্জোয়া সমাজ ও রাজনীতি পরিপক্কতা লাভ করে। হবস যেখানে বুর্জোয়া সমাজের দিকে থাকার প্রশ্নটি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, লক এই সমস্যা থেকে মুক্ত থেকে কিভাবে এই বুর্জোয়া সমাজের সেবা ভাল করে করা যায় তার উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর মতে, সে সময়ের যা প্রয়োজন তা হচ্ছে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাসমূহের একটি তালিকা (network) রচনা যা বুর্জোয়া সমাজকে পুষ্ট করবে। তিনি শুধুমাত্র সময়ের প্রয়োজনের সমস্যার সমাধান করেননি। এমন কিছু উপদেশ দিয়ে গেছেন যা পরবর্তীকালে বুর্জোয়া রাজনীতিক বিকাশের ক্ষেত্রে মূল্যবান বলে গৃহীত হয়েছে।

পঞ্চম পাঠ

HOBBES (হবস)

হবসের আর্বিভাবের পটভূমিকা রচনা করেছিল সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ড গৃহযুদ্ধে বিক্ষুব্ধ রাজতন্ত্রের সঙ্গে উদীয়মান পার্লামেন্টের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। হবস এই পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে যে রাজনৈতিক দর্শনের জন্ম দিয়েছেন তার গুরুত্ব একদিক থেকে সাময়িক এবং অপরদিক থেকে চিরন্তন। সাময়িক, কারণ হবস সেই যুগের সমস্যার একটি আপাত সমাধান দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল যে, অবাধ ও চরম রাজতন্ত্রের সময় ক্ষমতা নিয়ে কোন বিবাদ হয়নি বলে অশান্তি ও সংঘর্ষ দেখা দেয়নি। স্টুয়ার্ট রাজারা পার্লামেন্টকে ক্ষমতার অংশ ভোগ করতে দিয়ে বিরাট ভুল করেছেন। এর ফলে পার্লামেন্ট রাজতন্ত্রকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। সুতরাং পুনরায় রাজতন্ত্রের হাতে সব ক্ষমতা তুলে দিলে সমস্যার সমাধান হবে।

কিন্তু হবস-এর তত্ত্ব চিরকালীন, কারণ তিনি সর্বপ্রথম বিজ্ঞানের ভিত্তিতে রাষ্ট্রদর্শনকে বিচার করেছেন এবং তাঁর বৈজ্ঞানিক সূত্র আজ যথেষ্ট মূল্যবান। Hacker তাঁর গ্রন্থ "Political Theory"-তে সে জন্য বলেছেন যে, 'Hobbes is the author of the first scientific political system in Europe'.

'Leviathan' গ্রন্থের প্রথম ১১টি পরিচ্ছেদে হবস মানুষের অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তিগুলি বিশ্লেষণ করেছেন, কারণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রবৃত্তি থেকেই ব্যক্তি সবকিছু বিচার করে। এই প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে প্রধান হল — ক্রোধ, লজ্জা, লোভ, হতাশা ঈর্ষা, ক্ষুধা প্রভৃতি। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই এই প্রবৃত্তিগুলি সমানভাবে থাকায় ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। এর থেকে হবস দুটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। প্রথমটি হল দৈহিক ও মানসিকভাবে প্রতিটি ব্যক্তি সমান বলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তারা সাম্যের অধিকার দাবি করতে পারে। দ্বিতীয়ত, মানুষ একটি সচল কর্মক্ষম জীব। সুতরাং রাষ্ট্র কোন অলৌকিক শক্তি বা ঈশ্বরের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে মানুষ।

এইভাবে হবস Filmer-এর ঐশ্বরিক মতবাদ তত্ত্ব সম্পূর্ণ ধ্বংস করলেন এবং তার জায়গায় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস সন্ধানে সচেষ্ট হলেন। এরই ফল সামাজিক চুক্তি মতবাদ। সমাজ ও রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার আগে মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাকৃতিক অধিকার ভোগ করতে পারে। কিন্তু এই পরিবেশ ছিল জঘন্য। প্রতিটি মানুষ ছিল একান্তভাবে একা, অসহায়, ঘৃণ্য, পাশবিক এবং স্বল্পায়ু। 'Solitary, poor, nasty, brutish and short'; প্রাকৃতিক পরিবেশে একজন ব্যক্তি অপরের সঙ্গে সর্বদা দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকে। যেহেতু প্রত্যেকেই সমান ক্ষমতাশালী তাই এই যুদ্ধের অবসানের কোন সম্ভাবনা ছিল না। ব্যক্তির জীবনকে হবস এখানে পরমাণুর (atom) সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই অসহায় অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের জন্য চুক্তি হয়। সেই চুক্তির ফলশ্রুতি হয় রাষ্ট্র ও সরকার। ইউক্লিড ত্রিভুজের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে যেমন বলেছেন যে, প্রতিটি বাহুই সমান এবং তাদের অবদানও সমান। হবস তেমনি ইউক্লিড-এর বক্তব্য অনুসরণ করে বলেছেন যে, রাষ্ট্র তৈরীর ক্ষেত্রে প্রতিটি জাতি সমানভাবে অংশগ্রহণ করেছে। গ্যালিলিও যেমন তাঁর Theory of Motion-য়ে বলেছেন যে, প্রাকৃতিক রাজ্যে সব সচল জীবের একটি নির্দিষ্ট শক্তি রয়েছে এবং প্রয়োজন মত সেই শক্তির রূপান্তর ঘটে। হবসও তাঁকে অনুসরণ করে বলেছেন যে, ব্যক্তি বা মানুষ সচল জীব, তাদের সমবেত শক্তির রূপান্তরের ফলেই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং এই রূপান্তরের প্রাণকেন্দ্র (motive force) হচ্ছে ইচ্ছা শক্তি (will power)। সেজন্য অনেক সময় হবসকে সপ্তদশ শতাব্দীর সমাজ বিজ্ঞানের গ্যালিলিও আখ্যা দেওয়া হয়।

হবসের মতে চুক্তি হয়েছিল একটি এবং সরকার সেই চুক্তির অংশ নয়। চুক্তির ফলে একটি রাষ্ট্রীয় সমাজ (Commonwealth) প্রতিষ্ঠিত হল এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তার সমস্ত অধিকার ও ক্ষমতা সেই সমাজের হাতে অর্পণ

করল। পরে তারা সেই অধিকারগুলি একজন রাজা বা অধিক সংখ্যক রাজার হাতে তুলে দিল। রাজা চুক্তির অংশ না হওয়ায় তাঁর ক্ষমতা অনিয়ন্ত্রিত এবং তিনি জনগণের কাছে দায়িত্বশীল নন। অবশ্য হবস বলেছেন যে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের হাতে অধিকার তুলে দিল বলে আসলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হল না একজন যা ত্যাগ করেছিল সে আবার গাণিতিক নিয়মে তা ফিরে পেল।

আইন রাজার সৃষ্টি এবং এই আইনের বিরোধিতা করার অর্থ হল চুক্তি ভঙ্গ করা। হবসের মতে 'Law is the command of the sovereign'. স্বাধীনতা একটি নঞর্থক (negative) ধারণা। আইনের দ্বারা যে সব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি, শুধুমাত্র সেই সব ক্ষেত্রেই ব্যক্তির স্বাধীনতা রয়েছে। হবস বলেছেন 'Liberty depends on the intersts of law' এর ফলে ম্যাকিয়াভ্যালি যে চরম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কথা বলেছিলেন হবস তাঁকে আরও বিস্তৃত করলেন এবং পরবর্তীকালে বোদিন এই ধারণাকে সার্বভৌমিকতা বা Sovereigntyতে রূপ দিলেন।

হবসের বিচার করতে গিয়ে আধুনিককালে মতভেদ দেখা দিয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে মনে করা হত যে, তিনি চরম রাজতন্ত্রের এবং চরম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার (totalitarian state) সমর্থক। কিন্তু আধুনিক সমালোচকেরা বলেন যে; আপাত দৃষ্টিতে তা মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে হবস একজন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বা Individualist.

এই মতের সমর্থক Hacker লিখেছেন, "With Hobbes there comes a new departure in political theory : the politics of individualism".

এর সপক্ষে বলা যায় যে, হবস রাষ্ট্রকে ব্যক্তির ইচ্ছা ও প্রচেষ্টার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এমনকি তিনি একথা বলেছেন যে, ব্যক্তি প্রাকৃতিক অধিকারের যোগ্য। প্রতিটি ব্যক্তি সমান এবং সেজন্য সাম্যের অধিকারী। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (Resistance) করার কোন অধিকার ব্যক্তির নেই। আবার একথাও ঠিক যে, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই হয়েছিল তিনটি প্রাকৃতিক অধিকার রক্ষা করতে। এই তিনটি অধিকার হল — জীবনের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, এবং পরিবারের অধিকার। সুতরাং রাষ্ট্র সহজাতভাবেই এমন কিছু করবে না বা এমন আইন রচনা করবে না যার মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। এইভাবে হবস Resistance এর সমস্যাটি সমাধান করেছেন।

হবসের গুরুত্ব সপ্তদশ শতাব্দীতে অনুভূত হয়নি। তাঁর রাষ্ট্র চিন্তা একদিকে যুক্তি, বুদ্ধি ও মানসিকতা বোধের ওপর এবং অপরদিকে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই দিক থেকে তিনি নবজাগরণের সার্থক ফলশ্রুতি। ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তানায়কেরা হবসের রাষ্ট্রতত্ত্ব থেকে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন এবং প্রভাবিত হয়েছিলেন। হবস বলেছেন ব্যক্তিকে রক্ষার জন্যই রাষ্ট্রের জন্ম; বেন্থাম, মিল প্রভৃতি উপযোগিতাবাদীরা পরিষ্কার দেখিয়েছেন যে, ব্যক্তির আনন্দের জন্য (Pleasure) এবং দুঃখ (Pain) দূর করার জন্য আইনের সৃষ্টি। হবসের সামাজিক চুক্তি মতবাদের দ্বারা লক ও রুশো যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। আজকের দিনে যে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কল্পনা করা হয় তাও প্রথম লক্ষ্য করা যায় হবস-এর লেখায়। আজও আমাদের মূল সমস্যা কীভাবে রাষ্ট্রের হাত থেকে স্বাধীনতার অধিকারগুলি রক্ষার করা যায় এবং প্রয়োজন মত রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ মেনে নেওয়া যায়। সুতরাং হবসের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা দীর্ঘকাল ধরে যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে প্রভাবিত করবে এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

ষষ্ঠ পাঠ

LOCKE (লক)

সপ্তদশ শতাব্দীর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ গৃহযুদ্ধে বিধবস্ত ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক পটভূমিকাকে যে দুজন দার্শনিক অক্ষয় করে রেখে গেছেন তাঁরা হলেন হবস ও লক। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের অন্যতম পথিকৃত লক। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজ দার্শনিক দুজনের পটভূমিকা এক হলেও প্রতিক্রিয়া ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। হবসের মনে হয়েছে চরম রাজতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠা করলে শান্তি ফিরে আসবে। আর লকের মনে হয়েছে যে, সংবিধানের মাধ্যমে অসীম রাজতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করলে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র সুরক্ষিত হবে এবং ইংল্যান্ডে শান্তি ফিরে আসবে। পরবর্তী সময়ের পাদপ্রদীপে বিচার করলে লকের দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতা উপলব্ধি করা যায়। সেজন্য ১৬৮৮ সালে ইংল্যাণ্ডে যে গৌরবময় বিপ্লব হয় এবং যে বিপ্লবের ফলে অসীম রাজতন্ত্র সাংবিধানিক রাজতন্ত্র ধীরে ধীরে পরিণতি লাভ করে এবং আইন সভার চরম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই বিপ্লবের পথিকৃৎ তাত্ত্বিক হিসাবে লককে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

হবসের মত সামাজিক চুক্তি মতবাদকে লকও গ্রহণ করেছেন। কিন্তু লকের বক্তব্য হল, প্রাচীন মানুষের মধ্যে চুক্তি হয়েছিল দুটি (১) সামাজিক ও (২) রাষ্ট্রীয় চুক্তি। প্রথম চুক্তির দ্বারা সমাজ জীবনে ও রাজনৈতিক জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়। পরের চুক্তিটি দ্বারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বা সরকার নির্দিষ্ট হয়। সুতরাং জনগণের সঙ্গে সরকারের চুক্তি হয়েছিল এবং তার ফলে সরকারের কর্তব্য হল জনগণের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা সুদৃঢ় করা এবং স্বাভাবিক অধিকার সুরক্ষিত করা। এইভাবে সামাজিক চুক্তি মতবাদের পরিবর্তিত ব্যাখ্যার ফলে লক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্ম দিলেন। সহজেই প্রশ্ন ওঠে যে, ব্যক্তি যদি চুক্তি ভঙ্গ করে তবে তাকে যেমন শাস্তি পেতে হবে তেমনি সরকার চুক্তি ভঙ্গ করলে ব্যক্তির কি বিদ্রোহ করার অধিকার নেই ? হবস-এর মনে এ প্রশ্ন ওঠেনি, কারণ তাঁর মতে চুক্তি হয়েছিল শুধুমাত্র জনগণের মধ্যে, রাজার সাথে নয়। ন্যায় শাস্ত্র অনুযায়ী বিচার করে লক বলেছেন যে, স্বাভাবিক অধিকার সুরক্ষিত করতে ব্যর্থ হলে ব্যক্তি অবশ্যই সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। কিন্তু এখানেও একটি স্ববিরোধ রয়েছে। উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হওয়ায় এবং গৃহযুদ্ধের স্মৃতি খুব স্পষ্ট থাকায় লক বলেছেন যে, শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠরাই সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে। সংখ্যালঘিষ্ঠদের পক্ষে এ অধিকার স্বীকার করা যায় না।

গেটেল-এর মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের লকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল তাঁর স্বাভাবিক অধিকারের ধারণা। স্বাভাবিক অধিকার বলতে বোঝায় সেই সমস্ত অধিকারকে সুযোগ সুবিধাকে যা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে ব্যক্তি ভোগ করতো এবং যে অধিকারের ভিত্তি হচ্ছে যুক্তি ও বুদ্ধি। লক স্বাভাবিক অধিকারের তিনটি শ্রেণী বিন্যাস করেছেন — আত্মরক্ষার অধিকার, পারিবারিক স্থিতি ও সুরক্ষার অধিকার এবং সম্পত্তির অধিকার। এর মধ্যে সম্পত্তির অধিকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সম্পত্তির অধিকার লক যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমর্থকরা ও একই সাথে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রবক্তরা উৎসাহিত হয়েছেন। লকের মতে ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকা বা উর্দ্ধসীমা থাকা উচিত নয়। সম্পত্তি ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। এই তত্ত্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মূল কথা কিন্তু একই সাথে লক আরো বলেছেন "রাষ্ট্রে উত্তরাধিকার সম্পত্তির ব্যবস্থা থাকবে না।" কোন একটি বিষয়ে ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে বা দাবী করতে হলে প্রথমেই দেখতে হবে যে, সেই সম্পত্তি তৈরী করতে ব্যক্তি নিজের পরিশ্রম যুক্ত করেছে কিনা। এই তত্ত্বই পরবর্তীকালে "লেবার থিয়োরী অব ভ্যালু"

নামে পরিচিতিলাভ করেছে। বর্তমান কালের অন্যতম রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ল্যাস্কি লকের তত্ত্বকে সমর্থন করে বলেছেন যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তি হলো পরিশ্রম, যা সামাজিক মঙ্গলে নিয়োজিত। এই পরিশ্রম ছাড়া সম্পত্তি উদ্ধার হতে পারে না। ল্যাস্কির এই তত্ত্ব ''ফ্যাংশনাল থিয়োরী অব রাইটস্'' নামে পরিচিত।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে লকের বক্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্র একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান এবং সরকার সেই প্রতিষ্ঠানের অছি। একবছর অন্তর প্রতিষ্ঠানের অংশীদারদের দ্বারা অছি পরিষদ নির্বাচিত হয় এবং সেই পরিষদ সমস্ত কাজের হিসাব নিকাশ দেয়, সরকারও তেমনি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন এবং সমস্ত কাজের জন্য জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে বা আইন সভার কাছে দায়িত্বশীল থাকেন। লকের এই বক্তব্য খুবই আধুনিক। বর্তমানকালের অন্যতম রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার-এর চিন্তাধারার সাথে এর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সেই যুগে লকের এই তত্ত্ব গৌরবময় বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রথম সার্থক পথিকৃৎ হিসাবে লককে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

শুধুমাত্র রাষ্ট্রের উৎপত্তি বা প্রকৃতি নিয়ে লক চিন্তা করেন নি। তাছাড়া রাষ্ট্রের গঠন, বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, ব্যক্তির অধিকার রক্ষার জন্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও ভারসাম্য রক্ষা এবং বিচারালয়ের স্বাধীনতার কথা তিনি আলোচনা করে গেছেন। এইসব তত্ত্ব তাঁর রচিত "Constitution of Carolina" নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। সেজন্য লকের প্রশংসা করে Maxey বলেছেন যে, জরাজীর্ণ রাজনৈতিক অবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য যেমন লকের চিন্তাধারার প্রয়োজন তেমনি পূর্ণ গঠনের জন্য লককেই স্মরণ করতে হবে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে উদারনৈতিক গণতন্ত্রে (Liberal democracy) প্রথম সার্থক রূপদাতা হিসাবে লকের আসন চিরস্থায়ী। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র এই দুটি হল উদারনৈতিক চিন্তাধারার মূলকথা। লক এই দুটি প্রধান তত্ত্বকে বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করে গেছেন। সেজন্য সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ড তথা ইউরোপে তিনি ছিলেন সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিপ্লবের সময় আমেরিকায় এবং ফ্রান্সে তিনি ছিলেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বদাতা। আর ঊনবিংশ শতাব্দীর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবগুণ্ঠণে তিনি ছিলেন মূল চিন্তাবিদ। বর্তমান যুগে রাষ্ট্র যখন ব্যক্তির জীবনে ক্রমশঃ বিস্তৃতভাবে এবং গভীরভাবে প্রবেশ করছে, ব্যক্তিস্বাধীনতা যখন প্রতিবাদের আশঙ্কায় আচ্ছন্ন, তখন লকের চিন্তাধারা আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল।

সপ্তম পাঠ

ROUSSEAU (রুশো)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে যে অল্প কয়েকজনের চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমালোচকদের মধ্যে মৌলিক মত পার্থক্য দেখা গেছে তাঁদের মধ্যে ফরাসী দার্শনিক রুশো অন্যতম। আসলে এই মত পার্থক্যের কারণ রুশোর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব। আত্মজীবনীতে (Confessions) রুশো নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তার মধ্যে আগাগোড়া ভালো ও মন্দের বিরোধ ঘটেছে এবং শেষে মন্দের জয় হয়েছে। একেই মনোবিজ্ঞানীরা split personality বলেন। এই ব্যক্তিত্বের জন্যই রুশোর চিন্তাধারায় পরস্পর বিরোধী প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে বলে আধুনিক সমালোচকেরা মনে করেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে রুশো যে তত্ত্বটির জন্য বিশেষভাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন তা হলো সমষ্টিগত ইচ্ছাতত্ত্ব বা General Will তত্ত্ব। এই তত্ত্বটি যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় যে এর মধ্যে জনগণের সার্বভৌমত্ব যেমন রয়েছে, গণতন্ত্র এবং বিশেষ করে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে স্বৈরতন্ত্র এবং সমষ্টিবাদ্।

রুশো আধুনিক যুগে আদর্শবাদের প্রবক্তা। একথা মানতেই হবে যে, প্লেটো থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককালের বার্কার পর্যন্ত সব আদর্শবাদী ও নয়াআদর্শবাদীরা একটি সমস্যা সমাধান করতে চেয়েছেন এবং ব্যর্থ হয়েছেন। সমস্যাটি হলো কিভাবে রাষ্ট্রের ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তি স্বাধীনতা এই দুটির মধ্যে এমন সমন্বয় আনা যায় — যাতে দুটির কোনটি নষ্ট হবে না। আদর্শবাদীরা সকলেই ব্যর্থ হয়েছেন। তার কারণ তাঁরা শেষমেষ ব্যক্তি স্বাধীনতা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের কাছে বিসর্জন দিয়েছেন। পরবর্তীকালের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিকরা অধিকার ও কর্তব্যের ধারণা এনে যেভাবে এই সমন্বয়ের সমস্যাটি সমাধান করেছেন আদর্শবাদীরা তা করতে পারেন নি।

সুতরাং বোসাংকেত এবং পরবর্তীকালে হবহাউস যথার্থই বলেছেন যে, রুশো আদর্শবাদী বলেই তিনি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের পক্ষে এবং গণতন্ত্রের বিপক্ষে। "Social contract, 'Emile', 'The Origin of inequality', 'Has citizenship brought curse for humanity' ?" প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে আমরা রুশোর রাষ্ট্র চিন্তার গণতান্ত্রিক দিকগুলি তুলে ধরতে পারি।

প্রথমত, রুশো বলেছেন, মানুষ স্বাধীনতার জন্য জন্মায় কিন্তু সবক্ষেত্রেই তাকে শৃঙ্খল পরিয়ে দেওয়া হয়। এখানে শৃঙ্খল বলতে রুশো সামাজিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খল বুঝেছেন। সুতরাং স্বাধীনতা যে মানুষের প্রাথমিক চাহিদা রুশোর একথা মনে হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, রুশোর মতে সভ্যতা মানুষের মধ্যে জটিলতার সৃষ্টি করেছে, মানুষকে প্রকৃতি থেকে দূরে সরিয়ে এনেছে এবং তার ফলে মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়েছে। এক্ষেত্রে রুশো ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশ যে সমাজের দায়িত্ব সে কথা উল্লেখ করতে ভোলেন নি।

তৃতীয়ত, শিক্ষা সম্পর্কে রুশোর যে ধারণা তাতে সমস্ত রকম নিয়ন্ত্রণ ও খবরদারীর অবসানের কথা বলা হয়েছে। শিক্ষা ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রথম ও প্রধান ভিত্তি। রুশো শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আহ্বান করেননি।

চতুর্থত, ব্যক্তির উপর স্বাভাবিক বিশ্বাস ছিল বলে তিনি রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বেকার যে চিত্র এঁকেছেন তা হবসের থেকে পৃথক। সেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল, কিন্তু সম্পত্তি আবিষ্কারের ফলে বিরোধ দেখা দিল। সুতরাং ব্যক্তিকে রুশো কখনও অবিশ্বাস করেননি।

পঞ্চমত, ব্যক্তি স্বভাবতই মননশীল ও যুক্তিবাদী এবং সেজন্যই ব্যক্তির দ্বারাই চুক্তির ফলেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল।

ষষ্ঠত, রুশোর মতে চুক্তির দ্বারা Commonwealth সৃষ্টি হলো, এবং এই Commonwealth-এর অংশ হিসেবে প্রতিটি ব্যক্তি তার অধিকার ফিরে পেলো। চুক্তির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রুশো লিখেছেন, "From each to all and from all to each"। সুতরাং ক্ষমতা কোন ব্যক্তির, সমষ্টির বা সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। ব্যক্তির ক্ষমতা ও অধিকার বজায় রইল।

সপ্তমত, Commonwealth রাজনৈতিকভাবে কার্যকর করার জন্য সৃষ্টি হলো সমষ্টিগত ইচ্ছা। এই ইচ্ছাতত্ত্ব বা 'General Will' রাষ্ট্রবিজ্ঞানে নতুন অবদান এবং পরবর্তীকালে এর গভীর প্রভাব উপলব্ধি করা গেছে। 'Will'-এর মধ্যে দিয়ে রুশো ব্যক্তিকে গতিশীল করেছেন এবং তার ব্যক্তিত্বকে বোধশক্তি এবং প্রজ্ঞা দিয়েছেন।

অষ্টমত, সমষ্টিগত ইচ্ছা কখনোই সংখ্যাগুরুর ইচ্ছা নয়। এর দ্বারা রুশো বোঝাতে চেয়েছেন যে, একজন ব্যক্তির মধ্যে যদি Rationality থাকে তবে তার ইচ্ছাই সমষ্টিগত ইচ্ছা হবে। সুতরাং রুশো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে মর্যাদা দিয়েছেন।

নবমত, রুশোর মতে সমষ্টিগত ইচ্ছাই জনগণের ইচ্ছা এবং এই ইচ্ছাই আইনের উৎস। এর দ্বারা রুশো জনগণের সার্বভৌমত্য ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেন।

দশমত, রুশো ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী হিসেবে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের কথা বলেছেন। কারণ একমাত্র প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে জনগণ সচেতনভাবে এবং গতিশীলভাবে সবর্দাই রাষ্ট্রের কাজের সাথে যুক্ত থাকতে পারেন।

অপরদিকে নিম্নলিখিত ধারণা বা বক্তব্য থেকে রুশোর রাষ্ট্র চিন্তায় স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা বিশ্লেষণ করা যায়।

(১) সমষ্টিগত ইচ্ছা যদি সংখ্যা গরিষ্ঠের ইচ্ছা না হয় তবে কে বিচার করবে যে, কার ইচ্ছার ভিতর যুক্তি এবং Rationality রয়েছে এবং কার কার ইচ্ছার ভিতর তা নেই। এই অবস্থায়, ক্রমে রুশো বললেন, জনগণ নিজেদের মধ্য থেকে একজন সর্বগুণসম্পন্ন বিচক্ষণ ব্যক্তি বেছে নেবেন এবং তাঁর ইচ্ছাই সমষ্টিগত ইচ্ছা বলে বিবেচিত হবে। এই ধারণাটির সাথে প্লেটোর 'Philosopher King' তত্ত্বটির সাদৃশ্য রয়েছে এবং এখানেই রয়েছে রুশোর স্বৈরতান্ত্রিক চিন্তার ভিত।

(২) যে রুশো ব্যক্তিস্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্য উদগ্রীব ছিলেন সেই রুশোই বললেন যে, সংখ্যাগুরুর সাথে সংখ্যালঘুর যদি বিরোধ হয় তবে শক্তি প্রয়োগ করে সংখ্যালঘুকে মুক্ত করতে হবে। 'The minority should be forced to be free' পরবর্তীকালে নাৎসীরা ও ফ্যাসিষ্টরা রুশোর এই তত্ত্বকে ব্যবহার করে ইহুদি ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার বলে চালিয়েছে।

(৩) রুশো অধিকার সম্পর্কে কোন ধারণা দিয়ে যাননি। অন্যান্য আদর্শবাদীর মতো স্বাধীনতাকে তিনি একটি 'Moral and Non-Political' সমস্যা হিসাবে দেখেছেন। এর ফলে রুশো ব্যক্তির নীতিবোধকে স্বৈরাচারী শাসকের বেদীতে বলি দিয়েছেন।

(৪) যে রুশোর ভিতর ক্ষমতার বিরুদ্ধে এবং নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষিত হয়েছে সেই রুশোই পরবর্তীকালে রাষ্ট্রের হাতে আইন ও নীতিকে বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁর চিন্তাধারায় ব্যক্তির বক্তব্য বলে কতকগুলি বিশেষ কাজ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই কাজগুলি ও দায়িত্বগুলি পালন করার অর্থ হলো রাষ্ট্রের কাছে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বিসর্জন।

সুতরাং একথা অনস্বীকার্য যে, রুশো একই সাথে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ও সমষ্টিবাদী, গণতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে জ্যাকোবেনরা যদি প্রথম প্রবণতাটির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে বিংশ শতাব্দীর নাৎসী ও ফ্যাসিস্টরা দ্বিতীয়টির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। আর সূচনাতেই বলা হয়েছে যে, এই অসংগতির কারণ হলো রুশোর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বা Confused personality.

অষ্টম পাঠ

MILL (মিল)

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ইংরেজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জন স্টুয়ার্ট মিলকে যুগ সন্ধিক্ষণের চিন্তাবিদ বলা হয়েছে। বার্কার তাঁর ('Political thought in England' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বলেছেন যে, ১৮৪৮ সালটি ঊনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক বছর 'Annus Mirabilis'। কারণ হিসাবে তিনি দেখিয়েছেন যে ওই বছরটিতে একই সাথে মিলের Principles of Political Economy এবং মার্কস ও এঙ্গেলসের Communial Manifesto প্রকাশিত হয়েছিল। মিলের এই গ্রন্থটি থেকেই বোঝা যায় যে তিনি তাঁর চরম ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী অবস্থান থেকে কিছুটা সরে গিয়ে সমষ্টিবাদকে গ্রহণ করেছেন। এই সমষ্টিবাদের অন্যতম একটি ধারা হলো সমাজতন্ত্রবাদ এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ।

প্রধানত দুটি দিক থেকে বিশ্লেষণ করে দেখানো যায় যে মিল যুগ সন্ধিক্ষণের দার্শনিক। প্রথম দিকটি হলো উপযোগিতাবাদে তাঁর অবস্থান। বেন্থাম উপযোগিতাবাদের ভিত্তি হিসাবে যে ব্যক্তি স্বার্থ ও Hedonism-এর ভিত্তি প্রস্তুত করেছিলেন মিল তাকে এমনভাবে সংশোধন করলেন যাতে মানবতাবাদ ও সমষ্টিবাদের ভিত্তিতে উপযোগিতাবাদ কার্যকর করা যায়। এখানে ব্যক্তির চেয়ে গোষ্ঠী ও সমাজ বড় হয়ে উঠল। দ্বিতীয় দিকটি হলো মিলের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থনৈতিক চিন্তাধারা। সেক্ষেত্রেও তিনি এমনভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে সংশোধন করলেন যাতে সমাজতন্ত্রবাদ এবং বিশেষ করে বিবর্তনমূলক গণতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা করা যায়। সে জন্যই বার্কার লিখেছেন, 'Mill, rather than Marx, was the starting point of the Fabians'। সাথে সাথে একথাও মনে রাখতে হবে যে যুগ সন্ধিক্ষণের দার্শনিক বলে মিলের চিন্তাধারায় কিছু কিছু অসংগতি লক্ষ্য করা যায়।

উপযোগিতাবাদের দিক থেকে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি লক্ষনীয় ঃ

(১) বেন্থাম জোর দিয়েছিলেন পরিমাণ বা Quantity-র ওপর। মিল জোর দিলেন গুণগত দিকের ওপর।

(২) মিলের মতে ব্যক্তির লক্ষ্য শুধু তার স্বার্থ দেখা নয় বা আনন্দ খোঁজা নয়। ব্যক্তির লক্ষ্য হলো এমনভাবে নিজের স্বার্থ পূরণ করা যাতে সমাজের মঙ্গল হয়।

(৩) এর ফলে মিল ব্যক্তির চেয়ে সমাজকে বেশী মূল্য দিলেন এবং বললেন যে, কতকগুলি সুখ বা pleasure রয়েছে যা মানুষকে তার নৈতিক চরিত্র প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে এবং কতকগুলি pleasure রয়েছে যা মানুষের 'নেকড়ে বাঘত্ব' বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

(৪) মিলের মতে খৃষ্টীয় ধর্মের যে শিক্ষা এবং যার মধ্যে গোষ্ঠীগত মঙ্গলের ধারণা রয়েছে তাকেই উপযোগিতাবাদের ভিত্তি করতে হবে। ব্যক্তিকে মনে রাখতে হবে সমাজের বৃহত্তর মঙ্গলের মধ্যেই তার নিজের মঙ্গল নিহিত আছে এবং সমাজের মঙ্গলের চেষ্টা করলেই তার নিজের সুখ হবে ও স্বার্থ সিদ্ধ হবে।

এ থেকে বোঝা যায় যে বেন্থামের উপযোগিতাবাদে যে চরম ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ, স্বার্থবোধ ও সুখবাদ নিহিত ছিল মিল তাকে এমনভাবে সংশোধন করলেন যাতে উপযোগিতাবাদের সাথে সমষ্টিবাদের মিলন ঘটল। এদিক থেকে মিল এক নতুন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের জন্ম দিলেন যাকে আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বা Modern Individualism বলা হয়। গ্রাহাম ওয়ালাস, নর্মান এঙ্গেল প্রভৃতি দার্শনিকরা পরবর্তীকালে এই পথ অবলম্বন করেছেন।

মিলের অর্থনৈতিক চিন্তা বিচার করলেও আমরা সমষ্টিবাদের পদধ্বনি শুনতে পাই। এ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি অবশ্য স্মরণীয় ঃ

(১) Political Economy-র প্রথম সংস্করণে মিল উৎপাদন এবং বন্টন এই দুটি ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। কিন্তু ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি বলেন যে, উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা মেনে নেওয়া গেলেও প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বন্টনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ সীমাবদ্ধভাবে স্বীকার করে নিতে হবে।

(২) মিল নতুন পুঁজিপতি শ্রেণীর মুখপাত্র হিসাবে সামন্ত প্রভুদের ও ভূমিভিত্তিক ক্ষমতাবান শ্রেণীগুলির ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি তাই সম্পদকরকে ও উৎপাদন শুল্ককে অন্যায় বলে মনে করলেও জমির ওপর ভূমিকর বসাতে বললেন।

(৩) মিল তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন কখন সমাজে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেই ন্যায় বিচারের স্বার্থে শ্রমিক শ্রেণীর যাবতীয় উৎপাদন সমানভাবে সকলের মধ্যে বন্টিত হবে।

(৪) মিল শ্রমিক অধিকার সংস্করণের জন্য শ্রমিক সংগঠন তৈরীর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও নেন এবং বলেন যে, শ্রমিকের আন্দোলন সফল করতে হলে শ্রমিক সংগঠনগুলিকে স্বাধীনতা দিতে হবে।

(৫) Political Economy-র তৃতীয় সংস্করণে মিল ইংল্যান্ডে শ্রমিকশ্রেণীর ওপর যে ধরণের অন্যায় ও অত্যাচার হচ্ছে তার সমালোচনা করেন।

(৬) ওই একই সংস্করণে তিনি লিখলেন, পুঁজিপতিদের মনে রাখতে হবে যে, তাদের নিজেদের স্বার্থেই শ্রমিক শ্রেণীর মানসিক ও দৈহিক উন্নতির প্রয়োজন। শ্রমিকরা যদি উন্নত না হয় তবে নতুন প্রযুক্তিকে গ্রহণ করতে পারবে না এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারবে না। তাই পুঁজি ও শ্রম এবং পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব আছে তা দূর করা প্রয়োজন।

(৭) স্বয়ং-শাসিত মিউনিসিপ্যালিটি, করপোরেশন, বরো কাউন্সিল প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণের সুখ সুবিধা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা মিল অনুভব করেছিলেন এবং তার জন্য তিনি এই সংস্থানগুলিকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেবার কথা বলেছেন।

এর থেকে বোঝা যায় যে, মিল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী হয়েও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচারের স্বার্থে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং সমাজতন্ত্রবাদকে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সমাজতন্ত্রবাদ মূলত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ যা ইংল্যান্ডে Fabianism নামে পরিচিত। প্রধানত সিডনী এবং বিয়েট্রিস ওয়েব এবং বার্নার্ডশয়ের প্রচেষ্টায় ১৮৮৪ সালে ইংল্যান্ডে Fabian Society প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৮৯ সাল থেকে তাদের চিন্তাধারা বিভিন্ন প্রবন্ধ ও পুস্তকের মাধ্যমে প্রচারিত হতে থাকে। মিলের মতে পাশ্চাত্য পুঁজিবাদকে ধ্বংস না করে পুঁজিবাদ টিকিয়ে রাখার জন্য আইনের সংস্কার সাধনের প্রয়োজন রয়েছে। মার্কস রাষ্ট্রকে শ্রেণী শোষণের যন্ত্ররূপে দেখেছেন কিন্তু মিল ও ফেবিয়ানরা রাষ্ট্রের মাধ্যমে শ্রেণী সমন্বয় ঘটানো যায় এমন বিশ্বাস করতেন। মিল ও ফেবিয়ানরা মনে করতেন যে, বিবর্তনের মাধ্যমে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ক্রমাগত আইন করে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ করবে এবং এই ভাবেই গণতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে। মিল এবং ফেবিয়ানরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রয়োজন স্বীকার করতেন, কারণ শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে না। সেজন্য তাঁরা উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রমিকদের উৎসাহ দেবার জন্য নানারকম পদ্ধতি অবলম্বন করতে বলেছেন। এর মধ্যে একটি পদ্ধতি হলো উৎপাদন অনুযায়ী মজুরী নির্ধারণ।

এর থেকে বোঝা যায় যে, ফেবিয়ান সমাজবাদ মিলের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিল, মার্কসের দ্বারা নয়। পরবর্তীকালে ইংল্যান্ডে যে গণতান্ত্রিক সমাজবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে যে আদর্শ ছড়িয়ে পড়ে তা এই ধারারই ফল।

স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ থেকে সমষ্টিবাদে উত্তরণের কালে মিলের মধ্যে অসংগতি দেখা যায়। তিনি ব্যক্তিকে রক্ষার জন্য এমন কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলেন যেগুলি গণতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকারক। তিনি স্বাধীনতার কথা বললেও অর্থনৈতিক অধিকারের ওপর গুরুত্ব দেননি। পুঁজিবাদকে রক্ষার জন্য তিনি সম্পত্তিকর ও উত্তরাধিকারকরকে সমালোচনা করেছেন। তা সত্ত্বেও বলা যায় যে, ১৮৯০ সাল থেকে সমাজতন্ত্রের যে ঢেউ পাশ্চাত্যে ছড়িয়ে পড়েছিল মিল তার অন্যতম স্থপতি। স্বাধীনতা সম্পর্কে মিলের ধারণা সমালোচনা করতে গিয়ে বার্কার লিখেছেন, "Mill is the prophet of empty liberty and abstract individual."

তিনি স্বাধীনতার কথা বললেও অধিকারের কথা বলেননি। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের কথা বললেও একই সাথে ধনী সম্প্রদায়ের জন্য এবং বিদ্বানদের জন্য বিশেষ ভোটাধিকারের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মনে সর্বদা ভয় ছিল যে দরিদ্র, অশিক্ষিত জনগণ স্বাধীনতাকে ধবংস করবে। পরিমাণের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিলে গুণগত দিকটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এইভাবে সহজেই বলা যায় যে, যুগ পরিবর্তনের মূল সূত্রটি উপলব্ধি করলেও মিলের চিন্তাধারায় বহু অসঙ্গতি থেকে গেছে।

নবম পাঠ

HEGEL (হেগেল)

'Dialogue' শব্দটি থেকে Dialectics কথাটি এসেছে। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল সাতটি বর্গে ভাগ করে মানুষের Objective reality-কে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। জার্মান দার্শনিক কান্ট বাইরের দেখাকে বিশুদ্ধ মনে করেননি এবং তিনি subjective category-র কথা বলেছেন। হেগেল subjectivity-র সাথে objectivity-র মিলন ঘটিয়েছেন Dialectics-এর মধ্যে।

হেগেল তাঁর Philosophy of Right গ্রন্থে যে রাজনৈতিক দর্শনের কথা আলোচনা করেছেন সেখানে subject হলো ব্যক্তি এবং তার চেতনা, object হলো সমাজের আইনগত রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো। এর মূলে রয়েছে দুটি উপাদান। প্রথমটি হলো দুটি ক্ষেত্রের উপস্থিতি। হেগেলের বেলায় এই ক্ষেত্র দুটি হচ্ছে যথাক্রমে subjective-objective reality, দ্বিতীয়টি হলো দ্বন্দ্ব বা Contradictions. হেগেল মনে করেন যে ইতিহাস কতগুলি ধারণার বিবর্তনের সমষ্টি। প্রথম একটি ধারণার বা Idea-র জন্ম হয়, পরে তার বিপরীত ধারণাটি সৃষ্টি হয় এবং সবশেষে এই দুটি ধারণার সমন্বয়ে একটি নতুন ধারণার জন্ম নেয়। প্রথমটিকে Thesis দ্বিতীয়টিকে Anti-thesis এবং তৃতীয়টিকে synthesis বলা যায়।

হেগেল ইতিহাসে এই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া বোঝানোর জন্য তিনটি বিভিন্ন সূত্র গ্রহণ করেছেন —

(১) বাহ্যিক সত্য বা external & objective reality.

(২) চেতনা বা Consciousness বা Subjectivity.

(৩) আত্মা বা Spirit.

X – Object

Y – Subject

O – Spirit

WO — World Sprit

নিম্নের রেখা চিত্রটির দ্বারা বিষয়টি বোঝানো যায়।

$$A\boxed{(Y)\,X} \qquad B\boxed{O \rightarrow Y} \qquad C\boxed{XY \rightarrow WO}$$

(১) চেতনার সাথে বাইরের সত্য সম্পর্ক যুক্ত হয় এবং সৃষ্টি হয় Thesis এর। প্রথমটিতে আমরা এই বিষয়টি লক্ষ্য করছি। এখানে পর্যবেক্ষকের চেতনা বাহ্যিক সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করতে চাইছে।

(২) দ্বিতীয়টিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাহ্যিক সত্য মানব চেতনায় ধরা পড়েছে। এখানে পর্যবেক্ষকের চেতনা কিছুটা উঁচু স্তরে পৌঁছেছে, যার ফলে তার পক্ষে বাহ্যিক সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হচ্ছে। দুটিতেই দেখানো হয়েছে যে চেতনার সাথে বাহ্যিক পটভূমিকায় দ্বান্দ্বিক ঘাত প্রতিঘাত ঘটছে।

(৩) তৃতীয়টিতে Synthesis বা সমন্বয় ঘটেছে। এখানে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেখানে পর্যবেক্ষকের চেতনার সাথে বাহ্যিক সত্যের যে বিরোধিতা ছিল তা দূর হয়ে গেছে এবং পর্যবেক্ষক সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছে।

হেগেল তাঁর Philosophy গ্রন্থটিতে বলেছেন যে বাহ্যিক সত্যের মাধ্যমে বিশ্ব চেতনা নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। তৃতীয়টি থেকে আবার নতুন বৃত্ত জন্ম নেবে এবং ইতিহাসের অগ্রগতি সম্ভব হবে। এই অগ্রগতির পথে রাষ্ট্র হচ্ছে একটি রেখা স্তর। হেগেল তাই লিখেছেন, 'The State is self-conscious ethical substance and self-knowing and self-actualizing ethical substance and a self-knowing and self-actualizing individual'.

অন্য এক স্থানে হেগেল লিখেছেন "The State is the march of God on earth"। হেগেলের মতে ইতিহাসের বিবর্তনের ভিতর World Spirit বা বিশ্ব আত্মা ক্রমাগত স্বাধীনতার পথে নিজেকে প্রকাশ করতে থাকে। ব্যক্তি সত্তাও চায় স্বাধীন হতে। একটি চরম অবস্থায় গিয়ে বাহ্যিক পটভূমিকায় পূর্ণ স্বাধীনতা প্রকাশ পায় এবং সেই স্তরে ব্যক্তি চরম স্বাধীনতা লাভ করে। ব্যক্তি চেতনার সাথে বাহ্যিক জগতের এবং বিশ্বসত্তার সম্পূর্ণ সমন্বয় ঘটে। এই স্তরটিকেই হেগেল বলেছেন State বা রাষ্ট্র। যতক্ষণ রাষ্ট্রের ভিতর নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করতে না পারছে ততক্ষণ ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাচ্ছে না এবং সে অসম্পূর্ণ থাকছে। সুতরাং ব্যক্তির একমাত্র কর্তব্য হলো রাষ্ট্রের প্রতি চরম আনুগত্য প্রকাশ করা। এইভাবে Absolutist রাষ্ট্রের ধারণার জন্ম দিলেন হেগেল।

নিম্নলিখিত চার্টের মাধ্যমে বোঝানো যায় কেন হেগেল রাষ্ট্রকে আত্মসচেতন নৈতিক সত্তা বলেছেন।

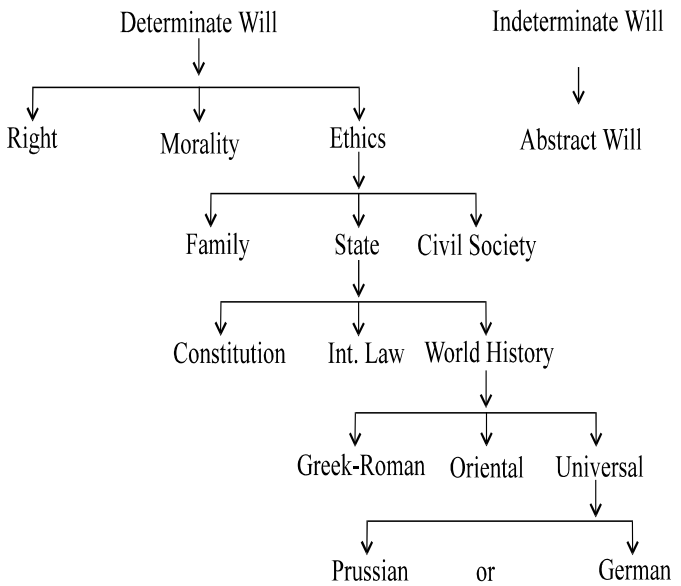

নীতিবোধ মানে Objective Reality যেমন আছে সেরকম থাকা। ধবংস হতে না দেওয়া। হেগেল Stateকে Ethical Substance বলেছেন, ফলে Ethics থেকে ভাগ করা এক Objective Reality-তে আসছি। Civil Society বলতে State ছাড়া অন্য সব সামাজিক সংগঠন বোঝায়। World History ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হেগেল বলেন অনেক উপাদান ছিল Greek Roman ইতিহাসে। এটা রাষ্ট্রের একটা রূপ। Oriental মানে প্রাচ্য-চীনা, ভারতীয় সভ্যতা। অন্যদিকে দেখা যায় Universal মানে জাতীয় রাষ্ট্র বা Nation, যেটা বর্তমানে গড়ে উঠেছে।

হেগেলের এই তত্ত্ব নানাভাবে পরবর্তীকালকে প্রভাবিত করেছে। মার্কস হেগেল থেকে দ্বন্দ্বমূলক ধারণাটি

গ্রহণ করেছেন এবং ইতিহাসের ভিতর সেই দ্বন্দ্ব বা Dialectics প্রয়োগ করেছেন। তবে হেগেল বিভিন্ন ধারণার মাধ্যমে বা Idea-র মধ্যে দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন। সেজন্য হেগেলের Dialectical Idealism মার্কসের হাতেই Dialectical Materialism-এ রূপান্তরিত হয়েছে।

অনেকে আবার হেগেলের এই তত্ত্বের বিরূপ সমালোচনা করেছেন। প্রথমত, হেগেলীয় তত্ত্বের ফলে জার্মান রাষ্ট্র দর্শনে Absolutist রাষ্ট্রের ধারণা জন্ম নিল। এর ফলে উদারনৈতিক গণতন্ত্র আঘাত পেল এবং ধীরে ধীরে জার্মানী নিজেই Totalitarian State-য়ে রূপান্তরিত হলো। বাস্তবিক পক্ষে অনেকে সমালোচকই নাৎসীবাদের জন্ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হেগেলকে তুলে ধরেন।

সমালোচকেরা আরও মনে করেন যে হেগেলের মধ্যে অনেক অসঙ্গতি রয়েছে। হেগেল ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলেছেন এবং সেইভাবেই তার দ্বন্দ্বমূলক আদর্শবাদ ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল তিনি ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের কাছে সম্পূর্ণ বিকিয়ে দিলেন। Laski তাই বলেছেন যে হেগেলের দর্শন হচ্ছে 'sheer non-sense'। আরেক জায়গায় Laski লিখেছেন যে হেগেলের ইতিহাস তত্ত্বের সিদ্ধান্ত হলো প্রথমে রাষ্ট্রের কাছে এবং পরে রাশিয়া ও জার্মানীরা সম্রাটের কাছে ব্যক্তিকে বিসর্জন দেওয়া। এই সমালোচনা সত্ত্বেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় হেগেলের তত্ত্ব রাষ্ট্রবিজ্ঞানে খুবই উল্লেখযোগ্য এবং প্রভাবশালী একটি বিষয়।

References :

1. Barker, E : (a) Greek Political Theory : Plato and His Predecessors
   (b) Political Thought of Plato and Aristotle.
   (c) Political Thought in England from Herbert Spencer to the Present Day.
2. Sabine, G.H. : A History of Political Theory.
3. Hacker : Political Theory
4. Mc Govern, W.M. : From Luther to Hitler
5. Mukhopadhyay, Amal : Western Political Thought.

Important dimensions from which Questions may be set :

1. Plato : (a) Methods
   (b) Idealist premises,
   (c) Pol. ideas,
   (d) Justice.
2. Aristotle : (a) Methods — difference from Plato,
   (b) Teleology — theory of State
   (c) Pol. ideas and their impact.
3. Machiavelli : (a) Method
   (b) Impact of Renaissance — both positive and negative,
   (c) State as power
   (d) Morality and Religion
   (e) Impact.
4. Hobbes : (a) Methods and Perspective
   (b) Fear-Psychosis — the reasons behind
   (c) First modern system-builder.
   (d) Pol. ideas— equality, social contract, obligation, law & liberty etc.
   (e) Individualism and Scientific Materialism — Impact.
5. Locke : (a) Methods and difference from Hobbes — the perspective of the

civil war and the Revolution of 1688.

(b) Pol. ideas — social contract, natural rights, right to resistance, property, organization of Govt. etc.

(c) Impact — the growth of liberalism.

6. Rousseau : (a) Methods

(b) Impact of own personality on Pol. ideas — Autobiography

(c) Pol. ideas-social contract, sovereignty, General Will, Paradox of Freedom, Organization of Govt. democracy etc.

(d) Confusions and Contradictions — Impact.

7. Mill : (a) Methods.

(b) Revision of Utilitarianism

(c) Pol. ideas — representative Govt. Women rights, liberty, economic ideas — Fabianism etc.

(d) A transitional thinker—Impact.

8. Hegel : (a) Methods

(b) Dialectics

(c) Freedom

(d) State

(e) Impact.

———————

Secend Paper

দ্বিতীয় পত্র

First Half

প্রথমার্ধ

পর্যায় - ১

উদারনীতিবাদ ও নয়া উদারনীতিবাদ
(Liberalism and Neo-Liberalism)

এই পর্যায়ে পাঁচটি এককের মাধ্যমে উদারনীতিবাদ কী, কীভাবে উদারনীতিবাদ গড়ে উঠেছে, উদারনীতিবাদের সঙ্কটের প্রত্যুত্তরে কীভাবে নয়া-উদারনীতিবাদ গড়ে উঠেছে এবং বার্কার, ল্যাস্কি, রলস্ কীভাবে উদারনীতিবাদের বিকাশ ঘটিয়েছেন — সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। দীর্ঘ কাল ধরে উদারনীতিবাদ পশ্চিমী দুনিয়ার একটি বিশিষ্ট মতবাদ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন, বাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ এবং রাষ্ট্রের সীমানাকে পিছনে গোটানোর প্রবনতা সাম্প্রতিককালে উদারনীতিবাদকে নতুনভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।

প্রথম এককটিতে "উদারনীতিবাদ ও তার সঙ্কট" সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এখানে উদারনীতিবাদের অর্থ, উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর উদারনীতিবাদে যে বিভিন্ন ধরনের সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে ; এই সঙ্কটগুলিই কার্যত নয়া-উদারনীতিবাদ বিকাশে সাহায্য করেছে।

দ্বিতীয় এককটির নামকরণ করা হয়েছে "নয়া-উদারনীতিবাদ ও তার বিভিন্ন দিক"। এই এককটিতে নয়া উদারনীতিবাদের মূল বক্তব্য ও বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। রাষ্ট্রের প্রতি আগ্রহের পুনর্নবীকরণ, বিশ্বায়ন ও রাষ্ট্রকে পিছনে গোটানোর তত্ত্বের সঙ্গে নয়া উদারনীতিবাদের সম্পর্কও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরিশেষে উদারনীতিবাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম এককে রাষ্ট্র, স্বাধীনতা, অধিকার ও ন্যায় সম্পর্কে যথাক্রমে বার্কার, ল্যাস্কি ও রলস্-এর তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

একক - ১

উদারনীতিবাদ ও তার সঙ্কট (Liberalism and its crisis)

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ উদারনীতিবাদের অর্থ

১.৩ উদারনীতিবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ

- ১.৩.১ প্রাক-আধুনিক উদারনীতিবাদী ধারণা
- ১.৩.২ প্রারম্ভিক আধুনিক যুগ ও উদারনীতিবাদ
- ১.৩.৩ উদ্ভাসনের যুগ ও উদারনীতিবাদ

১.৩.৪ ঊনবিংশ শতাব্দীর উদারনীতিক যুগ
১.৩.৫ বিংশ শতাব্দীর সংশোধনমূলক উদারনীতিবাদ
১.৪ বিংশ শতাব্দীর উদারনীতিবাদের সঙ্কট
১.৪.১ রাষ্ট্রতত্ত্বের সঙ্কট
১.৪.২ বৈধতার সঙ্কট
১.৪.৩ অর্থনৈতিক সঙ্কট
১.৪.৪ পরিকাঠামোগত সঙ্কট
১.৫ সারসংক্ষেপ
১.৬ প্রধান শব্দগুচ্ছ
১.৭ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা
১.৮ নমুনা-প্রশ্নাবলী
১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ : উদ্দেশ্য

রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে বিভিন্ন ধারার মধ্যে উদারনীতিবাদ হোল অন্যতম প্রধান ধারা। বিভিন্ন পর্যায়ে উদারনীতিবাদ বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। এই এককটির পাঠ শেষ করলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে জানা যাবে ঃ

* উদারনীতিবাদ কী ?
* উদারনীতিবাদের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়।
* বিংশ শতাব্দীর উদারনীতিবাদের সঙ্কট।
* সঙ্কটের সমাধানকল্পে নয়া-উদারনীতিবাদের সূচনা।

১.১ : প্রস্তাবনা

রাষ্ট্রতত্ত্বের জগতে উদারনীতিবাদী ধারার মতো আর কোনো ভাবধারা এত দীর্ঘকাল ধরে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়নি। যদিও ঐতিহাসিকগণ প্রাচীন যুগেও উদারনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর উপাদান লক্ষ করেছেন, কিন্তু সেগুলিকে আধুনিক উদারনীতিবাদী ধারার উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। বস্তুত, উদারনীতিবাদের উদ্ভব হয়েছে সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর আলোকপ্রাপ্তির যুগে ফরাসি দেশে, যখন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে নবোদিত বুর্জোয়া শ্রেণীর আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল। তাই উদারনীতিবাদকে বলা যায় ধনতন্ত্রের রাজনীতিক দর্শন। এই মতবাদটি আনুষ্ঠানিকভাবে 'উদারনীতিবাদ' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। কিন্তু উদারনীতিক চিন্তাধারার সামনে সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছিল সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা ও সাম্যবাদী রাষ্ট্রের উদ্ভব। এই প্রেক্ষিতে ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের কিছুটা সংশোধন করে নতুন উদারনীতিবাদ গড়ে ওঠে। কিন্তু ১৯৭০ দশকের শুরু থেকে রাষ্ট্রনীতিক দর্শনে ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের পুনরুত্থান ঘটে। সাম্প্রতিককালে বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে উদারনীতিবাদ নতুনভাবে গুরুত্ব লাভ করেছে। অনেকে উদারনীতিক চিন্তাদর্শনকে আধুনিক রাজনীতিক সংস্কৃতির যথাযথ প্রকাশ বলে মনে করেন।

[১] Liberalism may be defined "as an idea committed to freedom as a method and policy in government, as an organising principle in society and a way of life for the individual and the community." — Encyclopaedia Britannica.

১.২ : উদারনীতিবাদের অর্থ

উদারনীতিবাদের নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। শব্দগত বিচারে উদারনীতিবাদ বা 'লিবার‍্যালিজম্' (Liberalism) শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ 'লিবার' (Liber) থেকে। 'লিবার' শব্দটির অর্থ হোল স্বাধীন। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থে উদারনীতিবাদ হোল স্বাধীনতার মতবাদ। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা (Encyclopaedia Britannica) অনুসারে, উদারনীতিবাদ হোল এমন একটি ধারণা যা সরকারের কার্যপদ্ধতি ও নীতি হিসেবে, সমাজ সংগঠনের নীতি হিসেবে, এবং ব্যক্তি ও সমাজের একটি জীবনাদর্শ হিসেবে 'স্বাধীনতা'কে গ্রহণ করে।[১] সুতরাং উদারনীতিবাদের মূল বিষয় হোল স্বাধীনতা। অনেকে অন্যভাবে বলেছেন যে, উদারনীতিবাদ হোল এমন একটি স্বাধীন জীবনের কণ্ঠস্বর, যা ব্যক্তির চিন্তা, বিশ্বাস, মতপ্রকাশ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সর্বাধিক পরিমাণ স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়ায়। নেতিবাচক দিক থেকে উদারনীতিবাদ যে-কোন কর্তৃত্ববাদ, যে-কোন ধরনের স্বৈরতন্ত্রী, একনায়কতন্ত্রী কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে। সদর্থক ব্যাখ্যা অনুযায়ী, উদারনীতিবাদ হোল ব্যক্তি স্বাধীনতার নীতি বা মৌল গণতান্ত্রিক নীতি প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা।

সঙ্কীর্ণ ও ব্যাপক উভয় অর্থেই উদারনীতিবাদের প্রয়োগ দেখা যায়। সঙ্কীর্ণ অর্থে উদারনীতিবাদকে কেবল আর্থনীতিক ও রাজনীতিক গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। অর্থাৎ সঙ্কীর্ণ অর্থে উদারনীতিবাদ হোল এক ধরনের তত্ত্ব, যার দ্বারা দ্রব্যের উৎপাদন ও বন্টন এবং শাসকদের মনোনয়ন ও অপসারণ করার ব্যাপারে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। এই অর্থে উদারনীতিবাদ হোল রক্ষণশীলতা ও সমাজতন্ত্রের মধ্যবর্তী একটি অবস্থা। উদারনীতিবাদ সংস্কারের কথা বলে। এই দিক থেকে উদারনীতিবাদ রক্ষণশীলতার তুলনায় অগ্রসর একটি ধারণা। কিন্তু উদারনীতিক সংস্কার কখনোই সমাজ ও রাষ্ট্রের আমূল সংস্কারের কথা বলে না। এই দিক থেকে উদারনীতিবাদ সমাজতন্ত্রের তুলনায় অনগ্রসর একটি পর্যায়। কিন্তু ব্যাপক অর্থে উদারনীতিবাদকে গণতন্ত্রের সমার্থক বলে মনে করা হয়। এই অর্থে উদারনীতিবাদ নানাবিধ মূলগত পরিবর্তনের মধ্যে প্রকাশ পেতে থাকে। আধুনিক কল্যাণকামী রাষ্ট্রের পরিকল্পনার মধ্যে উদারনীতিবাদের এই ব্যাপক অর্থটি প্রতিভাত হয়েছে। বস্তুত, ব্যাপক অর্থে উদারনীতিবাদ হোল একটি মানসিক ধারণা যার দ্বারা মানুষের সঙ্গে মানুষের বৌদ্ধিক, নৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনীতিক সম্পর্ককে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় এবং তাদের মধ্যে অখণ্ডতা স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। উদারনীতিবাদের এই ব্যাপক অর্থটি সমগ্র পশ্চিমী সভ্যতার এক লোকায়ত অনাধ্যাত্মিক রূপ।

জি. ডব্লিউ. স্মিথ (G.W. Smith) বলেছেন যে, ব্যাপক অর্থে উদারনীতিবাদ হোল কয়েকটি ধারণা ও মূল্যবোধের সমষ্টি। এগুলি হোল ঃ ব্যক্তি স্বাধীনতা, সহিষ্ণুতা ও ব্যক্তিগত পছন্দ, এবং সীমাবদ্ধ শাসনব্যবস্থা ও আইনের শাসন।[১] এছাড়া, ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক থেকে বিচার করে, উদারনীতিবাদ রাষ্ট্রের বৈধকরণের উপাদান হিসেবে ব্যক্তিগত সম্মতির সঙ্গে জড়িত এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও পরিকল্পনার ঊর্ধ্বে ব্যক্তিগত পুঁজি ও বাজার প্রতিযোগিতাকে প্রাধান্য দেয়। এই সীমানার মধ্যে থেকেও উদারনীতিবাদের নীতিগুলির চিহ্নিতকরণ, তাদের যৌক্তিকতা এবং বাস্তব রাজনীতিক গুরুত্ব বিষয়ে উদারনীতিবাদীদের মধ্যে ব্যাপক মত-পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

১.৩ : উদারনীতিবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ

উদারনীতিবাদের প্রেক্ষাপট অনুধাবনের মাধ্যমেই তার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা সম্ভব হতে পারে। উদারনীতিবাদ একদিনে গড়ে ওঠেনি। যদিও উদারনীতিবাদের উৎপত্তির সময়কাল নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে, তবে একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, উদারনীতিবাদ সব সময়ে একই চেহারার থাকে নি। বিভিন্ন পর্যায়ে

[১] G.W. Smith (ed.), *Liberalism* : *Critical Concepts in Political Theory*, Routledge, London, 2002, Vol. I, P.1.

[২] John Gray, *Liberalism*, World View, Delhi, 1998, P.3

সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে উদারনীতিবাদ পরিবর্তিত রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত একটি অখণ্ড ধারা হিসেবে রাষ্ট্রতত্ত্বের জগতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে আছে। প্রাক্-আধুনিক যুগ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কালের নতুন উদারনীতিবাদ গড়ে ওঠার আগে পর্যন্ত বিভিন্ন চিন্তাবিদের দ্বারা উদারনীতিবাদ বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

১.৩.১ : প্রাক-আধুনিক উদারনীতিবাদী ধারণা

বেঞ্জামিন্ কনস্ট্যান্ট্ (Benjamin Constant) এর মতে, প্রাচীন যুগের স্বাধীনতার ধারণা আধুনিক যুগের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।[২] আধুনিক যুগের মানুষের কাছে স্বাধীনতা হোল নিয়ন্ত্রণের অনুপস্থিতির সংরক্ষিত ক্ষেত্র অথবা আইনের শাসনের অধীনে স্বাধীনতা। কিন্তু প্রাচীন যুগের ধারণায় স্বাধীনতা হোল সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত প্রণয়নে অংশগ্রহণের হকদারিত্ব, সমাজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি নয়। তবে গ্রে (Gray) বলেছেন যে, কনস্ট্যান্টের এই যুক্তি কিছুটা অতিরঞ্জিত। তাঁর মতে, উদারনীতিবাদের বীজ প্রাচীন গ্রীক চিন্তাধারার মধ্যেই নিহিত ছিল, তবে প্রাচীন গ্রীসের উদারনীতিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপাদানগুলি ছিল উদারনীতিবাদের প্রাক্-ঐতিহাসিক ধারণার অংশ বিশেষ, আধুনিক উদারনীতিক আন্দোলনের উপাদান নয়। গ্রে'র মতে প্রাচীন গ্রীসে বিশেষ করে গ্রীক সফিষ্টদের চিন্তাধারায়, উদারনীতিক ভাবধারার অস্তিত্ব ছিল।

সফিষ্টরা মানুষের সর্বজনীন সাম্যের নীতি প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। গ্লুকোঁ (Glaucon) সামাজিক চুক্তির তত্ত্ব গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর মতে, ন্যায় হোল চুক্তির ফল। সফিস্টদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্বাভাবিক দাসত্বের ধারণা প্রত্যাখ্যান করা। সরকারের এলিটীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও কাজকর্মের বিরুদ্ধে সফিস্টরা সর্বপ্রথম প্রতিবাদ করেছেন এবং তারা রাজনৈতিক সাম্যের কথা বলেছেন। প্রোটাগোরাস (Protagoras) অংশগ্রহণকারী গণতন্ত্রের তাত্ত্বিক ভিত্তি উপস্থাপিত করেছেন। পেরিক্লিস (Pericles) এর বক্তব্যও উদারনীতিক সাম্যবাদী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং পরবর্তীকালে উদারনীতিক ভাবধারার বিকাশে সাহায্য করেছিল। রোমান আইনতত্ত্বে ও রাষ্ট্রচিন্তায় ব্যক্তিস্বাধীনতা স্থান পাওয়ায় উদারনীতিবাদের স্ফুরণ ঘটেছিল। হায়েক (Hayek) সিসেরো (Cicero) কে আধুনিক উদারনীতিবাদের অগ্রদূত বলে অভিহিত করেছেন। সিসেরো বলেছেন যে নাগরিকরা আইন মেনে চলে স্বাধীন হ'বার জন্য।[১] বস্তুত, প্রাচীন গ্রীসের মতো প্রাচীন রোমেও উদারনীতিক চিন্তাধারার প্রাক্-ঐতিহাসিক উপাদান লক্ষ করা যায়।

১.৩.২ : প্রারম্ভিক আধুনিক যুগ ও উদারনীতিবাদ

ইউরোপীয় নবজাগরণের মধ্য দিয়ে যুক্তিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং মানবতাবাদের আদর্শ প্রচারিত হয়েছে। এই মানবতাবাদের অঙ্গীভূত ধারণা হিসেবে স্বাধীনতার নীতিও সমর্থিত হয়েছে। তাই দেখা যায় যে, ষোড়শ শতকে ধর্মীয় কর্তৃত্ববাদবিরোধী চরম প্রতিবাদ প্রকাশ পেয়েছে সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে। এইভাবে নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলনও উদারনীতিবাদের উদ্ভবে সাহায্য করেছিল। তবে গ্রে'র মতে, সপ্তদশ শতাব্দীতেই আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রকাশ ঘটে, যার থেকে উদারনীতিবাদী ধারা গড়ে উঠেছে। এই শতকে ইংল্যাণ্ডে পিউরিটান বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাজকীয় কর্তৃত্ববাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উপস্থিত হয়েছিল উদারনীতি বা স্বাধীনতার নীতি। প্রাকৃতিক অধিকারের ধারণা উপস্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করে পিউরিটান বিপ্লব উদারনীতির প্রাথমিক ভিত্তি প্রস্তুত করেছিল বলা যেতে পারে।

সাধারণভাবে লককেই আধুনিক উদারনীতিবাদের জনক বলা হয় ; কিন্তু সাম্প্রতিককালের ব্যাখ্যায় হবস্কেও

[১] John Gray, *Liberalism*, P.7

[২] Ibid. P.10

উদারনীতিবাদের অন্যতম প্রবক্তা বলে অভিহিত করা হয়েছে। জন গ্রে বলেছেন যে, উদারনীতিবাদের প্রতি হবসের আকর্ষণ লক্ষ করা যায়।[২] উদারনীতিবাদের প্রতি হবসের ঝোঁক তিন দিক থেকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। প্রথমত:, তিনি ছিলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। অ্যারিস্টটলের পর লক্ষ্যবাদের নীতিকে পরিহার করে তিনি ব্যক্তির প্রাধান্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন। সংজ্ঞাবাদ (nominalism) এর আলোকে বাস্তবতাকে তিনি বিচার করেছেন ব্যক্তিকে দিয়ে। দ্বিতীয়ত, প্রকৃতির রাজ্যের যে-চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন তাতে সকল মানুষের সমান স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। হবসের মতে, প্রকৃতির রাজ্যে সকল মানুষ শরীর ও মনের দিক থেকে সমান ছিল। তৃতীয়ত:, রাজনীতিক কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে বংশগত প্রাধান্যকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি। স্যাবাইনের মতে, হবসের চুড়ান্ত ক্ষমতার তত্ত্ব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে আবৃত। ব্যক্তির স্বার্থরক্ষার নিমিত্তই তিনি চুড়ান্ত ক্ষমতা সম্পন্ন কর্তৃত্বের সমর্থন করেছেন। হবসের তত্ত্ব অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদনের পিছনে প্রতিটি ব্যক্তির সম্মতি ছিল। পুরসমাজগঠনের পিছনেও ব্যক্তির সম্মতিই প্রধান ছিল। লিও স্ট্রাউস (Leo Straus) বলেছেন যে, যদি উদারনীতিবাদের মূল কথা হয়— মানুষের অধিকার রক্ষা করাই রাষ্ট্রের কাজ, তাহলে হবসকেই উদারনীতিবাদের প্রতিষ্ঠাতা বলা যেতে পারে। মাইকেল ওকসট্ (Michael Oakshott) এবং সি. বি. ম্যাকফারসন (C.B. Macpherson) ও সহমত পোষণ করে বলেছেন যে, হবস ছিলেন আধুনিক উদারনীতিবাদের প্রথম এবং অন্যতম প্রবক্তা।

জন গ্রে'র মতে, হবসের তুলনায় স্পিনোজা (Spinoza) [১৬৩২-১৬৭৭] উদারনীতিক চিন্তাধারার আরও নিকটবর্তী ছিলেন। হবসের মতো স্পিনোজাও মনে করতেন যে, প্রতিটি ব্যক্তির অধিকার আছে নিজেকে রক্ষা করার। তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, আত্মরক্ষাকারী ব্যক্তিদের মিথস্ক্রিয়ার প্রেক্ষিতেই মানবসমাজ বিশ্লেষণ করা যায়। কিন্তু স্পিনোজা ব্যক্তিস্বাধীনতাকে নেতিবাচক দিক থেকে দেখেন নি। তাঁর মতে, সর্ব্বোত্তম জীবনের জন্য প্রয়োজন স্বাধীনতা। হবসের কাছে কর্তৃত্ববাদী সরকারই হোল ভাল। কিন্তু স্পিনোজার মতে, গণতন্ত্রেই উদারনীতিক স্বাধীনতা সুনিশ্চিত হয়। এইভাবে স্বাধীনতাকে রাষ্ট্রচিন্তার মূল বিষয় হিসেবে গণ্য করায় হবসের তুলনায় স্পিনোজাকে উদারনীতিবাদের অধিকতর নিকটবর্তী বলে মনে করা হয়।[১]

আধুনিক যুগের প্রারম্ভে উদারনীতিবাদের বিকাশে জন লকের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ল্যাস্কি (Laski) মনে করেন যে, ইউরোপীয় উদারনীতিবাদের জন্ম লকের আমল থেকেই। লকের "সেকেণ্ড ট্রিটিজ অন্ সিভিল গভর্ণমেন্ট" (Second Treatise on Civil Government) বইতে উদারনীতিক দৃষ্টিভঙ্গীর মূল উপাদানগুলি প্রথম সুস্পষ্টভাবে উদারনীতিক চিন্তাধারার রূপ ধারণ করে এবং এক শক্তিশালী রাজনীতিক আন্দোলন রূপে প্রকাশ পায়। ইংল্যাণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব, সংসদীয় সরকারের উদ্ভব, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির তাত্ত্বিক রূপ প্রকাশ পেয়েছিল লকের চিন্তাধারায়। উদারনীতিবাদের যে মূল কথা — রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সঙ্গে ব্যক্তি স্বাধীনতার সমন্বয় সাধন — তা লকের তত্ত্বের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে। লকের মতে, রাষ্ট্র একটি শক্তিশালী ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু রাষ্ট্রের দায়িত্ব হোল জনগণের তিনটি অহস্তান্তরযোগ্য অধিকার — জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার ও সম্পত্তির অধিকার — রক্ষার ব্যবস্থা করা। রাষ্ট্র যদি এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তাহলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জনগণের বিরোধিতার অধিকার থাকবে। দ্বিতীয়ত, লক্ যে পুরসমাজের ধারণা উপস্থাপিত করেছেন, তা হোল স্বাধীন মানুষের সমাজ, সেই সমাজে থাকবে আইনের অনুশাসন। স্বাধীনতা হোল মানুষের জন্মগত অধিকার। এটি এমনই প্রাকৃতিক অধিকার, যাকে কোনভাবেই খর্ব করা যায় না। তৃতীয়ত, পুরসমাজের গোড়াপত্তন ও শাসন সম্পর্কে লক্ যে সব বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন, সেগুলির মধ্যে উদারনীতিবাদের মূল কথাই নিহিত আছে। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মূল ভিত্তি হিসেবে জনসাধারণের স্বত:স্ফূর্ত সম্মতিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তাঁর তত্ত্বে। লকের উদারনীতিবাদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হোল ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সংযোগ সাধন। বস্তুত, লক্কেই ইউরোপীয় উদারনীতিবাদের জনক রূপে অভিহিত করা যেতে পারে।

১.৩.৩ : উদ্ভাসনের যুগ ও উদারনীতিবাদ

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় উদ্ভাসন (enlightenment) এর যুগ উদারনীতিবাদের বিকাশে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। এই যুগে ফ্রান্স, স্কটল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড এবং জার্মানীতে কয়েকজন লেখক, মনীষী, দার্শনিক এবং সমাজতাত্ত্বিক তাঁদের মননশীল চিন্তার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় নিরিখের পরিবর্তে যুক্তির দ্বারা সমাজ ও মানুষের উন্নতির সম্ভাবনা পর্যালোচনা করেছিলেন। অন্ধ বিশ্বাস ও প্রচলিত ধারণার পরিবর্তে যুক্তির আলো দিয়ে মানব-সমাজের যথার্থ প্রকৃতি উন্মোচন করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। বস্তুত এই যুগটি ছিল মানবতাবাদের পূজারী। এই যুগের চিন্তাবিদদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ফ্রান্সের মঁতেস্ক্যু (Montesquien), কঁদসে (Condorcet) এবং স্কটল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডের অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith), ডেভিড হিউম (David Hume) প্রভৃতি। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, প্রত্যেক মানুষের চিন্তা ও মনের ভাব প্রকাশ করার স্বাধীনতা ও অধিকার আছে। কোন সরকার বা প্রতিষ্ঠান নাগরিককে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। এই যুগের দার্শনিকরা ছিলেন স্বৈরতন্ত্রের বিরোধী এবং সীমিত সরকারের পূজারী।

ব্যক্তির আর্থনীতিক কার্যাবলীর প্রেক্ষিতে ব্যক্তিকে বিশ্লেষণ করেছেন অ্যাডাম স্মিথ। ডেভিড রিকার্ডো ও রবার্ট ম্যালথাস কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ব্যক্তিকে যখন রাজনীতিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত, স্বনিয়ন্ত্রিত বাজারে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া হয়, তখনই সে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করতে সমর্থ হয়। বস্তুত, অ্যাডাম স্মিথ যে ব্যবস্থা উপস্থাপিত করেছেন তা ছিল পদ্ধতিগত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে যে-কোন সামাজিক ব্যাখ্যার লক্ষ্যস্থল হোল ব্যক্তি। এই দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে স্মিথ তাঁর 'ওয়েলথ্ অব্ নেশনস্' (Wealth of Nations) গ্রন্থে বলেছেন যে, মানব সমাজ বিভিন্ন পর্যায়ের মাধ্যমে বিকাশ লাভ ক'রে বাণিজ্যিক বা স্বাধীন কর্মোদ্যোগ ব্যবস্থায় উপনীত হয়। দ্বিতীয়ত:, আর্থনীতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন রাজনীতিক কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সমান তালে চলে, যার ফলে স্বাধীন বাণিজ্যিক ব্যবস্থা সাংবিধানিক ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিফলিত হয়, যেখানে পৌর এবং রাজনীতিক স্বাধীনতা প্রদত্ত হয়ে থাকে। তৃতীয়ত:, স্মিথের মতে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যক্তিগত কার্যকলাপের ফলশ্রুতি। এইভাবে দেখা যায় যে, স্মিথের ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হোল যে-কোন সামাজিক ব্যাখ্যার লক্ষ্য-স্থল।[২]

১.৩.৪ : ঊনবিংশ শতাব্দীর উদারনীতিক যুগ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে বিশেষত: ইংল্যাণ্ডে, উদারনীতিক তত্ত্ব ও প্রয়োগ — উভয়েরই স্বর্ণযুগ পরিলক্ষিত হয়। শিল্প বিপ্লবের ফলে ব্যক্তিগত মালিকানা ও পুঁজির দ্রুত বিকাশ ঘটেছিল। শিল্পোদ্যোগীরা নিজেদের আর্থিক প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপকে ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে এনেছিলেন। এই সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদারনীতিক আন্দোলন রাজনীতিক আন্দোলন রূপে প্রকাশ পেয়েছিল। ইংল্যাণ্ডে ১৮৩২ সালের সংস্কার আইনসহ কয়েকটি আইন এই সময়ের উদারনীতিক আন্দোলনের শক্তি প্রতিফলিত করেছিল। উদারনীতিক আন্দোলনের আর্থনীতিকভাবে সংগঠিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রূপকে রাজনীতিক দিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন বেন্থাম (Bentham), জেমস্ মিল (James Mill) , জে. এস. মিল (J.S. Mill) ও স্পেন্সার (Spencer)। তাঁরা প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত জীবনে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেছেন, কারণ তাঁদের মতে, ব্যক্তি অনিয়ন্ত্রিত অবস্থাতেই তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কল্যাণ সাধনে সমর্থ

[১] John Gray, *Liberalism*, P.12

[২] John Gray, *Liberalism*, P.25

হতে পারে। রাষ্ট্রের কাজ হোল কেবল নেতিবাচক, অর্থাৎ রক্ষণাবেক্ষণ প্রদান করা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সরকারী হস্তক্ষেপ ও কার্যকলাপের ক্ষেত্র আংশিকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তত্ত্বগত দিক থেকেও ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে সনাতনী ইংরেজ উদারনীতিবাদের প্রথম ভাঙন দেখা দিয়েছিল বেন্থামের আমল থেকেই।[১] বেন্থাম ছিলেন অবাধ বাণিজ্যনীতির একজন অন্যতম সমর্থক, কিন্তু তাঁর হিতবাদ ও রাষ্ট্রনীতিক দর্শন পরবর্তীকালের সংশোধনমূলক উদারনীতিবাদের রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপনীতির পথপ্রদর্শক রূপে কাজ করেছে। উদারনীতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতি জন স্টুয়ার্ট মিলের ঝোঁকের ফলে তাঁকে কিছুটা সনাতনী উদারনীতিবাদের সমর্থক বলে মনে হলেও, বেন্থামীয় হিতবাদের সংশোধন করে এবং সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনাকে সমর্থন করে সনাতনী উদারনীতিবাদী ধারা থেকে অনেকটা সরে এসেছেন তিনি।

উদারনীতিবাদের বিকাশে জে. এস. মিল এক নতুন মোড় সৃষ্টি করেছেন। যে মিল ছিলেন উদারনীতিবাদের অন্যতম প্রবক্তা, তিনিও শেষ জীবনে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপকে অপরিহার্য বলে মনে করেছেন। শিল্প বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে উদারনীতিবাদ ও পুঁজিবাদ পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গড়ে উঠেছিল এবং তা জনগণের কল্যাণ সাধনে সক্ষম বলে প্রচার করা হয়েছিল। কিন্তু ঊনিশ শতকের শেষার্ধে দেখা গিয়েছিল যে, উদারনীতিবাদ ও পুঁজিবাদ দুইই চরম সঙ্কটের সম্মুখীন। আর্থনীতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও অবাধ বাণিজ্য নীতি সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনে ব্যর্থ বলে অনেক চিন্তাবিদ মনে করেছিলেন। জে. এস. মিল প্রমুখ চিন্তাবিদ উপলব্ধি করেছিলেন যে, উদারনীতিক পুঁজিবাদ বা আর্থনীতিক উদারনীতিবাদ এবং এর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দর্শন অপরিবর্তিত আকারে টিকে থাকতে পারে না। তাই জে. এস. মিল হিতবাদ ও ব্যক্তি স্বাধীনতার ধারণা সংশোধন করে এবং কোঁত (Comte) এর সমাজদর্শন গ্রহণ করে উদারনীতিবাদের পরিবর্তনের সূচনা করেছেন। স্যাবাইনের মতে, পুরানো উদারনীতিবাদী চিন্তাবিদগণ উপলব্ধি করতে পারেন নি যে, উদারনীতিক সরকারের পিছনে উদারনীতিক সমাজকে অবশ্যই থাকতে হবে। মিলই প্রথম তা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।[২] মিলের মতে, মুক্ত সমাজে একটি উদারনীতিক রাষ্ট্রের কাজ ইতিবাচক — নেতিবাচক নয়। বস্তুত:, মিল সমকালীন উদারনীতিবাদের সঙ্কটের প্রেক্ষিতে ব্যক্তি স্বাধীনতার সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্কজনিত সমস্যা বিশ্লেষণ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, যা পরবর্তীকালের উদারনীতিবাদীগণ স্বাধীনতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পুনর্বিবেচনা করেছেন।

মিলের এক দশক পরে টি. এইচ. গ্রীণ (T.H. Green) মিলের আধুনিকীকৃত উদারনীতিবাদকে ভাববাদী দৃষ্টিভীর সাহায্যে সংশোধন করে আরও সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করেছেন। ব্যক্তিকে সামাজিক প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করে সমষ্টিবাদী উদারনীতিবাদ (Collective liberalism) এর তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন গ্রীন। হেগেলীয় উদারবাদী হিসেবে তিনি ধ্রুপদী উদারনীতবাদের নেতিবাচক স্বাধীনতাকে বর্জন করে ইতিবাচক স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। চুক্তিগত স্বাধীনতা (Contractual liberty) কে সীমাবদ্ধ করে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও কার্যাবলীর পরিধি বাড়ানোর পক্ষে যুক্তি উপস্থাপিত করেছিলেন তিনি। গ্রীণের মতে, আত্মসচেতন প্রাণী হিসেবে ব্যক্তি তার সত্তার পূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারে একমাত্র সামাজিক কাঠামোর মধ্যে। তিনি মানুষের সামাজিক সত্তা (Social self) এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সামাজিক কাঠামোর শর্তগুলি রাষ্ট্রের মধ্যেই পূরণ হতে পারে। তাই গ্রীন মনে করেছেন যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী নয়, পরিপূরক।

১.৩.৫ : বিংশ শতাব্দীর নতুন সংশোধনমূলক উদারনীতিবাদ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তা তত্ত্ব ও বাস্তবে পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের সঙ্কট ঘনীভূত হয়েছিল।

[১] John Gray, *Liberalism*, P.28

[২] Sabine and Thorson, *A History of Political Theory*, P.642

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ উদারনীতিক ব্যবস্থার ওপর তীব্র আঘাত হেনেছিল এবং যুদ্ধ ও স্বৈরাচারিতার পর্বের সূচনা করেছিল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলির মধ্যে উদারনীতিবাদের উপাদান বিলুপ্তপ্রায় হয়েছিল। বিশ্বযুদ্ধ, আর্থনৈতিক মন্দা ও সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বের আধিপত্যের দ্বারা উদারনীতিবাদ পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিল। এই প্রেক্ষিতে গ্রীনের দর্শনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ইংরেজ অর্থনীতিবিদ জে. এম. কেইনস্ (J.M. Keynes), উইলিয়াম বেভারিজ (William Beveridge) ও অন্যান্য পরিবর্তনকামী উদারনীতিবাদী উদারনীতিবাদের সংশোধন করতে এবং একে বাস্তবমুখী করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কেইনস্ তাঁর 'দ্য এণ্ড অব্ লেসা ফেয়া' (The End of Laissez-Faire) [১৯২৬] গ্রন্থে আর্থনীতিক সঙ্কটের মোকাবিলা করার জন্য অবাধ বাণিজ্য নীতির অবসানের সুপারিশ করেছেন। তাঁর রচিত 'দ্য জেনারেল থিওরি' (*The General Theory*) [১৯৩০] এবং অন্যান্য গ্রন্থে তিনি বলেছেন যে, জনকল্যাণের স্বার্থে সরকারী ভূমিকার সম্প্রসারণ অপরিহার্য। কেইনস্, বেভারিজ প্রমুখ চিন্তাবিদ উদারনীতিবাদের ক্ষেত্রকে পরিবর্ধন করে আর্থনীতিক নিরাপত্তাকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার অন্যতম শর্ত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আর্থনীতিক নিরাপত্তার স্বার্থে উদারনীতিক আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের আদর্শ উপস্থাপিত করেছেন তাঁরা। এইভাবে জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের ভিত্তির ওপর উদারনীতিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র, মিশ্র অর্থনীতি ও নিয়োগ বৃদ্ধির আর্থনীতিক কৌশল প্রাক-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্বে উদারনীতিবাদের ভিত্তিতে পরিণত হয়েছিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের চিন্তাবিদগণ পুরানো পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও নতুন সমাজতান্ত্রিক আদর্শের মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। হব্হাউস (Hobhouse) এর 'লিবারেলিজম' (Liberalism) [১৯১১] গ্রন্থে মিল ও গ্রীনের দর্শনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে এবং সংশোধনমূলক উদারনীতিবাদের তত্ত্ব উপস্থাপিত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বন্টনমূলক ন্যায় ও সামাজিক সমন্বয়ের আদর্শ উপস্থাপিত করা হয়েছে। এছাড়া বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বার্কার (Barker), লিণ্ডসে (Lindsay), ম্যাকাইভার (MacIver), ল্যাস্কি (Laski) প্রমুখ চিন্তাবিদও গ্রীনের তত্ত্বের দ্বারা অনেকাংশে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁরা ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সংগঠিত রাষ্ট্রনীতিক কর্তৃত্বের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, কিছুটা আর্থনীতিক সাম্য ছাড়া সম-স্বাধীনতা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে না। তাঁরা গোষ্ঠী স্বাতন্ত্র্যের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁদের মতে, গোষ্ঠী স্বাতন্ত্র্যের মাধ্যমেই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়ে থাকে।

অনুশীলনী —১

* সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী *

[প্রতিটি ৫ নম্বর করে]

১। উদারনীতিবাদ বলতে কী বোঝ ?

২। ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ কী ?

৩। উদারনীতিবাদের আধুনিক রূপ বলতে কী বোঝ ?

৪। ঊনবিংশ শতাব্দীকে উদারনীতির স্বর্ণযুগ বলা হয় কেন ?

৫। সংশোধনমূলক উদারনীতিবাদ কী ?

---

১ John Gray, *Liberalism*, P.36

২ Om Bakshi, *The Crisis of Political Theory, An Inquiry into contemporary thought,* OUP, Delhi. P.44

*** রচনাত্মক প্রশ্ন *** [প্রতিটি ১৫ নম্বর করে]

১। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক পর্ব পর্যন্ত ইউরোপীয় উদারনীতিবাদের বিকাশের ধারা পর্যালোচনা কর।

১.৪ : বিংশ শতাব্দীর উদারনীতিবাদের সঙ্কট

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলশ্রুতি হিসেবে সর্বত্রই রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কার্যাবলী বৃদ্ধি পেয়েছিল। আর্থনীতিক বিকাশের প্রেক্ষিতে কেইনসীয় নীতি ও বেভারিজ পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। গ্রে'র মতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ আহত হয়েছিল, কিন্তু, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।[১] সক্রিয় রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষে ঐকমত্য গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে একদিকে ফ্যাসিবাদী, নাৎসীবাদী ইত্যাদি সামগ্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভব অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রাধান্য বিস্তার ও শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠিত প্রকাশের ফলে উদারনীতিবাদ আরও সঙ্কটের মধ্যে পড়েছিল। জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের মাধ্যমে একদিকে রাজনীতিক ক্ষমতার সম্প্রসারণ হয়, আর অন্যদিকে আর্থনীতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটে। এই দুটি পরস্পর বিরোধী ঘটনার ফলে উদারনীতিক গণতন্ত্রের সঙ্কট অনিবার্য হয়ে ওঠে। বিংশ শতাব্দীর উদারনীতিবাদের এই সঙ্কটকে বিভিন্ন দিক থেকে পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

১.৪.১ : রাষ্ট্রতত্ত্বের সঙ্কট

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই মনেভাব গড়ে তোলা হয়েছিল যে, জনকল্যাণকামী নীতির মাধ্যমে পাশ্চাত্য সমাজের সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে ; বিদ্যমান উদারনীতিক গণতান্ত্রিক সমাজই কার্যকরী ভালো সমাজ। বেল (Bell), লিপসেট (Lipset), এরন (Aron), প্রমুখ চিন্তাবিদ মনে করেছেন যে, পাশ্চাত্যে রাষ্ট্রতত্ত্ব বিকাশের আর কোন প্রয়োজন ছিল না। সমকালীন সমাজে মতাদর্শগত ভিত্তিতে বিশ্লেষণের জন্য আর বিশেষ কোন বিচার্য বিষয় ছিল না। এই প্রেক্ষিতে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 'মতাদর্শের অবসান' (End of ideology) এর তত্ত্ব গড়ে ওঠে।[২] লিপসেট প্রমুখ চিন্তাবিদের মতে, সমকালীন পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে বাম ও দক্ষিণের মধ্যে গতানুগতিক পার্থক্য লোপ পেয়েছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পরিবর্ধন আর গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার পরিপন্থী নয়। লিপসেট বলেছেন যে, পাশ্চাত্য গণতন্ত্র 'উত্তর রাজনীতি' (Post politics) এর পর্যায়ে পৌঁছেছে। উদারনীতিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে আর কোন পার্থক্য নেই বলে মনে করা হয়। তাত্ত্বিক ভিত্তিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনকে অযৌক্তিক বলে দাবী করা হতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পরিবর্তনকে প্রগতির প্রতীক বলে মনে করা হোত। কিন্তু সমকালীন পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে সামগ্রিক পরিবর্তনকে ভয় ও সন্দেহের চোখে দেখা হতে থাকে। সাম্প্রতিককালের চিন্তাবিদগণ তাই বড়ো ধরনের সামাজিক ও রাজনীতিক সমস্যা থেকে সরে গিয়ে ছোট সমস্যা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকছেন। রাজনীতি থেকে নৈতিক বিষয়কে বাদ দেওয়ার প্রবণতা গড়ে ওঠে। এ সবের পরিণতি হোল রাজনীতিক তত্ত্বের অবনমন (deline of political theory)।

ডেভিড ইস্টন (David Easton), কোব্বান (Cobban), জার্মিনো (Germino), প্রমুখ চিন্তাবিদ এই অভিমত পোষণ করেছেন যে, দর্শন কেন্দ্রিক সনাতন রাজনীতিক তত্ত্ব বর্তমানে অতি দ্রুত গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছে। আবার লাসলেট (Laslett), ডাল (Dahl), প্রমুখ চিন্তাবিদের মতে, ইতিমধ্যেই রাজনীতিক তত্ত্বের মৃত্যু ঘটেছে। অনেকে মনে করেছেন যে, উদারনীতিক রাজনীতিক তত্ত্ব দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। রাজনীতিক তত্ত্বের অবনমনের মূল কারণ

[১] Desmond S. King, *The New Right, Politics, Markets and Citizenship*, The Dorsey Press, Chicago, 1987 P.63

[২] Ibid. P.63

হিসেবে অনেকে 'নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ' (moral relativism) কে চিহ্নিত করেছেন। এরূপ আপেক্ষিকতাবাদের প্রধান লক্ষ্য হোল রাজনীতিক ঘটনার বিশ্লেষণ থেকে মূল্যবোধকে পরিহার করা। নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদীরা রাজনীতিক বিশ্লেষণকে সম্পূর্ণভাবে মূল্যমান নিরপেক্ষ করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন ; অভিজ্ঞতাবাদী বিশ্লেষণ থেকে রাজনীতিক মূল্যবোধকে বিসর্জন দেবার প্রবণতা গড়ে ওঠে। মরগ্যানথাউ (Morganthan) প্রমুখ লেখক ক্ষমতার নিরিখে রাষ্ট্রকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন এবং রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে নৈতিক মূল্যবোধকে নির্বাসিত করেছেন। সমকালীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে উদ্দেশ্যহীনতা লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সনাতন রাজনীতিক চিন্তাবিদগণ বাস্তব উদ্দেশ্যের কথা মনে রেখে এবং বাস্তব রাজনীতিক আচরণকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে তাঁদের লেখনী ধারণ করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে সেরূপ বিশেষ কোন উদ্দেশ্য না থাকায় তাঁরা রাজনীতিক ঘটনাবলীকে মূল্যমান-নিরপেক্ষভাবে বিচার বিশ্লেষণ করার পক্ষপাতী। আর তা করতে গিয়ে, তাঁরা কার্যত: ইতিহাস-সর্বস্ব (historicist) হয়ে পড়েছেন। তাই কোব্বান বলেছেন যে, বর্তমানে রাজনীতিক দর্শনের মৃত্যু ঘটেছে এবং যৌক্তিক দৃষ্টবাদী (logical positivists), ও তাঁদের উত্তরসূরিরা তাকে হত্যা করেছে।

রাজনীতিক দর্শনের এই ধ্বংস সাধন উদারনীতিক গণতন্ত্রের সঙ্কটকে তীব্র করে তুলেছিল। জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের প্রভাবে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর অপ্রতিরোধ্য সম্প্রসারণ, সমাজের সর্বপ্রকার কাজকর্মের ওপর আমলাতন্ত্রের ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ রাজনীতিক তত্ত্বের অবনমনে সাহায্য করেছে। এসবের ফলশ্রুতি হিসেবে উদারনীতিক গণতন্ত্রের তত্ত্ব এক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। মূল্যমান-নিরপেক্ষ রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে উদারনীতিক গণতান্ত্রিক নীতির সমর্থনে তত্ত্ব গড়ে তোলা কঠিন হয়ে পড়ে। রাজনীতিক দর্শনের মৃত্যুর ফলে বলশেভিকবাদ, ফ্যাসিবাদ প্রভৃতিকে নিন্দা করা যেমন কঠিন হয়, তেমনি উদারনীতিক গণতন্ত্রের মূল্যবোধের যৌক্তিকতা প্রমাণ করাও দুরূহ হয়ে ওঠে। এই প্রেক্ষিতে রাজনীতিক দর্শনের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল — রাজনীতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের জন্য নয়, উদারনীতিক গণতন্ত্রকে সমর্থন করার জন্য। উদারনীতিক গণতন্ত্রের মূল্যবোধগুলির পুনরুজ্জীবনের জন্য নতুন উদারনীতিবাদী তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন বিভিন্ন চিন্তাবিদ। বার্লিন (Berlin), রলস্ (Rawls) প্রমুখ তাত্ত্বিক এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। বিগত তিন দশক ধরে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধিক প্রচেষ্টা হিসেবে উদারনীতিক রাজনীতিক তত্ত্বের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে।

১.৪.২ : বৈধতার সঙ্কট

আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে রাজনীতিক তত্ত্বেরও পরিবর্তন হয়ে থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটার সাথে সাথে উদারনীতিক গণতন্ত্রের ধ্যান-ধারণার বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এর ফলে আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিক অবস্থা এবং রাজনীতিক তত্ত্বের মধ্যে ফাঁক থেকে যায়। তাই কেইনসীয় জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রতত্ত্ব উদারনীতিক গণতন্ত্রের সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে কেইনসীয় ঐকমত্য ম্লান হয়ে পড়েছিল।[১] উদারনীতিবাদের পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। ১৯৭০র দশকে কেইনসীয় ঐকমত্য দু'ধরণের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল ঃ (১) মাত্রাতিরিক্ত রাজনীতিক বোঝা (Political overload) ; (২) কেইনসীয় আর্থনীতিক সমস্যা।

রাজনীতিক বোঝা দু'দিক থেকে গড়ে উঠেছে। প্রথমত:, আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পরিণতি হিসেবে অথবা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংরক্ষণের ফলশ্রুতি হিসেবে শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্য অতিমাত্রায় বেড়ে গেছে। দ্বিতীয়ত:, এই বর্ধিত কার্যাবলী বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সরকারে যথোপযুক্ত সম্পদের অভাব দেখা দিয়েছে। ১৯৪৫

[১] সামির আমিন, 'বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক অর্থনীতি', অমিয় কুমার বাগচী সম্পাদিত 'বিশ্বায়ন : ভাবনা-দুর্ভাবনা, দ্বিতীয় খণ্ড। ন্যাশান্যাল বুক এজেন্সি, ২০০২, কলকাতা, পৃষ্ঠা, ৫৪-৫৫।

এর পরবর্তী রাজনীতিক ব্যবস্থার বিকাশের ফলশ্রুতি হিসেবেই এই রাজনীতিক বোঝা সংক্রান্ত সমস্যা গড়ে উঠেছে। রোজ (Rose) এবং পিটারস্ (peters) এই অবস্থাকে 'রাজনীতিক দেউলিয়াপনা' (Political bankruptcy) বলে চিহ্নিত করেছেন।[২] রাজনীতিক অর্থনীতিতে মাত্রাতিরিক্ত বোঝা দেখা দেয় যখন সরকারী নীতির ব্যয়ের তুলনায় জাতীয় উৎপাদন খুব ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং সরকারী ও বেসরকারী দাবী পূরণের জন্য অর্থের অভাব পরিলক্ষিত হয়। জাতীয় আয় অপেক্ষা জাতীয় ব্যয় অনেক বেশী বৃদ্ধি পায়। জনকল্যাণমূলক কাজের বৃদ্ধি রাষ্ট্রকে অতি ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। অনেকে রাজনীতিক বোঝা সংক্রান্ত সমস্যার উৎস হিসেবে মুদ্রাস্ফীতি ও একচেটিয়া চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির আচরণ ও কার্যাবলীকে দায়ী করেছেন। বিভিন্ন চিন্তাবিদ এই বোঝা সংক্রান্ত সমস্যাকে শাসনব্যবস্থার প্রশাসন যোগ্যতার সমস্যা হিসেবে দেখেছেন। তাঁরা মনে করেছেন যে, উদারনীতিক রাষ্ট্র তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। এর ফলে রাজনীতিক আস্থা হ্রাস পাচ্ছে। সরকারী কার্যাবলী জনসমর্থন ও বৈধতা হারাচ্ছে। মুদ্রাস্ফীতি-তাড়িত সমাজে সরকারী হস্তক্ষেপ ও পরিকল্পিত অর্থনীতিতে রাজনীতিক প্রাধান্যকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে। হাবেরমাস (Habermas) প্রমুখ নয়া মার্কসবাদী চিন্তাবিদ উদারনীতিক সমাজের অন্যতম সমস্যা হিসেবে বৈধতার সঙ্কটকে তুলে ধরেছেন। তাঁদের মতে, বর্ধিত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তা ও সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। রাষ্ট্রের বৈধতার অভাব দেখা দিয়েছে ; রাষ্ট্র জনগণের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে।

১.৪.৩ : আর্থনীতিক সমস্যা

১৯৬০ এর দশকের শেষ থেকে আর্থনীতিক বিকাশের ধারণা পরিবর্তিত হতে থাকে। বৃহদাকার আর্থনীতিক (macroeconomic) সমস্যার সমাধানে কেইনসীয় অর্থনীতিকে আর যথোপযুক্ত বলে মনে করা হচ্ছে না। মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব বৃদ্ধির মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক ভুল বলে প্রমাণিত হচ্ছে। বস্তুত:, 'নিশ্চলতা স্ফীতি' (stagflation) র উদ্ভব কেইনসীয় নীতির বিরোধী হিসেবে দেখা দিয়েছে। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, নিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে না, অথচ মুদ্রাস্ফীতি ঘটছে। ঘাটতি বাজেট বা মুদ্রাস্ফীতির নীতির মাধ্যমে আর নিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। তাই মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্বজনিত সমস্যাকে কেইনসীয় নীতিরই ফলশ্রুতি বলে সমালোচনা করা হয়। অনেকে মন্তব্য করেছেন যে, প্রাক-কেইনসীয় পদ্ধতি দ্বারা পরিচালিত দেশগুলি অপেক্ষা কেইনসীয় তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত ব্রিটেন, ইটালী প্রমুখ দেশ মুদ্রাস্ফীতি, উৎপাদন হ্রাস, ঘাটতি বাজেট প্রভৃতির দ্বারা অধিকতর দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। যদিও সারা পৃথিবীতেই মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু কেইনসীয় নীতি গ্রহণকারী দেশগুলিই এর দ্বারা বেশী প্রভাবিত হয়েছে।

মাত্রাতিরিক্ত ভারাক্রান্ত অবস্থার সঙ্গে কেইনসীয় নীতির ব্যর্থতা বিকল্প নীতি উদ্ভাবনে সাহায্য করেছে। তাই মুদ্রাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অর্থনীতিতে স্থিতি আনার নীতি (monetarism) এবং যোগান পক্ষ (Supply side) অর্থনীতি কেইনসীয় তত্ত্বের বিকল্প নীতি হিসেবে গড়ে উঠেছে। এই নীতিগুলি প্রাক-কেইনসীয় আর্থনীতিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। মিলটন ফ্রিডম্যান (Milton Friedman), জেমস্ বুকানন (James Buckanan) প্রমুখ চিন্তাবিদ কেইনসীয় নীতির অন্যতম সমালোচক ছিলেন। তাঁদের আলোচনা ছিল অর্থনীতিতে অর্থের যোগান ও স্তরকেন্দ্রিক।

ফ্রিডম্যান মনে করেছেন যে, অতি মাত্রায় অর্থের যোগান বৃদ্ধিই মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। তাঁর মতে, বেকারত্বের একটা স্বাভাবিক স্তর আছে। সরকারী নীতি যদি বেকারত্বকে এই স্বাভাবিক স্তরের নীচে রাখে, তাহলে মুদ্রাস্ফীতি অনিবার্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। তাই বিকল্প নীতির সমর্থকগণ কম সক্রিয় সরকারী অর্থ সম্বন্ধীয় নীতিতে বিশ্বাসী। তাঁরা বেকারত্ব অপেক্ষা মুদ্রাস্ফীতিকে বেশী গুরুত্ব সহকারে বিশ্লেষণ করেছেন। অধিক সরকারী ব্যয় যেহেতু অধিক অর্থ যোগান ও ঋণের ওপর নির্ভরশীল, তাই তাঁরা অধিক সরকারী ব্যয়ের বিরোধী। বস্তুতঃ কেইনসীয় অর্থনীতির ব্যর্থতাকে সমকালীন আর্থনীতিক সমস্যার জন্য দায়ী করা হতে থাকে। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে নয়া দক্ষিণ পন্থা তত্ত্ব (New Right Theory), নয়া-উদারনীতিবাদ প্রভৃতি মতবাদ গড়ে উঠেছে।

১.৪.৪ : পরিকাঠামোগত সঙ্কট

বিংশ শতাব্দীর ৭০র দশক থেকে কেইনসীয় মডেলের পতন ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সঙ্কট শুরু হওয়ার ফলে সমাজব্যবস্থায় একটা পরিকাঠামোগত সঙ্কট উদ্ভূত হয়। বৃদ্ধি ও বিনিয়োগের হারে ব্যাপক হ্রাস (পূর্ববর্তী অবস্থার প্রায় অর্ধেক), বেকারত্ব বেড়ে যাওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে নিঃস্বকরণ (pauperization), প্রক্রিয়া নিবিড় হয়েছিল।[১] এই আর্থনীতিক সঙ্কট, জাতিকুলবাদ প্রভৃতি সমস্যা দূর করার জন্য উন্নত দেশগুলি পরিকাঠামো পরিবর্তন নীতি (structural adjustment policy) গ্রহণ করে এবং পরে বিশ্বের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। উন্নত দেশগুলির কাছে আগের আর্থনীতিক নীতির খুব বেশী পরিবর্তন দরকার না হোলেও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির পক্ষে আগের রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত ও পরিকল্পনামূলক অর্থনীতির আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। এই পরিকাঠামোগত সঙ্কট নয়া উদারনীতিবাদ ও বিশ্বায়নের প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। এর ফলে মুক্ত বাজার নির্ভর কাঠামোর ওপর নির্ভর করে নীতিগুলির পরিবর্তন করতে হচ্ছে। প্রযুক্তির অগ্রগতি ও আর্থনীতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন — এই দু'টি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে পুঁজিবাদের সঙ্কটের মোকাবিলা করার চেষ্টা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় বা স্বশাসিত ক্ষেত্রগুলিকে ভেঙে দিয়ে বেসরকারী বৃহৎ পুঁজির হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। জাতিরাষ্ট্রের অবসানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের জনকল্যাণ ভূমিকাকে অস্বীকার করা হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ বাজারকে বিদেশী বহুজাতিকদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়ে বিশ্বব্যাপী অবাধ বাজার তৈরী করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। এই পরিকাঠামো পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদারনীতিবাদী নীতির পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে।

অনুশীলনী —২

* সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী *

১। রাষ্ট্রতত্ত্বের সঙ্কট বলতে কী বোঝ ?

২। বৈধতার সঙ্কট কী ?

৩। 'মাত্রাতিরিক্ত রাজনীতিক বোঝা' বলতে কী বোঝায় ?

৪। কেইনসীয় তত্ত্ব ব্যর্থ হোল কেন ?

* রচনাত্মক প্রশ্ন *

১। বিংশ শতাব্দীর উদারনীতিবাদের সঙ্কটগুলি পর্যালোচনা কর।

১.৫ : সারসংক্ষেপ

ব্যাপক অর্থে উদারনীতিবাদ হোল কয়েকটি ধারণা ও মূল্যবোধের সমষ্টি। এগুলি হোল ঃ ব্যক্তি স্বাধীনতা, সহিষ্ণুতা ও ব্যক্তিগত পছন্দ, এবং সীমাবদ্ধ শাসনব্যবস্থা ও আইনের শাসন। উদারনীতিবাদ একদিনে গড়ে ওঠে নি। বিভিন্ন পর্যায়ে বিবর্তিত ও পরিবর্তিত হয়ে উদারনীতিবাদ বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। যদিও উদারনীতিবাদের বীজ প্রধান গ্রীক চিন্তাধারার মধ্যে নিহিত ছিল, প্রকৃতপক্ষে সপ্তদশ শতকের লককেই ইউরোপীয় উদারনীতিবাদের জনকরূপে অভিহিত করা হয়ে থাকে। উদারনীতিবাদের যে মূল কথা — রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সঙ্গে ব্যক্তি স্বাধীনতার সমন্বয় সাধন — তা লকের তত্ত্বের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ পদ্ধতিগত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মাধ্যমে ব্যক্তিকেই সামাজিক ব্যাখ্যার লক্ষ্যস্থল হিসেবে দেখেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দী ছিল উদারনীতিবাদের স্বর্ণযুগ। বেন্থাম প্রমুখ দার্শনিক ব্যক্তিগত জীবনে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেছেন। জে. এস.

মিল ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন হিতবাদকে সংশোধন করার মাধ্যমে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে গ্রীন নেতিবাচক স্বাধীনতাকে পরিহার করে ও ইতিবাচক স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে সমষ্টিবাদী উদারনীতিবাদের তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গ্রীনের দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হবহাউস, কেইনস, বেভারিজ প্রমুখ দার্শনিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন। একে সংশোধনমূলক উদারনীতিবাদ বলা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে সংশোধনমূলক উদারনীতিবাদও বিভিন্ন ধরনের সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছিল। রাজনীতিক তত্ত্বের অবনমনের ফলে উদারনীতিক গণতন্ত্রের সমর্থনে তত্ত্ব গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। জনকল্যাণমূলক-রাষ্ট্র প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে বৈধতার সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব বৃদ্ধি প্রভৃতি আর্থনীতিক সঙ্কট উদ্ভব হওয়ার ফলে কেইনসীয় তত্ত্বের বিকল্প নীতি গড়ে উঠেছিল। পরিকাঠামোগত পরিবর্তনের নীতিও নয়া-উদারনীতিবাদ গড়ে ওঠার পথ প্রশস্ত করেছিল।

আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে উদারনীতিক তত্ত্বও বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বিভিন্ন সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে উদারনীতিবাদ যে নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে তাকেই নয়া উদারনীতিবাদ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই নয়া-উদারনীতিবাদ বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করেছে; তবে এরও মূল লক্ষ্য হোল ব্যক্তির উন্নতি ও মঙ্গল সাধন। নয়া-উদারনীতিবাদীরা মনে করেছেন যে আর্থনীতিক জীবনের আঙ্গিকে রাষ্ট্রনীতিক জীবনেরও ভিত্তি হওয়া উচিত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও উদ্যোগ। নয়া-উদারনীতিবাদের একটি শাখাকে ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের নতুন সংস্করণও বলা যেতে পারে।

উদারনীতিবাদের ধারা

ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ (লক, স্মিথ বেন্থাম) → সমষ্টিবাদী উদারনীতিবাদ (জে.এস.মিল.গ্রীণ) → সংশোধনমূলক উদারনীতিবাদ (হবহাউস, কেইনস, বেভারিজ) → নয়া-উদারনীতিবাদ

১.৬ প্রধান শব্দগুচ্ছ

ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ (Classical Liberalism) ঃ

সনাতন বা চিরায়ত উদারনীতিবাদ। এর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হোল রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা। লক ছিলেন এই ক্ল্যাসিক্যাল উদারনীতিক তত্ত্বের জনক। অ্যাডাম স্মিথ, বেন্থাম প্রমুখ চিন্তাবিদ ছিলেন এর প্রবক্তা।

সমষ্টিবাদী উদারনীতিবাদ (Collective Liberalism) ঃ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে গ্রীন প্রমুখ দার্শনিক উদারনীতিবাদকে চরমতা থেকে মুক্ত করেন। এতে ব্যক্তিকে সামাজিক প্রেক্ষিতে বিচার করা হয়; ইতিবাচক স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। উদারনীতিবাদের এই পর্যায়কে সমষ্টিবাদী উদারনীতিবাদ বলা হয়।

সংশোধনমূলক উদারনীতিবাদ (Revisionary Liberalism) ঃ

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গ্রীণের দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কেইনস, বেভারিজ প্রমুখ তাত্ত্বিক পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সনাতন উদারনীতিবাদের সংশোধন করেছিলেন। তাঁরা মিশ্র অর্থনীতি, ইতিবাচক রাষ্ট্রের ধারণা, বন্টনমূলক ন্যায়, জনকল্যানমূলক রাষ্ট্রের তত্ত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

নয়া-দক্ষিণপন্থা তত্ত্ব (New Right Theory) ঃ

বিংশ শতাব্দীর উদারনীতিবাদের সঙ্কটের প্রেক্ষিতে যে নয়া উদারনীতিবাদ গড়ে ওঠে তার একটি অন্যতম দিক হোল এই তত্ত্ব। থ্যাচার (Thatcher) এবং রেগান (Reagan) প্রশাসন ছিল এই নীতির উদ্যোক্তা। এতে বাজার ও ব্যক্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। রক্ষণশীলতা হোল এর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

অবাধ নীতি (Laissez-faire) ঃ

ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের নীতি। অ্যাডাম স্মিথ, বেন্থাম প্রমুখ চিন্তাবিদ ছিলেন এর সমর্থক।

উদ্ভাসন (Enlightenment) ঃ

খ্রীস্টিয় অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্স, স্কটল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড এবং জার্মানীতে কয়েকজন লেখক, মনীষী, দার্শনিক এবং সমাজতাত্ত্বিক তাঁদের মননশীল চিন্তার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানিক ধর্মীয় নিরিখের পরিবর্তে যুক্তির দ্বারা সমস্ত সমাজ ও মানুষের উন্নতির সম্ভাবনা পর্যালোচনা করেছিলেন। এই যুগকেই Enlightenment বা উদ্ভাসনের যুগ বলা হয়।

দৃষ্টবাদ (Positivism) ঃ

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাজনীতিক তত্ত্বের অবনমনে সাহায্য করেছিল এই মতবাদ। দৃষ্টবাদীরা যে-কোনো ধরনের সমাজ সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাবাদী ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের পক্ষপাতী। এই তত্ত্ব মূল্যমান-নিরপেক্ষ আলোচনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। এরই একটি অন্যতম দিক হোল যৌক্তিক দৃষ্টবাদ, যা সনাতন অধিবিদ্যক ধারণাকে পরিহার করে।

সংজ্ঞাবাদ (Nominalism) ঃ

এর জন্ম মধ্যযুগের শেষ পর্বে এবং হবস্ ছিলেন এর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। সংজ্ঞাবাদের বিশেষত্ব হোল এই যে, বাস্তবতাকে বিচার করতে হবে ব্যক্তিকে দিয়ে। অর্থাৎ ব্যক্তি হোল সমাজের প্রকৃত কেন্দ্রবিন্দু।

ইতিহাস-সর্বস্বতা (Historicism) ঃ

রাজনীতিক তত্ত্বের অবনমনের কারণ হিসেবে অনেক ইতিহাসে-সর্বস্বতাকে চিহ্নিত করেছেন। অনেকে মনে করেন যে, রাজনীতিক তত্ত্বকে ইতিহাসের নিরিখে বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রাজনীতিক মূল্যবোধযুক্ত তত্ত্ব গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি।

নিশ্চলতা-স্ফীতি (Stagflation) ঃ

যে অবস্থায় চাহিদা, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান/নিয়োগ বৃদ্ধি পায় না অথচ মুদ্রাস্ফীতি ঘটে।

Monetarism (মানিটারিজ্‌ম) ঃ

মুদ্রা বা অর্থ সরবরাহকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অর্থনীতিতে স্থিতি আনার নীতি বা প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া প্রাক-কেইনসীয় আর্থনীতিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

১.৭ অনুশীলন পরখ করার উত্তরমালা

অনুশীলন — ১

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ

১। অনুচ্ছেদ ১.২ দেখুন।

২। অনুচ্ছেদ ১.৩.২, ১.৩.৩ ও ১.৬ দেখুন।

৩। অনুচ্ছেদ ১.৩.৪ দেখুন।

৪। অনুচ্ছেদ ১.৩.৪ দেখুন।

৫। অনুচ্ছেদ ১.৩.৫ দেখুন।

রচনাত্মক প্রশ্নের উত্তর ঃ

১। অনুচ্ছেদ ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৩.৫ দেখুন।

অনুশীলনী — ২

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ

১। অনুচ্ছেদ ১.৪.১ দেখুন।

২। অনুচ্ছেদ ১.৪.২ দেখুন।

৩। অনুচ্ছেদ ১.৪.২ দেখুন।

৪। অনুচ্ছেদ ১.৪.৩ দেখুন।

রচনাত্মক প্রশ্নের উত্তর ঃ

১। অনুচ্ছেদ ১.৪, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৪.৪ ও ১.৫ দেখুন।

১.৮ নমুনা প্রশ্নাবলী

Essay type :

1. Analyse the crisis of twentieth century liberalism that has led to the emergence of neo-liberalism.

Short type :

1. What is the nature of revisionary liberalism ?
2. How would you explain the crisis of liberal political theory ?

১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

1. John Gray, *Liberalism*, World view, Delhi 1998.

2. Sukhbir Singh, *History of Political Thought*, Rastogi, Meerut, 1997, vol. I & II.

3. J. C. Johari, *Traditions of Political Thought*, Himalaya Publishing House, Delhi 1994.

4. Desmond S. King, *The New Right* : *Politics*, *Markets and Citizenship*, The Dorsey Press, Chicago, 1987.

5. Om Bakshi, *The Crisis of Political Theory*, *A Inquiry into Contemporary Thought*, OUP, Delhi, 1987.

6. Sabine and Thorson, *A History of Political Theory*.

7. অমিয় কুমার বাগচী, বিশ্বায়ন : ভাবনা-দুর্ভাবনা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, ২০০২, প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড।

একক - ২

নয়া-উদারনীতিবাদ ও তার বিভিন্ন দিক (Neo-Liberalism and its different aspects)

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ নয়া-উদারনীতিবাদের মূল বিষয়

২.৩ নয়া-উদারনীতিবাদের বিভিন্ন দিক

২.৩.১ ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্যবাদ

২.৩.১.১ পরিণতিবাদ

২.৩.১.১.১ শিকাগো ঘরানা

২.৩.১.১.২ অষ্ট্রীয় ঘরানা

২.৩.১.১.৩ ভার্জিনিয়া ঘরানা

২.৩.১.২ নৈতিক ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্যবাদ

২.৩.২ সমতাবাদী উদারনীতিবাদ

২.৩.৩ উদারনীতিক বহুত্ববাদ ও উত্তর উদারনীতিবাদ

২.৩.৩.১ বহুসংস্কৃতিবাদ

২.৩.৩.২ কৌমবাদ

২.৪ রাষ্ট্রের প্রতি আগ্রহের পুনর্নবীকরণ

২.৫ বিশ্বায়ন ও রাষ্ট্রকে পিছনে ঠেলে দেওয়ার তত্ত্ব

২.৬ সারসংক্ষেপ

২.৭ প্রধান শব্দগুচ্ছ

২.৮ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

২.৯ নমুনা প্রশ্নাবলী

২.১০ গ্রন্থপঞ্জী

২.০ ঃ উদ্দেশ্য

প্রথম পর্যায়ের প্রথম এককে উদারনীতিবাদ কী এবং তার বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরগুলি সম্বন্ধে জানা হয়েছে। উদারনীতিবাদের সঙ্কটের প্রেক্ষিতে উদারনীতিক তত্ত্বের সংশোধন করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে নতুন উদারনীতিবাদ গড়ে উঠেছে। এই এককে নয়া উদারনীতিবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই এককের পাঠ শেষ হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা যাবে ঃ

* নয়া উদারনীতিবাদ কী ?
* নয়া উদারনীতিবাদের বিভিন্ন দিক।
* রাষ্ট্রের প্রতি আগ্রহের পুনর্নবীকরণ।
* বিশ্বায়ন ও রাষ্ট্রকে পিছনে ঠেলে দেওয়ার তত্ত্বের সঙ্গে নয়া উদারনীতিবাদের সম্পর্ক।
* উদারনীতিবাদের ভবিষ্যৎ।

২.১ ঃ প্রস্তাবনা

উদারনীতিবাদ হোল ধনতন্ত্রের রাজনীতিক দর্শন। তাই ধনতন্ত্রের সঙ্কটের সঙ্গে সঙ্গে উদারনীতিবাদও সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে একদিকে ফ্যাসিবাদী, নাৎসিবাদী ইত্যাদি রাষ্ট্রের উদ্ভব ও শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের সংগঠিত প্রকাশ এবং অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী আর্থনীতিক মন্দার ফলে উদারনীতিক গণতান্ত্রিক তত্ত্ব সঙ্কটের মধ্যে পড়ে। ভাষানুসারী দর্শন (linguistic philosophy) এবং যৌক্তিক দৃষ্টবাদ (logical positivism) এর বিকাশের দ্বারা এই সঙ্কটের মোকাবিলা করা সম্ভব হয়নি। মূল্যমান নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি একদিকে যেমন উদারনীতিবাদ-বিরোধী রাষ্ট্রতত্ত্বকে দুর্বল করেছিল, অপরদিকে তেমনি উদারনীতিক গণতন্ত্রের সমর্থনে তত্ত্ব গড়ে তোলার সম্ভাবনাও ধ্বংস করেছিল। এই পর্যায়কে রাষ্ট্রতত্ত্বের অবনমনের পর্যায় বলেও মন্তব্য করা হয়। সামাজিক ও রাজনীতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন উদারনীতিক তত্ত্ব গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন অনেকে। উদারনীতিক গণতন্ত্রের সমর্থকগণ আর গ্রীণ প্রবর্তিত সমষ্টিবাদী উদারনীতিবাদের ওপর আস্থা রাখতে পারেননি। কেইনস্ ও বেভারিজের জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের তত্ত্ব সমকালীন আর্থনীতিক সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়েছিল। অপরদিকে ক্রমান্বয়ে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার ব্যর্থতা নতুন করে উদারনীতিবাদের বিকাশের পথকে প্রশস্ত করে। এই প্রেক্ষিতে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল উদারনীতিক গণতান্ত্রিক তত্ত্বকে পরিবর্তন করে নতুন পরিস্থিতির উপযোগী করে তোলা। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে উদারনীতিবাদের যে পুনরুত্থান ঘটেছে তাকেই নয়া উদারনীতিবাদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

২.২ ঃ নয়া-উদারনীতিবাদের মূল বিষয়

নয়া-উদারনীতিবাদ বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করেছে, তবে সনাতন উদারনীতিবাদের মতো এরও মূল লক্ষ্য হোল ব্যক্তির উন্নতি ও মঙ্গল সাধন। নয়া-উদারনীতিবাদীরা নতুন চিন্তার আলোকে রাষ্ট্রের গঠন, কার্যাবলী, বৈশিষ্ট্য ও পরিধিকে বিশ্লেষণ করেছেন। রাষ্ট্র, পুরসমাজ ও নাগরিকদের মধ্যেকার সম্পর্ককে নতুনভাবে উপস্থাপিত করেছে নয়া উদারনীতিবাদ। এফ. এ. হায়েক (F. A. Hayek), মিলটন ফ্রিডম্যান (Milton Friedman), রবার্ট নজিক (Robert Nozick), জন রলস্ (John Rawls), রোনাল্ড ডয়োর্কিন (Ronald Dworkin), জন গ্রে (John Gray) প্রমুখ চিন্তাবিদ ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে নয়া-উদারনীতিবাদী তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন। নয়া-উদারনীতিবাদের একটি অন্যতম দিক হোল নয়া দক্ষিণপন্থা তত্ত্ব (New Right Theory)। ১৯৭০-র দশকে এই তত্ত্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং চরম রূপ লাভ করে ১৯৮০-র দশকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগান (Ronald Reagan) এবং যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার (Margaret Thatcher) এই তত্ত্বের সমর্থন ও প্রয়োগ করেছিলেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, নয়া-উদারনীতিবাদের মূল বিষয় হোল মুক্ত বাজার অর্থনীতি ও একটি ন্যূনতম রাষ্ট্র (minimal state)। এদিক থেকে নয়া-উদারনীতিবাদকে ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের নতুন সংস্করণ বলা যেতে পারে।

[১] John Gray, *Liberalism*, P. 96

এতে বাজার ও ব্যক্তির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নয়া-উদারনীতিবাদ মুক্ত বাজার অর্থনীতিকে সমাজজীবনের বিভিন্ন প্রান্তে প্রসারিত করতে চায়। এর মূল লক্ষ্য হোল রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের পরিধিকে সীমিত করা, রাষ্ট্রকে পিছনে গুটিয়ে নিয়ে আসা (Rolling back the State)। নয়া-উদারনীতিবাদ অনুযায়ী, আর্থনীতিক জীবনের আঙ্গিকে রাষ্ট্রনীতিক জীবনেরও ভিত্তি হওয়া উচিত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও উদ্যোগ। নয়া-উদারনীতিবাদ কেবল স্বাধীনতার কথাই বলে না, সাম্যকেও গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এর অন্যতম নীতি হোল সকলের জন্য সমান স্বাধীনতা। নয়া উদারনীতিবাদ উদারনীতিক বহুত্ববাদের ওপরও আলোকপাত করে। জন গ্রে উত্তর আধুনিক যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে উত্তর-উদারনীতিক তত্ত্ব গড়ে তোলার কথা বলেছেন, যেখানে উদারনীতিক সংস্কৃতি ও উদারনীতিক রাষ্ট্রের সর্বজনীন কর্তৃত্ব থাকবে না, বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান গড়ে উঠবে।[১]

২.৩ ঃ নয়া-উদারনীতিবাদের বিভিন্ন দিক

প্রায় তিন শত বছর ধরে উদারনীতিবাদ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। কিন্তু উদারনীতিবাদের মূল বিষয় অপরিবর্তিতই থেকে গেছে। তাই নয়া উদারনীতিবাদীরা দীর্ঘকালের উদারনীতিবাদী ধারা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়ে তাঁদের তত্ত্ব উপস্থাপিত করেননি। তাঁদেরও মূল বক্তব্য হোল এই যে, রাষ্ট্রের কাজ হোল এমন এক উদারনীতিক সমাজ গড়ে তোলা, যেখানে প্রত্যেকে স্বাধীনতা, সাম্য ও ন্যায় ভোগ করতে পারে।[১] তাঁরাও স্বীকার করেছেন যে, রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হোল ব্যক্তির উন্নতি ও মঙ্গল। কিন্তু কীভাবে তা অর্জন করা সম্ভব — সে সম্পর্কে নয়া-উদারনীতিবাদীগণ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছেন। জি. ডবলিউ. স্মিথ সমকালীন উদারনীতিবাদকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন — (১) নয়া ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ বা ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্যবাদ (Neo-classical liberation / Libertarianism), (২) সাম্য বা ন্যায়ভিত্তিক উদারনীতিবাদ (equality / justice based liberalism) এবং (৩) উদারনীতিক বহুত্ববাদ (liberal pluralism)।[২] প্রথমটির প্রধান প্রবক্তা হলেন ফ্রেডরিক হায়েক, দ্বিতীয়টির রোনাল্ড ডয়োর্কিন এবং তৃতীয়টির প্রবক্তা জন গ্রে।

২.৩.১ ঃ ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্যবাদ

ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্যবাদকে অ্যাডাম স্মিথের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের নতুন সংস্করণ বলা যেতে পারে। একে তাই নয়া ধ্রুপদী উদারনীতিবাদও বলা হয়ে থাকে। এই ধরনের উদারনীতিবাদের প্রবক্তাদের একই ঘরানার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হলেও, এঁদের বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। নর্ম্যান ব্যারি (Norman Barry) ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্যবাদী উদারনীতিবাদকে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করেছেন ঃ (১) পরিণতিবাদী (consequentialist) এবং (২) অধিকারভিত্তিক মানবতাবাদী বা নৈতিক।[৩] প্রথমটি মুক্ত সমাজের তত্ত্ব উপস্থাপিত করে, যার দ্বারা সামাজিক সুখ উৎপাদনে স্বাধীনতার সর্বাধিক গুরুত্বকে স্বীকার করা হয় ; স্বাধীনতার নৈতিক মূল্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। দ্বিতীয়টি স্বাধীনতার নৈতিক মূল্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী ব্যক্তি-সত্তার পরিপূর্ণতার জন্য স্বাধীনতা অপরিহার্য। সেইজন্য মনে করা হয় যে, রাষ্ট্রের দমনমূলক কাজের মাধ্যমে স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করা অনৈতিক। বস্তুতঃ ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্যবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, রাষ্ট্রের কোনভাবেই স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করা উচিত নয় এবং ব্যক্তির সর্বাধিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

---

[১] Amal Kr. Mukhopadhyay, *Liberalism* : *A Dilemma For Indian Political Science*, *in Socialist Perspective*, vol. 31, No. 1-2, June-Sept. 2003, P. 5

[২] G. W. Smith, *Liberalism*, Vol. I, P. 2

[৩] Norman Barry, 'The New Liberalism', in G. W. Smith, *Liberalism*, Vol. II, P. 3

[৪] নয়া দক্ষিণপন্থা তত্ত্ব 'রাষ্ট্রকে পিছনে ঠেলে দেওয়া' (rolling back the State) তত্ত্বের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।

২.৩.১.১ ঃ পরিণতিবাদ

পরিণতিবাদীরা মুক্তবাজার ও সীমাবদ্ধ শাসন ব্যবস্থাকে ব্যক্তির লক্ষ্যসাধনে অপরিহার্য বলে মনে করেছেন। এই মতবাদ অনুযায়ী, সমাজের মঙ্গল সাধিত হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যক্তিগত সন্তোষ বিধানের মাধ্যমে, পরিকল্পিত জনকল্যাণের মাধ্যমে নয়। এই তাত্ত্বিকদের কাছে লক্ষ্যের সহজাত মূল্য বলে কিছু নেই। তাঁরা মনে করেছেন যে, স্বাধীনতার সহায়ক মূল্য আছে, নৈতিক মূল্য নেই। ব্যারি আর্থনীতিক দিক থেকে এদের পরিণতিবাদী বলে চিহ্নিত করেছেন। পরিণতিবাদীরা ছিলেন নয়া দক্ষিণপন্থা তত্ত্বের সমর্থক।[৪] পরিণতিবাদী ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্যবাদীদের তিনটি ঘরানা হোল ঃ (১) শিকাগো, (২) অষ্ট্রীয় এবং (৩) ভার্জিনিয়া। শিকাগো ঘরানা মুক্ত বাজার অর্থনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং এর অন্যতম প্রবক্তা হোলেন মিল্টন ফ্রিডম্যান। অষ্ট্রীয় ঘরানার প্রধান প্রবক্তা হোলেন ফ্রেডরিক হায়েক। গণপছন্দের ভার্জিনিয়া ঘরানার প্রতিনিধি হিসেবে জেমস বুকানন (James Buchanan) এবং গর্ডন টুলক (Gordon Tullock) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

২.৩.১.১.১ ঃ শিকাগো ঘরানা

শিকাগো ঘরানার অর্থনীতিবিদগণ হোলেন দৃষ্টবাদী (positivist)। তাঁরা তথ্য ও মূল্যবোধের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করে নিয়ে বিষয়গত তথ্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিকাগো ঘরানার অন্যতম অর্থনীতিবিদ্ হিসেবে মিলটন ফ্রিডম্যান কেইনসীয় তত্ত্বের প্রধান সমালোচক ছিলেন। তাঁর প্রধান যুক্তি হোল এই যে, সরকারি কাজকর্মের ফলাফলগুলির অভিজ্ঞতাবাদী বিশ্লেষণ থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, সামাজিক লক্ষ্যগুলি অর্জনের ক্ষেত্রে সরকার থেকে বাজার বেশি কার্যকর হয়ে থাকে। ফ্রিডম্যান মনে করেছেন যে, কিছু কিছু বিশেষ স্বার্থ নিজেদের পক্ষে সরকারি হস্তক্ষেপ চেয়ে রাজনীতিক প্রক্রিয়ার ওপর অত্যধিক প্রভাব খাটিয়ে থাকে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, সরকারি হস্তক্ষেপ লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি সাময়িকভাবে নিয়োগ বৃদ্ধি করলেও কালক্রমে বেকারত্ব বৃদ্ধি করেছে। ফ্রিডম্যানের মতে, সরকারের বৈধ কাজগুলি কেবল অপরিহার্য বিষয়গুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। তিনি সরকারের বৈধ কাজের চারটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছেন ঃ (১) বহিঃশক্তির আক্রমণ বা বলপ্রয়োগ থেকে ব্যক্তিবর্গকে রক্ষা করা ; (২) বিচারব্যবস্থা পরিচালনা করা ; (৩) জনকল্যাণের ব্যবস্থা করা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে উদ্ভূত বিশেষ বিশেষ সমস্যার সমাধান করা ; এবং (৪) শিশু ও উন্মাদের প্রতি দায়িত্বশীলতা পালন করা। ফ্রিডম্যান তাঁর 'ক্যাপিট্যালিজ্‌ম এন্ড ফ্রীডম' (*Capitalism and Freedom*) [1962] গ্রন্থের মধ্যে ধনতন্ত্র ও স্বাধীনতার মধ্যে গভীর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে ধনতন্ত্র আর্থনীতিক স্বাধীনতা বর্ধিত করে এবং আর্থনীতিক স্বাধীনতা রাজনীতিক স্বাধীনতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। তাঁর মতে বাজার হোল স্বাধীনতার উৎস এবং রাষ্ট্র হোল নিপীড়নের শক্তি। রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের ব্যর্থতার নিদর্শন হিসেবে সরকারি কর্মসূচীর তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি। তাঁর মতে, আমেরিকার প্রগতি সম্ভব হয়েছে বাজারভিত্তিক কার্যাবলীর জন্য। তিনি বলেছেন যে, প্রগতি হোল মুক্ত বাজারের মাধ্যমে গড়ে ওঠা ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফল ; সরকারি হস্তক্ষেপ এই প্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ফ্রিডম্যানের মতে, রাজনীতিক স্বাধীনতার একটি আবশ্যিক শর্ত হোল বাজার অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল আর্থনীতিক স্বাধীনতা।

২.৩.১.১.২ ঃ অষ্ট্রীয় ঘরানা

অষ্ট্রীয় ঘরানা কার্ল মেঞ্জার (Carl Menger) [1840-1921] কে দিয়ে শুরু হয়েছিল এবং ওয়াইজার (Wieser) , মিজেস (Mises) ও হায়েকের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করেছিল। 'অষ্ট্রীয়' বলা হয় পদ্ধতিগত দিক থেকে, ভৌগলিক দিক থেকে নয় ; কারণ এই ঘরানার অধিকাংশ অর্থনীতিবিদই বর্তমানে আমেরিকার অধিবাসী। অষ্ট্রীয় অর্থনীতিবিদদের মতে, সমাজবিজ্ঞান হোল মানবীয় ক্রিয়ার উদ্দেশ্য ও পরিণাম চর্চার বিজ্ঞান। ব্যক্তিবর্গই হোল পর্যালোচনার একক।

অষ্ট্রীয় গোষ্ঠীর চিন্তাবিদদের মধ্যে রাষ্ট্রদর্শন, অর্থনীতি এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে হায়েকের অবদানই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলি হোল ঃ 'দ্য রোড টু সার্ফডাম' (*The Road to Serfdom*) [1944], 'দ্য কনস্টিটিয়ুশন অব্ লিবার্টি' (*The Constitution of Liberty*) [1960], 'লেজিসলেশন এ্যান্ড লিবার্টি' (*Legislation and Liberty*) [1973]। এই গ্রন্থগুলিতে হায়েকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী উদারনীতিক নীতি, সীমাবদ্ধ রাষ্ট্রের নীতি ও বাজার সম্পর্কে তার বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি ধ্রুপদী অর্থনীতিকে সংশোধন করে গ্রহণ করেছেন। কেইনসের বৃহদাকার আর্থনীতিক (macroeconomic) তত্ত্ব পরিহার করেছেন তিনি। হায়েকের উদারনীতিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অণু-আর্থনীতিক (micro-economic) দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতিগত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (methodological individualism) এর ওপর। কড়া পদ্ধতিগত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী হিসেবে তিনি এই আচরণগত ধারণা পোষণ করেছেন যে, মানুষ হোল যুক্তিবাদী এবং সে তার আত্মস্বার্থ রক্ষা করে। শুধু ব্যক্তিবর্গই পর্যালোচনার একক হতে পারে এবং সব ব্যাপারই ব্যক্তিগত আচরণে রূপান্তরযোগ্য। হায়েক মূল্যবোধের বিষয়ীগত তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। এর দ্বারা বলা হয়েছে যে, মূল্যবোধের অবস্থান দ্রষ্টার চোখে।

শিকাগো ঘরানার চিন্তাবিদ ফ্রিডম্যানের মতো হায়েকও ছিলেন দক্ষিণপন্থী চিন্তাবিদ ও পরিণতিবাদী ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্যবাদী। উভয়েই বিশ্বাস করতেন যে, বাজারই ব্যক্তিস্বাধীনতা সর্বাধিক করে তুলতে পারে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতাই সমাজে সম্পদ সৃষ্টির ভিত্তি। কিন্তু অষ্ট্রীয় ঘরানার অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে হায়েক প্রমুখ চিন্তাবিদের পার্থক্য হোল এই যে, প্রথম ধরনের অর্থনীতিবিদগণ পর্যবেক্ষণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন, কিন্তু হায়েক প্রমুখ চিন্তাবিদ অন্তর্দর্শনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। হায়েক উদারনীতিক নৈতিকতাকে প্রাধান্য দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে আর্থনীতিক উদারনীতিবাদের নৈতিক ভিত্তি আছে ; তবে কোন সর্বজনীন, বিমূর্ত, ঐতিহাসিক অধিকারের ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন না তিনি। কারণ তাঁর সমাজ-দর্শন যুক্তিবাদ-বিরোধী (anti-rationalism) নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি আর্থনীতিক উদারনীতিবাদ ও রাজনীতিক উদারনীতিবাদকে অবিচ্ছিন্নভাবে দেখেছেন।

হায়েকের মতে, সমস্ত প্রগতি সনাতনী ধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত। যুক্তিযুক্ত নৈতিক ব্যবস্থার ব্যাখ্যায় যুক্তির পরিবর্তে বিবর্তনকে স্থান দিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে, সমাজ হোল এক স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা ব্যবস্থা। তিনি বলেছেন যে, একটি মুক্ত বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা ব্যবস্থা পরিকল্পিত ব্যবস্থা থেকে শ্রেয়। হায়েকের কাছে, স্বাধীনতা হোল একটি নেতিবাচক ধারণা, যার অর্থ হোল বলপ্রয়োগের অনুপস্থিতি। সরকারি নিয়ন্ত্রণের অনুপস্থিতির মাধ্যমে গড়ে ওঠা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হোল স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবস্থার আবশ্যিক শর্ত এবং এর দ্বারাই উন্নতির সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটে। হায়েকের বিশ্বাস ছিল এই যে, মানুষের জ্ঞানের উদ্ভাবন ও বিকাশে স্বাধীনতা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তিনি বলেছেন যে, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির মাধ্যমে সমষ্টিগত কল্যাণের মাত্রা নির্ধারণ করার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হোল বাজার অর্থনীতি। এই বাজার-অর্থনীতিই সমাজে উন্নতি, সমৃদ্ধি ও দক্ষতা সুনিশ্চিত করতে সক্ষম হয়ে থাকে। তিনি আরও বলেছেন যে, সামাজিক ন্যায়ের ধারণাটি অর্থহীন ; তাই এটি কখনো সরকারি নীতির ভিত্তি হতে পারে না।[১] সামাজিক ও বন্টনমূলক ন্যায় কার্যকর করতে গেলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঘটে, যা, হায়েকের মতে, সর্বনিয়ন্ত্রণবাদে পরিণত হয়। এতে বাজারের ভূমিকা বাধাপ্রাপ্ত হয়। যোগ্যতা বা সামর্থ্য অনুযায়ী প্রাপ্য বন্টনের পরিবর্তে রাষ্ট্রনীতিক বিচার বিবেচনাই এক্ষেত্রে প্রধান গুরুত্ব পায়। হায়েকের মতে, সমাজতন্ত্র গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ

[১] Desmond S. King, *The New Right*, P. 14

[২] Ibid, P. 39

[৩] Ibid, PP. 14, 85

[৪] Sushila Ramaswamy, *Political Theory* ; *Ideas Concepts*, Macmillan, Delhi, 2003, P. 262

[৫] Desmond S. King, *The New Right*, P. 89

এর দ্বারা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত প্রণয়নকে সীমিত ক'রে স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয় এবং সর্বজনীন মান আরোপ করার প্রচেষ্টা হয়ে থাকে। বাজার ব্যবস্থায় আয় বৈষম্যের একটি ইতিবাচক ভূমিকা আছে বলে হায়েক মনে করেছেন।[২] বৈষম্য দূরীকরণের জন্য রাষ্ট্রীয় নীতি তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় ; কারণ এর দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব করা হয়।

যদিও হায়েক নয়া-দক্ষিণপন্থা চিন্তাবিদ বলে পরিচিত, অন্য ঘরানার চিন্তাবিদ থেকে তাঁর মতের কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সমকালীন জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের পরিধির সমালোচনা করলেও হায়েক মানুষের দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের পক্ষপাতী ছিলেন।[৩] তিনি স্বীকার করেছেন যে, সমাজে দুঃস্থ, দরিদ্র, বেকার ও বৃদ্ধদের সাহায্য করে কিছুটা ভারসাম্য আনার জন্য সরকারে প্রয়োজনীয় ভূমিকা আছে। ফ্রিডম্যানের মতো তিনিও এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কিছুটা দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে এব্যাপারে সরকারি ক্ষেত্রের একচেটিয়া ও স্থায়ী নিয়ন্ত্রণের সমালোচনা করেছেন হায়েক। তিনি সাধারণ কল্যাণ ও রাষ্ট্র পরিচালিত আইনগত কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। হায়েকের উদারনীতিবাদে যেমন স্বাধীনতার সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তেমনি আইন ও স্বাধীনতার মধ্যেও সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছে। এদিক থেকে বিচার করলে বলা যেতে পারে যে, তিনি শুধু সমষ্টিবাদকেই পরিহার করেননি, অবাধ বাণিজ্যনীতিকেও সংশোধন করেছেন। তাঁর মতে, মুক্ত সমাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাধীনতার উপযোগী আইন গড়ে তোলে।[৪] স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবস্থায় সরকার বাজারের বিকৃতি হ্রাস করে এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে পারে। নিউম্যান (Newman) হায়েকের উদারনীতিবাদী তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, তাঁর (হায়েকের) তত্ত্বের বিড়ম্বনা হোল এই যে, যে-রাজনীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন হায়েক, সেই রাজনীতি হোল অনেকাংশে তাঁর সমর্থিত আর্থনীতিক ব্যবস্থার ফলশ্রুতি।[৫]

২.৩.১.১.৩ ঃ ভার্জিনিয়া ঘরানা

ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্যবাদী উদারনীতিবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হোল সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণ অভিজ্ঞতাবাদী ও নীতিবাচক উভয় প্রকারেরই হয়ে থাকে। অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী পদ্ধতির সাহায্যে সরকারি কর্মকর্তাদের আচরণের অণু-আর্থনীতিক বিশ্লেষণ করা হয়। নীতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির পুনর্বিন্যাসের কথা বলা হয়, যাতে ব্যক্তিগত পছন্দগুলিকে অধিকতর সুষ্ঠভাবে প্রতিফলিত করা সম্ভব হয়। এই দু'ধরনের বিশ্লেষণই গণপছন্দ তত্ত্ব (Public Choice Theory) র ভার্জিনিয়া ঘরানার সদস্যদের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। এঁদের মধ্যে জেমস্ বুকানন্ (James Buchanan) এবং গর্ডন টুলক (Gordon Tullock) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। গণপছন্দ তত্ত্বকে 'রাজনীতির অর্থনীতি' ('The economics of politics') বলেও অভিহিত করা হয়।[১] এই তত্ত্বের প্রবক্তারা যদিও হায়েক প্রমুখ অষ্ট্রীয় অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু হায়েকের 'স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবস্থা'র ধারণাকে পরিহার করেছেন। বুকানন সরকারের চুক্তিগত ভিত্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

গণপছন্দ তত্ত্বও পদ্ধতিগত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই নীতি অনুযায়ী সব সামাজিক সত্তাই ব্যক্তিগত আচরণে রূপান্তরযোগ্য। 'সমাজ', 'রাষ্ট্র' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি কেবল ব্যক্তির আচরণ ও কার্যাবলীর প্রেক্ষিতেই উপলব্ধি করা যায়। এই তত্ত্বের সমর্থকগণ মনে করেছেন যে, ব্যক্তি হোল আত্মকেন্দ্রিক, সর্বাধিক উপযোগিতা বৃদ্ধিকারী (utility maximiser), যুক্তিবাদী ও আত্মস্বার্থরক্ষাকারী। এই বৈশিষ্ট্যগুলি রাজনীতিক ক্রিয়ার কারকদের আচরণে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। ভার্জিনিয়া ঘরানার সদস্যদের মতে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, বাজার অর্থনীতি ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা

[১] Desmond S. King, *The New Right*, P. 92

[২] G. W. Smith, *Liberalism*, Vol. I, P. 12

[৩] বিনিময় প্রক্রিয়া যখন জনকল্যাণকর বিষয় উৎপাদনে ব্যর্থ হয়, তখন তাকে 'বাজারের ব্যর্থতা' বলা হয়ে থাকে।

[৪] Desmond S. King, *The New Right*, P. 105

গ্রহণযোগ্য হতে পারে যদি এগুলি ব্যক্তির বিষয়ীগত পছন্দ অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। জোসেফ শুমপিটার (Joseph Schumpeter) এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গর্ডন টুলক তাঁর 'দ্য ভোট মোটিভ' (The Vote Motive) [১৯৭৬] গ্রন্থের মধ্যে ভোটারদের আচরণের সঙ্গে ক্রেতা বা ভোক্তার এবং রাজনীতিকদের আচরণের সঙ্গে বিক্রেতা বা উৎপাদকের আচরণের সাদৃশ্য বিশ্লেষণ করেছেন। গণপছন্দ তত্ত্বের প্রবক্তারা বাজারের ভারসাম্য রক্ষার আর্থনীতিক তত্ত্বের অনুকরণে উদারনীতিক গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতাভিত্তিক ও বাস্তব 'ভারসাম্যতত্ত্ব' উপস্থাপিত করেছেন। এর মূল বক্তব্য হোল এই যে, গণতন্ত্র হচ্ছে আসলে সরকার নির্বাচন করার ও সরকারকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রক্রিয়া, নিছকই বাজারের ভারসাম্য রক্ষার প্রক্রিয়ার মতো। গণতন্ত্রে কেনা-বেচার বিষয়টি হোল রাজনীতিক কর্মসূচী। টুলক বলেছেন যে, অন্য সকলের মতো আমলারাও নিজেদের স্বার্থের সর্বোচ্চ বৃদ্ধি ঘটাতে চায়। বুকানন ও টুলকের মতে, প্রতিযোগিতার অভাবে আমলাতন্ত্রের একচেটিয়া প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে।[২] তাঁরা জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের নীতিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। তাঁদের মতে, 'বাজারের ব্যর্থতা' সমষ্টিগত কার্যাবলীর উদ্ভব ঘটায়নি, বরং সমষ্টিগত কার্যাবলীই ব্যক্তিগত পছন্দের নীতি লঙ্ঘন করেছে। 'বাজারের ব্যর্থতা'[৩] থেকে রাজনীতিক ব্যর্থতা অনেক বেশি করে অনুভূত হতে থাকে।

জেমস্ বুকানন তাঁর 'দ্য লিমিটস্ অব্ লিবার্টি' (*The Limits of Liberty*) [১৯৭৫] এবং 'ফ্রিডম ইন কনস্টিটিয়ুশনাল কনট্র্যাক্ট' (*Freedom in Constitutional Contract*) [১৯৭৭] গ্রন্থ দু'টির মধ্যে রাজনীতিক ব্যবস্থায় সাংবিধানিক ও রাজনীতিক প্রাতিষ্ঠানের পরিবর্তন করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর মতে, রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানগুলি এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে আত্মস্বার্থরক্ষাকারী রাজনীতিক ও আমলাদের কার্যাবলী সীমাবদ্ধ হয় ও ব্যক্তিগত পছন্দ প্রতিফলিত হয়। তিনি মনে করেছেন যে, সরকারি স্বার্থ অবশ্যই সর্বাধিক ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষায় সচেষ্ট হবে। বুকানন নৈতিকতার পরিবর্তে 'সামাজিক সিদ্ধান্ত পদ্ধতি' (Social decision procedure) এর প্রেক্ষিতে সরকারকে সীমাবদ্ধ করার কথা বলেছেন।[৪] তাঁর মতে, 'বাজার' অবশ্যই গ্রহণযোগ্য কারণ এটি হোল এক অনিয়ন্ত্রিত বিনিময়ের প্রক্রিয়া, যার দ্বারা কেউই ক্ষতিগ্রস্ত হয়না। কিন্তু রাজনীতিক সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ঐকমত্যের পক্ষপাতি ছিলেন তিনি। সরকারি পরিষেবাগুলির ক্ষেত্রে আরও বেশি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে আমলাতন্ত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ, গণভোট, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যক্তিগত পছন্দকে গুরুত্ব দেবার কথা বলেছেন বুকানন। তাঁর মতে, রাষ্ট্র প্রথমে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 'সংরক্ষণকারী রাষ্ট্র' (Protective State) রূপে কাজ করে, পরবর্তীকালে 'উৎপাদনকারী রাষ্ট্র' (Productive State) রূপে কিছু জনকল্যাণমূলক কাজ করে। তবে এই জনকল্যাণমূলক কাজ অবশ্যই সংবিধানভিত্তিক ও নিয়ন্ত্রিত হতে হবে।

গণপছন্দ তত্ত্বের মধ্যে বাজারের ভারসাম্য তত্ত্ব ও সংস্কার সম্বন্ধে যে-সব বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে সেগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিম ইউরোপের উদারনীতিক গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে কিছুটা প্রযোজ্য হলেও এই তত্ত্বের দ্বারা উদারনীতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা করা যায় না বা এর যৌক্তিকতাও প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সরকার পরিচালিত উন্নয়নমূলক কর্মসূচী সবক্ষেত্রে গণপছন্দের নীতির দ্বারা পরিচালিত হতে পারে না। তাই গণপছন্দ তত্ত্বের কোন সর্বজনীন প্রাসঙ্গিকতা আশা করা যায় না। সমষ্টিগত জীবনের আদর্শকে আমরা উপেক্ষা করতে পারিনা। তবে সরকারের প্রসার ও জটিলতা বৃদ্ধি এবং আমলাতন্ত্রের একচেটিয়া প্রাধান্যের প্রেক্ষিতে গণপছন্দ তত্ত্বের গুরুত্বকে আমরা অস্বীকার করতে পারিনা।

অনুশীলনী — ১

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্নাবলী ঃ

১। নয়া-উদারনীতিবাদ বলতে কী বোঝ ?

২। ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্যবাদ কী ?

৩। পরিণতিবাদী ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্যবাদ বলতে কী বোঝায় ?

৪। মিলটন ফ্রিডম্যানের মূল বক্তব্য কী ?

৫। হায়েক কীভাবে আর্থনীতিক উদারনীতিবাদের সঙ্গে রাজনীতিক উদারনীতিবাদের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন ?

৬। গণপছন্দ তত্ত্বের মূল বিষয় কী ?

২.৩.১.২ ঃ নৈতিক ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্যবাদ

নৈতিক দিকে গুরুত্ব আরোপকারী ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্যবাদ এক নৈতিক দর্শন উপস্থাপিত করে, যার দ্বারা রাষ্ট্রনীতিক দর্শনের ব্যাখ্যা করা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি এক উন্নতমানের অহংবাদী মতবাদ পুনর্গঠন করে এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নীতির ভিত্তি হিসেবে 'স্বীয়-মালিকানা' (self ownership)-র ধারণা গড়ে তোলে। এই মতবাদের প্রবক্তাদের 'অধিকার' তাত্ত্বিক ('rights' theorists) বলা হয়। উদারনীতিবাদের সমর্থনে তাঁরা আর্থনীতিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করেছেন এবং অধিকতর সংস্কারবাদী সীমিত রাষ্ট্রের তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন। এই মতবাদে আইন ও নীতিকে সংগঠিত সমাজের আগে ভাবা হয় এবং এর ফলে মনে করা হয় যে, রাষ্ট্রনীতিক কর্তৃপক্ষের নিপীড়নমূলক ক্ষমতা কখনোই ব্যক্তির নৈতিক হকদারিত্ব অতিক্রম করতে পারবে না। আইন র‍্যণ্ড (Ayn Rand), মুরে রথবোর্ড (Murray Rothbard) এবং রবার্ট নজিক (Robert Nozick) ছিলেন এই ধরনের ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্যবাদের অন্যতম দার্শনিক, আইন র‍্যাণ্ডের 'ক্যাপিট্যালিজম্ ঃ দ্য আননোন আইডিয়াল' (*Capitalism* : *The Unknown Ideal*) [1957] গ্রন্থে আর্থনীতিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে ধনতন্ত্রের সমর্থনে তত্ত্ব উপস্থাপিত করা হয়েছে। তিনি আত্মস্বার্থ, জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র অপেক্ষা বাজারের বেশি গুরুত্ব প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলি গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে ধনতন্ত্রের নৈতিক যৌক্তিকতা হোল এই যে, এই ব্যবস্থা মানুষের যৌক্তিক প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং মানুষ হিসেবে মানুষের টিকে থাকাকে বজায় রাখে। রথবার্ড প্রমুখ নৈরাজ্যবাদী ধনতন্ত্রের সমর্থক স্বাভাবিক আইন ও স্বাভাবিক অধিকার নীতির ভিত্তিতে সম্পত্তির দাবীর বৈধতা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কর ব্যবস্থাকে তিনি অনৈতিক বলে মনে করেছেন, কারণ এর দ্বারা ব্যক্তির সম্পত্তি বলপূর্বক অধিগ্রহণ করা হয়। জনকল্যাণের জন্য ন্যূনতম সরকারকেও তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, প্রতিরক্ষাসহ সমস্ত পরিষেবার বেসরকারীকরণ করা উচিত।

অপরদিকে, হার্ভাড প্রফেসর রবার্ট নজিক (১৯৩৮-২০০২) তাঁর 'অ্যানার্কি, স্টেট অ্যাণ্ড ইউটোপিয়া' (*Anarchy, State and Utopia*) [1974] গ্রন্থে ন্যায়ের হকদারিত্ব তত্ত্ব (Entitlement theory of justice) এর সাহায্যে ন্যূনতম রাষ্ট্র (minimal State) এর ধারণা উপস্থাপিত করেছেন। জন রলস্ (John Rawls) এর 'থিওরি অব্ জাস্টিস্' (Theory of Justice) [1971] এ উপস্থাপিত সমতাবাদী উদারনীতিবাদকে তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি। নজিকের মতে, জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র হোল এক ধরনের চৌর্য এবং করব্যবস্থা হোল বলপূর্বক শ্রমের সমতুল্য।[১] নজিকের অধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি কান্টের সজ্ঞাবাদ (intuitionism) এর ওপর প্রতিষ্ঠিত। কান্টের মতো তিনি ব্যক্তিকে লক্ষ্য হিসেবে দেখেছেন, উপায় হিসেবে নয়।

নজিক যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতিতে রাষ্ট্রের স্বতঃস্ফূর্ত উৎপত্তি ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, প্রকৃতির রাজ্যে প্রতিযোগিতামূলক সংরক্ষণকারী কর্তৃপক্ষগুলির মধ্য থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাধান্যকারী সংরক্ষণমূলক কর্তৃপক্ষ (Dominant Protective Agency) গড়ে ওঠে। এই কর্তৃপক্ষ (DPA) অতি-ন্যূনতম রাষ্ট্র (ultra-minimal state)

[১] Edward W. Younkins, *Robert Nozick's Libertarian Framework For Utopia, in Socialist Perspective*, Vol. 31, No. 1-2, June-Sept, 2003, P. 39

[২] G. W. Smith, *Liberalism*, Vol. II, P. 22

[৩] Sushila Ramaswamy, *Political Theory*, P. 310

-এ পরিণত হয় যখন অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে বাজারের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ থেকে বাধা দেয়। এই অতি-ন্যূনতম রাষ্ট্র আবার ন্যূনতম রাষ্ট্রে পরিণত হয় ঐ এলাকার অন্য সকলকে বিনামূল্যে রক্ষণাবেক্ষণ প্রদান করে। নজিকের প্রকৃতির রাজ্য ছিল কাল্পনিক নৈরাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক সমাজ যেখানে বিভিন্ন বেসরকারি কর্তৃপক্ষ বাজারের প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে সংরক্ষণমূলক পরিষেবা দিয়ে থাকে। নজিক দেখাতে চেয়েছেন যে, অতি-ন্যূনতম রাষ্ট্র বাজারের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কারও অধিকার লঙ্ঘন না করে ন্যূনতম রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তাঁর ন্যূনতম রাষ্ট্র হোল ধ্রুপদী উদারনীতিক তত্ত্বের 'প্রহরী রাষ্ট্র' (night watchman state)।[২] ন্যূনতম রাষ্ট্রকে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করেছেন তিনি। তাঁর মতে বর্ধিত ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্র হোল অযৌক্তিক এবং অধিকার ভঙ্গকারী। ন্যূনতম রাষ্ট্রের কাজ হোল কেবল রক্ষণাবেক্ষণ প্রদান করা এবং চুক্তি বলবৎ করা। রাষ্ট্রের পক্ষে পীড়নমূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হোল অন্যায়।

নজিকের 'ন্যূনতম রাষ্ট্রের তত্ত্ব' 'ন্যায়ের হকদারিত্বের তত্ত্ব' দ্বারা আবৃত করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া যদি ন্যায়সঙ্গত হয়, তা হলে এর ফলও ন্যায়সঙ্গত হবে। নজিক বলেছেন যে, সৎ উপায়ে যদি সম্পত্তি অর্জিত হয় তাহলে তার ওপর ব্যক্তির ন্যায়সঙ্গত অধিকার থাকবে। এমনকি কোন ব্যক্তি যদি উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় সম্পত্তি পায়, তাহলে সেই সম্পত্তির ওপর ব্যক্তির হকদারিত্ব বর্তাবে। তিনি আরও বলেছেন যে, অতীতে কোন ব্যক্তির অবৈধ দখলের ফলে যদি কারও প্রতি অবিচার হয়, তাহলে সংশোধন নীতি (rectification principle) এর মাধ্যমে ব্যক্তির হকদারিত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা যাবে। সুতরাং নজিকের মতে, সম্পত্তির ওপর ব্যক্তির অধিকার আছে এবং পীড়নমূলক উপায়ে তার পুনর্বন্টন করার পিছনে কোন নৈতিক যুক্তি থাকতে পারেনা। তিনি বলেছেন যে, বন্টনের পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে কোন ব্যক্তিকে সম্পত্তির মালিকানা ও হকদারিত্ব থেকে বঞ্চিত করে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা যুক্তিহীন। তিনি মনে করেছেন যে, ঈর্ষা থেকে সাম্যের ইচ্ছা দেখা দেয় এবং বন্টনের পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে সাম্য প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা স্বাধীনতাকে ধ্বংস করে। রাষ্ট্রের কাজ হবে ব্যক্তির সম্পত্তি সুরক্ষিত করা। তাঁর মতে, সরকার যদি আইন ও নীতির সাহায্যে আয় বন্টনের একটা নির্দিষ্ট ধাঁচ (pattern) প্রবর্তন করতে চায় অথবা 'উদ্দেশ্যমূলক রাষ্ট্র' (end-state) গড়ে তুলতে চায়, তাহলে সেই প্রচেষ্টা হবে স্বাধীনতা হরণের নামান্তরমাত্র।

জন রলস্ যেমন কান্টের তত্ত্বকে নতুনভাবে গড়ে তুলেছেন, নজিক তেমনি লকের তত্ত্বকে আরও উন্নত করেছেন।[৩] সম্পত্তি ভোগ দখলের ক্ষেত্রে নজিক 'লকীয় শর্ত' (Lockean proviso) অনুসরণ করেছেন। লকের মতো তিনি বলেছেন যে, বস্তুজগতের কোন অংশের সঙ্গে শ্রম মিশ্রিত করে কোন ব্যক্তি তার মালিকানা অর্জন করতে পারে। কিন্তু দেখতে হবে যে, মালিকানাহীন বিষয় দখলের ফলে অপরের অবস্থা যেন আরও খারাপের দিকে না যায়। এবিষয়ে নজিক একটি ভিত্তিরেখা (base line)-র কথা বলেছেন, যার নীচে গেলে জনগণের আর্থনীতিক কল্যাণ ও জীবনের অধিকার বিঘ্নিত হয়। তাঁর মতে, একজনের ভোগ দখলের ফলে অপরের স্বাভাবিক অধিকার যাতে বিঘ্নিত না হয়, অর্থাৎ অপরে যাতে ভিত্তিরেখার নীচে না যায়, তার জন্য কোন ব্যক্তির বৈধ দখলের অধিকারেরও ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন। নজিকের বিশ্বাস ছিল যে, মুক্ত বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমেই এই উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। তিনি বাজারের বন্টনমূলক কাজের ফলকে নির্দোষ বলে ধরে নিয়েছেন। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে নজিক তাঁর ন্যূনতম রাষ্ট্রের তত্ত্ব থেকে সরে এসেছেন এবং সাময়িকভাবে রাষ্ট্রের বর্ধিত ক্ষমতার প্রয়োগকে সমর্থন করেছেন।[১] অতীতের অবিচারের সংশোধনের জন্য সাময়িকভাবে আয় বন্টনের নির্দিষ্ট ধাঁচ গ্রহণের কথা বলেছেন তিনি। এর মূল উদ্দেশ্য হোল সব থেকে কম সুবিধাপ্রাপ্ত গোষ্ঠীর অবস্থার উন্নতি ঘটানো। এক্ষেত্রে নজিকের 'সংশোধন নীতি' রলসের 'পার্থক্যের নীতি' (difference principle) অপেক্ষা বেশি সরকারি হস্তক্ষেপকে সমর্থন করে।[২] এক্ষেত্রে নজিকের দর্শনের মধ্যে কিছুটা স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। নজিকের ন্যূনতম রাষ্ট্র ছিল কল্পরাষ্ট্র যেখানে মানুষ

স্বাধীনভাবে যোগদান করতে পারত। নজিককে অনেকে বলেছেন স্বাধীনতার একজন অনিচ্ছুক দার্শনিক, যিনি তাঁর তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ দেখতে চাননি। তবে ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্যবাদী আন্দোলনে তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন তা আমরা অস্বীকার করতে পারিনা।

অনুশীলনী — ২

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। অধিকার-ভিত্তিক ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্যবাদ কী ?

২। নজিক 'ন্যূনতম রাষ্ট্র' বলতে কী বুঝেছেন ?

৩। 'হকদারিত্ব তত্ত্ব' কী ?

৪। সংশোধন নীতির প্রয়োজন কখন হয়ে থাকে ?

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। রবার্ট নজিকের ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্যবাদ পর্যালোচনা কর।

২.৩.২ ঃ সমতাবাদী উদারনীতিবাদ

সমতাবাদী উদারনীতিবাদ কেবল স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দেয় না, সাম্যকেও গুরুত্ব দেয়। বস্তুত উদারনীতিবাদের মূল কথা হোল সকলের জন্য সমান স্বাধীনতা। কিন্তু সনাতন উদারনীতিবাদে সাম্যকে স্বাধীনতার পরিপন্থী বলে মনে করা হোত। তবে গত তিন দশক ধরে উদারনীতিবাদের দার্শনিক বিকাশে সাম্য ও ন্যায়ের আদর্শের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপের ফলে স্বাধীনতার নৈতিক প্রাধান্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। রোনাল্ড ডয়োর্কিন হোলেন এই সাম্য বা ন্যায়ভিত্তিক উদারনীতিবাদের অন্যতম প্রবক্তা। তিনি 'টেকিং রাইটস্ সিরিয়াসলি' (Taking Rights Seriously) [1977] গ্রন্থে এবং 'লিবার‍্যালিজম্' (Liberalism), 'হোয়াট ইজ ইকোয়ালিটি' (What is Equality) প্রভৃতি রচনায় সমতাবাদী উদারনীতিবাদের নীতি উপস্থাপিত করেছেন। রলসের মতো তিনি ও কান্টের উদারনীতিবাদের পুনরুত্থান ঘটিয়েছেন এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজের বর্ণনা প্রসঙ্গে হিতবাদকে পরিহার করেছেন। তাঁরা এমন এক নৈতিক তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন, যার দ্বারা সকল মানুষের সমান মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে রাষ্ট্রনীতিক সমাজের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এদিক থেকে রলসের মতো ডয়োর্কিনও পরোৎকর্ষবাদ (Perfectionism) বিরোধী ছিলেন।[৩] রলস ও ডয়োর্কিন ন্যায়ের হকদারিত্বের তত্ত্বের বিরোধী ছিলেন।

রলসের মতো ডয়োর্কিন সম-স্বাধীনতার নীতিতে বিশ্বাসী হলেও উভয়ের আলোচনা পদ্ধতি ছিল ভিন্ন। রলস্ কান্টের চুক্তিবাদী পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু ডয়োর্কিনের আলোচনার ভিত্তি ছিল এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি সমান সম্পর্ক ও মর্যাদার অধিকারী এবং মানুষকে তার উপযুক্ত সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার অর্থ হোল এই অধিকারের লঙ্ঘন।[৪] জনকল্যাণমূলক সমতাবাদ ও সম্পদের সমতাবাদ — এই দু'ধরনের সমতাবাদের মধ্যে ডয়োর্কিন

[১] Ibid.

[২] Ibid.

[৩] 'পরোৎকর্ষবাদ' হোল এক নৈতিক তত্ত্ব, যার দ্বারা বলা হয় যে, কিছু জিনিস সহজাতভাবে ভাল এবং রাষ্ট্রের উচিৎ সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতিবিধান করা।

[৪] "Every person is entitled to equal concern and respect ....." — Quoted in Sushila Ramaswamy, P. 338

সম্পদের সমতাবাদকে সমর্থন করেছেন। রলসের মতো ডয়োর্কিনও 'পুনর্বন্টনমূলক নীতি' গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ডয়োর্কিনের নীতি ছিল আরও সমতাবাদী। তিনি বলেছেন যে, সরকারের উচিৎ ভালোত্বর ধারণা সম্পর্কে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে সকল নাগরিকের প্রতি সমান সম্পর্ক ও সম্মান প্রদর্শন করা। তিনি আরো বলেছেন যে, নাগরিকের জীবন উন্নত করার জন্য সরকারের দায়িত্ব থাকবে ইতিবাচক সম্পদ বন্টনের নীতি গ্রহণ করা। এ ব্যাপারে ডয়োর্কিন বাজারী পদ্ধতি নিলাম (auction) এর মাধ্যমে সম্পদ সমভাবে বন্টনের কথা বলেছেন এবং প্রকৃতিগত দিক থেকে অসুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন। অনেক উদারনীতিবাদী সমালোচক ডয়োর্কিনকে উদারনীতিবাদ-বিরোধী দার্শনিক বলে মন্তব্য করেছেন ; কারণ তিনি সাম্যের কাছে স্বাধীনতাকে বলি দিয়েছেন। কিন্তু ডয়োর্কিন মনে করেছেন যে, স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে কোন বিরোধ নেই এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক সঠিকভাবে উপলব্ধি করা যায় যদি স্বাধীনতাকে সাম্যের অধীনে রাখা যায়।

জন রলসের 'নতুন সমতাবাদ' (New Egalitarianism) ঃ ডয়োর্কিন যে সমতাবাদের কথা বলেছেন তা হোল রক্ষণশীল সমতাবাদ, যেখানে সম্পদের বন্টন এমনভাবে করার কথা বলা হয়েছে যে, প্রত্যেকে সমপরিমাণ না পেলেও তার পরিমাণে সন্তুষ্ট থাকবে এবং তার কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সমর্থ হবে। জন রলস্ (১৯০২-২০০২) তাঁর তত্ত্বের মধ্যে উদারনীতিবাদের ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্যবাদী আদর্শের সঙ্গে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের আর্থনীতিক সমতাবাদের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। 'নতুন সমতাবাদ' নামে নতুন ধরনের আন্দোলনের অপরিহার্য অংশ রূপে তাঁকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।[১] ১৯৬০ এর দশকে রলস্ সমাজতান্ত্রিক মতবাদের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এতে বলা হোত যে, একমাত্র সমাজতন্ত্রই সমাজে সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বন্টন প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। সেইজন্য রলস্ তাঁর ন্যায়তত্ত্বের মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছেন যে, উদারনীতিক নীতি ও সমাজতান্ত্রিক সমতাবাদের নীতি একসঙ্গে সহাবস্থান করতে পারে। তাঁর নৈতিক দর্শনে স্বাধীনতা ও সাম্যের নীতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা হয়েছে। বস্তুত, বিংশ শতাব্দীর উদারনীতিক তত্ত্বের সঙ্কটের প্রেক্ষিতে রলস্ উদারনীতিবাদের এক নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এবং তাঁর ন্যায় তত্ত্বের মাধ্যমে নৈতিক তত্ত্ব ও রাজনীতিক দর্শনের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন।

রলসের উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রনীতিক দর্শনে হিতবাদের প্রাধান্য খণ্ডন করা। হিতবাদের 'সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক সুখ' নীতি পরিহার করেছেন তিনি। লক, রুশো ও কান্টের উদারনীতিক ও গণতান্ত্রিক 'সামাজিক চুক্তি' তত্ত্বকে অনুসরণ করেছেন রলস্। তবে রলস্ এমন এক উদারনীতিবাদী ধারা গড়ে তুলেছেন, যা লকের তত্ত্ব থেকে অধিকতর সমতাবাদী, আবার মার্কসবাদ থেকে অধিকতর ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্যবাদী এবং এইভাবে তাঁর ন্যায়ের তত্ত্বের মধ্যে উদারনীতিক ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শের মধ্যে সুসংবদ্ধ সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। রলস্ পরমলক্ষ্যবাদী নীতির বিকল্প পদ্ধতি গ্রহণের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, নৈতিক তত্ত্বের উদ্দেশ্য হোল আগে সঠিক নৈতিক আচরণ ঠিক করা এবং তার ভিত্তিতে নৈতিক মঙ্গল নির্ধারণ করা।[২] পরোৎকর্ষবাদের বিরোধী ছিলেন তিনি। তাই তিনি চুক্তিবাদী পদ্ধতির সাহায্যে ন্যায়ের তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন। রলস্ তাঁর ন্যায়তত্ত্ব গঠনে 'প্রতিফলনকারী ভারসাম্য' (reflective equilibrium) এর পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। এই পদ্ধতির সাহায্যে নৈতিক বিশ্বাস ও তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করা হয়। রলসের রাজনীতিক উদারনীতিবাদ 'অধিক্রমণকারী ঐকমত্য' (overlapping consensus) নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই নীতির মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন যুক্তিসঙ্গত 'ব্যাপক মত' (comprehensive views) এর মধ্যে সেতু নির্মাণের চেষ্টা করেছেন। এটিকে তিনি 'জনসাধারণের যুক্তি' (public reason) বলেও অভিহিত করেছেন।

---

[১] Asok Kr. Mukhopadhyay, 'John Rawls' Theory of Justice', in *Socialist Perspective*, vol. 31, No. 1-2, June-Sept. 2003, P. 35.

[২] "The right is prior to the good."

রলসের 'ন্যায্যতা হিসেবে ন্যায়' অধিক্রমণকারী ঐকমত্যের নীতির মূল বিষয়কেই প্রতিভাত করে। রলসের মূল ধারণা হোল এই যে, সমাজের সকল মূল্যবোধ — স্বাধীনতা এবং সুযোগ, আয় এবং সম্পদ ও আত্মসম্মানের ভিত্তি — সমভাবে বন্টন করতে হবে, যদি না এগুলির অসম বন্টন সমাজের প্রত্যেকের সুবিধায় আসে। এই সাধারণ ধারণার অস্পষ্টতা দূর করার জন্য রলস্ ন্যায়ের দু'টি নীতি ও দুটি অগ্রাধিকারের নিয়ম উপস্থাপিত করেছেন। প্রথম নীতিটি হোল সকলের জন্য সমান মৌল স্বাধীনতা সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, প্রতিটি ব্যক্তির ব্যাপকতম মৌলিক স্বাধীনতায়, যা অন্যদের সমতুল স্বাধীনতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সমান অধিকার থাকবে। দ্বিতীয় নীতিটি হোল সকলের জন্য সুযোগের ন্যায্য সমতা সম্বন্ধে। এই নীতিটির দুটি অংশ আছে। প্রথম অংশটি হোল পার্থক্যের নীতি। এতে বলা হয়েছে যে, সামাজিক ও আর্থনীতিক অসমতাগুলিকে এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যাতে সেগুলি যুক্তিসঙ্গ তভাবে প্রত্যেকের সুবিধায় আসে এবং বিশেষ করে সর্বাধিক কম সুবিধাপ্রাপ্তদের সর্বাধিক সুবিধার জন্য হয়। এই নীতিকে রলস্ সংক্ষেপে 'ম্যাক্সিমিন' (maximin) অর্থাৎ সবথেকে কম সুবিধাপ্রাপ্তদের সর্বাধিক সুবিধা দান (maximization of the minimum)ও বলেছেন। দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে যে, সামাজিক ও আর্থনীতিক বৈষম্যগুলি এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে, যাতে তারা সেইসব পদ ও মর্যাদার সঙ্গে যুক্ত থাকে যেগুলি সুযোগের সমতার অবস্থায় সকলের জন্য উন্মুক্ত। অর্থাৎ সমান যোগ্যতা ও দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি সমান সুযোগের অধিকারী।

রলসের ন্যায়তত্ত্বের প্রথম নীতিটি তাঁর উদারনীতিক তত্ত্বের ভিত্তি, এবং দ্বিতীয় নীতিটি সমাজতান্ত্রিক নীতির মূল বিষয়। অগ্রাধিকারের নিয়ম বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছেন যে, প্রথম নীতি অর্থাৎ স্বাধীনতার নীতি দ্বিতীয় নীতি অর্থাৎ সুযোগের সমতার নীতির অগ্রবর্তী। দ্বিতীয়তঃ সুযোগের সমতার নীতি আবার 'ম্যাক্সিমিন' অর্থাৎ সবথেকে কম সুবিধাপ্রাপ্তদের সবথেকে বেশি সুবিধা দানের নীতির অগ্রবর্তী। বস্তুতঃ, রলস্ সমতাবাদী উদারনীতিবাদের কথা বললেও নাগরিকের স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠা করার নীতিকে পরিহার করেছেন। 'মোটা এবং সরু' (Thick and Thin) নীতির ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, রলসের তত্ত্বে স্বাধীনতার নীতিকে 'মোটা' করা হয়েছে এবং সাম্যের নীতিকে 'সরু' করা হয়েছে।

রলসের তত্ত্ব উদারনীতিক রাষ্ট্রনীতিক দর্শনে এক গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে এই অর্থে যে, রাষ্ট্রচিন্তাবিদগণ তাঁর তত্ত্বকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন। দক্ষিণপন্থা উদারনীতিবাদী নজিক তাঁর তত্ত্বের অন্যতম সমালোচক হলেও মন্তব্য করেছেন যে জন স্টুয়ার্ট মিলের পর রলসের মতো আর কোন দার্শনিক এত গভীর ও সুসংবদ্ধভাবে নৈতিক ও রাষ্ট্রনীতিক তত্ত্ব গড়ে তুলতে সমর্থ হননি।[১] অমর্ত্য সেন রলসের কাছে তাঁর বৌদ্ধিক ঋণ স্বীকার করেছেন। বামপন্থীরা বলেন যে, রলসের তত্ত্ব ঠিক না হলেও খুবই প্রাসঙ্গিক। রলসের 'অধিক্রমণকারী ঐকমত্য' এর নীতি সাম্প্রতিককালে সাজুয্যের রাজনীতির প্রেক্ষিতে এবং ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় পুনরুত্থানের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। বস্তুতঃ নয়া উদারনীতিবাদের বিকাশে রলসের অবদান আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

অনুশীলনী — ৩

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। সমতাবাদী উদারনীতিবাদ বলতে কী বোঝ ?

২। ডয়োর্কিনের উদারনীতিক সমতাবাদকে তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে।

৩। রলসের 'নতুন সমতাবাদ' কী ?

[১] Asok Kr. Mukhopadhyay, in *Socialist Perspective*, P. 36.

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। উদারনীতিক সমতাবাদী হিসেবে ডয়োর্কিন ও রলসের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর।

২.৩.৩ ঃ উদারনীতিক বহুত্ববাদ ও উত্তর উদারনীতিবাদ

উদারনীতিবাদের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করে জন গ্রে (John Gray) তাঁর 'লিবার‍্যালিজম্' (Liberalism) গ্রন্থের মধ্যে উদারনীতিক বহুত্ববাদকে উদারনীতিবাদের অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। গ্রে'র মতে, উত্তর আধুনিক যুগে উদারনীতিক সংস্কৃতি ও উদারনীতিক রাষ্ট্রকে সর্বজনীন কর্তৃত্ব ত্যাগ করতে হবে এবং অ-উদারনীতিক সংস্কৃতি ও রাজনীতির সঙ্গে সহাবস্থান করার নীতি গ্রহণ করতে হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন আলোকপ্রাপ্তির তত্ত্বের ব্যর্থতাই সূচিত করে। উদারনীতিক মূল্যবোধগুলিকে সর্বজনীনভাবে কর্তৃত্বমূলক না ভেবে, উদারনীতিবাদকে পরস্পর-বিরোধী মূল্যবোধগুলির মধ্যে সমন্বয়ের নীতি হিসেবে ভাবা উচিত। এই দিক থেকে বিচার করলে, উদারনীতিক দর্শন সর্বজনীন ঐকমত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত কোন তত্ত্ব নয়, বরং একমত না হতে পারা পক্ষগুলির মধ্যে বোঝাপড়া (*modus vivendi*) হিসেবে গণ্য হতে পারে। গ্রে'র মতে জে. এস. মিল যে মূল্যবোধের বহুত্ববাদের নীতিকে উদারনীতিবাদের অঙ্গীভূত করে গেছেন এবং বিংশ শতাব্দীতে ঈশাইয়া বার্লিন (Isaiah Berlin) যাকে প্রাধান্য দিয়েছেন সেই বহুত্ববাদী নীতিরই উন্নতি ঘটিয়ে উত্তর-উদারনীতিবাদী তত্ত্বের মাধ্যমে উদারনীতিবাদের সঙ্কট দূর করা যেতে পারে।

২.৩.৩.১ ঃ বহুসংস্কৃতিবাদ

বস্তুত, মানুষ যে-সব বিষয়কে ঐতিহাসিকভাবে গ্রহণ করেছে এবং ভালো বলে স্বীকৃতি দিয়েছে সেই সব সাদৃশ্যহীন বহুত্ববাদী বিষয়কে উদারনীতিবাদীগণ সঠিকভাবে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে মনে করেছেন জন গ্রে।[১] সাম্প্রতিককালে উদারনীতিক সমাজ ও উদারনীতিবাদের সঙ্কটের প্রত্যুত্তরে গড়ে উঠেছে বহুসংস্কৃতিবাদ (multi-culturalism)। কিমলিকা (Kymlica), টেলর (Taylor) প্রমুখ চিন্তাবিদ বহুসংস্কৃতিবাদের অন্যতম প্রবক্তা। বহুসংস্কৃতিবাদের মূল কথা হোল ঃ (১) মানুষ সংস্কৃতিগতভাবে গ্রথিত ; (২) সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে আমরা অস্বীকার করতে পারিনা এবং তাদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক গড়ে ওঠে ; এবং (৩) প্রত্যেক সংস্কৃতি আবার অভ্যন্তরীণ দিক থেকে বহুবিধ। বহুসংস্কৃতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন রাষ্ট্রনীতিক দর্শনই মানবজীবনের পূর্ণ সত্যতা প্রতিফলিত করতে পারেনা। তাই উদারনীতিবাদও মানবজীবনের একটা বিশেষ দিক প্রতিফলিত করে, সামগ্রিক দিক নয়। বস্তুতঃ, বহুসংস্কৃতিবাদীরা নয়া উদারনীতিবাদের অতিমাত্রায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ওপর গুরুত্ব আরোপকে সমালোচনা করেছেন। তাঁরা সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও সংখ্যালঘু সংস্কৃতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বহুসংস্কৃতিবাদ উত্তর উদারনীতিবাদেরই এক বর্ধিত রূপ হিসেবে গড়ে উঠেছে।

২.৩.৩.২ ঃ কৌমবাদ

পাশ্চাত্যের উদারনীতিবাদের ক্রমবর্ধমান সঙ্কটের প্রত্যুত্তরে আর এক ধরনের মতবাদ গড়ে উঠেছে, যাকে কৌমবাদ (Communitarianism) বলা হয়েছে। এই মতবাদ উদারনীতিবাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে

[১] "Every person is entitled to equal concern and respect ....." — Quoted in Sushila Ramaswamy, P. 338

[২] Harihar Bhattacharyya, 'The Communitarian Challenge to Liberalism and its Relevance', in *Social Perspective*, vol. 31, No. 1-2, 2003, P. 96.

সমালোচনা করলেও একে উত্তর-উদারনীতিবাদেরই একটি বর্ধিত রূপ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। ম্যাকিনটায়ার (Macintyre), স্যান্ডেল (Sandel) প্রমুখ চিন্তাবিদ এই তত্ত্বের প্রবর্তক। কৌমবাদ রাজনীতিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে সর্বজনীন ভিত্তিকে পরিহার করেছে ; এর পরিবর্তে সম্প্রদায়কে এবং সম্প্রদায়ের সামাজিক তাৎপর্যকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। নয়া কান্টবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধারার পরিবর্তে গ্রীণের সমষ্টিবাদী উদারনীতিবাদী ধারাকে অনুসরণ করেছেন এই কৌমবাদের প্রবক্তাগণ। কৌমবাদীরা উদারনীতিবাদের ব্যক্তিগত সত্তার ধারণার বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের মতে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী উদারনীতিবাদে ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্যকে বিমূর্ত, নিরপেক্ষ ও সর্বজনীনভাবে দেখানো হয়েছে ; যৌথ উদ্দেশ্যকে অবহেলা করা হয়েছে। তাই তাঁরা উদারনীতিবাদের মধ্যে অতিমাত্রায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতি ঝোঁককে সমালোচনা করেছেন। তাঁরা গ্রীণের 'সামাজিক সত্তা' (Social self) কে অনুসরণ করে 'অবস্থিত সত্তা' (situated self) এর ধারণা উপস্থাপিত করেছেন। তাঁরা মনে করেছেন যে, কোন ব্যক্তির সম্প্রদায়ের প্রেক্ষিতেই তার অধিকার ও দায়িত্ব অর্জিত হয়ে থাকে। বস্তুত, কৌমবাদীরা মানুষের জীবনে স্বাধীনতা অপেক্ষা সম্প্রদায়ভিত্তিক সংঘের মূল্যকে অধিক গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন এবং এর দ্বারা সম্প্রদায়গুলির কল্যাণকে রাজনীতিক আলোচনার বিচার্য বিষয়ে পরিণত করেছেন।[২]

২.৪ ঃ রাষ্ট্রের প্রতি আগ্রহের পুনর্নবীকরণ

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উদারনীতিবাদের সঙ্কটের প্রেক্ষিতে রাজনীতিক দর্শনের অবনমন ঘটেছিল, মূল্যমান নিরপেক্ষ আলোচনার মাধ্যমে সমাজ-কেন্দ্রিক বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এর দ্বারা উদারনীতিক গণতন্ত্রের সঙ্কটকে আড়াল করার চেষ্টা হয়েছিল। পরবর্তীকালে ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের পুনরুত্থানের মাধ্যমে সীমিত রাষ্ট্রের তত্ত্ব উপস্থাপিত করা হয়েছে। কিন্তু ১৯৮০-র দশকে আবার রাষ্ট্র-কেন্দ্রিক আলোচনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে কয়েকজন চিন্তাবিদ বিশ্লেষণের গতিমুখ পরিবর্তন করেছেন। এই পরিবর্তনে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে পি. ভি. ইভানস্ (P. B. Evans), টি. স্কক্পোল (T. Skocpol) প্রমুখ চিন্তাবিদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের লেখা 'ব্রিঙ্গিং দ্য স্টেট ব্যাক ইন' (*Bringing the State Back In*) [1985] নামক বিখ্যাত গ্রন্থে রাষ্ট্রের প্রতি আগ্রহের পুনর্নবীকরণ ঘটেছে। তাঁরা তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্যে বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জাতীয় আর্থনীতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং জাপানের মতো শিল্পোন্নত উদারনীতিক গণতান্ত্রিক দেশসমূহেও সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যথেষ্ট পরিমাণে তার স্বাধিকার বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। এঁদের বক্তব্য ছিল এই যে, রাষ্ট্র সমাজ থেকে স্বাধীন ; তাই এই রাষ্ট্রকে বুঝতে গেলে তার সামাজিক সম্পর্ককে নয়, বুঝতে হবে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও সামর্থ্যকে। উন্নয়নশীল ও উন্নত উভয়প্রকার দেশেই রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.৫ ঃ রাষ্ট্রকে পিছনে ঠেলে দেওয়ার তত্ত্ব ও বিশ্বায়ন

রাষ্ট্রকে পিছনে গুটিয়ে নেওয়া (Rolling back the State) এর ধারণা ১৯৭০-র দশকে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং ৮০-এর দশকে চরম রূপ লাভ করে। পাশ্চাত্য উদারনীতিক গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা সংক্রান্ত ধারণায় এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ধারা চলে আসে। নয়া দক্ষিণপন্থা অর্থনীতি ও রাজনীতিক তত্ত্বের সঙ্গে এই ধারণা যুক্ত হয়ে পড়ে। সেই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রেগান ও যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী থ্যাচার এই তত্ত্বের অন্যতম সমর্থক ও প্রয়োগকারী ছিলেন। তাঁরা সরকারের আকৃতি ও ভূমিকা হ্রাস করেছিলেন এবং মুক্ত বাজার অর্থনীতির পূর্ণ ভূমিকার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করেছিলেন।

সাম্প্রতিককালে বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিবেদনে এই রাষ্ট্রকে গুটিয়ে নিয়ে যাওয়ার ধারণা ঘোষণা করা হয়। ১৯৯১ সালে 'ওয়ার্লড ডেভেলপমেন্ট' রিপোর্টে 'দ্য চ্যালেঞ্জ অব ডেভেলপমেন্ট' প্রকাশ করা হয়। এতে বলা হয় যে,

'বিকাশ' হবে বাজার-বন্ধু প্রকৃতির। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ কেবল অপরিহার্য ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে। এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অতিরিক্ত সরকারি হস্তক্ষেপ আমলাতন্ত্র, দুর্নীতি প্রভৃতি বৃদ্ধি করেছে, উৎপাদন বৃদ্ধি হ্রাস করেছে, রাজনীতিক স্থায়িত্ব ক্ষুণ্ণ করেছে। উন্নয়নশীল দেশেও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বাজারের বিকৃতি ঘটিয়েছে, উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যাহত হয়েছে। তাই এই ধারণার মূল কথা হোল 'বাজার'। যা বেসরকারি তাই ভালো, আর সরকারি সব কিছুই মন্দ। বর্তমান আর্থনীতিক সঙ্কটের সমাধানের উপায় হোল বেসরকারীকরণ।

এইভাবে দেখা যায় যে, নয়া-উদারনীতিবাদের 'সীমিত রাষ্ট্র' বা 'ন্যূনতম রাষ্ট্রের' তত্ত্ব এবং 'মুক্ত বাজার' অর্থনীতির ফসল হোল বিশ্বায়ন। পূর্ব ইউরোপের পতন, একমেরু বিশ্বের আধিপত্য নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। জাতিসমূহের রাজনীতিক সীমানাসমূহ অতিক্রম করে আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের প্রসার ঘটেছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে পরিকাঠামোগত পরিবর্তন ঘটাতে হয়েছে। বহুজাতিক সংস্থাগুলি রাষ্ট্রের জনকল্যাণমূলক পরিকাঠামো ধ্বংস করেছে। বিশ্বায়ন নয়া সাম্রাজ্যবাদের রূপ নিয়েছে। জনকল্যাণমূলক সংস্থারূপে রাষ্ট্রের ভূমিকা বিশ্বব্যাপী খর্ব করে জনগণকে মুক্ত বাজার অর্থনীতির নিয়মের অধীনে আনা হয়েছে। পুঁজির তুলনায় জাতিরাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্র তার জনকল্যাণমূলক নীতি ধ্বংস করে বিশ্বব্যাপী উদারীকরণের নীতি কার্যকর করছে। এই প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে বিশ্বায়ন হোল নয়া উদারনীতিবাদেরই কাঠামোগত বর্ধিত রূপ।

অনুশীলনী — ৪

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। গ্রে'র মতে, উত্তর-উদারনীতিবাদের সমস্যার সমাধান কী ?

২। বহুসংস্কৃতিবাদ কী ?

৩। সম্প্রদায়বাদিতা কী ?

৪। স্ককপোলের 'রাষ্ট্রকে ফিরিয়ে আনার নীতি' কী ?

৫। 'রাষ্ট্রকে পিছনে গুটিয়ে নিয়ে যাওয়া'র ধারণা কীভাবে গড়ে ওঠে ?

৬। বিশ্বায়নকে নয়া উদারনীতিবাদের বর্ধিত রূপ বলা হয় কেন ?

২.৬ ঃ সারসংক্ষেপ

উদারনীতিবাদ ও নয়া-উদারনীতিবাদকে বিভিন্ন গোষ্ঠীর চিন্তাবিদ নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা করেছেন। রক্ষণশীলরা একভাবে করেছেন, আবার সংস্কারবাদীরা অন্যভাবে করেছেন। নারীবাদীরা আর একভাবে করেছেন। মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয় যে, উদারনীতিবাদ হোল ধনতন্ত্রের আদর্শগত ধুম্রজাল।[১] মার্কস্‌বাদী সমালোচক সি. বি. ম্যাকফারসন মন্তব্য করেছেন যে, রলস্ প্রমুখ তাত্ত্বিকের নয়া-উদারনীতিবাদ বেসরকারি পুঁজিবাদী মালিকানার সমর্থনে গড়ে উঠেছে। তিনি উদারনীতিক আদর্শকে 'অধিগ্রাহী ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ' (Possessive individualism) বলে মন্তব্য করেছেন, যেখানে মানুষকে 'সীমাহীন আগ্রহী ভোক্তা' রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। মার্কস্‌বাদীগণ উদারনীতিবাদকে

[১] G. W. Smith, ed. Liberalism, Vol. I, P. 4

[২] "Liberalism is not a kind of thing that has an essence." — John Gray, Two Faces of Liberalism, in G. W. Smith, Liberalism, Vol. I, P. 81

[৩] John Gray, *Liberalism*, P. 86

বুর্জোয়াদের 'মিথ্যা চেতনা' বলেও মন্তব্য করেছেন। কৌমবাদের সমর্থকগণও উদারনীতিবাদকে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা করেছেন।

কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, উদারনীতিবাদ এক জায়গায় থেমে থাকেনি। পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে উদারনীতিবাদ রাষ্ট্র, পুরসমাজ ও নাগরিকের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে পরিবর্তিত আকারে উপস্থাপিত করেছে। সুতরাং উদারনীতিবাদের বিভিন্ন দিকগুলি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, উদারনীতিক তত্ত্ব কোন সাধারণ ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। গ্রে যথার্থই বলেছেন যে, উদারনীতিবাদের কোন মৌল সত্তা নেই।[২] তবে তিনি বলেছেন যে, উদারনীতিবাদী ধারার বিভিন্ন দিকের মধ্যে মানুষ ও সমাজ সম্পর্কিত ধারণার চারটি উপাদান উদারনীতিবাদকে একটি বিশেষ রূপ দিয়েছে ঃ (১) উদারনীতিবাদ হোল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী, কারণ এই মতবাদ সামাজিক সমষ্টিবাদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিকে নৈতিক প্রাধান্য দেয় ; (২) উদারনীতিবাদ হোল সমতাবাদী, কারণ এর দ্বারা সকল মানুষের সমান নৈতিক মর্যাদা স্বীকৃত হয় ; (৩) উদার-নীতিবাদ মনুষ্যপ্রকৃতির নৈতিক ঐক্যকে স্বীকার করে সর্বজনীনতাকে প্রতিফলিত করে ; এবং (৪) উদারনীতিবাদীরা মনে করেন যে, মানুষের চেষ্টার দ্বারাই মানবজীবনের সার্বিক উন্নতি ঘটতে পারে। রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে ও প্রেক্ষিতে এই উপাদানগুলি পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও পুনর্গঠিত হয়েছে। কিন্তু সপ্তদশ শতক থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত উদারনীতিবাদ একটিই ধারা হিসেবে থেকে গেছে। বিভিন্ন সময়ে উদারনীতিবাদ নানাভাবে সংশোধিত হলেও মানুষ ও সমাজ সম্পর্কিত ধারণা উদারনীতিবাদকে এক অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি ও সুনির্দিষ্ট সাযুজ্য প্রদান করেছে।[৩]

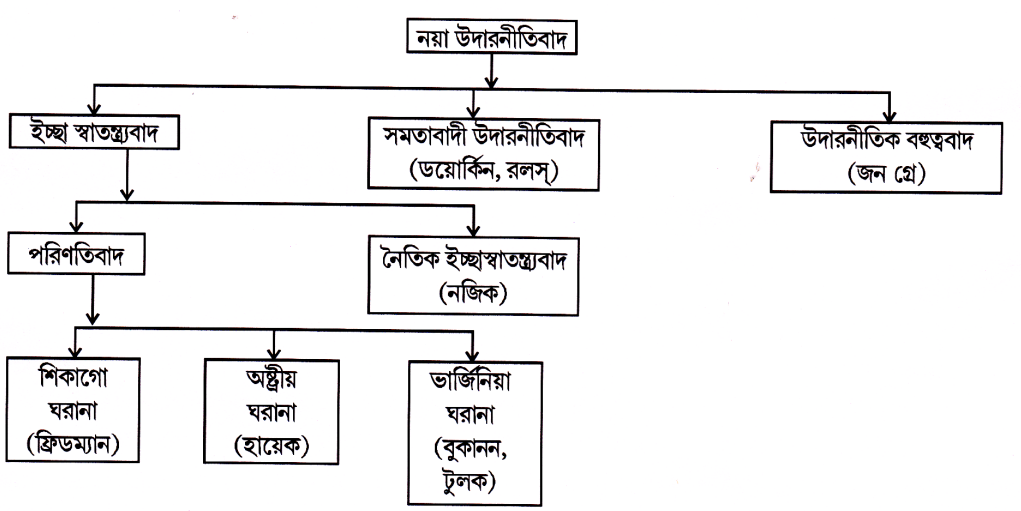

২.৭ ঃ প্রধান শব্দগুচ্ছ

ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্যবাদ (Libertarianism) ঃ নয়া উদারনীতিবাদের একটি অন্যতম দিক। ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্যবাদীরা বিশ্বাস করতেন যে, রাষ্ট্র কোনভাবেই স্বাধীনতা হ্রাস করতে পারে না, এবং ব্যক্তির সর্বাধিক স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য থাকা উচিত।

পরিণতিবাদ (Consequentialism) ঃ ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্যবাদের একটি ধরণ। এই মতবাদে, লক্ষ্যের কোন সহজাত মূল্য নেই। স্বাধীনতার সহায়ক মূল্য আছে, নৈতিক মূল্য নেই।

গণপছন্দ তত্ত্ব (Public Choice Theory) ঃ রাজনীতিক আচরণের বিশ্লেষণে আর্থনীতিক ধারণা ও কৌশলের প্রয়োগ। বুকানন, টুলক প্রমুখ অর্থনীতিবিদ এই তত্ত্বের প্রবক্তা।

হকদারিত্ব তত্ত্ব (Entitlement Theory) ঃ পদ্ধতিগত ন্যায় তত্ত্বের একটি অন্যতম দিক হোল হকদারিত্ব তত্ত্ব। সৎ উপায় বা ন্যায়সঙ্গতভাবে সম্পত্তি অর্জিত হলে তার ওপর ব্যক্তির হকদারিত্ব থাকে। নজিক এর অন্যতম প্রবক্তা।

পরোৎকর্ষবাদ (Perfectionism) ঃ এটি হোল এক নৈতিক তত্ত্ব, যেখানে বলা হয় যে, কিছু জিনিস সহজাতভাবে ভালো, এবং রাষ্ট্রের উচিত সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতি বিধান করা।

প্রতিফলনকারী ভারসাম্য (Reflective equilibrium) ঃ এই পদ্ধতির সাহায্যে নৈতিক বিশ্বাস ও তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সমন্বয় সাধন করা হয়।

অধিক্রমণকারী ঐকমত্য (Overlapping Consensus) ঃ বিভিন্ন যুক্তিসঙ্গত ব্যাপক মতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

'Maximin' (maximization of the minimum) ঃ সবথেকে কম সুবিধাপ্রাপ্তদের সবথেকে বেশি সুবিধা প্রদান।

Modus Vivendi ঃ একমত না হতে পারা পক্ষসমূহের মধ্যে বোঝাপড়া।

'Roll-back State' ঃ সীমিত রাষ্ট্রের তত্ত্ব।

'Bringing the State Back In' ঃ ১৯৮০-র দশকের উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন রাষ্ট্রের ধারণা। স্কচপোল এর অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন।

২.৮ ঃ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

অনুশীলনী —১

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ

১। অনুচ্ছেদ ২.২ দেখুন।

২। অনুচ্ছেদ ২.৩.১ দেখুন।

৩। অনুচ্ছেদ ২.৩.১.১ দেখুন।

৪। অনুচ্ছেদ ২.৩.১.১.১ দেখুন।

৫। অনুচ্ছেদ ২.৩.১.১.২ দেখুন।

৬। অনুচ্ছেদ ২.৩.১.১.৩ দেখুন।

অনুশীলনী — ২

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ

১। অনুচ্ছেদ ২.৩.১.২ (পৃষ্ঠা ১১-১২) দেখুন।

২। অনুচ্ছেদ ২.৩.১.২ (পৃষ্ঠা ১২-১৩) দেখুন।

৩। অনুচ্ছেদ ২.৩.১.২ (পৃষ্ঠা ১৩-১৪) দেখুন।

৪। অনুচ্ছেদ ২.৩.১.২ (পৃষ্ঠা ১৪) দেখুন।

রচনাত্মক প্রশ্নের উত্তর ঃ

১। অনুচ্ছেদ ২.৩.১.২ দেখুন।

অনুশীলনী — ৩

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ

১। অনুচ্ছেদ ২.৩.২ (পৃষ্ঠা ১৫) দেখুন।

২। অনুচ্ছেদ ২.৩.২ (পৃষ্ঠা ১৫-১৬) দেখুন।

৩। অনুচ্ছেদ ২.৩.২ (পৃষ্ঠা ১৬-১৯) দেখুন।

রচনাত্মক প্রশ্নের উত্তর ঃ

১। অনুচ্ছেদ ২.৩.২ দেখুন।

অনুশীলনী — ৪

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ

১। অনুচ্ছেদ ২.৩.৩ দেখুন।

২। অনুচ্ছেদ ২.৩.৩.১ দেখুন।

৩। অনুচ্ছেদ ২.৩.৩.২ দেখুন।

৪। অনুচ্ছেদ ২.৪ দেখুন।

৫। অনুচ্ছেদ ২.৫ দেখুন।

৬। অনুচ্ছেদ ২.৫ দেখুন।

২.৯ ঃ নমুনা প্রশ্নাবলী

Essay Type :

1. Analyse the main issues of contemporary liberalism.
2. Examine the main features of neo-liberalism.

Short Type :

1. What is meant by the idea of 'rolling back the State' ?
2. In what sense can globalisation be regarded as an expansion of neo-liberalism ?
3. Identify the main features of neo-liberalism.
4. What is New Right Theory ?

২.১০ ঃ গ্রন্থপঞ্জী

1.G. W. Smith (ed.) *Liberalism* : *Critical Concepts in Political Theory*, Routledge, London, 2002, Vol I-IV.

2.John Gray, *Liberalism*, World View, Delhi, 1998.

3.Desmond S. King, *The New Right* : Politics, Markets and Citizenship, The Dorsey Press, Chicago, 1987.

4.Sushila Ramaswamy, *Political Theory* : Ideas and Concepts, Macmillan, 2003, Delhi.

5.The Indian Journal of Public Administration, Special Number on Liberalisation and Social Concerns, July-Sept. 1996, vol. XLII, No. 3.

দ্বিতীয় পত্র

প্রথম অর্ধ

এল. টি. হবহাউস ঃ স্বাধীনতা তত্ত্ব

চিরায়ত উদারনীতিবাদীদের থেকে ব্যতিক্রম হিসাবে হবহাউসকে চিহ্নিত করা যায়, যিনি রাষ্ট্রের সীমিত ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে অনিয়ন্ত্রিত ইতিবাচক স্বাধীনতার ধারণাকে ব্যাখ্যা করেছেন।

পুরাতন উদারনৈতিক চিন্তাধারায় রাষ্ট্রীয় কার্যের নেতিবাচক ধারণার আবেদন ক্রমশ শিথিল হয়ে যাওয়ার শেষপর্বে তথা বিংশ-শতাব্দীর সূচনাপর্বে পুঁজিবাদের বিকাশের সাথে সাথে উদার নৈতিক কাঠামোর মধ্যেই জনকল্যান ও সমাজবাদের সংহতির ক্ষেত্রে ইতিবাচক রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর তাত্ত্বিক কাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ জোরদার হচ্ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর শুরু — এরকম যুগ সন্ধিক্ষণে চিরায়ত উদারনীতিবাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ হবহাউস নয়া উদারনীতিবাদের প্রবক্তা হিসাবে অগ্রণী ভূমিকা নেন।

হবহাউসের মতে, "১৮৩২ থেকে ১৮৮৬-এই সময় পর্ব জুড়ে পুরাতন ইংরেজ উদারনীতিবাদীগণ ও সংস্কারবাদীগণ রাষ্ট্রের কার্যাবলী সীমিত করার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু বর্তমানের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন, এই ভিন্ন পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে রাষ্ট্রের বর্ধিত ইতিবাচক কার্যাবলীর প্রতি সমর্থন বৃদ্ধি পেয়েছে।"

'সাধারণ কল্যান' সম্পর্কিত ধারণা ঃ

হবহাউসের সামাজিক তত্ত্বে 'সাধারণের কল্যান' ধারণাটি — যাকে তিনি যুক্তিসিদ্ধ কল্যান (Rational good) বলেছেন — জৈবিক সমাজ ধারণার ভিত্তি হিসাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সাধারণের কল্যান হোল সেই কল্যান যার মধ্যে সকল ব্যক্তিরই অধিকার আছে। মানুষের ব্যক্তি-অধিকার কখনই সাধারণের কল্যানের উর্দ্ধে নয়। সাধারণের কল্যান ধারণাটির পরিপ্রেক্ষিতেই আত্মোপলব্ধির বিষয়টি অর্থবহ হয়ে ওঠে। হবহাউসের মতে, মানব ঐক্য বা সমন্বয়ের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংহতি তখনই সম্ভব হয় যখন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি আবেগগুলিকে যুক্তিসিদ্ধ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা যায়। একইভাবে সামাজিক ঐক্য (social harmony) নির্ভর করে বিভিন্ন মানুষের সহযোগিতা ভিত্তিক একতার উপর। তাঁর মতে, সমাজে এই পারস্পরিকতাই হোল স্বাধীনতার ভিত্তি। বস্তুতপক্ষে ব্যক্তির সঠিক বিকাশ নির্ভর করে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সাধারণের কল্যানকে সুনিশ্চিত করার উপর।

অনিয়ন্ত্রিত নেতিবাচক স্বাধীনতার ধারণাকে হবহাউস গ্রহণ করেননি। সমন্বয়ের নীতিতে সমাজ একটি সজীব সামগ্রিক সত্তায় পরিণত হয় সহযোগিতামূলক কার্যাবলী ও পারস্পরিক দায়বদ্ধতার মাধ্যমে। ব্যক্তি কতটা স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে তা নির্ভর করে পারস্পরিক সংঘাত থেকে নিজস্ব অনুভূতি, প্রথা, আইন ইত্যাদিকে কতটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে তার উপর। স্বাধীনতা যেহেতু একটি সামাজিক ধারণা হবহাউসের মতে — সেহেতু সমস্ত সামাজিক স্বাধীনতাই নিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভর করে। নিয়ন্ত্রণের পরিধি গতিশীল ও বর্ধিত প্রকৃতির। গতিশীল নিয়ন্ত্রণের পরিধি যত বাড়বে, স্বাধীনতার পরিধিও তত বৃদ্ধি পাবে। মানুষের ত্রুটিপূর্ণ প্রকৃতির জন্যই নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন রয়েছে। তাই নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্য নয় — বরং লক্ষ্যে পৌঁছনোর উপায় মাত্র। স্বাধীনতার বিস্তৃতি হোল ঐ নির্দিষ্ট লক্ষ্যের একটি প্রধান উপাদান।

হবহাউসের পরবর্তী যুক্তি হোল — স্বাধীনতার সমস্যা প্রকৃতপক্ষে নিয়ন্ত্রণকে সংগঠিত করার সমস্যা। বিষয়টি এই রকম ঃ যদি নিয়ন্ত্রণ আরোপ স্বাধীনতার পরিধিকে বৃদ্ধি করে, তাহলে কোন্ ধরনের নিয়ন্ত্রণ এক্ষেত্রে

প্রাসঙ্গিক ? স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বা স্বাধীনতার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ এমন কোন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কি আমরা দেখতে পাই ? অন্যভাবে বলা যায় যে, কোন্ ধরনের দমননীতি স্বাধীনতার সহায়ক হতে পারে এবং এর সমস্যা কোথায় ?

হবহাউস যুক্তি দিয়ে বলেছেন — অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করে সকলের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা অনুমান মেনে নিতে হলে স্বাধীনতার নীতিকে সামাজিক করা দরকার। কিন্তু সামাজিক শৃঙ্খলায় এটা সুসংহত নয়। হবহাউসের মতে, যদি স্বাধীনতা ভোগের পরিবেশটাই অনিশ্চিত ও বৈষম্যমূলক হয়, তাহলে 'সাধারণের কল্যান' ধারণার প্রেক্ষিতে সকলের জন্য সমান স্বাধীনতার কথা অর্থহীন হয়ে পড়ে। এই যুক্তির দিক থেকে মিলের স্বাধীনতার ধারণা-যেখানে মিল ব্যক্তির কাজকে ব্যক্তিগত আচরণ (Self regarding) এবং সমাজ সংক্রান্ত আচরণ (other regarding) এই দু'ভাগে ভাগ করেছেন — তা হবহাউস মেনে নেননি। তিনি বলেছেন, মানুষের জীবনে এমন কোন দিক নেই যা সমাজের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ নয়। সুতরাং ব্যক্তির ব্যক্তিগত আচরণ বলে কিছু থাকতে পারে না এবং এরকম পরিবেশে সকলের কল্যানের বাইরে কিছু থাকতে পারে না।

সাধারণের কল্যান ধারণা — হবহাউসের মতে স্বাধীনতার প্রকৃতি সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। প্রতিটি ব্যক্তির স্বাধীনতা অপরের স্বাধীনতা দ্বারা সীমাবদ্ধ। যুক্তির দিক থেকেই এটা বলা যায় কারণ সকলের কল্যানের মধ্যেই ব্যক্তি স্বাধীনতার অর্থ নিহিত আছে, সব অধিকার হোল স্বাধীনতা এবং ব্যক্তির ঐ স্বাধীনতা ভোগ নির্ভর করে সকলের নিরাপত্তার উপর। এই প্রসঙ্গে হবহাউসের উক্তি উল্লেখযোগ্য — "অধিকারের মধ্যেই আমরা একটি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা দেখতে পাই যা কিনা সমস্ত ধরনের স্বাধীনতার ভিত্তি।"

টি. এইচ. গ্রীনের মতই ভাববাদী দৃষ্টিতে হবহাউস বলেছেন — স্বাধীনতা সামাজিক বন্ধনের অতিন্দ্রিয় প্রকৃতি ও জনকল্যানের যুক্তিভিত্তিক চরিত্রের উপর নির্ভর করে। ব্যক্তি একটি নৈতিক সত্তা এবং নৈতিকতাকে কখনও জোর করে তৈরী করা যায় না। নৈতিকতা হোল মুক্ত সত্তা বিশেষ। বিভিন্ন মানুষের মধ্যে সহিষ্ণুতার সীমা মুক্ত সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করে। হবহাউসের মতে, সম-মানসিকতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা সম্ভব নয়। কিন্তু সমরূপতার চেয়ে সহিষ্ণুতা সামাজিক জীবনকে অনেক বেশি উন্নত করে।

স্বাধীনতা ও দমনমূলক নিয়ন্ত্রণ - এই উভয়ের মধ্যে নীতিগতভাবে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব ? — এই প্রশ্ন হবহাউস বারবার উত্থাপন করেছেন। উত্তরে তিনি বলেছেন, স্বাধীনতা কোন বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়; সকলেই সমানভাবে স্বাধীনতা ভোগ করবে এই সামগ্রিক সামাজিক মানসিকতা ও পারস্পরিক সম্পর্ক সমূহের সঙ্গে স্বাধীনতা ধারণাটি ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। এই স্বাধীনতার একটি শর্ত দমনমূলক নিয়ন্ত্রণ, যা স্বাধীনতার নিশ্চয়তাকে প্রতিফলিত করে। 'হবহাউসের মতে, ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তির উপর নির্ভর করে না। স্বাধীনতা ভোগের ক্ষেত্রে গোষ্ঠী সদস্য হিসাবে ব্যক্তি অন্যের স্বাধীনতা ভোগের বিষয়টি দ্বারা প্রভাবিত হয়। তিনি বলেছেন, যেহেতু অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে কখনই প্রকৃত স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারেনা সেহেতু প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য কিছুটা দমনমূলক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। অন্যকথায়, এই ধরনের দমন প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার শর্ত।

এই ধরনের বক্তব্য স্ববিরোধী মনে হতে পারে যে, স্বাধীনতা নিজেই দাবী করে নিয়ন্ত্রণকে। কিন্তু হবহাউস মনে করেন — স্বাধীনতা ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই। প্রকৃত বিরোধ রয়েছে সেখানে যেখানে দমননীতি ব্যক্তিগত শৃঙ্খলাকে বিনষ্ট করে এবং যে দমন পার্থিব অপার্থিব জগতের স্বাধীন বিকাশকে ব্যাহত করে। হবহাউস স্বাধীনতা বনাম কর্তৃত্ব বা বলপ্রয়োগ এমন বিরুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গীতে স্বাধীনতার সমস্যাকে ব্যাখ্যা করেননি। তাঁর মতে, স্বাধীনতার মধ্যে ব্যক্তির দাবী, অধিকার ক্ষমতা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার বিষয় রয়েছে ; যেগুলি ভোগের ক্ষেত্রে সমাজ বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ ও বাধ্যবাধকতার দ্বারা নিশ্চয়তা প্রদান করে। এটাই একমাত্র সংগঠিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যার মাধ্যমে সমাজের সব মানুষের কাছে স্বাধীনতা প্রাপ্তি সহজ হয়। আবার, সকলের কল্যানের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত তথা

অধিকার থাকা দরকার বলেই মানুষের অবাধ্যতাকে নিয়ন্ত্রণ আবশ্যিক, বাইরে থেকে স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ বা নেতিবাচক ধারণার প্রেক্ষিতে স্বাধীনতাকে দেখলে হবে না।

হবহাউস ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীতে স্বাধীনতার ধারণাটি ব্যাখ্যা করেছেন এবং স্বাধীনতা কর্তৃত্ব বা বাধ্যবাধকতার আপাত বিরোধের সমাধানের চেষ্টা করেছেন। সাধারণের কল্যানের ধারণার আলোকে তিনি স্বাধীনতা দেখতে চেয়েছেন এবং সিদ্ধান্ত করেছেন যে, স্বাধীনতা হোল সামাজিক সমন্বয়ের 'কারণ' ও 'ফল'-এর মিশ্রিত রূপ। এটি সামাজিক সমন্বয়ের ফল কারণ স্বাধীনতার মাধ্যমেই কেবলমাত্র সকলের ইচ্ছার স্বতস্ফূর্ত সমন্বয় সম্ভব। এটি 'কারণ' এই অর্থে যে, এই সমন্বয় বা সামঞ্জস্য হোল অতিন্দ্রিয় বিকাশের সর্বোচ্চ অনুভূতি, সহযোগিতামূলক ঐক্যের মধ্যে আত্মশৃঙ্খলার পারস্পরিক শক্তির বিকাশ এবং স্বাধীনতার মধ্যে আত্ম-শৃঙ্খলার বিকাশ সাধন।

উপরিউক্ত আলোচনায় কিছু আপাত বিরোধ বা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। হবহাউস একদিকে স্বাধীনতাকে আরোপিত আত্মশৃঙ্খলা বা অর্ন্তমুখী নৈতিকতা বলে বর্ণনা করেছেন; অন্যদিকে আবার স্বাধীনতাকে তিনি নিয়ন্ত্রণের সংগঠন অথবা দমনের দমন হিসাবে দেখেছেন যেখানে রাষ্ট্রের ভূমিকা হবে স্বাধীনতার সংরক্ষণ করা। এতদসত্ত্বেও বলা যায়, হবহাউসের চেষ্টা ছিল মূলতঃ 'সাধারণের কল্যান' ধারণাকে বিকাশ সাধন করা যা স্বাধীনতার সঠিক বিকাশের জন্য প্রয়োজন।

———————

পাঠ - ২

সম্প্রদায়বাদিতা (কম্যুনিটারিয়ানইজম)

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রদর্শনে মুখ্যতঃ ব্যক্তি স্বাধীনতার সযত্ন সংরক্ষণে আগ্রহী উদারপন্থী রাজনৈতিক ভাবনার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। সপ্তদশ শতকের লকীয় রাষ্ট্রনৈতিক উদারনীতিবাদের সৌধের উপর ডেভিড রিকার্ডো ও অ্যাডাম স্মিথ 'অদৃশ্য হস্ত' বিশিষ্ট লেসেফেয়ার দর্শন গড়ে তোলেন এবং সব শেষে জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাকে এক চূড়ান্ত পরিশীলিত রূপ দেন। যদিও পরবর্তীকালে টি. এইচ. গ্রীন, এল. টি. হবহাউস এবং জে. এস. কীনস একে নতুন করে সূত্রায়িত করেন এবং উদারনীতিবাদের নতুন সংজ্ঞা দেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমষ্টিবাদের মধ্যে পর্যাপ্ত সমন্বয় সাধনও করা হয়, তবু ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল্য উদারনীতিবাদীদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হতে থাকে।

এটা অবশ্য খেয়াল করা দরকার, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পাশাপাশি সমষ্টিবাদী চিন্তা ও যাকে সম্প্রদায়বাদী দর্শন বলে অভিহিত করা যায় সেই রূপে, পাশ্চাত্য রাষ্ট্রদর্শনের ইতিহাসে উপস্থিত থেকেছে। প্রাচীন কালে অ্যারিষ্টটল সম্প্রদায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে পুণ্যের নীতিবিজ্ঞান গড়ে তোলেন, তাঁর যুক্তিধারা বিশদায়িত করেন পরবর্তীকালে টমাস অ্যাকুইনাস। আধুনিক যুগে রুশোর লেখায় এবং সবচাইতে লক্ষ্যণীয় ভাবে হেগেলের রচনায় সম্প্রদায়বাদী দৃষ্টিকোণ প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। বিশ শতকে সম্প্রদায়বাদী চিন্তাধারা অত্যন্ত জোরালোভাবে আলাসডেয়ার ম্যাকইনটায়ার, মাইকেল স্যান্ডাল এবং চার্লস টেলর-এর দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে।

সম্প্রদায়ের ধারণা বিশশতকের শেষাশেষি মার্কিন ও পশ্চিমী পন্ডিতমহলে ভাবনা চিন্তার একটি প্রধান ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। সম্প্রদায়ের হারিয়ে যাওয়া এবং 'স্থানীয়'-কে পুনরাবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশিত হতে থাকে। সম্প্রদায়বাদিতা বৈপ্লবিক বিকেন্দ্রীকরণ ও স্ব-পরিচালনার দাবির সঙ্গে, অধিকার ও দায়িত্বের পারস্পরিকতার ধারণার সঙ্গে এবং কর্তৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও সাবেকী মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিকে শক্তিশালী করে তোলার আহ্বানের সঙ্গে যুক্ত থেকেছে। সম্প্রদায়বাদী ধ্যানধারণার মর্মমূলে নিহিত প্রত্যয় হল — প্রথম, সম্প্রদায়ের একটি অনুভূতি সুস্থ সমাজের জন্য অপরিহার্য; এবং দ্বিতীয়, আধুনিক যুগে সম্প্রদায়ের বন্ধনগুলি ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে আসছে।

ম্যাকইনটায়ারের, 'After Virtue – Study in Moral Theory' 1981 সালে প্রকাশিত হয় যাতে অ্যারিষ্টটলীয় নীতিবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক নীতিশাস্ত্রীয় মতবাদের বিশ্লেষণ ও বিচার করা হয়েছে। ম্যাকইনটায়ারের মনোযোগের বস্তু হল আধুনিক নীতিশাস্ত্রীয় মতপার্থক্যগুলির অমীমাংসেয়তা, যা তাঁর মতে নৈতিকতার ক্ষেত্রে কাম্যলক্ষ্য সম্পর্কে প্রকৃত সহমতের অভাবজনিত কারণে উদ্ভূত হয়ে থাকে। সুতরাং তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, প্রজ্ঞানদীপ্ত উদারনীতিবাদ কোন সুসংহত নীতি বিজ্ঞান নির্মাণে ব্যর্থ এবং মানবপ্রকৃতির একটি অস্তিত্বশীল ধারণার উপর গড়ে উঠা অ্যারিষ্টটলীয় নীতিবিজ্ঞানে প্রত্যাবর্তনই সম্ভবতঃ একমাত্র বিকল্প।

নীতিবিজ্ঞানের এই সম্প্রদায়বাদী ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স্যান্ডাল তাঁর Liberalism and the Limits of Justice (1982) গ্রন্থে সাধারণ ভাবে উদারনীতিবাদের এবং বিশেষভাবে রলস-এর ন্যায়ের তত্ত্বের সমালোচনার মধ্য দিয়ে সম্প্রদায়বাদী রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর ধারণাটি উপস্থাপিত করেছেন। 1985 সালে প্রকাশিত হল টেলর-এর 'Philosophy and the Human Sciences : Philosophical Papers' যাতে সম্প্রদায়বাদিতার দর্শনের আরও বিকাশ সাধন করা হয়।

উদারনীতিবাদে প্রধানত দুটি বিষয় বারবার ঘুরে ঘুরে আসে — ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সীমিত রাষ্ট্র।

উদারনীতিবাদীরা বিশ্বাস করেন স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল্য এতই প্রত্যক্ষগোচর যে তার সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শনের কোনই প্রয়োজন নেই। তাঁরা বলেন, লোককে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দেওয়া পূর্ণ নৈতিক সত্তা হিসেবে তাদের সম্মান জানানর একমাত্র পন্থা। এই যুক্তি অনুসরণ করে উদারনীতিবাদীরা রাষ্ট্রের পিতৃসুলভ খবরদারির বিরোধিতা করেন, কারণ তাঁরা বলেন বাইরে থেকে, যে মূল্যবোধ ব্যক্তি অনুমোদন করেনা সেই মূল্যবোধ অনুযায়ী পরিচালিত জীবন কখনও উন্নততর জীবন হতে পারে না।

উদারনীতিবাদীদের এই অবস্থান ব্যক্তিসত্তার যে একটি ধারণার উপর নির্ভরশীল তাকে ব্যক্তিসত্তার এক নির্দায় দৃষ্টিভঙ্গি বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এর অর্থ হল, ব্যক্তিসত্তার দ্বারা যে সব লক্ষ্য স্বীকৃত হয়েছে, ব্যক্তিসত্তা সে সবের পূর্ববর্তী। অর্থাৎ, কোন বিশেষ উদ্যোগ থেকে আমরা সবসময়ই পিছিয়ে আসতে পারি এবং সেটি আমরা আর অনুসরণ করতে চাইছি কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতেই পারে। কোন লক্ষ্যই ব্যক্তিসত্তার দ্বারা সংশোধিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত নয়। একে ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে কান্টীয় মত বলেও অভিহিত করা হয় কারণ কান্ট এই মতের অন্যতম দৃঢ় সমর্থক ছিলেন যে, ব্যক্তিসত্তা সামাজিক ভাবে নির্ধারিত যাবতীয় ভূমিকা ও সম্পর্কের পূর্ববর্তী এবং তার সামাজিক অবস্থানের এইসব বৈশিষ্ট্য সূচক দিকগুলিকে সে যদি কিছুটা দূরে সরিয়ে রেখে যুক্তির কষ্টিপাথরে সে গুলির বিচার করতে সক্ষম হয় তবেই সে হতে পারে মুক্ত, স্বাধীন। এই রকম ভাবে উদারনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, প্রচলিত সামাজিক বিধিব্যবস্থায় তাদের অংশগ্রহণ করা নিয়ে ব্যক্তিবর্গের প্রশ্ন তুলবার অধিকার রয়েছেই এবং ঐসব আচরণ বিধি আর অনুসরণ যোগ্য নয় বলে মনে হলে তারা সেগুলি থেকে বেরিয়ে আসতেও পারে। সুতরাং মানুষকে কোন বিশেষ অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, দাম্পত্য অথবা বিনোদন মূলক সম্পর্কের সদস্য হিসেবে গণ্য করে সংজ্ঞাবদ্ধ করা যায়না, কারণ যে কোন বিশেষ সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন তুলবার এবং সেটিকে বাতিল করবার পূর্ণ অধিকার তার রয়েছে।

সম্প্রদায়বাদীরা এর সঙ্গে একমত নন। স্যান্ডেল বলেন, ব্যক্তিসত্তা প্রচলিত সামাজিক ব্যবহার সমূহের মধ্যে গ্রথিত বা স্থিত, আমরা সবসময় সেগুলি থেকে পিছিয়ে আসতে বা বের হয়ে যেতে পারি না। আমাদের সামাজিক ভূমিকাসমূহ এবং সম্পর্কগুলি, অন্ততঃ তাদের মধ্যে কিছু অংশকে, ব্যক্তিগত বিচারের জন্য নির্ধারিত বলে গণ্য করতেই হয়। স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সুতরাং, এইসব সামাজিক ভূমিকার মধ্যে থেকেই করা যেতে পারে, এগুলির বাইরে দাঁড়িয়ে নয়।

সম্প্রদায়বাদীরা বিশ্বাস করেন কিছু সামাজিক ব্যবহার রয়েছে যে গুলিকে সাধারণের মঙ্গলের রাজনীতির ভিত্তি হিসেবে প্রত্যেকেই অনুমোদন করতে পারে। স্যান্ডেল ও স্টেলর বলেন কিছু যৌথ লক্ষ্য রয়েছে যা সাধারণ কল্যাণের রাজনীতির ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে, সমাজের সকল গোষ্ঠীর কাছেই যা বৈধ বলে বিবেচিত হবে। এঁদের মতে এইসব যৌথ লক্ষ্যগুলিকে আমাদের ঐতিহাসিক ব্যবহার সমূহের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে।

ব্যক্তিসত্তার ধারণা ছাড়াও সম্প্রদায়বাদীরা লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক শর্তাবলীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের জন্য — উদারনীতিবাদীদের সমালোচনা করেছেন। টেলর দাবি করেন অনেক উদারনীতিবাদী তত্ত্ব 'কণাবাদ' (atomism) এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে যে মতে বলা হয়ে থাকে যে, সমাজের বাইরে ব্যক্তি স্বয়ং সম্পূর্ণ। কণাবাদী তত্ত্বগুলিতে বলা হয় যে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার বিকাশ এবং তার প্রয়োগের জন্য ব্যক্তিদের কোন সম্প্রদায়গত পরিপ্রেক্ষিতের প্রয়োজন হয় না। টেলর এর পরিবর্তে যুক্তি দেখান 'সামাজিক থীসিস' এর পক্ষে, যাতে বলা হয় ঐ ক্ষমতা (স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা) কেবল এক বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতিতে বিশেষ এক সামাজিক বাতাবরণের মধ্যে ব্যবহৃত হতে পারে।

সম্প্রদায়বাদীরা যথার্থই 'সামাজিক থীসিস' এর গুরুত্বের উপর জোর দেন এবং এইজন্যই আমাদের পছন্দের ক্ষমতার ব্যবহারের জন্য এক নিরুপদ্রব সামাজিক পরিবেশের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করে থাকেন। এবং তাঁরা

সঠিকভাবেই দাবি করে থাকেন যে, তাঁদের ঐ বক্তব্যের সঙ্গে আনুষঙ্গিক হিসেবে পৌরক্ষেত্রে অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক বৈধতার প্রয়োজনীয়তার বিষয়গুলি এসে পড়ে। এর দ্বারা ব্যক্তি অধিকার থেকে সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্বের উপর ঝোঁক সরে আসা সূচিত হয়।

সম্প্রদায়বাদিতার দর্শন ও আবার বিভিন্ন ভাবে সমালোচিত হয়েছে। সম্প্রদায়বাদী দর্শনের মূল দার্শনিক বিষয়, আমরা আমাদের সামাজিক ভূমিকাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারিনা কিংবা আমরা ব্যক্তির অঙ্গীভূত লক্ষ্যগুলি নিয়েও প্রশ্ন তুলতে পারিনা, পুরোপুরিভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। সম্প্রদায়বাদিতার এই যুক্তি, আমরা কেবলমাত্র আমাদের সামাজিক ভূমিকার অর্থকেই ব্যাখ্যা করতে পারি সামাজিক ভূমিকাগুলিকে বর্জন করতে পারিনা, সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। যে সব সামাজিক ভূমিকায় আমরা নিজেদের দেখি শুধু সেগুলির অর্থ নিয়েই নয় সেগুলির উপযোগিতা নিয়েও আমরা প্রশ্ন করে থাকি। অনুরূপভাবে সমালোচকরা উল্লেখ করেছেন যে, অধিকারের উপরে কর্তব্যগুলির গুণকীর্তন করায় সম্প্রদায়বাদিতা ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে কর্তৃত্বের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলতে পারে। উপরন্তু, সম্প্রদায়ের জন্য ভাবনার কিছু রক্ষণশীল তাৎপর্য দেখা যায়, কারণ তা বিদ্যমান সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহ, যেমন পরিবারকে, শক্তিশালী করে তোলার কথা বলে। সম্প্রদায়বাদিতা তার এইরূপ স্থিতাবস্থার বৈধতা প্রতিপাদন করতে চেষ্টা করে এবং পরিবারের ক্ষেত্রে তা গৃহবধু, মা এবং পরিচর্যাকারিণী হিসেবে মহিলাদের চিরাচরিত ভূমিকাগুলিকেই পাকাপোক্ত করে তুলতে চায়।

Further reading :

1. Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy: An Introduction, Clarendon Press, Oxford, 1990.
2. Michael Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge, Cambridge University Press, 1982.

পাঠ - ৩

বহুসংস্কৃতিবাদ

(মাল্টিকালচারালিজম)

পন্ডিতিরচনায় যেমন, তেমনি সাদামাটা লেখাতেও 'বহুসংস্কৃতিবাদ' (multiculturalism) পরিভাষাটির ঘনঘন ব্যবহার আমাদের এই সম্ভাবনা সম্পর্কে সর্তক করার পক্ষে যথেষ্ট হওয়া উচিত যে শব্দটি বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন অর্থবহন করে। পরিভাষাটির যথাযথ অনুধাবন তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

পরিভাষাটির সাম্প্রতিক প্রয়োগগুলির একেবারে প্রথম দিককার একটি উদ্ভূত হয়েছে 'বহুসাংস্কৃতিক' (Multicultural) এই বিশেষণটি থেকে, বিশেষতঃ 'বহুসাংস্কৃতিক পাঠক্রম' (Multicultural Curriculum), 'বহুসাংস্কৃতিক শিক্ষা' (Multicultural Education), 'বহুসাংস্কৃতিক সমাজ' (Multicultural Society), এই শব্দ বন্ধগুলিতে যে ভাবে তা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শেষের শব্দটি থেকেই প্রথম দুটির উদ্ভব ঘটেছে বলে মনে হয়। এটি যা সূচিত করে তা হল, এমন এক সমাজ যেখানে বিভিন্ন সংস্কৃতি বিদ্যমান রয়েছে। একটি বহুসাংস্কৃতিক সমাজের কথা বলার অর্থ হল এমন এক সমাজের — একটি রাষ্ট্র, জাতি, দেশ, অঞ্চল, এমন কি সাধারণভাবে একটি সীমাবদ্ধ ভৌগলিক ক্ষেত্র, যেমন একটি শহর বা স্কুলের সম্বন্ধে বলা, বিভিন্ন সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত লোকদের নিয়ে যা গঠিত।

এটা অবশ্য উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সমাজ বিজ্ঞানগুলিতে এই একই ব্যাপার বোঝাতে আরও অনেকগুলি পরিভাষা রয়েছে। সে সমস্তগুলির তুলনায় 'বহুসাংস্কৃতিক' শব্দটির অব্যাহত জনপ্রিয়তার পিছনে এর যথাযথ অর্থের কোন সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক রয়েছে শব্দটির গমগমে ভাবের এবং যে সমস্ত ইতিবাচক ব্যঞ্জনা সে জাগায় তার সাথে। 'জাতিকুল' (race) যদি এখন এক সন্দেহ উদ্রেককারী শব্দ হয়, তবে তার তুলনায় 'সংস্কৃতি' হল একটি গর্বিত হওয়ার মতো, বহুপ্রশংসিত শব্দ, একটি বৈশিষ্ট্য সূচক জীবনধারার সঙ্গে আবেগঘন স্মৃতি মেদুরতায় যা জড়িত হয়ে আছে, সব অপূর্ণতা সত্ত্বেও ব্যক্তির আত্মপরিচিতি ও একাত্মতা বোধের কাছে যা সরাসরি আহ্বান জানিয়ে থাকে। এবং লোকে যখন তাদের নিজেদের মধ্যে এই স্বাতন্ত্র্যবোধের অনুভূতি আবেগের যে এক তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চার করে তা উপলব্ধি করে অন্যদের জীবনেও সংস্কৃতির গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে স্বীকৃতি দিতে তারা তৈরী থাকে। 'বহুসাংস্কৃতিক' এই শব্দটি অন্যান্য সমজাতীয় পরিভাষাগুলির থেকে যেখানে আলাদা তা হল, শব্দটি শুধু একটি পার্থক্যের বোধকেই সূচিত করেনা উপরন্তু এই পার্থক্যগুলি যে নিজ নিজ সাংস্কৃতির প্রতি প্রত্যেক মানুষ সমভাবে যে গুরুত্ব আরোপ করে থাকে তা থেকেই উদ্ভূত তা স্বীকার করে এই সঙ্গে সব সংস্কৃতির সমতার এক অন্তর্নিহিত ধারণাকেও মেনে নেয়।

'বহুসাংস্কৃতিক' (multicultural) শব্দটির বিশেষ্যের রূপ 'বহুসংস্কৃতিবাদ' (multiculturalism) কেবল একটি ব্যাকরণগত নিয়মে ব্যুৎপন্ন শব্দই নয় পরন্তু তা বিভিন্ন ভাবানুষঙ্গের দ্যোতক। আগেই যে রকম বলা হয়েছে, বহুসংস্কৃতিবাদ দৃষ্টিগ্রাহ্য এবং সকলেই যা অধিগত করতে পারে সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের সেই সমস্ত উৎপন্ন বস্তু — খাদ্য, পোষাক পরিচ্ছদ, সঙ্গীত, থিয়েটার ইত্যাদি — ভোক্তা হিসাবে যা আমাদের পছন্দের পরিসর বৃদ্ধি করে আমাদের আয়ত্তাধীন জীবন চর্যায় বর্ণ ও বৈচিত্র নিয়ে আসে সে সবের দিকেই নির্দেশ করে। বহুসংস্কৃতিবাদ বৈচিত্রের এইসব নিছক দৃষ্টিগ্রাহ্য দিকগুলি থেকে পৃথিবীর ব্যাপারে নিয়োজিত হওয়ার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সহাবস্থান এবং যে পথে এই বিভিন্নতাগুলি জাতীয় এবং বিশ্বজনীন ক্ষেত্রে স্বীকৃতি অর্জনের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়, কখনও পরস্পরের মধ্যে আপেক্ষিক সামঞ্জস্য বজায় রেখে, কখনও প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পথ ধরে, সে সবের গভীরতর দার্শনিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্যের দিকে আমাদের মনোযোগকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

পরিভাষা দুটির ব্যবহারবিধিকে অন্য আর এক ভাবে দেখতে হলে তাদের শব্দার্থগত বিস্তারের উপর মনোযোগ না দিয়ে লক্ষ্য করতে হবে কিভাবে 'বহুসাংস্কৃতিক' শব্দটিকে এমন এক পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে যুক্ত করা যায় যার কেন্দ্রে রয়েছে ব্যক্তি, পক্ষান্তরে 'বহুসংস্কৃতিবাদ' বিভিন্নতার সামাজিক ও সমষ্টিগত মাত্রার মধ্য দিয়ে চিন্তা করায় আমাদের বাধ্য করে। দুটি পরিভাষার ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতের সবিশেষ প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে পশ্চিমী উদারনীতিবাদী গণতান্ত্রিক সমাজে। উদারপন্থী সমাজ এটা অবশ্যই স্বীকার করে যে, ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হওয়া উচিত, বিশেষতঃ প্রকাশ যাদের বিপদাপন্ন করতে পারে তাদের অধিকারগুলি সংরক্ষণের স্বার্থে। একই সঙ্গে ব্যক্তির কেন্দ্রস্থতা নিয়ে একটা ঐকমত্যও দেখা যায় যা পৌরস্বাধীনতার আলোচনায় প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। কেবল অতি সাম্প্রতিক কালে বিশ্বব্যাপী সচলতা বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে উদারপন্থী-গণতন্ত্রগুলি ভিন্নধর্মীতাকে ধর্তব্যের মধ্যে গণ্যকরতে বাধ্য হচ্ছে, যে ভিন্নধর্মীতা ব্যক্তির উপর মূল মনোযোগ নিবদ্ধ করা নিয়ে, অতএব, অভিযোগ করা হয়, উদারনীতিবাদের ভিত্তি নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে। এখানেই বহুসংস্কৃতিবাদ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে। আত্মপরিচিতি, জাতিকুল, ধর্ম ও জাতীয়তা ইত্যাদি বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনার ব্যাপ্তি ঘটনার যৌক্তিকতাও এ থেকে পাওয়া যায়।

বহুসংস্কৃতিবাদ, তার এই বিস্তৃততর অর্থে, এক অপেক্ষাকৃত নবোদ্ভাবিত শব্দ। কিন্তু বিভিন্ন বাহ্যরূপের আড়ালে এর তাৎপর্য উপনিবেশোত্তর জাতি গুলির কাছে, যেখানে বিভিন্নতা ও বহুধর্মীতা ব্যতিক্রম না হয়ে বরং সাধারণ নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে সে সব ক্ষেত্রে, দীর্ঘদিন ধরেই, সরাসরি উদ্বেগের ব্যাপার হয়ে আছে।

উপনিবেশোত্তর নবীন জাতিগুলির জাতিকুলগত, ধর্মীয় ও প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত সমস্যাগুলি মোকাবিলার চেষ্টার তাৎপর্য উপলব্ধি করাতেই হোক বা উত্তর-আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজগুলির নতুন নাগরিকদের ন্যায়বিচার, সমতা এবং অন্যরকম হওয়ার সুযোগের দাবিগুলির মধ্যে ভারসাম্য বিধানের সমস্যাগুলির লিপিবদ্ধ করার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেই হোক, বহুসংস্কৃতিবাদ অভিজ্ঞতার অনেকগুলি মাত্রাই যে সংকটাপন্ন একথা আমাদের মনে করিয়ে দিয়ে একটি প্রয়োজনীয় কাজ করে থাকে। পরিচিতি, এগুলির মধ্যে একটি; সদস্যতার অনুভূতি (sense of belonging) হল আর একটি; আঞ্চলিকতার বোধ, কোন বিশেষ জায়গার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধতা, হল তৃতীয়; এবং আত্মীয়তা ও পারিবারিক ঐতিহ্যের মধ্যদিয়ে খুঁজে পাওয়া অতীতের যোগসূত্র থেকে উদ্ভূত ইতিহাস চেতনা হল চতুর্থ; কার্য নির্বাহের একটি নীতি হিসেবে বহুসংস্কৃতিবাদের জন্য যা আবশ্যিক তা হল ভিন্নতাকে গ্রহণ করতে পারার মানসিকতা, পরিবর্তনকে খোলা মনে নেওয়া, সাম্যের প্রতি এক সুতীব্র অনুরাগ এবং অপরিচিত জনের মুখে নিজেদের পরিচিত মুখচ্ছবি চিনে নেবার ক্ষমতা।

Further reading :

1. C. W. Watson, Multiculturalism, Open University Press, Philadelphia, 2000.
2. D. T. Goldbers(ed), Multiculturalism : A Critical Reader, Blackwell, Oxford, 1994.

একক - ৩

আর্নেষ্ট বার্কার (১৮৭৪-১৯৬২)

রাষ্ট্র, স্বাধীনতা, অধিকার ও ন্যায় সম্পর্কে তাঁর ধারণা

[Ernest Barker (1874-1962) : His views on State, Liberty, Rights and Justice]

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ প্রেক্ষিত

৩.৩ রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কে বার্কারের ধারণা

৩.৪ স্বাধীনতা সম্পর্কে বার্কারের ধারণা

৩.৪.১ স্বাধীনতার প্রকারভেদ

৩.৪.২ স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে সম্পর্ক

৩.৫ অধিকার সম্পর্কে বার্কারের ধারণা

৩.৬ ন্যায় সম্পর্কে বার্কারের ধারণা

৩.৭ সারসংক্ষেপ

৩.৮ প্রধান শব্দগুচ্ছ

৩.৯ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

৩.১০ নমুনা প্রশ্নাবলী

৩.১১ গ্রন্থ নির্দেশিকা

৩.০ ঃ উদ্দেশ্য

প্রায় তিনশ' বছর ধরে উদারনীতিবাদ ইউরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তায় এক বিশিষ্ট মতবাদ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। কিন্তু উদারনীতিবাদ কখনই এক রৈখিক পথ ধরে বিকাশ লাভ করেনি। সাবেকী উদারনীতিবাদ যখন সঙ্কটের মধ্যে পড়েছিল তখন তা জনকল্যাণকর উদারনীতিবাদে রূপান্তরিত হয়েছিল। হবহাউস, বার্কার, ল্যাস্কি প্রমুখ চিন্তাবিদ এই উদারনীতিবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমষ্টিবাদী উদারনীতিবাদের বিকাশ ঘটান। এই এককটির পাঠ শেষ করলে বার্কারের সমষ্টিবাদী উদারনীতিবাদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে জানা যাবে ঃ

* রাষ্ট্র ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক।
* স্বাধীনতার প্রকৃতি।
* অধিকার সম্পর্কিত আলোচনা।
* ন্যায়ের ধারণা।
* বার্কারের উদারনীতিবাদের মূল্যায়ন।

৩.১ ঃ প্রস্তাবনা

বিংশ শতাব্দীর উদারনীতির চিন্তাধারার বিকাশে আর্নেষ্ট বার্কারের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর মধ্যে ছিল সৃজনশীলতার অফুরন্ত শক্তি। এই দিক থেকে তাঁকে অনেকটা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মতোই মনে হয়।[১] তবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিন্তামূলক সৃষ্টিসম্ভার সত্ত্বেও ছিলেন মুখ্যত কবি। বার্কারও তেমনি ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শী হওয়া সত্ত্বেও মূলত রাষ্ট্রচিন্তাবিদ হিসেবেই পরিচিত। ১৮৭৪ সালে ব্রিটেনের ম্যানচেষ্টার অঞ্চলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সুদীর্ঘকাল তাঁর নিরবচ্ছিন্ন অধ্যাপনা, বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দান এবং বিভিন্ন গ্রন্থাদি প্রণয়নের মাধ্যমে তিনি তাঁর চিন্তাধারার সুস্পষ্ট পরিচয় রেখে গেছেন।

বার্কার কোন বিশেষ রাজনীতিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর মতে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমষ্টিবাদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ থাকতে পারে না। কমিউনিজম্ তাঁর মনঃপুত নয়, কারণ এই মতবাদ মানুষকে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও দায়দায়িত্বের জীবন্ত উৎস হিসেবে গণ্য না করে তাকে যেন একটা মাটির পুতুলে পরিণত করে দেয়। ফ্যাসিবাদ বর্জনীয়, কারণ তা বিচারবুদ্ধি ও আলাপ-আলোচনার যুক্তিসঙ্গত প্রণালীটিকে নির্মূল করে দিয়ে সেখানে নিয়ে আসে একটা উন্মত্ত-উদ্দীপনা। আবার ফেবিয়ান সমাজতন্ত্র, যৌথব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্র, কিংবা সংঘমূলক সমাজতন্ত্র-এর কোনটিই ব্রিটেনের জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, কারণ দেশটি হ'ল আইনের অনুশাসন এবং স্বাধীনতার সনাতন ভূমি। আজীবন বার্কার শুধু একটি আদর্শের প্রতিই অবিচল বিশ্বাস স্থাপন করে গেছেন। সেটি হ'ল উদারনীতির গণতন্ত্রের আদর্শ। এই আদর্শের পিছনে রয়েছে খ্রীষ্টধর্ম সম্ভূত মানবতাবাদ। এই কারণেই তিনি ছিলেন মধ্যপন্থী; রাজনীতি তাঁর কাছে ছিল মূল্যবোধ ও ক্ষমতার একটা মীমাংসাক্ষেত্র। তিনি কোন রাজনীতিক বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন না। কিন্তু তিনি নৈতিক বিপ্লবে বিশ্বাস করতেন। টি. এইচ. গ্রীনের আদর্শবাদ তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। হবহাউসের মতো বার্কার ছিলেন উদারনীতিক আদর্শবাদী।

অ্যারিস্টটলের মতো বার্কারের কাছেও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। বার্কারের কাছে রাজনীতির বিজ্ঞান অপেক্ষা রাজনীতির দর্শন ছিল বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, রাজনীতি হল নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত দর্শন। অ্যারিস্টটলের মতো বার্কারও রাষ্ট্রকে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, রাষ্ট্রতত্ত্ব হল সামাজিক তত্ত্বের অঙ্গ। রাষ্ট্রতত্ত্বের সমস্যাগুলিকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত করেছেন বার্কার। তাঁর সমকালীন উদারনীতিবাদীদের মতো তিনিও বলেছেন যে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশই হল সমাজ ও রাষ্ট্রের লক্ষ্য।

[১] অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়, **সামাজিক ও রাজনৈতিকতত্ত্বের নীতি**, পৃষ্ঠা-১।

[২] অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা - ১২

৩.২ ঃ প্রেক্ষিত

বার্কারের চিন্তাধারাকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে দু'টি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম পর্যায়ে তিনি বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি উদারনীতিবাদের ইতিবাচক মূল্যবোধের ওপর গুরুত্ব দেবার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম পর্যায়ে রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'গ্রীক পলিটিক্যাল থিয়োরী,' ১৯১৭ (Greek Political Theory, 1917) এবং 'চার্চ, স্টেট এ্যাণ্ড স্টাডি,' ১৯৩০ (Chruch, State and Study, 1930) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইংল্যান্ডে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত রাজনীতিক বহুত্ববাদের ইংরেজ ঘরানার প্রভাব বার্কারের চিন্তাধারার উৎস হিসেবে কাজ করেছিল। এই সময়ে তিনি সমাজের বহুত্ববাদী কাঠামোর ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্র হ'ল সমাজেরই এক অঙ্গ। তবে বার্কার নিজেকে বহুত্ববাদী বলে মনে করেননি।[২] তাঁর সময়ে বহুত্ববাদী ধারণা হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছিল। পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে এবং সময়ের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে তৎকালীন চিন্তাবিদ ল্যাস্কি ছিলেন সহজ-অনুভবনশীল। সেই কারণে ল্যাস্কি বহুত্ববাদী ধারণাকে সহজেই তাঁর মনের মধ্যে টেনে নিয়ে ছিলেন। কিন্তু বহুত্ববাদ যেখানে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতাকে বিভক্ত করতে উদ্যত বার্কারের প্রধান আপত্তি ছিল সেখানে। এই বিষয়টি বাদ দিলে গোষ্ঠীর স্বপক্ষে তিনি যে সকল যুক্তি দেখিয়েছেন, সেগুলোর সঙ্গে বহুত্ববাদী ধারণার মিল সহজেই চোখে পড়ে। বস্তুত, বার্কার যৌথ-সমাজতন্ত্রবাদ (Syndicalism) ও বহুত্ববাদ এই উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েও রাষ্ট্র, সমাজ ও গোষ্ঠী সম্পর্কে অনেকটা লিন্ডসে (Lindsay)-র মতোই একটা মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করেছিলেন। এই প্রেক্ষিতে তিনি রাষ্ট্রের এমন এক ব্যাখ্যা করেছেন, যেখানে গোষ্ঠী ও সংস্থাগুলো সক্রিয় এবং সেগুলো সক্রিয় বলেই যেখানে রাজনীতির জীবনের সহনশীলতা ও ঔদার্য কাম্য।

বার্কারের দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রন্থগুলি ১৯৩০ সালের পর দু দশকের মধ্যে রচিত। এই সময়ের গ্রন্থগুলির মধ্যে 'এসেজ্ অন গভর্নমেন্ট,' ১৯৪৬ (Essays on Govrnment), 1946) এবং 'প্রিনসিপ্‌ল্‌স অব্ সোশ্যাল এ্যাণ্ড পলিটিক্যাল থিয়োরী, ১৯৫১ (*Principles of Social and Political Theory*, 1951) ছিল অন্যতম। এই গ্রন্থগুলির মাধ্যমে তিনি উদারনীতিক আদর্শ ও সংসদীয় ব্যবস্থার ওপর ফ্যাসিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে তাঁর মত প্রকাশ করেছেন। জার্মানির জাতীয় সমাজবাদ, ইতালির ফ্যাসিবাদ এবং রাশিয়ার সাম্যবাদের উদ্ভব উদারনীতিক গণতান্ত্রিক আদর্শের কাছে নতুনভাবে সঙ্কট সৃষ্টি করেছিল। এগুলি উদারনীতিক আদর্শকে বিকৃত করে প্রতিদ্বন্দ্বী মতবাদ গড়ে তুলেছিল। এই প্রেক্ষিতে বার্কার গণতান্ত্রিক নীতির আলোকে প্রতিদ্বন্দ্বী মতবাদের বিশ্লেষণ করেছেন এবং উদারনীতিক গণতন্ত্রের সদর্থক দিকগুলোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তার প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করার জন্য সুসংবদ্ধভাবে আলোচনা করেছেন।

বিংশ শতাব্দীর সূচনাতে ইংল্যাণ্ডের রাজনীতিতে সমষ্টিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ নিয়ে বিতর্কের ঝড় প্রশমিত হয়ে এসেছিল। গ্রীন-ব্রাডলে-বোসাঙ্কের প্রচেষ্টায় তখন সমষ্টিবাদ ও স্বাচ্ছন্দ্যনীতি সেখানকার রাজনীতিতে একটা স্বাভাবিক ধারণা বলে গৃহীত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কালে প্রভূত পরিমাণ সরকারী তৎপরতা দেখা দেয়। আবার ১৯১৮ সালের পর থেকেই ব্যাপক বিনিয়ন্ত্রণও প্রবর্তিত হয়। ফলে সমষ্টিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের প্রায়-অবলুপ্ত বিতর্কটি আবার আত্মপ্রকাশ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা থেকে সমগ্র চল্লিশের দশক ধরে নানা জাতীয় সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় সমষ্টিবাদের পাল্লাটাই ভারী হয়ে ওঠে। স্বাচ্ছন্দ্যনীতির সমর্থকগণ তখন সমষ্টিবাদের বিরুদ্ধে যে যুক্তি রাখেন, তাতে একটা আপোষমূলক সুরই দেখতে পাওয়া যায়। বার্ক্বারও একটি মধ্যবর্তী পন্থায় বিতর্কিত প্রসঙ্গটির মীমাংসায় উদ্যোগ নেন, রাষ্ট্রের আশু কর্তব্যের নির্দেশ দেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বার্কারের' রাজনীতিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে যে, তিনি যে উদারনীতিক ঐতিহ্যের ধারারক্ষী তাতে সমষ্টিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ— এই উভয়েরই একটা সুখকর মিলনসূত্র খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

৩.৩ ঃ রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কে বার্কারের ধারণা

বার্কারের রাষ্ট্রতত্ত্বে আইনগত দৃষ্টিভঙ্গি ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। তাঁর মতে, রাষ্ট্র হ'ল একটি আইনগত সংস্থা। রাষ্ট্র ও আইন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হ'ল আইনের মধ্য দিয়ে ন্যায়ের শাসন অক্ষুণ্ণ রাখা। রাষ্ট্র কর্তৃক ঘোষিত ও প্রযুক্ত আইনকে ব্যক্তি মেনে চলতে বাধ্য। কারণ কর্তৃত্ব আইনকে দেয় বৈধতা, আর ন্যায় দেয় মূল্যবোধ। আদর্শ আইনের মধ্যে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত কর্তৃত্ব এবং ন্যায় কর্তৃক প্রদত্ত মূল্যবোধ— এই দুইই থাকা চাই। উদারনীতিক চিন্তাবিদ হিসেবেই বার্কার বলেছেন যে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকশিত করে তোলাই রাষ্ট্রের চরম উদ্দেশ্য এবং সেটাই চূড়ান্ত রাজনীতিক মূল্যবোধও। রাষ্ট্র এই উদ্দেশ্য সাধনে কতকগুলো প্রয়োজনীয় বাহ্যিক শর্ত সুনিশ্চিত ও সংরক্ষিত করে দেয় আইনের মাধ্যমে। এই কারণে আইনের মধ্যে থেকে যায় একটা ন্যায়ের উপাদান। অপরদিকে সমাজ বলতে বার্কার সেই জনসম্প্রদায়কে বুঝেছেন, যা নিজের জন্য নিজস্ব সাধারণ সামাজিক পদ্ধতিতে কাজ করে চলে এবং সেই কারণে যা নির্দিষ্ট আইনগত পদ্ধতিতে কর্মরত রাষ্ট্রের তুলনায় পৃথক। বার্কারের মতে, সমাজ বা মানুষের কার্যকলাপের একটি বিরাট পরিধি রাষ্ট্রের বাইরে অবস্থিত। সমাজ প্রক্রিয়ার এমন সব এলাকা রয়েছে, যেখানে আইন প্রবেশ করতে পারে না, বা যা আইনগত নিয়ন্ত্রণ-সাপেক্ষ নয়। বার্কারের মত অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের পরিধি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, রাষ্ট্র অধিকার-কর্তব্য-কাঠামোর রচয়িতা; কিন্তু নিজেই জীবনের সমগ্র কাঠামো নয়।

রাষ্ট্র ও সমাজের সম্পর্ক বিশ্লেষণে বার্কার ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করেছেন। তাঁর মতে, মানুষের কাছে এটাই কাম্য যে, রাষ্ট্র ও সমাজ তাদের নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রের পার্থক্য বজায় রেখে চলবে এবং সেই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার সঙ্গে সঙ্গে সহযোগিতার মধ্য দিয়েও কর্মরত থেকে নিজেদের সমৃদ্ধি ঘটাবে। কিন্তু যা কাম্য তা-ই সর্বদা বাস্তবে ঘটে না। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্ব উল্লেখ করে বার্কার দেখিয়েছেন কীভাবে বিভিন্ন সময়ে সর্বময় 'সমাজ-রাষ্ট্র' প্রবর্তনের অবাঞ্ছিত প্রচেষ্টা গড়ে উঠেছিল। প্রথমত, গ্রীক নগর-রাষ্ট্র ছিল একটা একত্রীকৃত 'সমাজ-রাষ্ট্র'। এটা ছিল একের মধ্যে রাষ্ট্র ও সমাজের সমন্বিত রূপ। দুয়ের মধ্যে কোন প্রকার প্রভেদ ছিল না বা দুয়ের কোনো পৃথক স্বাতন্ত্র্যও ছিল না। বার্কার অ্যারিস্টটলের তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাঁর নির্দেশিত রাষ্ট্র-ধারণার সঙ্গে একমত হতে পারেননি। প্লেটো, অ্যারিস্টটল নগর-রাষ্ট্রকে সার্বভৌম ও সর্বব্যাপী বলে স্বীকার করেছেন, যা অন্যান্য সব সংস্থাকেই নিয়ন্ত্রণাধীন করে রেখেছে। দ্বিতীয়ত, অষ্টম বনিফেস্ কল্পিত ধর্মভিত্তিক গীর্জা-রাষ্ট্রও সমাজ ও রাষ্ট্রের বাস্তব স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করেছিল। পোপ সপ্তম গ্রেগরীর সময় থেকে পোপ অষ্টম বনিফেসের সময়কাল পর্যন্ত গীর্জা পার্থিব বিষয়গুলিও রাষ্ট্রের হাত থেকে নিজের হাতে নিয়ে নেয়। এটাকে বার্কার নগররাষ্ট্রের প্রাচীন সামগ্রিকতাবাদেরই প্রত্যাগমন বলে অভিহিত করেছেন।[১] তৃতীয়ত, ষোড়শ শতক এমন একটি সার্বভৌম ধারণার পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছায়, যা পার্থিব ক্ষেত্রে একটি চরম শাসন কর্তৃপক্ষ ও একটি চরম আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষ প্রবর্তন করে দেয়। সেই সঙ্গে একটি সর্বোপরি ক্ষমতারও সূচনা হয়, যা যাজকীয় ব্যাপারে কার্যকরী। চতুর্থত, ষোড়শ শতকে যে সর্বময় রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে, তা অষ্টাদশ শতকেও সক্রিয় ছিল। জাতীয় সার্বভৌমিকতা ছিল ফরাসী বিপ্লবের একটি মুখ্যনীতি। বস্তুত, ফরাসী বিপ্লবের জাতি রাষ্ট্রের তত্ত্ব ছিল এমন একটি তত্ত্ব, যেখানে রাষ্ট্রই শুধু একক সংগঠন এবং একমাত্র শাসক। পঞ্চমত, উনিশ শতকের প্রথম দিককার জার্মানতত্ত্ব রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে এবং রাষ্ট্রের পিছনে দণ্ডায়মান জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে কল্পনাবাদ (romanticism) গড়ে তুলেছিল। হেগেলীয়বাদ এই জার্মান কল্পনাবাদ থেকে সৃষ্ট। হেগেলীয়বাদ ঐক্যবদ্ধ 'সমাজ-রাষ্ট্রের'ই চরমতম সংস্করণ। হেগেলীয় তত্ত্বে নৈতিকতা ও আইন একটি একক সত্তায় আসীন এবং এইভাবে রাষ্ট্রও হয়ে ওঠে সর্বময়। বার্কার আরও বলেছেন যে, হেগেলের চিন্তাসমৃদ্ধ মার্কসবাদও ঐক্যবদ্ধ সমাজ-রাষ্ট্রের ধারণারই পুনরাবৃত্তি করে।

[১] অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা - ১২

বার্কারের মতে, হেগেলের রাজনীতিক তত্ত্ব সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্রের সমর্থন করলেও তাঁর সাধারণ দার্শনিক তত্ত্ব উদারনীতিক ভাবধারার সম্পূর্ণ পরিপন্থী নয়। রাজনীতিক দলগুলোকে বাদ ও প্রতিবাদ বলে ধরে নিলে এবং সংসদকে সম্বাদ বলে মেনে নিলে হেগেলীয় চিন্তাসূত্রে সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে যুক্তি দেখানো যেতে পারে। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করে বার্কার রাষ্ট্র ও সমাজের নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবস্থানের এবং দুয়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার যথার্থ চিত্রটি দেখতে পেয়েছেন ইংরেজ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মধ্যে এবং ইংরেজ শাসনতান্ত্রিক জীবনযাত্রায়, যা ১৬৮৮ সাল থেকে শুরু করে সমগ্র উনিশ শতকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত বিভিন্ন গোষ্ঠী, সমিতি, সংস্থা-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি স্বেচ্ছামূলক সংগঠনের মধ্যেই সমাজের প্রাণধর্ম নিহিত। বার্কারের মতে, এই প্রাণধর্মটি অক্ষুন্ন থাকবে যদি এই সকল সংগঠন অবাধে তাদের কার্যকলাপ সম্পন্ন করার সুযোগ বা অধিকার লাভ করে। ভিক্টোরীয় যুগের শেষার্ধে (১৮৬৫-১৯০১) এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়।

বার্কার ইংরেজ সমাজজীবন এবং শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও প্রতিষ্ঠানগুলির স্বেচ্ছামূলক কার্যকলাপ ক্রিয়াশীল বলে মনে করেছেন। তবে তিনি এটাও লক্ষ করেছেন যে, যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ এবং তার অন্যতম ইংরেজী সংস্করণ সংঘবদ্ধমূলক সমাজতন্ত্রবাদও চিন্তাধারার অগ্রগতিতে এবং রাষ্ট্র ও সমাজের পার্থক্য স্থাপনে একটি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। অবশ্য যৌথ সমাজতন্ত্র একটা বিকৃত রূপ নিয়ে যেভাবে ফ্যাসিবাদের জন্ম দিয়েছে তা একটি পীড়াদায়ক অভিজ্ঞতা। কিন্তু বার্কার মনে করেছেন যে, সমাজের ধারণাকে রাষ্ট্রের ধারণা থেকে মুক্ত করে দেওয়ার ব্যাপারে এই মতবাদ একটি উল্লেখযোগ্য শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

বার্কারের বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি রাষ্ট্র ও সমাজ উভয়কেই অপরিহার্য বিবেচনা করে, উভয়ের কার্যকলাপের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। একদিকে গোষ্ঠী-সংস্থা-সমাবৃত সমাজের স্বাধীনতা, অন্যদিকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার প্রশ্নাতীত স্বীকৃতি— এই ধরনের কোনো দুই মেরুপ্রান্তের ব্যবধান তিনি মেনে নিতে পারেননি। বৃহৎ সমাজে রাষ্ট্রের স্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে অধ্যাপক ল্যাস্কিও বলেছেন যে, বৃহৎ সমাজের একটি অংশ হল রাষ্ট্র। তবে রাষ্ট্র হল সমাজের অত্যন্ত মূল্যবান অংশ। ল্যাস্কির মতে প্রত্যেক ব্যক্তির দু'টি সত্তা আছে। একদিকে সে নাগরিক, সুতরাং রাষ্ট্রের সঙ্গে একাত্ম। আর একদিকে সে ব্যক্তি; এই দিক দিয়ে তার সত্তা রাষ্ট্রাতীত। বস্তুত সমকালীন বহুত্ববাদী ধারণাকে ল্যাস্কি অনেকটা মেনে নিয়েছিলেন। গোষ্ঠীর সপক্ষে বার্কার যে-সকল যুক্তি দেখিয়েছেন সেগুলির সঙ্গে ল্যাস্কি প্রমুখ বহুত্ববাদীর ধারণার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু বহুত্ববাদ যেখানে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা বিভক্ত করতে উদ্যত, বার্কার সেইখানে বিরোধিতা করেছেন। বস্তুত, বার্কার যৌথ-সমাজতন্ত্রবাদ ও বহুত্ববাদ এই উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েও, রাষ্ট্র, সমাজ ও গোষ্ঠী সম্পর্কে একটা মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করেছেন।

বার্কারের মত অনুযায়ী রাজনীতিক জীবনের বিচার্য বিষয় ব্যক্তি বনাম রাষ্ট্র বা সমাজ বনাম রাষ্ট্র বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বনাম সমষ্টিবাদ নয়। কারণ এই ধারণাগুলির মধ্যে কোন বিরোধ নেই, একে অন্যের পরিপূরক। এদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিতে পারে। কিন্তু তাতে আতঙ্কিত হবার কোন কারণ নেই; কারণ জীবনের অর্থই উত্তেজনা। তবে এদের মধ্যে একটা সুষ্ঠু সমন্বয়সাধন দরকার। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সমগ্র প্রক্রিয়াই হ'ল সমন্বয়ের প্রক্রিয়া। ব্যক্তির সুন্দর জীবনের শর্তগুলি পূরণ করার জন্য রাষ্ট্র ও সমাজ উভয়েই কারক। বার্কারের মতে রাষ্ট্র মানুষের বাহ্যিক কাঠামোর সার্বভৌম স্রষ্টা, কিন্তু একমাত্র স্রষ্টা নয়।[১] রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরেও ব্যাপক কর্মক্ষেত্র আছে। সমাজ রাষ্ট্রের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। সুন্দর জীবনের উপযোগী বাহ্যিক শর্ত পূরণের ক্ষেত্রে সমাজ রাষ্ট্রের সহযোগীর ভূমিকা পালন করে। বার্কার বলেছেন যে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মহত্তম বিকাশ সাধনই হল ন্যায়ের লক্ষ্য, সমাজ ও রাষ্ট্র উভয়েরই উদ্দেশ্য হল এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া । সমাজের লক্ষ্য হচ্ছে, তার সদস্যদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে সকল গুণ ও যোগ্যতা আছে, সহযোগিতার নীতির মাধ্যমে সেগুলির মহত্তম বিকাশে উৎসাহিত

[১] Ernest Barker, Principles of Social and Political Theory, Book-II, Sec. 2

করা। রাষ্ট্র হল এক আইনগত সংস্থা, যা জাতীয় সমাজের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর লক্ষ্য হচ্ছে, সেই সমস্ত বাহ্যিক শর্তকে একত্রিত করে সুনিশ্চিত করে দেওয়া, যা প্রত্যেক নাগরিকের গুণাবলী বিকাশের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। সুতরাং রাষ্ট্র ও সমাজ উভয়ের মধ্যে মানুষ তার চরিতার্থতা খুঁজে পায়।

উদারনীতিবাদের বিকাশে বার্কার জন স্টুয়ার্ট মিলের নৈতিক তত্ত্ব ও টি. এইচ. গ্রীনের সমষ্টিবাদী উদারনীতিবাদের দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়েছিলেন। গ্রীনের মত বার্কারও বলেছেন যে, রাষ্ট্রের কাজ হল মানুষের নৈতিক মঙ্গলের জন্য বাহ্যিক কাঠামো গঠন করা। উদারনীতিবাদকে সমষ্টিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বার্কার হবহাউসের অনুগামী ছিলেন। হবহাউসের মতো বার্কার ও বলেছেন যে, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে কোনো বিরোধিতা নেই। বার্কারের সমকালীন চিন্তাবিদ বার্টাণ্ড রাসেলও ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। বস্তুত, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জনকল্যাণকর উদারনীতিবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে যে ইতিবাচক রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর তাত্ত্বিক কাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল, হবহাউস, বার্কার, ল্যাস্কি, রাসেল প্রমুখ চিন্তাবিদ তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন তাঁদের রাষ্ট্রতত্ত্বের মধ্যে।

অনুশীলনী - ১

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। বার্কার কী বহুত্ববাদী ছিলেন ?

২। বার্কার কী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ছিলেন ?

৩। বার্কার কেন রাষ্ট্রকে আইনগত সংস্থা বলেছেন ?

৪। বার্কারের মতে রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য কী ?

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। বার্কার কীভাবে রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেছেন ?

৩.৪ ঃ স্বাধীনতা সম্পর্কে বার্কারের ধারণা

স্বাধীনতা সম্পর্কে বার্কারের ধারণায়, জন স্টুয়ার্ট মিল থেকে শুরু করে গ্রীণ-ব্রাড্‌লী-বোসাঙ্কের মধ্য দিয়ে হবহাউস পর্যন্ত যে উদারনীতিবাদী ধারা গড়ে উঠেছিল, তারই একটা সমকালীন পুনর্বিন্যাস দেখতে পাওয়া যায়। স্বাধীনতা সম্পর্কিত বার্কারের ধারণা বিশ্লেষণ করলে বার্কারের ওপর গ্রীসের ভাববাদ এবং সমকালীন চিন্তাবিদ ল্যাস্কির উদারনীতিবাদ— উভয়েরই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বার্কারের মতে স্বাধীনতা সম্পর্কিত মিলের ধারণা অসম্পূর্ণ, কারণ তিনি স্বাধীনতার কথা বলেছেন অধিকারের ব্যাখ্যা না দিয়ে। বার্কার বলেছেন যে, মিল ছিলেন শূন্যগর্ভ স্বাধীনতার প্রবক্তা। অধিকার সম্পর্কে তাঁর আদৌ কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না, যার থেকে প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতার সৃষ্টি হয়। বার্কার মিলকে বিমূর্ত ব্যক্তির প্রবক্তা হিসেবে অভিহিত করেছেন। স্বাধীনতার ধারণা বাস্তবে কার্যকর হতে পারে এমন কোন তত্ত্বের অবতারণা মিল করতে পারেননি। আবার ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে বিরোধিতার ধারণার অবসানের সম্ভাবনাযুক্ত কোন সামগ্রিক সমাজব্যবস্থার কথাও বলতে পারেননি তিনি। গ্রীন-ব্রাডলী এবং পরবর্তীকালে হবহাউস এইসব ত্রুটি সংশোধন করে দেখিয়েছেন যে, অধিকারের মধ্যেই স্বাধীনতার তাৎপর্য নিহিত। বোসাঙ্কের মতে, অধিকার ছাড়া স্বাধীনতার কোনো অস্তিত্ব নেই।[১] হবহাউস ও ল্যাস্কির তত্ত্বে সামাজিক কল্যাণের স্বার্থে ব্যক্তির আচরণের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। বার্কারের বক্তব্যে এই সমস্ত কথারই অনুরণন ঘটেছে। তবে এক্ষেত্রে তিনি গ্রীণের চিন্তাধারার দ্বারাই অধিকতর প্রভাবিত।

বার্কার স্বাধীনতাকে অধিকার বন্টনের অন্যতম নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ব্যক্তি-মানুষের সামর্থ্যের সর্বাধিক বিকাশ সাধন করাই হ'ল এই নীতির মূল লক্ষ্য। এই নীতি অনুসারে রাষ্ট্রের কাছে প্রত্যেক নৈতিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিই হ'ল স্বাধীন সত্তাযুক্ত। এরকম প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের সামর্থ্যসমূহকে নিজের মতো করে বিকশিত করতে সমর্থ। এই বিকাশের জন্য অপরিহার্য শর্ত হিসেবে যে সমস্ত অধিকারের কথা বলা হয় সেগুলি অনুশীলন ও ভোগ করতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সক্ষম। বার্কারের মতে, স্বাধীনতা সর্বদাই দায়িত্বের সূচক হিসেবে প্রতীয়মান হয়। যেমন কোন কাজ করার স্বাধীনতা দাবি করার অর্থ হ'ল সংশ্লিষ্ট কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করা। এইভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বাধীনতার একটি পদ্ধতিগত নিয়মে অধীনস্থ ও অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

বার্কারের মতে, স্বাধীনতা হল একটি আইনগত ধারণা। স্বাধীনতা পরিমাণগতভাবে বৈধতার বা আইনবদ্ধতার গুণও বহন করে। প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতার অর্থ হ'ল ব্যক্তির আইনসম্মতভাবে স্বীকৃত অধিকার ভোগের ক্ষমতা। এই সমস্ত অধিকার আইনের মধ্যেই নিহিত থাকে। রাষ্ট্র হ'ল একটি বৈধ সংগঠন এবং ব্যক্তি হ'ল রাষ্ট্রের বৈধ ও স্বাধীন সদস্য। রাষ্ট্রের আইনানুগ ব্যবস্থার মধ্যে স্বাধীনতা অনুশীলন করার অধিকার ব্যক্তির আছে। ক্রীতদাসরা রাষ্ট্রের বৈধ নাগরিক নয় বলে স্বাধীনতা দাবি করতে পারে না। নাগরিকের স্বাধীনতার দাবি সম্পূর্ণরূপে আইনসম্মত। তাই বার্কার বলেছেন যে, স্বাধীনতাও হ'ল একটি আইন; অন্ততঃ আইনের একটি অংশ।

বার্কার স্বাধীনতাকে কেবলমাত্র একটি আইনগত ধারণা হিসেবে গণ্য করেননি। এটি একটি সামাজিক ধারণাও বটে। নাগরিকের বাধ্যতা রাষ্ট্রের কাছে যেমন, তেমনি সমাজের কাছেও থাকে। সামর্থ্যের বিকাশ সাধনের জন্য সমাজ তাকে নানা উপায়ে সাহায্য করে। সমাজের সদস্য হিসেবে ব্যক্তি ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি স্বাধীনতা ভোগ করে। তাই সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক গভীর। রাষ্ট্রের আইনগত এক্তিয়ারের বাইরে সামাজিক স্বাধীনতা অবস্থান করে। তবে সামাজিক স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারে না। রাষ্ট্র আইনের দোহাই দিয়ে সামাজিক স্বাধীনতার পরিধিকে সঙ্কুচিত করতে পারে। বার্কার বলেছেন যে, রাষ্ট্রই যে কেবল সামাজিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে সমাজ নিজেই সামাজিক স্বাধীনতাকে ক্ষুন্ন করে। যেমন ধর্মের দোহাই সামাজিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়। অনেক সময় অন্যায়ভাবে সমাজ ব্যক্তিবর্গের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এরকম ক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রয়োজনবোধে সামাজিক স্বাধীনতা সংরক্ষণের স্বার্থে সামাজিক এলাকায় প্রবেশ করার অধিকারী।

বার্কারের মতানুসারে আইনগত স্বাধীনতা যেহেতু আইনগত চরিত্রসম্পন্ন, সেইহেতু তা চরম বা শর্তবিহীন স্বাধীনতা নয়। প্রত্যেকের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা অনিবার্যভাবে সকলের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও সীমাবদ্ধ। প্রত্যেক মানুষেরই স্বাধীন হওয়া উচিত। এই কারণে কোন মানুষ ই চূড়ান্তভাবে বা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হতে পারে না। অন্য সকলের অনুরূপ ও সমপরিমাণ স্বাধীনতার সঙ্গে মিলিতভাবে প্রত্যেককে তার নিজের স্বাধীনতা ভোগ করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মানুষ সমাজবদ্ধ জীব এবং সে অন্যের সঙ্গে নানাভাবে সম্পর্কযুক্ত। তার কাজ অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। আবার অন্যের কাজের প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবীরূপে তার ওপর এসে পড়ে। সুতরাং কোন ব্যক্তি একাকী নিজের সম্পর্কে ও সমাজ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। অন্যের কথা ভাবতেই হবে। এখানেই স্বাধীনতার আপেক্ষিকতা এসে পড়ে। সুতরাং স্বাধীনতা হ'ল সব সময়েই আপেক্ষিক। প্রত্যেকের স্বাধীনতা অন্যের স্বাধীনতার সামঞ্জস্য-সাপেক্ষ এবং অন্যের স্বাধীনতার আপেক্ষিক। স্বাধীনতা আপেক্ষিক বলেই নিয়ন্ত্রিত হতে বাধ্য। বস্তুত, নিয়ন্ত্রিত না হলে এর অস্তিত্বই থাকতো না। স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকলেই এর যথেচ্ছ ব্যবহার হবে। এটি তখন স্বাধীনতা না হয়ে স্বেচ্ছাচারিতায় রূপান্তরিত হবে। ফলে একজনের অবাধ স্বাধীনতা অন্যের স্বাধীনতা হরণের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাছাড়া বার্কার মনে করেছেন যে, স্বাধীনতার একটা নৈতিক ভিত্তি আছে। স্বাধীনতাকে অবশ্যই নৈতিক স্বাধীনতা হয়ে উঠতে হবে। স্বাধীনতা নৈতিক ব্যক্তিত্বের সর্বোচ্চ মূল্যবোধ

[১] Frank Thakurdas, *Recent English Political Theory* 1972, p 18.

থেকে উদ্ভূত। স্বাধীনতা কোন অনির্ণীত ব্যক্তির অনির্দিষ্ট স্বাধীনতা নয়, এটা সুনির্দিষ্ট কিছু কর্মশক্তি উপলব্ধিতে সচেষ্ট কোন নির্ণীত ব্যক্তির নির্দিষ্ট স্বাধীনতা। সুতরাং স্বাধীনতা ঐ ব্যক্তিত্বের সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত হবে এবং তার আপেক্ষিক হয়ে পড়বে।

এইভাবে বিচার করলে বলা যায় যে, রাষ্ট্রাধীন স্বাধীনতা আপেক্ষিক ও নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা। এটাই হচ্ছে স্বাধীনতার সর্বজনীন ও সর্বাধিক মাত্রা বা পরিমাণ, যা সকলকে দেওয়া সম্ভবপর। বার্কারের মতে, স্বাধীনতা নির্ণীত ও স্থিরীকৃত হয় দুটি শর্তের দ্বারা। এই শর্ত দু'টি হল : (১) অন্যের সমপরিমাণ ও অনুরূপ স্বাধীনতার সঙ্গে প্রত্যেকের স্বাধীনতা ভোগ করার প্রয়োজনীয়তা; এবং (২) সুনির্দিষ্ট কিছু কর্মক্ষমতা উপলব্ধির জন্য সকলের নির্দিষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করার প্রয়োজনীয়তা। এইভাবে বিবেচনা করলে স্বাধীনতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না, বরং তা বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হয়।

স্বাধীনতা সম্পর্কে বার্কারের ধারণার সঙ্গে গ্রীণ, হবহাউস, ল্যাস্কি প্রমুখ চিন্তাবিদের চিন্তাধারার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। গ্রীণও ইতিবাচক অর্থে স্বাধীনতার কথা বলেছেন। তিনি সামাজিক কল্যাণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। হবহাউসের মতানুসারে প্রত্যেক ব্যক্তির কাজকর্ম ও চিন্তা-ভাবনা সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির কাজকর্ম ও চিন্তাভাবনাকে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। বার্কারের মতো ল্যাস্কিও স্বাধীনতাকে ব্যক্তিত্ব বিকাশের অপরিহার্য হাতিয়ার হিসেবে মনে করেছেন। ল্যাস্কিও মনে করেছেন যে, অধিকার থেকেই স্বাধীনতার জন্ম। ল্যাস্কির মতেও স্বাধীনতার ধারণা ইতিবাচক। ব্যক্তিবর্গের স্বাধীনতার সঙ্গে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সম্পর্কযুক্ত।

৩.৪.১ স্বাধীনতার প্রকারভেদ

সাধারণত বলা হয় যে, আইন ও স্বাধীনতা পরস্পর বিরোধী; কারণ আইন স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু বার্কার, ল্যাস্কি প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই মত মানেন না। তাঁদের মতে, আইন অবাধ স্বাধীনতাকে খর্ব করলেও সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বাধীনতাকে সংরক্ষিত করে। প্রকৃত স্বাধীনতা হল রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা। এই প্রসঙ্গে বার্কার বলেছেন যে, স্বাধীনতা ও আইনের মধ্যে কলহ না বাধলেও, স্বাধীনতার নিজের সঙ্গেই নিজের কলহের কারণ রয়েছে।[১]

বার্কারের মতানুসারে, স্বাধীনতা, এমনকী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেও, বরাবরই বহুত্ববাচক। সামাজিক এলাকার স্বাধীনতা ও আইনগত স্বাধীনতাই শুধুমাত্র লক্ষ করা যায় না; আইনগত স্বাধীনতার মধ্যেও একাধিক গঠনাকৃতি লক্ষ করা যায়। এই স্বাধীনতাগুলি যেমন সহাবস্থানে অবস্থিত, তেমনি আবার পারস্পরিক সংঘর্ষেও সম্ভাবনাপূর্ণ। বার্কার মূলত তিন ধরনের স্বাধীনতার কথা বলেছেন। স্বাধীনতার এই তিনটি ধরণ হ'ল পৌর স্বাধীনতা, রাজনীতিক স্বাধীনতা ও আর্থনীতিক স্বাধীনতা। এই তিন প্রকার স্বাধীনতার মধ্যে সংঘাত দেখা দিতে পারে বলে বার্কার মনে করেন। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ থাকে। কোন বিষয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিতে পারে। তখন সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিভেদ দেখা দেয়। এই বিভেদের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতাও ভিন্নমুখী হয়ে পড়তে পারে। বস্তুত, বার্কারের মতে স্বাধীনতা একটি জটিল ধারণা। এই স্বাধীনতার প্রতি আনুগত্যের কারণেই মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়; আবার স্বাধীনতা যদি ভিন্নমুখী হয় তখন বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বিভেদ গড়ে ওঠে।

বার্কারের মতানুসারে ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণতার পক্ষে পৌর স্বাধীনতার অনুশীলন ও সংরক্ষণ একান্তভাবে অপরিহার্য। তাঁর মতে মানুষ ব্যক্তি হিসেবে যে স্বাধীনতা ভোগ করে তা হ'ল ব্যক্তি স্বাধীনতা বা পৌর স্বাধীনতা। তিনি তিনটি বিষয়কে পৌর স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই তিনটি বিষয় হল : (১) দৈহিক স্বাধীনতা— জীবন, স্বাস্থ্য ও দৈহিক গতিবিধির প্রতি ভীতিপ্রদর্শন থেকে অব্যাহতির দৈহিক স্বাধীনতা; (২) মতামত ও বিশ্বাস ব্যক্ত করার

[১] "If law and liberty do not quarrel, liberty may quarrel with itself." Barker, *Principles of Social and Political Theory,* Book IV, Sec. 2.

বৌদ্ধিক স্বাধীনতা এবং (৩) নিজের ইচ্ছা ও পছন্দমত অন্যের সঙ্গে চুক্তিমূলক কাজ ও সম্পর্ক স্থাপনের বাস্তব স্বাধীনতা। সুতরাং ব্যক্তিমানুষের পৌর স্বাধীনতা হল তার মনের, দেহের ও সম্পত্তির স্বাধীনতা।

পৌর স্বাধীনতার পরেই আসে রাজনীতিক স্বাধীনতা। বার্কারের মতে নাগরিক হিসেবে যে স্বাধীনতা ভোগ করা হয় তাই হল রাজনীতির স্বাধীনতা। অর্থাৎ জনসাধারণের একজন সদস্য হিসেবে এবং আইনসঙ্গত সংগঠনের একটি অংশ হিসেবে ব্যক্তি যে স্বাধীনতার অধিকারী তাকে বলে রাজনীতিক স্বাধীনতা। এক্ষেত্রে বার্কার ব্ল্যাকস্টোনের বক্তব্যকে খণ্ডন করেছেন। ব্ল্যাকস্টোন রাজনীতিক স্বাধীনতাকে নেতিবাচক হিসেবে দেখেছেন। তাঁর মতে এই স্বাধীনতার উদ্দেশ্য হল সরকারকে নিয়ন্ত্রিত ও সঙ্কুচিত করা। কিন্তু বার্কারের মতে প্রকৃতির দিক থেকে রাজনীতিক স্বাধীনতা হ'ল ইতিবাচক। এই স্বাধীনতার উদ্দেশ্য সরকারকে খর্ব করা নয়। এর উদ্দেশ্য হ'ল সরকারের গঠন ও সরকারী কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রণ।

তৃতীয় ধরনের স্বাধীনতা হ'ল আর্থনীতিক স্বাধীনতা। বার্কারের মতে, আর্থনীতিক স্বাধীনতার ধারণা হ'ল সাম্প্রতিককালের। ব্যক্তি মানুষ কর্মী বা শ্রমিক হিসেবে কোন-না-কোন অর্থকরী চাকরি বা পেশায় নিযুক্ত থাকে। ব্যক্তির এই শ্রম কায়িক বা মেধাগত যে কোন ধরনের হতে পারে। এই সূত্রে ব্যক্তি মানুষ শ্রমিক হিসেবে যে স্বাধীনতা অর্জন করে তাকে বলে আর্থনীতিক স্বাধীনতা। বার্কারের মতানুসারে আর্থনীতিক স্বাধীনতার সঙ্গে পৌর স্বাধীনতার নিকট সম্পর্ক বর্তমান। রাজনীতিক স্বাধীনতার সঙ্গেও আর্থনীতিক স্বাধীনতার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। তাঁর মতে, যেহেতু এই দুই ধরনের স্বাধীনতার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তাই আর্থনীতিক স্বাধীনতা কোনোটিরই অংশ নেয়। আর্থনীতিক স্বাধীনতার সঙ্গে এমন কিছু বিষয় যুক্ত যেগুলি রাজনীতিক স্বাধীনতার এলাকাভুক্ত। আবার এর সঙ্গে এমন কতকগুলি বিষয় সম্পর্কযুক্ত যেগুলি পৌর স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত, তাই আর্থনীতিক স্বাধীনতাকে পৌর স্বাধীনতা বা রাজনীতিক স্বাধীনতা— কোনোটিরই অংশ বলা যাবে না।

বার্কার বলেছেন যে, এই তিন প্রকার স্বাধীনতাকে মাঝে মধ্যে ঝগড়া করতে দেখা যায়। রাজনীতিক পরিধির এলাকাধীন নাগরিকের অধিকার, পৌর পরিধির এলাকাধীন ব্যক্তি মানুষের অধিকারের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, চিন্তা ও বিশ্বাস প্রকাশের স্বাধীনতা, যা একটি অন্যতম পৌর স্বাধীনতা, তা রাজনীতিক স্বাধীনতার নামে কাজ করছে এমন কোনো সংসদীয় সংখ্যা গরিষ্ঠের সঙ্গে সংঘর্ষে আসতে পারে। এই ধরনের সংখ্যা গরিষ্ঠ এমন কিছু আইন প্রনয়ণ করতে পারে যা চিন্তা ও বিশ্বাসের অবাধ প্রকাশের প্রতিকূল। অনুরূপভাবে ব্যক্তির পৌর স্বাধীনতা শ্রমিকের আর্থনীতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সংঘর্ষমূলক হয়ে উঠতে পারে। কারখানার শ্রমিকের বেতন ও কাজের সময় সংক্রান্ত বিষয়সমূহ স্থির করার স্বাধীনতা আছে। সে বেতন বৃদ্ধির দাবি জানাতে পারে। অপরদিকে কারখানার মালিকের স্বাধীনতা আছে বেতন ও কাজের শর্তাদি স্থির করা। এক্ষেত্রে শ্রমিকের আর্থনীতিক স্বাধীনতা মালিকের চুক্তির স্বাধীনতা বা পৌর স্বাধীনতার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। সংসদের রাজনীতিক স্বাধীনতা তখন আর্থনীতিক স্বাধীনতাকে উদ্ধারের কাজে এগিয়ে আসতে পারে। কিন্তু সংসদীয় সংখ্যগরিষ্ঠ রাজনীতিক স্বাধীনতার নামে এই আর্থনীতিক স্বাধীনতার প্রতিকূল শর্তাবলী চাপিয়ে দিতে পারে। সুতরাং তিন ধরনের স্বাধীনতাই পরস্পরের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে।

বার্কার আর্থনীতিক স্বাধীনতা ও রাজনীতিক স্বাধীনতার মধ্যে সম্পর্ককে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি দুটি দৃষ্টিকোণের কথা উল্লেখ করেছেন। উদারনীতিক দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনীতিক স্বাধীনতাকে একটি প্রতিষ্ঠিত বাস্তব ঘটনা হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং আর্থনীতিক স্বাধীনতাকে রাজনীতিক স্বাধীনতার অনুগামী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অপরদিকে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে আর্থনীতিক স্বাধীনতাই হ'ল অগ্রবর্তী। কারণ হিসেবে বলা হয় যে, আর্থনীতিক স্বাধীনতা ব্যতিরেকে রাজনীতিক স্বাধীনতা হল মূলহীন। আর্থনীতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতার অভাব নাগরিকের রাজনীতিক স্বাধীনতা ভোগের ক্ষেত্রে একটি বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সুতরাং আর্থনীতিক স্বাধীনতা

রাজনীতিক স্বাধীনতার পূর্বশর্ত। তার কোন ফসল নয়। বার্কারের মতে, যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই বিশ্লেষণ করা হোক না কেন, এটা অস্বীকার করা যাবে না যে, আর্থনীতিক স্বাধীনতা রাজনীতিক স্বাধীনতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত।

রাজনীতিক স্বাধীনতার সঙ্গে আর্থনীতিক স্বাধীনতার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে বার্কার সনাতন উদারনীতিবাদী ধারা থেকে অনেকটা সরে এসেছেন। এক্ষেত্রে তিনি হবহাউস ও ল্যাস্কির মত অনুসরণ করেছেন। হবহাউস বিভিন্ন ধরনের স্বাধীনতার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আর্থনীতিক স্বাধীনতা বলতে আর্থনীতিক সাম্যকে বোঝায়। তবে তিনি রাজনীতিক স্বাধীনতাকে অন্যান্য স্বাধীনতার পূর্বশর্ত বলে অভিহিত করেছেন।[১] অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেছেন যে, আর্থনীতিক স্বাধীনতার ওপর অন্যান্য স্বাধীনতা নির্ভরশীল। তাঁর মতে আর্থনীতিক স্বাধীনতা না থাকলে অন্যান্য স্বাধীনতাকে বাস্তবে রূপায়িত করা অসম্ভব। বার্কার ও ল্যাস্কি উভয়েই স্বাধীনতার প্রকারভেদ সম্পর্কে সহমত পোষণ করলেও বার্কার যেখানে স্বাধীনতার নৈতিক দিকটার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন, ল্যাস্কি সেখানে গুরুত্ব দিয়েছেন স্বাধীনতার বস্তুবাদী দিকটির ওপর। বার্কার বহুত্বের মধ্যে ঐক্যের কথা ভেবেছেন। স্বাধীনতার বিভেদমূলক বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ন্যায়ের নীতির মাধ্যমে স্বাধীনতার বিভেদমূলক প্রবণতা দূর করা সম্ভব। ল্যাস্কির তত্ত্বে এই দিকটার বিশেষ কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

অনুশীলনী - ২

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন :

১। বার্কার স্বাধীনতাকে আপেক্ষিক ও নিয়ন্ত্রিত বলেছেন কেন?

২। বার্কার কেন বলেছেন যে, স্বাধীনতা নিজের সঙ্গেই বিরোধে লিপ্ত হয়?

৩। বার্কারের মতে রাজনীতিক স্বাধীনতার সঙ্গে আর্থনীতিক স্বাধীনতার সম্পর্ক কী রূপ?

রচনাত্মক প্রশ্ন :

১। স্বাধীনতার নীতি সম্পর্কে বার্কারের মত পর্যালোচনা কর।

২। স্বাধীনতার প্রকারভেদ সম্পর্কে বার্কারের মত বিশ্লেষণ কর।

৩.৪.২ ঃ স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে সম্পর্ক

অধ্যাপক বার্কার তাঁর "প্রিন্সিপল্‌স অব সোশ্যাল এ্যাণ্ড পলিটিক্যাল থিওরী" গ্রন্থে স্বাধীনতার সঙ্গে সাম্যের সম্পর্কও বিশ্লেষণ করেছেন। বার্কারের মতে, ন্যায় হল একটি মুখ্য সামাজিক ও রাজনীতিক মূল্য। এর প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি তিনটি নীতির কথা বলেছেন। এই নীতিগুলি হল : স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাত্র। বার্কারের মতানুসারে স্বাধীনতা কোন বিচ্ছিন্ন নীতি নয়, সাম্য ও সৌভ্রাত্র নীতির পাশাপাশি স্বাধীনতার অবস্থান। তাঁর মতে স্বাধীনতার সঙ্গে সাম্যের সামঞ্জস্য বিধান আবশ্যক। কারণ সাম্য ও স্বাধীনতা উভয়ই হ'ল গুরুত্বপূর্ণ।

সনাতন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী উদারনীতিক চিন্তাবিদগণ সাম্য ও স্বাধীনতার মধ্যে বিরোধিতার কথা বলেন। লর্ড এ্যাকটন, টকভিল, স্পেনসার, লেকী প্রমুখ চিন্তাবিদ সাম্য ও স্বাধীনতার ধারণাকে পরস্পর বিরোধী বলে মত প্রকাশ করেছেন। এ্যাকটনের মতে, 'সাম্য অর্জনের আগ্রহ স্বাধীনতার আশাকে ব্যর্থ করে।' কিন্তু এই অভিমত সাম্য ও স্বাধীনতা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সাম্য বলতে নিরঙ্কুশ সাম্যকে বোঝায় না। আবার স্বাধীনতা বলতে অনিয়ন্ত্রিত ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতাকেও বোঝায় না। তাই বার্কার, ল্যাস্কি প্রমুখ সমষ্টিবাদী উদারনীতিক চিন্তাবিদ সাম্য ও স্বাধীনতার মধ্যে বিরোধিতাকে অস্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পরের পরিপূরক। উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক অতি নিবিড়।

[১] Frank Thakurdas, p. 66

বার্কারের মতানুসারে, সাম্য কথাটির অর্থ হল সুযোগ-সুবিধা বা অধিকার বন্টনের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার পার্থক্য সৃষ্টি না করা। একজন নাগরিককে ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য যে সুযোগ দেওয়া হবে, একই সুযোগ অন্যেরাও পাবে। আবার অন্যেরা যে অধিকার ভোগ করবে, অন্য একজনকে সেই অধিকার দিতে হবে। স্বাধীনতার মতো সাম্যের লক্ষ্য হল— নাগরিকের অন্তর্নিহিত সত্তার পূর্ণাঙ্গ বিকাশকে সম্ভব করে তোলা। ব্যক্তিত্ব বিকাশের সর্বোচ্চ মূল্যবোধ থেকেই সাম্যের ধারণার উৎপত্তি। এই সর্বোচ্চ মূল্যবোধের সঙ্গে সাম্যের সামঞ্জস্য বিধান আবশ্যক। তবে বার্কার বলেছেন যে সাম্য বলতে একরূপতাকে বোঝায় না। তাহলে মানুষের ব্যক্তিত্বের যাবতীয় বৈচিত্র্যের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ অতি অবশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। বার্কারের মতে সাম্য হল শুরুর বিষয়; একে সমাপ্তি বলা যায় না। সমাপ্তি ব্যক্তিবর্গের ওপর নির্ভরশীল। ব্যক্তিবর্গ কীভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সামানাধিকার বা সুযোগ সুবিধার সদ্ব্যবহার করবে, তার ওপরই সমাপ্তি নির্ভরশীল।

সাম্যও তাই কোন বিচ্ছিন্ন নীতি নয়, এটি স্বাধীনতা-নীতি ও সৌভ্রাত্র-নীতির পাশাপাশি দণ্ডায়মান। সাম্যের নীতিকে তাই এই দুই নীতির সঙ্গে, বিশেষতঃ স্বাধীনতার সঙ্গে সমন্বিত করে নিতে হবে। বার্কারের কাছে স্বাধীনতা ও সাম্য দুইই গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু স্বাধীনতা সাম্যের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রযুক্তি ও ব্যাপ্তির দিক থেকে স্বাধীনতা আমাদের ইতিহাসে অধিকতর প্রাচীন নীতি। বিভিন্ন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই নীতি দৃঢ়রূপে ঘোষিত হয়েছে। সেইসব সংগ্রাম এখন অতীত ইতিহাসের মতো। কিন্তু সেজন্য এটি সবলতর নয়; বরং প্রাচীন বলে দুর্বলতর। তাছাড়া সাম্য নামক আধুনিকতর তারকার দীপ্তিতে এটি কিঞ্চিত নিষ্প্রভ। তথাপি বার্কার মনে করেছেন যে, দুয়ের মধ্যে স্বাধীনতার নীতি মহত্তর। এটি মহত্তর এই কারণে যে, এটি ব্যক্তিত্বের সর্বোচ্চ মূল্যের সঙ্গে এবং সেই ব্যক্তিত্ব বিকাশের সঙ্গে অধিকতর গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। এটি মহত্তর এই কারণে যে, এর সঙ্গে সাম্যও এসে পড়ে। স্বাধীনতা দাবি করলে সাম্যও নাগালের মধ্যে চলে আসে। এককথায় স্বাধীন মানুষ স্বাধীন বলেই, স্বাধীনতার মূল লক্ষণ অনুসারে তারা পরস্পরের সঙ্গী এবং সমকক্ষও বটে। পরিশেষে, স্বাধীনতা মহত্তর এই কারণে যে, এর লক্ষ্য মানুষকে এমন বিষয়ে একত্রিত করে দেয়, যার অধিকারী সকলেই হতে পারে। কিন্তু সাম্যের লক্ষ্য স্বতন্ত্রভাবে উপলব্ধি করতে গেলে অনেকসময় মানুষকে ঐক্যবদ্ধ না করে বিভক্তই করে দেয়।

বার্কারের মতে, যোগ্যতার মুক্তিসাধনই হ'ল মানুষের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু এর জন্য যে সুযোগের ক্ষেত্রে সাম্য থাকা দরকার তা অনস্বীকার্য। অনুরূপভাবে আর্থনীতিক আদর্শও মূলত মুক্তি সাধনেরই আদর্শ। এক্ষেত্রেও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের সাফল্যের আগে মর্যাদা ও সম্পদের ক্ষেত্রে অধিকতর সাম্য প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। তবে এক্ষেত্রেও প্রধান ও চূড়ান্ত লক্ষ্য হল অবাধ অংশীদার হিসেবে কাজ করার জন্য সকলের মুক্তি সাধন। বস্তুত বার্কার অবাধ যোগ্যতা বিকাশের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে আর্থনীতিক সাম্য স্বাধীনতা বিকাশের অধীনস্থ এবং মাধ্যমও বটে। কিন্তু দেখতে হবে যে, সাম্য যেন স্বাধীনতার প্রভু না হয়ে ওঠে।

বার্কারের মতো ল্যাস্কিও স্বাধীনতা ও সাম্যের সহাবস্থানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। ল্যাস্কির মতে, স্বাধীনতা ও সাম্যের ভিত্তিতে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয় সেখানে সকলের সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব বিকশিত ও কার্যকর হয়। মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিবেশ হিসেবে যে স্বাধীনতার কথা বলা হয়, আর্থনীতিক ক্ষেত্রে সাম্য ব্যতিরেকে তার সৃষ্টি হতে পারে না। তাঁর মতে আর্থনীতিক ক্ষেত্রে সাম্য না থাকলে রাজনীতিক ক্ষমতা আর্থনীতিক ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। বস্তুত ল্যাস্কি আর্থনীতিক সাম্যের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বার্কারও আর্থনীতিক সাম্যের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। কিন্তু তিনি আর্থনীতিক সাম্যের যে কোনো প্রকার সাধারণ নীতিকে স্বীকার করেননি। সাম্য থেকে স্বাধীনতাকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন তিনি। বার্কার ও ল্যাস্কি উভয়েই সংশোধনমূলক উদারনীতিবাদের সমর্থক হলেও ল্যাস্কি বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষের দিকে মার্কসীয় চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট

[১] অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা-৮।

হয়েছিলেন। বার্কার মার্কসীয় চিন্তাধারার বিরোধী ছিলেন। বার্কারের মতে মার্কসবাদও পরিণামে সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্রে গিয়ে পৌঁছায়।[১] এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সংশোধনমূলক উদারনীতিবাদী হিসেবে হবহাউসও বলেছেন যে, সাম্য ছাড়া স্বাধীনতার পরিণতি জঘন্য হয়।

৩.৫ ঃ অধিকার সম্পর্কে বার্কারের ধারণা

উদারনীতিবাদের মূল লক্ষ্য হল ব্যক্তির অধিকার, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ। উদারনীতিক চিন্তাধারায় অধিকার হ'ল মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ও ব্যক্তিজীবনের সম্যক প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা। গ্রীণ, হবহাউস প্রমুখ সংশোধনবাদী উদারনীতিক চিন্তাবিদ অধিকারকে সমষ্টিগত কল্যাণকামী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছেন। বার্কারও তাঁর 'প্রিন্সিপল্‌স অব্‌ সোশ্যাল এ্যাণ্ড পলিটিক্যাল থিয়োরী' শীর্ষক গ্রন্থে সমষ্টিবাদী উদারনীতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অধিকার সম্পর্কে তাঁর অভিমত বিস্তারিতভাবে ব্যক্ত করেছেন। বার্কারের মতানুসারে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত আইন সমাজের সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সম্ভাব্য সর্বাধিক ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক বাহ্যিক শর্তাবলী নির্ধারণ ও সংরক্ষণ করে থাকে। এই সমস্ত নির্ধারিত ও সংরক্ষিত শর্তকে অধিকার হিসেবে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ অধিকার হ'ল স্থিরীকৃত ও সংরক্ষিত এক বাহ্যিক পরিবেশ বা শর্তাবলী যা সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের ব্যক্তিত্বের সামর্থ্যসমূহের সর্বোচ্চ বিকাশের সহায়ক।[১] বার্কার বলেছেন যে, এইরকম শর্তাদির একটা পরিকল্পনা তৈরী করে সেগুলিকে বন্টন করে থাকে রাষ্ট্র। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে কতকগুলো সাধারণ নীতির ভিত্তিতে কাজ করতে হয়। বার্কার বলেছেন যে, ১৭৮৯ সাল থেকে এই নীতিগুলিকে স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাত্র বলা হচ্ছে।

বার্কার ব্যক্তির অধিকারকে সমগ্র সমাজ ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে চিন্তা করেননি। রাষ্ট্রের এলাকার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত নাগরিকই অধিকার ভোগ করে। এগুলি সামগ্রিকভাবে একটি অধিকার ব্যবস্থা বলে অভিহিত হয়। রাষ্ট্র ও আইন এই অধিকার ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তির অধিকার হ'ল সমগ্র অধিকার-ব্যবস্থারই একটি অংশবিশেষ। একজন নাগরিক ব্যক্তি হিসেবে স্বতন্ত্র হলেও অধিকার সমগ্র অধিকার-ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ব্যক্তির অধিকার সমষ্টি রাষ্ট্রের ভিতরে এবং রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত আইনের অধীনে থাকে। রাষ্ট্র ও আইন থেকে বিচ্ছিন্ন কোন অধিকারকে সুনিশ্চিত বা সংরক্ষিত করা যায় না।

প্রত্যেক ব্যক্তির একটি নৈতিক ব্যক্তিত্ব আছে। এই নৈতিক ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করার জন্য ব্যক্তিকে একটি বৈধ ব্যক্তিত্ব প্রদান করা হয়। আইন ব্যক্তির হাতে অধিকারসমূহ ন্যস্ত করে এবং আইনই তা সংরক্ষণ করে। এই সমস্ত অধিকার হ'ল ব্যক্তির বৈধ ব্যক্তিত্ব। এই বৈধ ব্যক্তিত্ব হ'ল নৈতিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনের পূর্ব শর্ত। বার্কার বৈধ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে নৈতিক ব্যক্তিত্বের সংযুক্তির কথা বলেছেন। আদর্শগত বিচারে অধিকার সব সময় দু'টি উৎস থেকে উৎসারিত। একটি উৎস হ'ল নৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং আর একটি হ'ল রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় আইন। অধিকার দু'টি উৎস থেকে উৎসারিত হলে তবেই তাকে আদর্শ অধিকার বলা যাবে। কিন্তু যদি অধিকারের একটিমাত্র উৎস থাকে তাহলে তাকে আদর্শ অধিকার না বলে আধা-অধিকার (quasi-right) বলা যেতে পারে। আধা-অধিকার কেবল ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অথবা রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় আইন থেকে নির্গত হয়। দাস-ভিত্তিক রাষ্ট্রের মধ্যে ক্রীতদাসের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার কেবল ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের দাবি থেকে উৎসারিত; রাষ্ট্র ও আইনের স্বীকৃতি থাকে না। আবার দাস-ভিত্তিক রাষ্ট্রে দাস-মালিকদের ক্রীতদাসকে সম্পত্তি হিসেবে ভোগ করার অধিকার শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় আইনের

[১] Barker, *Principles of Social and Political Theory,* Book IV, Sec. 1

মাধ্যমে সুরক্ষিত করা হয়। এর মধ্যে নৈতিক ব্যক্তিত্ব থাকে না। তাই উভয় প্রকার অধিকারই হ'ল আধা অধিকারের উদাহরণ। এগুলি আদর্শ অধিকারের মর্যাদা পেতে পারে না।

বার্কারের মতানুসারে রাষ্ট্র ও আইন ব্যতিরেকে অধিকারের ধারণা অর্থহীন হয়ে পড়ে। রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে অধিকারগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করার ব্যবস্থা করে। তাই তিনি বলেছেন যে, আইনের মধ্যেই অধিকার নিহিত, আইনই হ'ল অধিকার। তিনি আইন ও অধিকারকে একই জিনিসের দু'টি দিক হিসেবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। আইন হল এর বস্তুগত দিক এবং অধিকার হল এর বিষয়ীগত দিক। এইভাবে বার্কার বলতে চেয়েছেন যে, রাষ্ট্র, আইন এবং অধিকার ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত।

বার্কারের মতে যে নীতিগুলি অনুসরণ করে অধিকার বন্টন করা হয় সেগুলিকে বন্টনমূলক ন্যায়ের নীতি বলা যেতে পারে। এগুলি হচ্ছে কতকগুলো পদ্ধতিগত নিয়ম যা রাষ্ট্র অধিকার বন্টনের ব্যাপারে অনুসরণ করে চলবে। বার্কার মনে করেছেন যে, তিনটি নীতির ওপর ভিত্তি করে অধিকার বন্টন করা যেতে পারে। এগুলি হ'ল স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাত্রের নিয়মাবলী, যে নিয়মাবলী ন্যায় থেকে আসছে এবং ন্যায়কেই অনুসরণ করছে। বার্কার এক্ষেত্রে প্রথমে সৌভ্রাত্র বা সহযোগিতার নীতির কথা বলেছেন, যার দ্বারা বিভিন্ন অধিকার সদস্যদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া যেতে পারে। এ অধিকারগুলি হচ্ছে তাদের আত্মবিকাশের শর্ত। সৌভ্রাত্রের নীতি হ'ল সর্বজনীন উপভোগের জন্য সর্বজনীন উপকরণ বন্টন নীতি। এই নীতি অনুযায়ী সকলের জন্য সাধারণ বস্তুগত ও মানসিক উপকরণ ব্যবস্থাপনা ও বন্টন করে দেওয়া হয়। রাস্তাঘাট, পয়ঃপ্রণালী থেকে গ্রন্থাগার, যাদুঘর প্রভৃতির সুযোগ সহযোগিতার মাধ্যমেই নাগরিক পায়।

বার্কারের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, সাম্যের নীতি অনুসারে নাগরিক চারটি অধিকার পায়। এগুলি হ'ল : (১) আইনের দৃষ্টিতে সমানাধিকার; (২) ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে সমান আচরণের অধিকার; (৩) কর প্রদানের ক্ষেত্রে সমান আচরণের অধিকার; এবং (৪) সম্মানপ্রাপ্তি ও সরকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে সমান আচরণের অধিকার। বার্কার বলেছেন যে, কেবল রাজনীতিক ক্ষেত্রে সাম্যের অধিকারের কথা ভাবলে চলবে না; বর্তমানে আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও সাম্যের কথা বলা হয়। তিনি মনে করেছেন যে, এ দুটি ক্ষেত্রে নাগরিক সাম্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে সামর্থ্যের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটবে না।

স্বাধীনতার নীতির অধীনে যে সমস্ত অধিকার আছে তুলনামূলকভাবে সংখ্যায় তারা অনেক বেশী, কারণ স্বাধীনতার ধারণা একাধিক নীতি বহন করে। বার্কার স্বাধীনতার নীতির অধীনে অধিকারগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন— রাজনীতিক, পৌর এবং আর্থনীতিক। রাজনীতিক স্বাধীনতার আওতায় যে সমস্ত অধিকার আছে তাদের মধ্যে অন্যতম হ'ল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা, রাজনীতিক দল গঠন করা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ইত্যাদি।

বার্কার পৌর অধিকারসমূহকে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। এগুলি হল : দৈহিক ক্রিয়াকলাপের অধিকার, মনের ক্রিয়াকলাপের স্বাধীনতা এবং বাস্তব ক্ষেত্রে ক্রিয়াকলাপের অধিকার।

বার্কার মনে করেছেন যে, রাজনীতিক ও পৌর অধিকার ছাড়াও আর্থনীতিক অধিকার বিভিন্ন দেশে গুরুত্ব পাচ্ছে। হবহাউসের মতো বার্কারও আর্থনীতিক অধিকারকে রাজনীতিক ও পৌর অধিকারের বর্ধিত রূপ হিসেবে দেখছেন। এটি আবার সাম্যনীতির সঙ্গেও যুক্ত। সাম্যের দিক থেকে আর্থনীতিক অধিকারের তাৎপর্য হচ্ছে আর্থনীতিক ক্ষেত্রে অসাম্য দূরীকরণ। আর স্বাধীনতার দিক থেকে আর্থনীতিক অধিকার বলতে বোঝায় কর্মের অধিকার, ন্যায়সঙ্গত মজুরী, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার প্রভৃতি। ব্ল্যাকস্টোনের সঙ্গে একমত হয়ে বার্কার বলেছেন যে, এগুলি প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে অষ্টাদশ শতক থেকে যে কথাগুলি বলে আসছে

[১] Frank Thakurdas, p. 142

তারই সম্প্রসারিত রূপ। তবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারে লক্ যে পবিত্রতা আরোপ করেছিলেন বার্কারের হাতে তা অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। তিনি একে অন্যান্য বহুপ্রকার অধিকারের আপেক্ষিক ও শর্তাধীন করে তুলেছেন।[১]

বার্কারের অধিকার সংক্রান্ত ধারণার সঙ্গে গ্রীন, হবহাউস ও ল্যাস্কির ধারণার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। গ্রীনের মতে অধিকার হল গণমঙ্গলের পরিপূরক কতকগুলি শর্ত যা দাবি করা হয় ও স্বীকৃত হয়। অধিকার একদিকে ব্যক্তির দাবি হিসেবে আসে, অপরদিকে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয়। বার্কারও বলেছেন যে, অধিকারে দু'টি উৎস— (১) নৈতিক ব্যক্তিত্ব, এবং (২) রাষ্ট্র ও আইন। বার্কার হবহাউসের অধিকার তত্ত্বের দ্বারাও কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। হবহাউসেরও অধিকার সংক্রান্ত ধারণা নৈতিক তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মতে অধিকার একটি নৈতিক ধারণা। অধিকার নিরঙ্কুশ নয়, সামাজিক কল্যাণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বার্কারের মতো ল্যাস্কিও বলেছেন যে, অধিকার হ'ল নৈতিক ব্যক্তিত্ব বিকাশের কতকগুলি সামাজিক উপকরণ। উভয়েই অধিকারের আইনগত স্বীকৃতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বস্তুত গ্রীন, হবহাউস, বার্কার ও ল্যাস্কি অধিকার সম্পর্কে অনেকটা একই ধরনের অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউই হবস্, লক্, রুশো বর্ণিত স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্ব স্বীকার করেননি। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে অধিকার কখনো জনগণের অধিকার হতে পারে না। বৈষম্যমূলক সমাজে অধিকার বলতে মুষ্টিমেয় শাসকশ্রেণীর অধিকারকেই বোঝায়।

৩.৬ ঃ ন্যায় সম্পর্কে বার্কারের ধারণা

রাজনীতিক তত্ত্বে অন্য বহু ধারণার মতোই ন্যায় ধারণাটির প্রকৃতিতেও অনেক দিক ও মাত্রা রয়েছে। তাছাড়া ন্যায় ধারণাটি নিশ্চল নয়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি পরিবর্তিত হয়েছে। প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল ন্যায়কে সামাজিক ও রাজনীতিক সহযোগিতা হিসেবে দেখেছেন, যার দ্বারা বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ তাদের নিজ নিজ সামাজিক ভূমিকা পালন করতে পারে। হিতবাদীরা সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক মঙ্গলকেই ন্যায়ের প্রকৃত মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সমতাবাদীদের বিচারে সমতাই হ'ল ন্যায়ের মূল বিষয়। আবার মুক্ত চিন্তাবাদে বিশ্বাসীরা স্বাধীনতাকেই ন্যায়ের ভিত্তি হিসেবে দেখেছেন। অপরদিকে বার্কার প্রমুখ সমন্বয়বাদীর মতে, বিভিন্ন উপাদান ও মূল্যবোধের সমন্বয় সাধনই হল ন্যায়ের মূল ভিত্তি।

ন্যায় বা জাস্টিস্ (Justice) শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল নিরপেক্ষতার গুণ বা নিরপেক্ষ হওয়া। 'জাস্টিস্' শব্দটি লাতিন শব্দ 'জাস্টিসিয়া' (Justitia) থেকে এসেছে। বার্কার বলেছেন যে, ন্যায় শব্দটির উৎপত্তিগত ধারণায় কেবল জাস্টিসিয়া নয়, 'জাস' (Jus) এবং জাস্টাস (Justus) ও আছে। সুতরাং 'জাস্', 'জাস্টাস' এবং 'জাস্টিসিয়া' শব্দগুলির উৎপত্তিগত ধারণায় সংযোগ বা 'সুসমঞ্জস্', 'বন্ধন' বা 'বন্ধনসূত্র' এই শব্দগুলি প্রতিফলিত। এগুলির দ্বারা প্রধানত মানব সম্বন্ধের একটি 'সংগঠিত' ব্যবস্থায় মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক চলছে তারই ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু বার্কার বলেছেন যে, 'ন্যায়' শব্দের দ্বারা একটি সুসমন্বিত মূল্যবোধ ব্যবস্থার মূল্যবোধের সঙ্গে মূল্যবোধের সংযোগ সাধন বা সুসামঞ্জস্য বিধানও প্রতিফলিত হয়। মানব-সম্পর্কের সংগঠিত ব্যবস্থায় আমরা বহুসংখ্যক এবং বিভিন্ন প্রকারের মূল্যবোধকে স্বীকৃতি দিয়ে থাকি। যেমন, স্বাধীনতার মূল্যবোধ, সাম্যের মূল্যবোধ, এবং সৌভ্রাত্রের মূল্যবোধ। ন্যায়ের কাজ হল বিভিন্ন রাজনীতিক মূল্যবোধের বিন্যাস সাধন, সংযুক্তিকরণ অথবা সুসামঞ্জস্য বিধান। অনুরূপভাবে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির মিলন ঘটানোও এর কাজ।

বার্কার মনে করেছেন যে, ন্যায়ের প্রকৃতি সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে গেলে এর উৎস সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। ন্যায় ধারণার উৎপত্তিতে ধর্ম, প্রকৃতি, অর্থনীতি এবং নীতিশাস্ত্র কীভাবে উৎসকেন্দ্র হিসেবে কাজ করেছে বার্কার তার বিবরণ দিয়েছেন। ধর্ম প্রসঙ্গে বার্কার বলেছেন যে, যেহেতু রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ধার্মিক-অধার্মিক উভয়েই

[১] Barker, *Principles of Social and Political Theory,* Book III, Sec. 2

বসবাস করছে সেইহেতু ধর্মকে ন্যায়ের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা ঠিক হবে না। ন্যায়ের উৎস হিসেবে যে প্রকৃতির ধারণা করা হয়, তাকে বার্কার কোন পৃথক বা মৌলিক উৎস হিসেবে মনে করেননি। প্রকৃতির ধারণা ধর্মীয় বিশ্বাস বা নৈতিক দর্শনের সঙ্গে যুক্ত। উনিশ শতকে ইউরোপে যখন আধুনিক শিল্প বিকাশ প্রবল হয়ে ওঠে তখন জার্মানি, ফ্রান্স ও রাশিয়ার কয়েকজন চিন্তাবিদ মত প্রকাশ করেছিলেন যে, অর্থনীতি ন্যায়ের উৎস। আর্থনীতিক অবস্থা, ঘটনাবলী বা সাধারণ নীতি থেকে ন্যায়ের ধারণা গড়ে ওঠে বলে মনে করা হয়। কিন্তু বার্কার বলেছেন যে, আইন আর্থনীতিক ব্যবস্থার দ্বারা যতটা প্রভাবিত হয়েছে, তার চেয়ে বেশি তা নির্ধারিত করেছে আর্থনীতিক ব্যবস্থাকে। অর্থনীতির সঙ্গে ন্যায়ের সম্পর্কও এই ধরনের। বার্কার আর্থনীতির নীতিকে ন্যায় ধারণার একমাত্র উৎস হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন।

নীতিশাস্ত্রকে ন্যায়ের উৎস বলে বার্কার গণ্য করেছেন। তিনি মনে করেছেন যে, জনসম্প্রদায়ের নৈতিক মান ন্যায়ের উৎস। এই নৈতিক মান সাধারণ নৈতিক চেতনা দ্বারা সৃষ্ট এবং বাস্তবায়িত। ন্যায়ের মধ্যে নিহিত আছে কতকগুলি মূল্যবোধ, যেগুলি হল আইনের নৈর্বক্তিক উৎস। সমাজে যদি নৈতিকতা না থাকে তাহলে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এহেন সমাজে আইন নীতি-বর্জিত হয়ে পড়বে। নৈতিকতার পরিপ্রেক্ষিতে বার্কার আইনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, আইনের মূল্যবোধ ও বৈধতা দুইই থাকবে। তাঁর মতে, কর্তৃত্ব আইনকে দেয় বৈধতা, আর ন্যায় দেয় মূল্যবোধ।[১] আইন যদি জনসম্প্রদায়ের যথাবিহিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত, স্বীকৃত ও প্রযুক্ত হওয়ার পূর্বশর্তগুলি পরিপূরণ করে, তবে তার বৈধতা আছে বলে গণ্য হবে। আবার আইনকে মূল্যবোধ সম্পন্ন হতে হলে তাকে নৈতিক চেতনার দাবিগুলির সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। এই দাবিগুলি ন্যায় সংক্রান্ত সাধারণ ধারণারই বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং বার্কারের মতে, আইন, নৈতিকতা ও ন্যায়— এরা কেউ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

ন্যায়ের চূড়ান্ত নীতি শীর্ষক আলোচনায় বার্কার বলেছেন যে, ন্যায় হ'ল চূড়ান্ত নীতি, যা অধিকারগুলির সাধারণ বন্টন এবং তাদের বন্টনের বিভিন্ন নীতিগুলি নিয়ন্ত্রণ করে। তাঁর মতে, "ন্যায় হ'ল রাষ্ট্রের সংঘের দ্বারা এবং তার অভ্যন্তরে সাধারণভাবে মানবিক সম্পর্কের যথাযথ বিন্যাস সাধন।" ন্যায় ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এবং নীতির সঙ্গে নীতির সামঞ্জস্যবিধান করে। ন্যায়ের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে মনে হতে পারে যে, এটি একটি বিমূর্ত ধারণা। আসলে তা নয়। প্রতিটি ব্যক্তির মনের মধ্যে ন্যায়ের ধারণা নিহিত। সুদীর্ঘকাল ধরে সামাজিক চিন্তার যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটি গড়ে উঠেছে, তার থেকেই ন্যায়ের ধারণার উদ্ভব ঘটেছে। সামাজিক চিন্তার যেমন বস্তুগত ভিত্তি আছে তেমনি ন্যায়েরও একটি বাস্তব ভিত্তি আছে। যদিও ন্যায় নৈতিকতার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু ন্যায় নিজে নৈতিকতা নয়। এর আচরণবিধি নীতিবিদ্যার আচরণবিধিও নয়। ন্যায় বলতে অন্তর্জীবনের নিয়মাবলী বোঝায় না। সুসংগঠিত মানব সমাজের বাহ্যিক জীবনের নিয়ম হল ন্যায়।

বার্কার দেখিয়েছেন যে, জাস্টিনিয় ইনস্টিটিউটস্ (Institutes of Justinian) প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে ন্যায়ের তিন প্রকার কর্মানুশাসনের উল্লেখ পাই। এগুলি হল— (১) নিজের অবস্থা বা মর্যাদা অনুযায়ী জীবনযাপন, (২) অন্যের অবস্থা বা মর্যাদার কোন ক্ষতি না করা এবং (৩) অন্যের মর্যাদা ও অধিকারকে যথাযোগ্য সম্মান দেখানো। অ্যারিস্টটলের বন্টনভিত্তিক ন্যায় অনুযায়ী প্রতিটি ব্যক্তি তার প্রকৃত মর্যাদা এবং সমাজ থেকে ন্যায্য অংশ পাবার অধিকারী।

এইভাবে প্রাথমিক দিক থেকে ন্যায় বন্ধনসূত্র এবং সংযোগ রক্ষাকারী হিসেবে কাজ করে। কিন্তু ন্যায় বিভিন্ন নীতির মধ্যেও সামঞ্জস্যবিধান করে থাকে। ন্যায় হল চূড়ান্ত নীতি, যা বিভিন্ন ব্যক্তি ও নীতির দাবি ও পাল্টা দাবির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে। বার্কার বলেছেন যে, সমাজে স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাত্রের নীতিগুলির মধ্যে প্রায়শই বিরোধ দেখা দেয়। ন্যায় এই বিরোধের মীমাংসার দায়িত্ব গ্রহণ করে। স্বাধীনতার নীতি সাম্যের নীতির মধ্যে বিরোধে লিপ্ত হতে পারে। উভয়ের সঙ্গে সৌভ্রাত্রের নীতির ও বিরোধ দেখা দিতে পারে। আবার বিভিন্ন প্রকার স্বাধীনতা

(পৌর, রাজনীতিক ও আর্থনীতিক)র মধ্যেও বিরোধ দেখা দিতে পারে। ভারসাম্যের ধারক হিসেবে ন্যায় সমাজের সকল ব্যক্তির মধ্যে অধিকারসমূহকে দাবি অনুযায়ী বন্টন করে দেয়। বন্টনের নীতিগুলির নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব এর ওপর ন্যস্ত। বার্কার ন্যায়কে এমন এক ব্যক্তি হিসেবে কল্পনা করেছেন, যার হাতে একটি তুলাদণ্ড ও চোখ বাঁধা। শেষটি হল নিরপেক্ষতার প্রতীক। ন্যায় সবার অলক্ষে অবস্থান করে ব্যক্তিত্বের সর্বোচ্চ বিকাশ সাধনের জন্য সমাজে ভারসাম্য রক্ষা করে চলে।

বার্কারের ন্যায় তত্ত্বটি পুরোপুরিভাবে ভাববাদের আবরণে আবৃত বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন। ন্যায়ের বাস্তব রূপায়ণের দিকটির প্রতি বার্কার আদৌ দৃষ্টি দেননি। মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বার্কার-এর ন্যায়-তত্ত্বের সমালোচনা করে বলা হয়ে থাকে যে, যে-কোনো নৈতিক ব্যবস্থাকে সব সময়ই শ্রেণী সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানার ধরনের আলোকে বিশ্লেষণ করা উচিত। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ন্যায়ের নীতি বাস্তবায়িত করা অসম্ভব। সমাজের সুষম ও সার্বিক বিকাশ যে ন্যায় প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান শর্ত তা বার্কার বলেননি।

সাম্প্রতিককালে জন রলস্ উদারনীতিক তত্ত্বকে মানবিক করার উদ্দেশ্যে যে ন্যায়তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন তা রাষ্ট্রতত্ত্বের জগতে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করেছে। রলসের ন্যায়তত্ত্বে দুটি প্রধান নীতির কথা বলা হয়েছে। একটি হ'ল সকলের জন্য সমান মৌল স্বাধীনতা, অপরটি হল সকলের জন্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে ন্যায্য সাম্য। এই নীতিতে বলা হয়েছে যে, সামাজিক ও আর্থনীতিক বৈষম্যগুলিকে এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যাতে সর্বাধিক কম সুবিধাপ্রাপ্তদের সর্বাধিক সুবিধায় আনা যায়। বার্কার ও রলস্ উভয়েই জনকল্যাণমূলক উদারনীতিবাদের তত্ত্ব উপস্থাপিত করলেও রলসের ন্যায়তত্ত্ব অনেক বেশী যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তবসম্মত।

৩.৭ ঃ সারসংক্ষেপ

বার্কারের রাজনীতিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, তিনি কোন বিশেষ রাজনীতিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। সাম্যবাদ তাঁর মনঃপুত ছিল না, কারণ এই মতবাদ মানুষকে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও দায়দায়িত্বের জীবন্ত উৎস হিসেবে গণ্য না করে তাকে যেন একটা মাটির পুতুলে পরিণত করে দেয়। ফ্যাসিবাদ বর্জনীয়, কারণ তা বিচারবুদ্ধি ও আলাপ আলোচনার যুক্তিসঙ্গত প্রণালীটিকে নির্মূল করে দিয়ে সেখানে নিয়ে আসে একটা উন্মত্ত উদ্দীপনা। আবার ফেবিয়ান সমাজতন্ত্র, যৌথ-ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্র, কিংবা সংঘমূলক সমাজতন্ত্র— এর কোনটিই ব্রিটেনের জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, কারণ দেশটি হচ্ছে আইনের অনুশাসন ও স্বাধীনতার সনাতন ভূমি। বার্কার কোন রাজনীতিক বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন না। তিনি মনে করতেন সময় এবং পরীক্ষা নিরীক্ষামূলক প্রচেষ্টাই যে কোন সমস্যার উত্তর যোগাবে। তবে তিনি নৈতিক বিপ্লবে বিশ্বাস করতেন। নৈতিক অগ্রগতির জন্যই সামাজিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে থাকে।

চিন্তাবিদ হিসেবে বার্কার ছিলেন মুক্তবুদ্ধির বিশ্বস্ত সেবক। যে আদর্শের প্রতি তিনি অবিচল বিশ্বাস স্থাপন করে গেছেন সেটি হ'ল উদারনীতিক গণতন্ত্রের আদর্শ। হবহাউস, ল্যাস্কির মতো উদারনীতিক গণতন্ত্রকে তিনি মানবিক করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই প্রচেষ্টায় সমষ্টিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ তাঁর কাছে পরস্পর বিরোধী ছিল না। তাঁর মতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে যদি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকশিত করা হিসেবে দেখি এবং সমষ্টিবাদকে যদি ব্যক্তির সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সমষ্টিগত পরার্থমূলক কাজ হিসেবে মনে করি, তাহলে এ দুয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। বস্তুত বার্কার ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ এবং সমষ্টিবাদকে পরস্পরের পরিপূরক হতে পারে বলে মনে করেছেন। তবে তার জন্য দরকার উভয়ের মধ্যে এক সুষ্ঠু সমন্বয়-সাধন। বার্কার বলেছেন যে, সরকারের কার্যাবলী এবং ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতা পরস্পরবিরোধী নয়, পরিপূরক। তিনি রাষ্ট্রের জনকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতার সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিলেন। ল্যাস্কির মতো বার্কারও বলেছেন যে, রাজনীতিক স্বাধীনতা ও আর্থনীতিক স্বাধীনতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। তবে ল্যাস্কি কিছুটা মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেছিলেন, কিন্তু বার্কার মার্কসবাদকে সমর্থন করতে পারেননি।

অনুশীলনী - ৩

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। বার্কারের মতে স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে সম্পর্ক কী?

২। বার্কার কীভাবে অধিকারের শ্রেণীবিভাগ করেছেন?

৩। বার্কার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমষ্টিবাদের মধ্যে কীরূপ সম্পর্ক দেখেছেন ?

রচনাত্মক প্রশ্ন :

১। বার্কারের অধিকার সংক্রান্ত ধারণা বিশ্লেষণ কর।

২। বার্কারের ন্যায়তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। রলসীয় ন্যায়তত্ত্বের সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে দেখাও।

৩.৮ ঃ প্রধান শব্দগুচ্ছ

সমষ্টিবাদ (Collectivism) ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'অবাধ বাণিজ্যনীতি'র ওপর প্রতিষ্ঠিত চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে সমষ্টিবাদের তত্ত্ব গড়ে ওঠে। সমষ্টিবাদ হল এক সামাজিক তত্ত্ব যার দ্বারা রাষ্ট্রকে এক কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে মনে করা হয়। এর উদ্দেশ্য হল কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক কর্তৃত্বের দ্বারা অধিকতর উন্নত বন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে নতুন ধরনের সমাজ গড়ে তোলা।

যৌথ-ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ (Syndicalism) ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ফ্রান্সে ফরাসী শ্রমিক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এই মতবাদের উদ্ভব হয়। যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ হ'ল এক সামাজিক তত্ত্ব যার দ্বারা ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে সমাজের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং বলা হয় যে এদের দ্বারাই এই ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। এই মতবাদের সমর্থকগণ মার্কসীয় তত্ত্বে বিশ্বাসী।

বহুত্ববাদ (Pluralism) ঃ রাষ্ট্রের আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতার তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে বহুত্ববাদের উদ্ভব হয়। হবস্, বোঁদা, অস্টিন প্রমুখ চিন্তাবিদ রাষ্ট্রের চরম, চূড়ান্ত ও অসীম সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছিলেন এবং তাঁরা বলেছিলেন যে, রাষ্ট্রের আদেশই আইন। এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে ল্যাস্কি লিন্ডসে, বার্কার প্রমুখ তাত্ত্বিক দেখিয়েছেন যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা বিভিন্ন দিক থেকে সীমাবদ্ধ। তাঁদের মতে, অন্যান্য সংঘের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আইনের ক্ষেত্রে এবং অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এই মতবাদ বহুত্ববাদ নামে পরিচিত।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism) ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে তৎকালীন ব্যাপক সরকারী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উদ্ভব হয়। এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি যত বেশি সীমিত করা যাবে রাষ্ট্র ও সমাজের ততই মঙ্গল। এই মতবাদে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকারকে সম্প্রসারিত করে রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সংকুচিত করার কথা বলা হয়। আর্থনীতিক ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণশূন্য অবাধ প্রতিযোগিতা থাকা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করা হয়। সেইজন্য এই তত্ত্ব অবাধ নীতি বা স্বাচ্ছন্দ্য নীতি (Laissez faire Theory) হিসেবেও পরিচিত।

৩.৯ ঃ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

অনুশীলনী - ১

সংক্ষিপ্ত উত্তর :

১। অনুচ্ছেদ ১ ও ২ দেখুন।

২। অনুচ্ছেদ ১ ও ২ ভালো করে পড়ুন।

৩। অনুচ্ছেদ ৩ দেখুন।

৪। অনুচ্ছেদ ও দেখুন।

রচনাত্মক উত্তর :

১। অনুচ্ছেদ ২ ও ৩ দেখুন।

অনুশীলনী - ২

সংক্ষিপ্ত উত্তর :

১। অনুচ্ছেদ ৪ দেখুন।

২। অনুচ্ছেদ ৪.১ দেখুন।

৩। ৪.১ অনুচ্ছেদের শেষ অংশ দেখুন।

রচনাত্মক উত্তর :

১। অনুচ্ছেদ ৪, ৪.১ ও ৪.২ ভালো করে পড়ুন।

২। অনুচ্ছেদ ৪.১ দেখুন।

অনুশীলনী - ৩

সংক্ষিপ্ত উত্তর :

১। অনুচ্ছেদ ৪.২ দেখুন।

২। অনুচ্ছেদ ৫ ভাল করে পড়ুন।

৩। অনুচ্ছেদ ৭ দেখুন।

রচনাত্মক উত্তর :

১। অনুচ্ছেদ ৫ দেখুন।

২। অনুচ্ছেদ ৬ দেখুন।

৩.১০ ঃ নমুনা প্রশ্নাবলী

Short answer types questions :

1. How does Ernest Barker define the concept of rights ?
2. What does Barker mean by intra-liberty quarrel ?

3. What does Barker mean by Justice ?
4. What, according to Barker, is the relationship between liberty and equality ?
5. How does Barker distinguish between State and Soceity ?
6. How does Barker define the concept of liberty ?

Essay type questions :

1. Examine Ernest Barker's views on the principle of liberty.
2. Attempt a write-up on Barker's views on rights.

৩.১১ ঃ গ্রন্থ-নির্দেশিকা

1. Ernest Barker, *Principles of Social and Political Theory, Oxford,* 1951.
2. Frank Thakurdas, *Recent English Political Theory,* The Minerva Associates, Cal, 1972.
3. O.P. Gauba, *Political Theory,* Macmillan, Delhi, 2003.
4. অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়, **সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্বের নীতি**, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯০।

একক - ৪

হ্যারল্ড জে. ল্যাস্কি (১৮৯৩-১৯৫০)

রাষ্ট্র, অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা

[Harold J. Laski (1893-1950) : His Views on State, Rights and Liberty]

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য

৪.১ ভূমিকা

৪.২ পরিপ্রেক্ষিত

৪.৩ আলোচনা পদ্ধতি

৪.৪ বৃহৎ সমাজে রাষ্ট্রের স্থান

- ৪.৪.১ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তি
- ৪.৪.২ নাগরিকের অধিকার ও রাষ্ট্র
- ৪.৪.৩ সমাজের যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতি

৪.৫ অধিকারের তত্ত্ব

৪.৬ স্বাধীনতার তত্ত্ব

৪.৭ উদারনীতিক ধারায় ল্যাস্কির স্থান

৪.৮ প্রধান শব্দগুচ্ছ

৪.৯ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

৪.১০ নমুনা প্রশ্নাবলী

৪.১১ গ্রন্থ-নির্দেশিকা

৪.০ ঃ উদ্দেশ্য

ল্যাস্কি তাঁর সময়কালের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাজনীতিক তত্ত্ব রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। সাবেকী উদারনীতিবাদ থেকে সমষ্টিবাদী উদারনীতিবাদে পরিবর্তন, বহুত্ববাদ এবং মার্কসবাদের প্রভাব তাঁর রাজনীতিক তত্ত্ব রচনায় গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই এককটি পাঠ শেষ করলে ল্যাস্কির রাজনীতিক তত্ত্বের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে জানা যাবে।

- বৃহৎ সমাজে রাষ্ট্রের অবস্থান সম্পর্কে ল্যাস্কির ধারণা।

- ল্যাস্কির অধিকার সংক্রান্ত তত্ত্ব।
- ল্যাস্কির স্বাধীনতার তত্ত্ব।
- উদারনীতিক ধারায় ল্যাস্কির স্থান।

৪.১ ঃ ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সাবেকী উদারনীতিবাদের যে সঙ্কট দেখা দিয়েছিল তার থেকে উদারনীতিবাদকে রক্ষা করার জন্য যে কজন চিন্তাবিদ বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন হ্যারল্ড ল্যাস্কি ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ফ্রাঙ্ক ঠাকুরদাস যথার্থই বলেছেন যে, ল্যাস্কির তত্ত্বের মধ্যে একদিকে যেমন ইংরেজ উদারনীতিবাদের সমালোচনা করা হয়েছে অপরদিকে তেমনি এর সমর্থনে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে।[১] সমকালীন রাজনীতিক ভারসাম্যের প্রতিটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনকে তাঁর তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তিনি। বাস্তবের সঙ্গে তাঁর তত্ত্বকে সম্পর্কযুক্ত করতে গিয়ে অনেক সময় তাঁর তত্ত্বের মধ্যে অসংগতি দেখা গেছে ঠিকই। কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যে সমস্যাটি তাঁর সমগ্র চিন্তাধারার মধ্যে সংযোগ রক্ষা করেছিল তা হ'ল ব্যক্তি স্বাধীনতা অর্জন। মানবিক স্বাধীনতার জন্য এই চিন্তাই তাঁকে ইংরেজ উদারনীতিবাদী ধারার অন্তর্ভুক্ত করে তুলেছিল। তবে তিনি উদারনীতিক চিন্তাধারায় ছিলেন আমূল সংস্কারবাদী। ল্যাস্কির রাজনীতিক ধারণার গবেষক হার্বার্ট ডিন (Herbert Deane) এর মতে ল্যাস্কির চিন্তাধারায় সার্বভৌমত্বের বহুত্ববাদের সঙ্গে সংস্কারমূলক সমাজতন্ত্রবাদের সংমিশ্রণ হয়েছিল।[২]

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে ৩০শে জুন ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেষ্টারে হ্যারল্ড যোসেফ ল্যাস্কি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা নাথন ল্যাস্কি (Nathan Laski) ছিলেন গোঁড়া ইহুদি। কিন্তু হ্যারল্ড তাঁর পিতাকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি অজ্ঞেয়বাদী, ইহুদি নন। তাঁর ছাত্রজীবন ছিল অসাধরণ কৃতিত্বপূর্ণ। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন, প্রথমে এক বছর বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন তিনি। পরে তিনি বিষয় পরিবর্তন করে ইতিহাসে শিক্ষালাভ করেন। শিক্ষা গ্রহণকালে তিনি ফিশার (Fisher), বার্কার, মেইটল্যান্ড (Maitland) প্রমুখ বিশিষ্ট আধ্যাপকের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। শিক্ষা শেষে তিনি ম্যাক্‌গিল (McGill) বিশ্ববিদ্যালয় ও হাভার্ড (Harvard) বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯২৬ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত তিনি লন্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্স-এ অধ্যাপনা করেন। অধ্যাপক হিসেবে তিনি ছিলেন অসাধারণ জনপ্রিয় কৃতিত্বের অধিকারী। মূলত রাষ্ট্রচিন্তাবিদ হলেও তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিটেনের লেবার পার্টি (Labour Party)র সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন।

তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সংখ্যা ত্রিশের অধিক। এগুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল : 'অথরিটি ইন দ্য মডার্ন স্টেট' (*Authority in the Modern State*) ১৯১৮, 'এ গ্রামার অব্ পলিটিক্স্' (*A Grammar of Politics*) ১৯২৫, 'লিবার্টি ইন দ্য মডার্ন স্টেট' (*Liberty in the Modern State*) ১৯৩০, 'ডেমোক্র্যসী ইন ক্রাইসিস' (*Democracy in Crisis*) ১৯৩৮, 'দ্য স্টেট ইন থিয়োরী এ্যন্ড প্র্যাক্‌টিস্' (*The State in Theory and Practice*) ১৯৩৫, 'এ্যান ইন্ট্রোডাক্‌সন্ টু পলিটিক্স্' (*An Introduction to Politics*) ১৯৩১, 'মার্কস এ্যান্ড টু ডে' (*Marx and Today*) ১৯৪৩ প্রভৃতি। একথা ঠিক যে, ল্যাস্কির রাজনীতিক চিন্তাধারা সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু প্রারম্ভিক যৌবনে যে ধারণাগুলি তিনি পোষণ করেছিলেন, সেগুলি তাঁর সারা জীবন ধরে একই ছিল। তিনি চেয়েছিলেন মানুষের দুঃখ-কষ্ট, অজ্ঞতা এবং দারিদ্র্য লাঘব করতে। প্রত্যেক ব্যক্তি যাতে তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারে তার জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের নীতি — সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা ছিল তাঁর রচনার মৌল লক্ষ্য।[৩]

---

[১] Frank Thakurdas, *Recent English Political Theory.*

[২] বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য (অনুবাদ) হ্যারল্ড ল্যাস্কি : রাজনীতি পরিচয়, ভূমিকা।

[৩] Sukhbir Singh, *History of Political Though* vol. 2, p. 312

৪.২ ঃ পরিপ্রেক্ষিত

অন্যান্য রাষ্ট্রচিন্তাবিদের মতো ল্যাস্কিরও রাজনীতিক তত্ত্ব তাঁর সমকালীন বিভিন্ন ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গড়ে উঠেছিল। তাঁর সময়ে হিতবাদ ফেবীয় সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ প্রভৃতি আদর্শ সার্বভৌমিকতা, সংসদীয় গণতন্ত্র, ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রভৃতি ধারণাকে সংস্কার সাধনের জন্য উদ্ভব হয়েছিল। শিক্ষা গ্রহণকালে ল্যাস্কি গভীরভাবে বিজ্ঞান ও উদারনীতিবাদ পাঠ করেছিলেন। তখন থেকেই তিনি সামাজিক ও রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সাবেকী গোঁড়া মতবাদের বিরোধিতা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। প্রাক-বিশ্বযুদ্ধ পর্বে নারীদের ভোটাধিকার আন্দোলন, ফ্রান্সে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন প্রভৃতি সংস্কারবাদী আন্দোলন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর উদারনীতিক জগৎ ধ্বংসের মুখে উপনীত হয়েছিল। এই সময়ের মধ্য দিয়েই ল্যাস্কি তাঁর কলেজের পাঠ শেষ করেছিলেন। এর ফলে তিনি এই পরিবেশের বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, ভিক্টোরীয় যুগের সাধারণ মানুষের যে দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও দুঃখ-কষ্ট দেখা দিয়েছিল তা দূর করার জন্য এক নতুন জগৎ গড়ে তোলা প্রয়োজন। তিনি বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণও করেছিলেন। যদিও সাংবিধানিক পথে আন্দোলনেই তিনি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর মন বিপ্লবী হয়ে উঠেছিল। তিনি বলেছিলেন যে, সাবেকী জীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিকে বর্জন করে ডারউইন ও মার্কসের ধারণাকে স্বাগত জানানো উচিত। তিনি আরো বলেছেন যে, স্বাধীনতার পরিবেশেই সামাজিক সত্য উদঘাটিত হতে পারে।[১] ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত 'দ্য স্টেট ইন থিয়োরী এ্যান্ড প্র্যাক্টিস' গ্রন্থে তিনি মন্তব্য করেছেন যে, পুঁজিবাদের আর্থনীতিক সংকট রাজনীতিক গণতন্ত্রের ধবংস ডেকে আনতে পারে। সমাজতন্ত্রকেই ফ্যাসিবাদের বিকল্প বলে মনে করেছিলেন তিনি।

ল্যাস্কির রাজনীতিক চিন্তাধারার প্রথম পর্যায় বোঁদা, হবস্, অস্টিন প্রমুখ চিন্তাবিদের সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পর্কে একত্ববাদী তত্ত্বের বিরুদ্ধে আক্রমণের বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ ছিল। ল্যাস্কির প্রারম্ভিক জীবনে বহুত্ববাদী ধারণা হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছিল। পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে এবং সময়ের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ল্যাস্কি ছিলেন সহজ-অনুভবনশীল। সেই কারণে হাওয়ায় ভাসমান বহুত্ববাদী ধারণাকে তিনি মনের মধ্যে টেনে নেন। প্রকৃতপক্ষে নিউ কলেজের দিনগুলোতে তাঁর চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছেন গিয়ার্কে (Gierke)। মেটল্যান্ড এবং ফিগিস (Figgis)। এঁরা সমাজের ধর্মীয় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যৌথ ব্যক্তিত্বের তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ডুগুই (Duguit) এর রাজনীতিক বহুত্ববাদের সমর্থক ছিলেন। বার্কারের সংস্পর্শে এসে তিনি হেগেলীয় মতবাদের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে, অতিমাত্রায় কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গোষ্ঠী-স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট করতে পারে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে রাষ্ট্র সম্পর্কে ল্যাস্কির দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা পরিবর্তন হয়েছিল। তাঁর বহুত্ববাদী তত্ত্ব কিছুটা নরম হয়েছিল। তিনি মনে করেছিলেন যে, সমাজজীবনে রাষ্ট্রের কিছুটা প্রাধান্য থাকা প্রয়োজন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন তখন ফেরীয় সমাজবাদীদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। এর ফলে ফেরীয় সমাজবাদ তাঁর তত্ত্বের ওপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এছাড়া এই সময় তিনি ব্রিটিশ লেবার পার্টির সদস্য হন। এই পার্টি তখন ব্রিটিশ রাজনীতিতে প্রভাব বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছিল। এই দলের সদস্যপদ তাই ল্যাস্কির দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিল। তবে যদিও তিনি রাষ্ট্রের প্রাধান্যের নীতি গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু এর ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। তাই কর্তৃত্বের গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের নীতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর মতে সমাজ যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রীয়, তাই কর্তৃত্বও হবে যুক্তরাষ্ট্রীয়।

তৃতীয় ও শেষ পর্যায়ে ল্যাস্কি সংশোধিত বহুত্ববাদের নীতি বর্জন করেছিলেন এবং রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণা গ্রহণ করেছিলেন। এই সময় গণতন্ত্রকে তিনি পুঁজিবাদী গণতন্ত্ররূপে আখ্যায়িত করেন। বস্তুত বিংশ শতাব্দীর

[১] Ibid p. 310.

তৃতীয় দশকের শেষ দিকে তিনি মার্কসীয় চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি মনে করেছিলেন যে, আর্থনীতিক স্বাধীনতাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে গেলে ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তন প্রয়োজন। মার্কসের মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি বলেছেন যে, কোন রাষ্ট্রে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আর্থনীতিক অসাম্য খুব বেশী হলে সেই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বিকৃত হয়। কারণ রাষ্ট্র সেখানে ধনিকশ্রেণীর স্বার্থই রক্ষা করে চলে। সেই সময় তিনি উপলব্ধি করে ছিলেন যে, ইংল্যাণ্ডের ক্ষমতাসীন দল সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে চাইলেও মহাজনী পুঁজি সংসদীয় শাসনব্যবস্থার নীতি গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক ছিল। ইতালীতে ফ্যাসিষ্ট আধিপত্য, জার্মানীতে নাৎসী স্বৈরাচার এবং স্পেনে ফ্রাঙ্কোর একনায়কতন্ত্র প্রভৃতির উদ্ভব থেকে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে ধনতন্ত্র ও গণতন্ত্র একই সমাজে একসঙ্গে বেশী দিন টিকে থাকতে পারে না। লেনিনের মতো তিনিও বিশ্বাস করেছিলেন যে, ফ্যাসিবাদ হল ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের শেষ পর্যায়।

৪.৩ ঃ আলোচনা পদ্ধতি

রাজনীতি আলোচনায় ল্যাস্কি যে প্রয়োগবাদ (pragmatism) এর উপস্থাপনা করেছেন তা আধুনিক উদারনীতিক গণতন্ত্রের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। এই প্রয়োগবাদ ছিল রাজনীতিক প্রক্রিয়ার আলোচনায় এক বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে দার্শনিক ও আইনগত দৃষ্টিভঙ্গির বিরেধিতা করেছেন তিনি ; কারণ আধিবিদ্যক অথবা আইনগত ভিত্তিতে এই তত্ত্ব রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে প্রাধান্য দিয়ে এক বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করে। তাছাড়া ঐক্যের ওপর প্রাধান্য দিয়ে এই তত্ত্ব সমাজ জীবনে সংঘের গুরুত্বকে অস্বীকার করেছে এবং রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। এই তত্ত্বের বিমূর্ত অবরোহ পদ্ধতির জবাবে ল্যাস্কি আরোহী পদ্ধতির সাহায্যে রাজনীতি সম্পর্কে এক বাস্তব ধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন।

ল্যাস্কির মতে, রাজনীতি সম্পর্কে বাস্তবধর্ম দৃষ্টিভঙ্গিই বৈধ রাষ্ট্রতত্ত্ব গড়ে তুলতে পারে। তিনি মনে করেছেন যে রাষ্ট্রের প্রকৃতিকে বুঝতে হবে রাষ্ট্রের প্রকৃত লক্ষ্য সাধনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার দ্বারা। অর্থাৎ রাষ্ট্র তার সদস্যদের কতটা নৈতিক ও বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারছে তাঁর ভিত্তিতেই রাষ্ট্রে প্রকৃতি নির্ধারণ করা উচিত। সেইজন্যই তিনি রাজনীতিক ও সামাজিক তত্ত্বের তিনটি মৌল ধারণা — সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকার — এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর 'গ্রামার অব্ পলিটিক্স্' গ্রন্থে রাজনীতিক বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, কিছু কিছু সামাজিক সম্পর্ক আছে যা রাষ্ট্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় না। রাষ্ট্র সম্পর্কে বাস্তবধর্মী ব্যাখ্যায় ল্যাস্কি বলেছেন যে, রাষ্ট্রের কাজ প্রকৃত পক্ষে সরকারের কাজ। রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা সেই ক্ষমতা যা সরকার বাস্তবে প্রয়োগ করে।

ল্যাস্কি ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিহার করেছেন, কারণ ভাববাদীরা সমাজ ও রাষ্ট্রকে এক করে দেখেছেন। তাঁরা আদর্শ ও বাস্তবকে এক করে দিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মতে রাষ্ট্রের সর্বব্যাপক ঐক্য আদর্শ হতে পারে, কিন্তু বাস্তব নয়। নৈতিকতা রাষ্ট্রের কার্যনির্ণায়ক কোন স্বতলব্ধ গুণ হয়। নৈতিক উৎকর্ষ সাধনে রাষ্ট্রের ইতিবাচক অবদানের ভিত্তিতে এর কার্যাবলী বিচার করতে হবে। আধুনিক রাষ্ট্রে প্রকৃত ক্ষমতার উৎস কী — এটাই ছিল ল্যাস্কির প্রয়োগবাদের মূল আলোচ্য বিষয়। প্রয়োগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি দেখিয়েছেন যে, সরকারের ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত মুষ্টিমেয় সম্পদশালী শ্রেণীর ইচ্ছাকেই প্রতিফলিত করে। সমাজে প্রাধান্য বিস্তারকারী সম্পদশালী শ্রেণীর স্বার্থই রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবিত করে। রাজনীতির বাস্তবধর্মী তত্ত্ব রাষ্ট্রের রাজনীতিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করে না। কিন্তু বিশুদ্ধ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির থেকে এর পার্থক্য হল এই যে, প্রয়োগবাদ রাষ্ট্রের আদর্শ রূপায়ণে সীমাবদ্ধতাগুলিকে অবহেলা করে না এবং এগুলি কীভাবে দূর করে যায় তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

৪.৪ ঃ বৃহৎ সমাজে রাষ্ট্রের স্থান

বৃহৎ সমাজে রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে ব্যাপক মত পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এ সম্পর্কে যে মতবাদগুলি গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে আদর্শবাদ, বহুত্ববাদ ও মার্কসবাদ অন্যতম। আদর্শবাদীরা মনে করেন যে,

রাষ্ট্র একটি সর্বাঙ্গসুন্দর প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের মধ্যে সর্বব্যাপক ঐক্য লক্ষ করা যায়। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেই মানুষ স্বাধীন হবে। তাঁরা সমাজ ও রাষ্ট্রের পাস্পারিক স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেননি। বহুত্ববাদীরা মনে করেন যে, বৃহৎ সমাজে রাষ্ট্র কোন একক প্রতিষ্ঠান নয়। এই সমাজে অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠান আছে। রাষ্ট্রের স্থান তাদের মধ্যে একটি। তবে রাষ্ট্র হল এই বৃহৎ সমাজের একটি অত্যন্ত মূল্যবান অংশ। অপরদিকে মার্কসবাদীরা রাষ্ট্রকে সমাজের শ্রেণীদ্বন্দ্বের ফলশ্রুতি হিসেবে দেখেন। তাঁদের কাছে রাষ্ট্র হল শ্রেণী শোষণের যন্ত্র। ল্যাস্কি প্রথম জীবনে বোঁদা, হবস্, অস্টিন প্রমুখ চিন্তাবিদের একত্ববাদী তত্ত্বের বিরোধিতা করে বহুত্ববাদকে সমর্থন করেছিলেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা পরিবর্তন করে সীমিত ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা স্বীকার করে নিয়ে ছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রের স্বৈরী ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনি ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেছেন। তৃতীয় পর্যায়ে তিনি মার্কসবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ল্যাস্কির রাজনীতিক ধারণার গবেষক হার্বার্ট ডিন-এর মতে ঐ সময়ে ল্যাস্কির চিন্তাধারায় সার্বভৌমত্বের বহুত্ববাদের সঙ্গে সংস্কারমূলক সমাজতন্ত্রবাদের সংমিশ্রণ হয়েছিল।[১] ল্যাস্কির 'গ্রামার অব্ পলিটিক্স্' ও 'এ্যান ইন্ট্রডাক্শন টু পলিটিক্স্' গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে বৃহৎ সমাজে রাষ্ট্রের স্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে-ভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে তাকে তিনটি দিক থেকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। এগুলি হল ঃ (১) রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তি, (২) নাগরিকের অধিকার ও রাষ্ট্র এবং (৩) সমাজের যুক্ত রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি।

৪.৪.১ ঃ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তি

রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্য প্রদানের ব্যাপারে ল্যাস্কি আদর্শবাদীদের মতকে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর মতে, আনুগত্য লাভের ব্যাপারে রাষ্ট্রের কোন নিরঙ্কুশ দাবি থাকতে পারে না। এক্ষেত্রে ল্যাস্কির ওপর বহুত্ববাদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। ল্যাস্কির মতে ব্যক্তি কেবলমাত্র রাষ্ট্রের নাগরিক নয়। যে-সমাজের সে অংশ, সেই সমাজের অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সে নানাভাবে জড়িত হতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো মুখ্যত রাষ্ট্রের আইনের আওতায় থাকে। তবে যেহেতু ব্যক্তি কেবল রাষ্ট্রেরই সভ্য নয়, রাষ্ট্র আইনত সমাজের সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান— শুধু এই যুক্তিতে সে সকল সময় রাষ্ট্রের আদেশ মানতে বাধ্য নয়। তার নিজের অভিজ্ঞতার কথাও সে চিন্তা করে এবং রাষ্ট্র কী করছে সে তার বিচার করে দেখে। প্রত্যেক ব্যক্তির দুটি সত্তা আছে। একদিকে সে নাগরিক, সুতরাং রাষ্ট্রের সঙ্গে একাত্ম। আর একদিকে সে ব্যক্তি, এই দিক দিয়ে তার সত্তা রাষ্ট্রাতীত। এই দুই সত্তার মধ্যে বিরোধ বাধলে একমাত্র সেই ব্যক্তিই স্থির করবে সে কোন পক্ষ সমর্থন করবে। যদি রাষ্ট্র তার শ্রমিক সংঘকে নিষ্পেষিত করে তাহলে সেই স্থির করবে রাষ্ট্রের এই কাজ সে সমর্থন করবে কিনা।

ল্যাস্কির মতে, নাগরিকের সম্মতির ওপরই রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি নির্ভরশীল। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের বিষয়টি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীর ফলাফল পর্যালোচনার ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে। প্রত্যেক নাগরিক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কাজকর্ম সবসময় বিচার-বিবেচনা করে দেখে। রাষ্ট্র সমাজে এমনভাবে কাজ করবে যাতে নাগরিকরা বুঝতে পারে যে, রাষ্ট্রের কল্যাণেই সকলের কল্যাণ। নাগরিকদের অনুভব করতে হবে যে, অন্যান্য সংঘের নিয়মের মতো রাষ্ট্রের আইনও নাগরিকদের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির সহায়। সুতরাং ল্যাস্কির মতে, আইনের ফলাফলের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই আইনের প্রতি আনুগত্যের দাবি বৈধতা লাভ করে। আইনের জন্যই আইন প্রণয়ন করা হয় না। আইন প্রণয়নের একটা উদ্দেশ্য থাকে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির কল্যাণসাধন। রাষ্ট্র নাগরিক জীবনের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই আইন প্রণয়ন করে। রাষ্ট্রীয় আইন ও তার প্রয়োগ হল শর্তসাপেক্ষ। আইনের প্রতি আনুগত্যের শর্ত হল এই যে, জনগণের কল্যাণ সাধনে আইন সক্ষম হবে। একথা ঠিক যে, রাষ্ট্র সকলকেই সব বিষয়ে সুখী করার ভার নিতে পারে না, কারণ মানুষের সুখের সবগুলো উৎস রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের স্বার্থে একটা

[১] বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য, পূর্বে উল্লিখিত, 'ভূমিকা'।

অনুকূল পরিবেশের প্রয়োজন। আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্র এই পরিবেশটি গড়ে তোলার ব্যবস্থা করে এবং এটাই হল রাষ্ট্রের মূল কর্তব্য। বস্তুত, সার্থক সমাজ জীবনের একটা ন্যূনতম মান আছে। রাষ্ট্র এইরকম এক সমাজজীবনের ভিত্তি প্রস্তুত করার চেষ্টা করে।

ল্যাস্কির মতে, রাষ্ট্র যেখানে নাগরিকের স্বার্থবিরোধী কাজ করে সেখানে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধাচারণ করতে নাগরিক বাধ্য থাকবে।[২] নাগরিকদের গুরুত্বপূর্ণ দাবি পূরণের ক্ষেত্রে যদি রাষ্ট্রীয় আইন ব্যর্থ হয় তা হলে রাষ্ট্র ও তার আইনের বিরোধিতা করা হয়। ল্যাস্কি মনে করেছেন যে, যেহেতু নাগরিকের কল্যাণই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যের সফলতার জন্যই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাগরিকের অধিকার থাকা প্রয়োজন। রাষ্ট্র নাগরিকদের লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হলে বিরোধিতার প্রশ্ন আসে। সমাজের প্রাধান্যকারী ব্যক্তিদের চাহিদার প্রতি রাষ্ট্রীয় আইন সংবেদনশীল হয়। রাষ্ট্রীয় আইন যাদের দাবিকে উপেক্ষা করে তারাই অবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্য আইন অমান্য করতে উদ্যোগী হয়। রাষ্ট্র আনুগত্য দাবি করার জন্য এই যুক্তির অবতারণা করতে পারে যে, আইনের বিরোধিতা করলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। এই যুক্তির সারবত্তাকে একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করলে নাগরিকদের অনেক ক্ষতি হয়। তাই রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় আইনের বিরোধীতাকে শেষ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা উচিত। আইন অমান্যের অধিকার হল সমাজের মানুষের বিশেষ ক্ষমতা। এই ক্ষমতার সাহায্যেই মানুষ রাষ্ট্রের মধ্যে শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তন করতে ন্যায়সঙ্গতভাবে চেষ্টা করতে পারে।

ব্যক্তির আনুগত্যের ভিত্তি সম্পর্কিত ল্যাস্কির অভিমত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সহায়ক ভূমিকা বিরোধ বিতর্কের ঊর্ধে। এক্ষেত্রে ল্যাস্কির মতের সঙ্গে বার্কারের মতের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু বার্কার রাজনীতিক আনুগত্যের ভিত্তি হিসেবে ন্যায়ের ধারণা উপস্থাপিত করেছেন। ল্যাস্কি আইন ও ন্যায়ের মধ্যে কোন স্বতঃসিদ্ধ সম্পর্কের কথা স্বীকার করেননি। তবে উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীর প্রেক্ষিতে নাগরিকরা আইনকে ন্যায়সম্মত বলে মেনে নিলে আইন ন্যায়সম্মত বলে প্রতিপন্ন হবে। রাষ্ট্রীয় আইনের বিরোধিতার সম্পর্কেও ল্যাস্কি যা বলেছেন বার্কারের তত্ত্বের তার কিছুটা প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। উভয়েই বলেছেন যে, রাজনীতিক বাধ্যবাধকতা ও সামাজিক বাধ্যবাধকতার মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দিলে পরিশীলিত বিচার-বিবেচনা একান্ত আবশ্যক।

৪.৪.২ ঃ নাগরিকের অধিকার ও রাষ্ট্র

ল্যাস্কির মতে, নাগরিকের কল্যাণই হল রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করে। এই উদ্দেশ্যের সাফল্যের জন্যই নাগরিকের অধিকার থাকা প্রয়োজন। নাগরিকের সুখের বা কল্যাণের সহায়ক পবিবেশই অধিকার হিসেবে বিবেচিত হয়। এই পরিবেশ সৃষ্টি ও সংরক্ষণের দায়িত্ব হল রাষ্ট্রের। ল্যাস্কি বলেছেন যে, রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকারের মাধ্যমেই কোন রাষ্ট্রের পরিচয় পাওয়া যায়। একথা ঠিক যে, ব্যক্তির সকল সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা রাষ্ট্র করতে পারে না। তবে সাধারণভাবে কতকগুলি সুযোগসুবিধা প্রত্যেকের জন্যই প্রয়োজন। ল্যাস্কির মতে, অধিকার হল সমাজ জীবনের সেই সমস্ত শর্তাদি যেগুলির অনুপস্থিতিতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ অসম্ভব।[১] ব্যক্তির সুখ যেহেতু রাষ্ট্রের নিশ্চিত লক্ষ্য, তাই মানুষের কতকগুলি অধিকার স্বীকার করতেই হবে। রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে অধিকার অনুশীলনের সুযোগ নাগরিক লাভ করে থাকে। আবার অধিকার হল রাষ্ট্রীয় নির্দেশের প্রতি নাগরিকের আনুগত্যের শর্ত। এই বিচারেও অধিকারের স্বীকৃতি আবশ্যক। তবে ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণতার জন্য রাষ্ট্র বৃহৎ সমাজের ভূমিকাকে উপেক্ষা করতে পারে না। বৃহৎ সমাজে রাষ্ট্র হল একটি অন্যতম প্রতিষ্ঠান মাত্র। রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। তা না হলে অধিকারকে কার্যকর করা যায় না।

---

[২] বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা ২৩।

[১] H. J. Laski, *A Grammar of Politics*, p. 94

ল্যাস্কি বলেছেন যে, গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে গঠিত না হলে কোন রাষ্ট্রই তার উদ্দেশ্য সফল করতে পারবে না। রাষ্ট্রের প্রকৃতি নির্ভর করে নাগরিকদের সুখের জন্য তার অবদানের ওপর। রাষ্ট্র নাগরিকদের অধিকারকে সৃষ্টি করে না, স্বীকৃতি দেয়। সুতরাং অধিকারের স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক চরিত্র নির্ধারিত হয়। এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার কর্মের অধিকার শিক্ষার অধিকার, সর্বজনীন ভোটাধিকার, বাক্ স্বাধীনতা ও সংঘ গঠনের অধিকার থাকবে। অন্যতম গণতান্ত্রিক অধিকার হিসেবে ল্যাস্কি আইনের বিরোধিতা করার অধিকারের কথাও বলেছেন।

ল্যাস্কির মতে, অধিকার অবাধ নয়। রাষ্ট্রের কাছে বৃহৎ সমাজের স্বার্থ ও শান্তি হল বড়। এই বৃহৎ সমাজের স্বার্থ বিঘ্নিত হলে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে। রাষ্ট্র প্রয়োজনবোধে অধিকার বা স্বাধীনতার ওপর বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে। ল্যাস্কি আরও বলেছেন যে, বৃহৎ সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আর্থনীতিক অসাম্য খুব বেশী হ'লে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় আইন বিত্তবানদের স্বার্থই রক্ষা করে এবং রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য বিকৃত হয়ে পড়ে। অসাম্যের অবসান এবং সাম্যের প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব বিপন্ন হয়ে পড়তে বাধ্য। ল্যাস্কির মতানুসারে বৃহৎ সমাজে রাষ্ট্র আর পুলিশী রাষ্ট্র নয়, জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র। এর ফলে সামাজিক ন্যায়বিচার ও আইনের পরিধি বিস্তৃততর হয়েছে। রাষ্ট্রের আইন মানুষের জীবনকে বৃহত্তর সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে— এটা প্রমাণ করতে পারলেই রাষ্ট্র অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হতে পারবে।

নাগরিকদের অধিকারের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ল্যাস্কি রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট দার্শনিক উদ্দেশ্য অস্বীকার করেছেন বলে অনেকে মন্তব্য করেন। কিন্তু ল্যাস্কি মনে করেছেন যে রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে নাগরিকদের সেই সমস্ত অধিকার দিয়েছে কী না, যেগুলো ছাড়া তাদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব— এই মানদণ্ডে বিচার না করলে রাষ্ট্রের প্রকৃতি সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যাবে না। তাঁর মতে কেউই বিশ্বাস করবে না যে, ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ফরাসী রাষ্ট্রের বা ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রুশ রাষ্ট্রের আইন ব্যবস্থা সমস্ত নাগরিকদের কল্যাণ কামনায় নিয়োজিত হত। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীরা এবং ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশ নাগরিকরা স্থির করেছে, যে ব্যবস্থায় তারা বাস করছিল, সে ব্যবস্থায় তাদের দাবি পূরণ হচ্ছিল না। সুতরাং রাষ্ট্রের কাজের ফলাফল যারা ভোগ করছে কেবলমাত্র তারাই বিচার করবে রাষ্ট্র সকলের মঙ্গল করছে কী না।

৪.৪.৩ ঃ সমাজের যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতি

রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রকৃতি প্রসঙ্গে ল্যাস্কি সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপিত করেছেন। রাষ্ট্রের অপ্রতিরোধ্য আধিপত্য ও চরম কর্তৃত্বের বিরোধিতা করেছেন তিনি। রাষ্ট্রের নৈতিক যৌক্তিকতাশূন্য আদেশকে তিনি আইন বলে মেনে নিতে পারেননি। ল্যাস্কির মতে সীমাবদ্ধ অবস্থায় নাগরিকের অবিরাম কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টাই আইনের আনুগত্যের ভিত্তি।[১] এই দিক থেকে বিচার করলে সরকারকে বলা যেতে পারে রাষ্ট্রের অছি, যার সাফল্য বিচার করবে তারাই যারা তার দ্বারা উপকৃত হওয়ার আশা করে। সরকারকে অছি হিসেবে দেখে ল্যাস্কি নাগরিকদের ইচ্ছার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং সরকারের স্বৈরাচারী ক্ষমতার পথ রুদ্ধ করেছেন।

বৃহৎ সমাজে রাষ্ট্রের প্রকৃতি আলোচনার ক্ষেত্রে ল্যাস্কি ভাববাদী দার্শনিকদের চিন্তাধারাকে অনুসরণ করেননি। আবার তিনি একত্ববাদীদের বক্তব্যকেও সমর্থ করেননি। উদারনীতিক চিন্তাধারার দ্বারা ল্যাস্কির রাজনীতিক দর্শন বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে। তাঁর ওপর বহুত্ববাদীদের প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রের একক সার্বভৌমত্বকে তিনি স্বীকার করেননি। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের অনন্য ও অখণ্ড আনুগত্যকেও মেনে নেননি তিনি। বর্তমান রাষ্ট্রের বিরাট আয়তন নাগরিককে এককভাবে অসহায় করে তুলেছে। নিজেদের দাবিদাওয়াকে কার্যকর করার জন্য ব্যক্তি

[১] বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা ৩৬।

অন্যের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। এইভাবে বৃহৎ সমাজে বহু ও বিভিন্ন সংঘ সমিতির সৃষ্টি হয়। এই সংঘগুলি নাগরিকদের অভাব পূরণ করতে পারে বলেই সমাজ টিকে থাকতে পারে। তাছাড়া প্রকৃতিগত দিক থেকেই মানুষ হল সমাজবদ্ধ জীব। কেবল রাষ্ট্রের মধ্যেই মানুষের সংঘবদ্ধ জীবনযাপনের প্রবণতা শেষ হয়ে যায় না। তার বৃহত্তর সমাজজীবনে অন্যান্য সংঘ গঠনেরও যে প্রয়োজন আছে, তা অস্বীকার করা যায় না। ল্যাস্কির মতে ব্যক্তি জীবনে রাষ্ট্রের মতোই সংঘগুলি হল বাস্তব সত্য।

ল্যাস্কি মনে করেছেন যে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ স্বার্থের সংরক্ষণ, অভাব-অভিযোগের পরিতৃপ্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সামাজিক সংঘ বা গোষ্ঠীগুলির ভূমিকা অপরিসীম। যেহেতু রাষ্ট্রের পক্ষে এককভাবে সবকিছু পরিচালনা করা অসম্ভব, তাই সমাজের একটি বৃহৎ অংশের কার্যভার এই সংঘগুলির হাতে এসে পড়েছে। ল্যাস্কির মতে, রাষ্ট্র এই সমস্ত সংঘের কাজে যত কম হস্তক্ষেপ করবে রাষ্ট্র ও সংঘ উভয়েরই তত বেশী মঙ্গল হবে। রাষ্ট্রের স্বীকার করা উচিত যে, জীবনের এমন অনেক দিক আছে— যেমন ধর্ম বিষয়— সেখানে জোর করে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে সমাজেরই ক্ষতি হবে। কারণ আন্তরিক বিশ্বাসের প্রশ্নে রাষ্ট্রের আদেশ অর্থহীন বলে মনে হবে। সুতরাং রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা মানুষের সকল রকম আবেগ ও অনুভূতির ক্ষেত্রে বিস্তৃত হতে পারে না এবং সেইজন্য সে সর্বময় আনুগত্যের দাবি করতে পারে না।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, ল্যাস্কি সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, যে-কোনও সমাজ মূলত যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতির। আইনগতভাবে বিচার না করলে, রাষ্ট্রও অন্যান্য সংঘের মতো একটি সংঘ এবং তার স্থান অন্যান্য সংঘের ওপরে নয়। বস্তুত সমাজের কাঠামোও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মতো। কারণ সমাজ গঠিত হয় বিভিন্ন সংঘ সমিতিকে নিয়ে এবং এই সংঘ সমিতিগুলি স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন। অন্যান্য সংঘ তাদের সভ্যদের জন্য যে সমস্ত নিয়মকানুন তৈরি করে রাষ্ট্রের আইন যদি সেগুলিকে সার্থক করে তোলার প্রচেষ্টা করে তবেই রাষ্ট্রের আইন সফল হয়। যেহেতু সমাজের কাঠামো প্রধানত যুক্তরাষ্ট্রের মতো আইনের সার্বভৌমত্বের অখণ্ড প্রকৃতি কেবল নামমাত্র থাকাই সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিভূস্বরূপ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারের কার্যপদ্ধতির সঙ্গে যত বেশী ঘনিষ্টভাবে জড়িত হবে, আইনের বিষয়বস্তুও তত বেশী সুপরিকল্পিত হবে এবং আইন পাশ হওয়ার পর তা অনেক বেশী কার্যকরীও হবে। আইনের ফলাফল যারা ভোগ করবে আইন পাশ বা পরিবর্তনের সময় তাদের মতামত যদি না নেওয়া হয় তার সুফল বা যৌক্তিকতা সম্পর্কে তাদের সমর্থন বলে কিছুই থাকবে না।

ল্যাস্কি বলেছেন যে, সামাজিক কাঠামো যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতির বলেই রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতা যত বেশী বিভক্ত হবে, ততই তা বেশী কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। এর কারণ হিসেবে তিনি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, আইনের ফলাফলের দায়িত্ব সাধারণের ওপর যত বেশী থাকবে, তার ফলাফল সম্পর্কে তারা তত বেশী আগ্রহান্বিত হবে। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীকরণের ফলে বৈচিত্র্যহীন ঐক্যের সৃষ্টি হয়। স্থান ও কাল ভেদে যে বৈচিত্র্যের প্রয়োজন হয় তার সম্পূর্ণ অভাব দেখা যায়। তৃতীয়ত, কেন্দ্রীকরণের ফলে সময়াভাব একটা মস্তবড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, যার সমাধান সরকার কিছুতেই করতে পারে না। রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি দ্রুত বেড়ে যাওয়ায় ল্যাস্কি মনে করেছেন যে, সমস্যার সমাধানে বিকেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের প্রয়োজন, যার মধ্যে এমন কতগুলি সংগঠন থাকবে যেগুলি তাদের নিজেদের বিশেষ বিশেষ কাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ বলতে ল্যাস্কি তিনটি বিষয়ের কথা বলেছেন। (১) রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের নীতি বর্জন করতে হবে। রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য থাকবে। ঐ সংঘগুলির ওপর আধিপত্য বিস্তারের অধিকার রাষ্ট্রের থাকবে না। (২) যেহেতু এর দ্বারা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করা হয়, তাই ক্রমোচ্চস্তর বিশিষ্ট রাষ্ট্রের সর্বব্যাপী ভূমিকারও বিরোধিতা করা হয়। (৩) সহযোগিতার নীতিগ্রহণ করতে হবে। এই নীতির ভিতর থেকে গড়ে তুলতে হবে; বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া চলবে না।

রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতির সমর্থনে ল্যাস্কি বিভিন্ন দিক থেকে যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন। আইনকে

সার্বভৌমের আদেশ হিসেবে তিনি মেনে নিতে পারেননি। আইন যাদের জন্য প্রণীত তাদের স্বার্থের সঠিক প্রকাশ ঘটানো উচিত। ল্যাস্কি মনে করেছেন যে, যেহেতু কর্তৃত্ব হল যুক্তরাষ্ট্রীয়, সেহেতু অভ্যন্তরীণ দিক থেকে যেমন বিভিন্ন সংঘের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা উচিত, বহির্গত দিক থেকেও বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা করা উচিত। ল্যাস্কি একদিকে যেমন বহুত্ববাদী ছিলেন, অপরদিকে ছিলেন মানবতাবাদী। বৃহৎ সমাজে রাষ্ট্রের স্থান সম্পর্কে ল্যাস্কির অভিমত বার্কার, রাসেল প্রমুখ চিন্তাবিদের চিন্তাধারার অনুরূপ। তবে ল্যাস্কি সমাজতান্ত্রিক ধারণাকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু ল্যাস্কি বিপ্লব অপেক্ষা সংস্কার সাধনের ওপরই জোর দিয়েছেন। তিনি নৈরাজ্যবাদীও ছিলেন না, কারণ তিনি রাষ্ট্রের বিলুপ্তির কথা বলেননি। রাষ্ট্রের একচ্ছত্র ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বিরোধী ছিলেন তিনি।

৪.৫ ঃ অধিকারের তত্ত্ব

অধ্যাপক ল্যাস্কি তাঁর 'এ গ্রামার অব্ পলিটিক্স' (A Grammar of Politics) শীর্ষক গ্রন্থে অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। ল্যাস্কির অধিকার সম্পর্কিত ধারণাটি তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে।[১] যদিও ল্যাস্কি রাজনীতিক আদর্শবাদের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তাঁর অধিকার তত্ত্ব অনেকাংশে গ্রীনের তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত। গ্রীনের মতোই ল্যাস্কি বলেছেন যে, মানুষের নৈতিক উন্নতির প্রয়োজনীয় অধিকার। তাঁর মতে, অধিকার উদ্ভুত হয় মানুষের নৈতিক প্রকৃতি থেকে। গ্রীনের মতো ল্যাস্কিও বলেছেন যে, অধিকার উদ্ভুত হয়েছে সমাজ থেকে। এদিক থেকে বলা যেতে পারে যে, রাষ্ট্র সৃষ্টির আগে থেকেই অধিকার রয়েছে। কিন্তু অন্য দিক থেকে বলা হয় যে, অধিকার সৃষ্টি হয় রাষ্ট্রের দ্বারা, কারণ অধিকার রাষ্ট্রের আইনগত স্বীকৃতির দ্বারাই বাস্তবে রূপায়িত হয়। রাষ্ট্র যেহেতু অধিকার সমূহের ফসল সেইহেতু অধিকারের দ্বারা রাষ্ট্র সীমাবদ্ধ। আবার অধিকারগুলি রাষ্ট্রেরই সৃষ্টি, কারণ রাষ্ট্রের আইনগত স্বীকৃতি ছাড়া এগুলির দ্বারা স্বাধীনতা নিশ্চিত হতে পারে না।

অধিকার সম্পর্কে তাঁর নিজের ধারণা উপস্থাপনের আগে ল্যাস্কি এ বিষয়ে কতকগুলি প্রচলিত ধারণার সমালোচনা করেছেন। অধিকার সম্পর্কে একটি প্রচলিত ধারণা হল যে, রাষ্ট্র অধিকার সৃষ্টি করে। কিন্তু কার্যত তা নয়। রাষ্ট্র অধিকার সমূহকে স্বীকৃতি দেয় মাত্র। রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতিলাভের আগেও অধিকারের অস্তিত্ব ছিল। অধিকার সম্পর্কে আর একটি প্রচলিত ধারণা অনুসারে বলা হয় যে, অধিকার হল শৈশবে প্রাপ্ত কোন জাতির কতকগুলি ঐতিহাসিক শর্ত। তবে কালক্রমে তার অবসান ঘটে। তারই পুনরুদ্ধার হল অধিকার। ল্যাস্কি এই মতও মানেন না। অধিকারকে কোন প্রকারেই হারিয়ে যাওয়া উত্তরাধিকারের পুনরুদ্ধার বলা চলে না। ল্যাস্কির মতানুসারে এই ধারণা ভ্রান্ত এবং ক্ষতিকর। অধিকারকে অনেক সময় প্রাকৃতিক বিন্যাসের প্রতিফলন বলা হয়। কিন্তু ল্যাস্কির মতে এই ধারণা যথার্থ নয়; কারণ অধিকার চিরন্তন নয়। সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের অধিকারেরও পরিবর্তন ঘটে। ল্যাস্কি আরও বলেছেন যে, আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি সাধন অধিকার নয়। চুক্তিবাদী হবস্ এইরকম ধারণা পোষণ করতেন। আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি অধিকার হলে মানুষ খুন করার ইচ্ছা পূরণের দাবিকেও অধিকার বলতে হয়। পরিশেষে, ল্যাস্কি অধিকারের আইনানুগ মতবাদের সমালোচনা করেছেন। বেন্থাম আইনানুগ মতবাদের সমর্থক। এই মতবাদের সারকথা হল যে, আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্র অধিকারের স্বীকৃতি দেয় ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। আইনীতত্ত্বকে ল্যাস্কি আকর্ষণীয় তত্ত্ব বলেছেন। কিন্তু আইনসর্বস্ব চিন্তাধারা রাষ্ট্রদর্শনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক নয় বলে তিনি মনে করেছেন। আইনানুগ মতবাদ রাষ্ট্রের স্বরূপ অনুধাবনের ক্ষেত্রে সাহায্য করে এবং অধিকারের বাস্তব অস্তিত্বটাকে বলে দেয় মাত্র। কিন্তু এই তত্ত্বের একটি নীতিবাচক উপাদান থাকা আবশ্যক। অধিকারের আলোচনায় ল্যাস্কি ঔচিত্যের প্রশ্নের ওপর জোর দিয়েছেন এবং অধিকারের ধারণাকে ব্যাপকতর অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে, সমাজের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকারের যথার্থতা যাচাই করা দরকার।

[১] H. J. Laski, *A Grammar of Politics*, 1938, PP. 89-142

অধিকার সম্পর্কে এই ধারণাগুলি খণ্ডন করে ল্যাস্কি তাঁর "এ গ্রামার অব্ পলিটিক্স" গ্রন্থে অধিকারের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "প্রকৃত অর্থে অধিকার হল সমাজজীবনের সেইসব শর্ত যেগুলি ছাড়া কোন মানুষ সাধারণভাবে তার ব্যক্তিত্বের সর্বোচ্চ বিকাশে সচেষ্ট হতে পারে না।"[১] সুতরাং অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমেই রাষ্ট্র তার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে, অর্থাৎ নাগরিকদের সত্তাকে সর্বোত্তমভাবে উপলব্ধি করতে ও বিকশিত করতে সাহায্য করে। এইভাবে অধিকার হল ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক সুবিধার আধার।

ল্যাস্কি প্রদত্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে অধিকারের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। (১) অধিকার হল রাষ্ট্র-পূর্ব, কারণ অধিকারের উদ্ভব হয়েছে ব্যক্তির প্রকৃষ্টতম বিকাশের অপরিহার্যতা থেকে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি হল পরের ব্যাপার। রাষ্ট্র স্বীকৃতি প্রদান করার আগে এগুলি ছিল। প্রকৃতিগত বিচারে অধিকার সমাজ-নির্ভর। এগুলি সমাজের মধ্যেই নিহিত। (২) যে-কোনো ইচ্ছা পূরণের দাবি অধিকার হতে পারে না। যে-দাবি ব্যক্তির সর্বোকৃষ্ট সত্তার বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তা অধিকারের মর্যাদা পেতে পারে না। (৩) প্রাথমিকভাবে অধিকার হল দাবি, কিন্তু তা অবশ্যই সামাজিক কল্যাণবোধযুক্ত হবে। সামাজিক কল্যাণ সাধণের চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ বলে সমাজ ও রাষ্ট্র এই সমস্ত দাবি-দাওয়াকে স্বীকৃতি জানায়। গ্রীণের অভিন্ন কল্যাণ ধারণাটিকে ল্যাস্কি তাঁর অধিকার তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। সূতরাং প্রকৃতিগতভাবে অধিকার একই সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ভিত্তিক ও সমষ্টিভিত্তিক। (৪) অধিকার কাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কর্তব্য পালন না করলে অধিকার দাবি করা চলে না। অভিন্ন সামাজিক কল্যাণ সাধনে ব্যক্তির অবদান থাকলেই ব্যক্তির দাবি ন্যায্যতা পায়। ল্যাস্কির মতে কাজ না করলে যেমন ব্যক্তির খাবার জোটে না, তেমনি কর্তব্য পালন না করে ব্যক্তি অধিকার দাবি করতে পারে না। (৫) অধিকার পরিবর্তনশীল; স্থিতিশীল নয়। সময় ও স্থান বদলে গেলে অধিকারও বদলে যায়। গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণার বিকাশ ও সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য নাগরিকদের অধিকার বোধের পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নতুন অধিকারের স্বীকৃতির প্রয়োজন হয়। নতুন আইন প্রণয়ন দরকার হয়। (৬) গ্রীনের মতো ল্যাস্কিও বলেছেন যে, গণ কল্যাণের আদর্শটিকে কার্যকর করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এই আদর্শকে কার্যকর করতে পারলে ব্যক্তির অধিকার অর্জিত হয় এবং ব্যক্তির দিক থেকেও বাধ্য বাধকতার সৃষ্টি হয়। অধিকারে দাবি স্বীকারের মাধ্যমে রাষ্ট্র ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে সাহায্য করে। রাষ্ট্র যদি এক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে ব্যর্থ হয় তা হলে বঞ্চিত মানুষের বিরোধিতা করার অধিকার থাকবে। ব্যক্তির আনুগত্য তখন রাষ্ট্রের বিরোধিতায় পরিণত হয়। (৭) অধিকারের নিশ্চয়তার মধ্যেই সাম্য নিহিত। গণ কল্যাণে সকলের সমান দাবি থাকে। (৮) অধিকারের নিয়মকে সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হল প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত। শাসনকার্য পরিচালনায় জনগণের সক্রিয় ও পূর্ণ অংশগ্রহণ হল গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি — যেখানে মুষ্টিমেয় শ্রেণীর বিশেষ সুবিধার্থে সকলের অধিকার লঙঘন করা হয় না। (৯) অধিকারের ধারণা স্বেচ্ছাধীন সংঘগুলির ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত। এদের অধিকার রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার ওপর সীমাবদ্ধতার নির্দেশ দেয়।

ল্যাস্কি কেবল একজন তাত্ত্বিক ছিলেন না; একজন বাস্তববাদীও ছিলেন। তাই তিনি মনে করেছেন যে, কেবল ঘোষণার মধ্যেই অধিকারকে সীমাবদ্ধ রাখলে তা অর্থহীন হয়ে পড়তে বাধ্য। অধিকারকে ফলপ্রসূ করে তোলার ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে অধিকারের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য তিনটি সাধারণ শর্ত পূরণ করা প্রয়োজন।[২] প্রথমত, বাস্তবায়নের একটি অন্যতম উপায় হল রাষ্ট্রিক কাঠামোর বিকেন্দ্রীকরণ। স্থানীয় সমস্যা স্থানীয় জনগণের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। এতে অধিকার ভোগের ক্ষেত্র প্রসারিত হবে। জনগণ স্থানীয় প্রশাসনে অংশীদার হতে পারলে তাদের দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশিত হবে। ল্যাস্কির মতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ

---

[১] "Rights, in fact, are those conditions of social life without which no man can seek, in general, to be himself at his best" — H. J. Laski, A Grammar of Politics P. 94.

[২] Sukhbir Singh, *A History of Political Thought,* vol : 2, p. 316.

অধিকারের বিপদ সূচনা করে। দ্বিতীয়ত, যে কোনো গুরুত্ব বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে সরকারের উচিত সংশ্লিষ্ট সকল স্বার্থের সঙ্গে পরামর্শ করা। সকল স্বার্থের প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সংস্থার সঙ্গে পরামর্শ করলে অধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার আশঙ্কা অপসারিত হবে। সরকারের দিক থেকে এই পরামর্শ গ্রহণ বাধ্যতামূলক হওয়া দরকার। তাহলে জনগণের অধিকারের প্রয়োগ ও সংরক্ষণ সুনিশ্চিত হবে, তৃতীয়ত, অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্যান্য সংঘের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। রাষ্ট্রের বৈধ এলাকার মধ্যে বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এই সমস্ত সংগঠন নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সদা সতর্ক থাকে। এই সংগঠনগুলির অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অবাধ হস্তক্ষেপ অনভিপ্রেত। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের ওপর প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ আরোপিত হওয়া আবশ্যক।

অধিকারের বাস্তব রূপায়নের ক্ষেত্রে ল্যাস্কি অধিকারের তিনটি দিকের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল ব্যক্তির অধিকার, গোষ্ঠীর অধিকার, ও 'কোম' (কমিউনিটি) এর অধিকার। 'কোম' এর অধিকার হল সামাজিক শক্তির সামগ্রিক ফল। ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এককভাবে অধিকারভোগ সুনিশ্চিত করতে পারে না। জনগণ অবশ্যই কতকগুলি সাধারণ নিয়ম মেনে চলবে এবং এই নিয়মগুলি কার্যকর করার সামর্থ্য কোন প্রতিষ্ঠানের থাকবে। অভিন্ন কল্যাণের স্বার্থে অভিন্ন নিয়মকানুন সবাইকে মেনে চলতে হবে।

ল্যাস্কি কতকগুলি অধিকারের উল্লেখ করেছেন, যেগুলির দ্বারা কোন নাগরিক তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারে। কাজ করার অধিকার একটি উল্লেখযোগ্য অধিকার। প্রত্যেকের বাঁচার অধিকার আছে ; তাই প্রত্যেকের কাজ করার অধিকার স্বীকার করা দরকার। তবে কাজ করার অধিকার যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কাজের অধিকারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হল যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভের অধিকার। শ্রমিককে শ্রমের সমানুপাতিক মজুরী দিতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে, সকলের পারিশ্রমিক সমান হবে। তবে ল্যাস্কি বলেছেন যে, মুষ্টিমেয়র বিলাস-বৈভবের আগে প্রত্যেকে যাতে স্বচ্ছন্দে গ্রাসাচ্ছাদন করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। পর্যাপ্ত পারিশ্রমিকের সঙ্গে যুক্তিসঙ্গত শ্রমের পরিমান জড়িত। শ্রমিকের শ্রমের সময়সীমা যুক্তিসঙ্গত হওয়া দরকার। সৃজনশীল কাজের জন্য পর্যাপ্ত অবসর প্রয়োজন এবং তার ব্যবস্থা থাকা উচিত। কাজের প্রকৃতি, শ্রমিকের স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে শ্রম সময় নির্দিষ্ট থাকা দরকার। শিক্ষার অধিকার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক অধিকার। শিক্ষার অধিকারের স্বীকৃতি ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য। এর মাধ্যমে ব্যক্তি জীবিকা অর্জনের যোগ্যতা লাভ করে। যার যে দিকে প্রবণতা আছে তাকে সেইরকম শিক্ষা দিতে হবে। ল্যাস্কি বলেছেন যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনগণের হাতে রাজনীতিক ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার ন্যস্ত থাকা দরকার। এই কারণে নির্বাচন করার এবং নির্বাচিত হওয়ার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকা প্রয়োজন। মত প্রকাশের অধিকারও অন্য একটি গণতান্ত্রিক অধিকার। ল্যাস্কির মতানুসারে ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার ও সংঘ গঠন করার অধিকারের ওপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অনভিপ্রেত। ল্যাস্কি ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশের স্বার্থে সম্পত্তির অধিকারের স্বীকৃতিকে সমর্থন করেছেন। তবে কার্য সম্পাদনের সঙ্গে সম্পত্তির অধিকার আনুপাতিকভাবে সম্পর্কযুক্ত হওয়া আবশ্যক। তাঁর মতে সর্বজনীন কল্যাণের পরিপন্থী না হলে নাগরিককে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যুক্তিযুক্ত হবে না।

ল্যাস্কির অধিকার তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি জনকল্যাণকামী দৃষ্টিভঙ্গিতে অধিকারের ব্যাখ্যান উপস্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি গ্রীন, হবহাউস, হবসন প্রমুখ চিন্তাবিদের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন। তাঁর অধিকারতত্ত্বে উদারনীতিক-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে জনকল্যাণকামী দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা হয়েছে। ল্যাস্কি অধিকারের সাম্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে সমাজের কোন একটি অংশকে বৈষম্যমূলক সুযোগ সুবিধা প্রদান করা রাষ্ট্রের উচিত নয়। যে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য বর্তমান সেখানে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। তিনি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি মূলে আক্রমণ করেছেন। সামাজিক ন্যায়ের অন্যতম সমর্থকে পরিণত হয়েছেন তিনি।[১] ল্যাস্কির অধিকার তত্ত্ব সামাজিক-গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে। তবে অধিকার সম্পর্কে ল্যাস্কির ধারণা অনেক ক্ষেত্রে স্ববিরোধী রূপে দেখা দিয়েছে। একদিকে তিনি বলেছেন

[১] O. P. Gauba, *An Introduction to Political Theory,* P. 291.

যে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সংঘের অধিকারের দ্বারা সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে তিনি দেখিয়েছেন যে, রাষ্ট্র ব্যক্তির অধিকার রক্ষার্থে সংঘের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

অনুশীলনী — ১

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। তুমি কীভাবে ল্যাস্কিকে প্রয়োগবাদী বলে বিবেচনা করবে ?

২। ল্যাস্কির মতে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তি কী ?

৩। নাগরিকের অধিকারের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক ব্যাপারে ল্যাস্কির অভিমত কী ?

৪। অধিকারকে বাস্তবে রূপায়িত করার পদ্ধতি সম্পর্কে ল্যাস্কি কী বলেছেন ?

৫। অধিকার সম্পর্কে ল্যাস্কির ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব কী ?

৬। ল্যাস্কির মতানুসারে অধিকারের বৈশিষ্ট্যগুলি কী ?

৭। বিভিন্ন ধরনের অধিকার সম্পর্কে ল্যাস্কি কী বলেছেন ?

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। বৃহৎ সমাজে রাষ্ট্রের স্থান সম্পর্কে ল্যাস্কির অভিমত পর্যালোচনা কর।

২। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতি সম্পর্কে ল্যাস্কির ব্যাখ্যান বিশ্লেষণ কর।

৩। ল্যাস্কির অধিকার-তত্ত্ব বিশ্লেষণ কর।

৪.৬ ঃ স্বাধীনতার তত্ত্ব

উদারনীতিক চিন্তাবিদ হিসেবে ল্যাস্কি ব্যক্তি স্বাধীনতার বিকাশের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শৃঙ্খলা ও ঐক্যকে চরম রাজনীতিক মূল্যবোধ হিসেবে তিনি গ্রহণ করেননি। তাঁর মতে ব্যক্তি কেবল মানুষের দঙ্গলের সদস্য নয়। কান্টের ব্যক্তির লক্ষ্যকে সমর্থন করেছেন তিনি। কান্টের মতো তিনি বলেছেন যে মানুষ প্রকৃতিগত দিক থেকে স্বাধীন ও সমমর্যাদা সম্পন্ন। যদিও কান্ট সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর যথোপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তাঁর দর্শন মূলত স্বতন্ত্র ইচ্ছাসম্পন্ন যৌক্তিক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠিছিল। কান্টের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই ল্যাস্কিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল।[১] রুশোর মতানুসারে সাধারণ ইচ্ছার অনুবর্তী হয়ে ব্যক্তি তার স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। হেগেল বলেছেন যে রাষ্ট্রকে মান্য করার মাধ্যমেই ব্যক্তির স্বাধীনতা ভোগ সম্ভব। ল্যাস্কি এই দুই মতকেই অস্বীকার করেছেন। স্বাধীনতা সম্পর্কে ল্যাস্কির বক্তব্য অনেক বাস্তব সম্মত। তাঁর মতে সমগ্র সমাজ হল একটি অখণ্ড সত্তা। স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। তবে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের নির্দিষ্ট সীমারেখা থাকা দরকার।

ল্যাস্কির ধারণায় অধিকার ও স্বাধীনতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অধিকার থেকেই স্বাধীনতার সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্র কর্তৃক আইনের মাধ্যমে স্বীকৃত না হলে অধিকারের সৃষ্টি হয় না। আর অধিকার ছাড়া স্বাধীনতা থাকতে পারে না। অধিকারের স্বীকৃতি আইনের সংযত ও যথাযথ ব্যবহারকে সুনিশ্চিত করে তোলে। এর মাধ্যমেই ব্যক্তিত্ব বিকাশের

[১] Sukhbir Singh , vol. 2., p. 312

অনুকুল পরিবেশটি রচিত হয় এবং স্বাধীনতা ভোগ সম্ভবপর হয়। সুতরাং স্বাধীনতা ও অধিকার অবিচ্ছিন্ন। 'অথরিটি ইন্ মর্ডান স্টেট' (Authority in Modern State) গ্রন্থে ল্যাস্কি স্বাধীনতাকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সঙ্গে জড়িত করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্বাধীনতা বলতে নিয়ন্ত্রণবিহীনতা বোঝানো হত। ল্যাস্কি এই ধারণাকে অসম্পূর্ণ বলে মনে করেছেন। তিনি জন স্টুয়ার্ট মিলের আত্মকেন্দ্রিক ও পরকেন্দ্রিক কাজের মধ্যে পার্থক্যকে অস্বীকার করেছেন। ল্যাস্কির মতে মানুষের সমস্ত আচরণই সামাজিক আচরণ। একজনের আচরণ অন্যের অন্যের আচরণকে প্রভাবিত করবেই। তাই ল্যাস্কি সমাজের সার্বিক কল্যাণের প্রয়োজনে ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রিত করার কথা বলেছেন। ল্যাস্কি গ্রীণকে সমর্থন করে বলেছেন যে, স্বাধীনতা হল কোন কাজ করার ক্ষমতা বা কিছু ভোগ করার সামর্থ্য, যা আমরা অন্যের সাথে অভিন্ন ভাবে করে থাকি। [১] তার মতে স্বাধীনতার মৌলিক দিক হল সাধারণ জীবনে কিছু যুক্ত করা ক্ষমতা - অভিন্ন কল্যাণসাধনে স্বাধীনভাবে কাজ করা । ল্যাস্কি স্বাধীনতার নেতিবাচক ধারণা থেকে ইতিবাচক লক্ষ্যকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন।

ল্যাস্কি নেতিবাচক ও ইতিবাচক-উভয় দিক থেকেই স্বাধীনতার ধারণাটি ব্যাখ্যা করেছেন। নেতিবাচক অর্থে তিনি স্বাধীনতাকে ব্যক্তির বিকাশের জন্য অপরিহার্য সামাজিক অবস্থার ওপর থেকে বিধি নিষেধের অনুপস্থিতি হিসেবে দেখেছেন। কিন্তু কেবল বিধি-নিষেধের অনুপস্থিতিই স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতার ধারণা নিছক নেতিবাচক বা সংকীর্ণ নয়। তাঁর মতে স্বাধীনতার ধারণা ইতিবাচক। তিনি বলেছেন যে, "স্বাধীনতা মানে প্রতিটি ব্যক্তি যাতে আত্মবিকাশের সুযোগ পায় এমন পরিবেশকে রক্ষা করা। কাজেই স্বাধীনতা অধিকারের দ্বারা সৃষ্ট হয়।"[২] বস্তুত, স্বাধীনতা হল সেই অধিকারের পরিবেশ যা আইনতঃ রাষ্ট্রই সুনিশ্চিত করে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইসাইয়া বর্লিন (Isaiah Berlin) তাঁর টু কনসেপ্টস অব্ লিবার্টি' (Two Concepts of Liberty) নামক প্রবন্ধে নেতিবাচক ও ইতিবাচক স্বাধীনতার বিশ্লেষণ করে নেতিবচক স্বাধীনতার ধারণায় যেখানে নিয়ন্ত্রণের অপসারণ এবং ব্যক্তির স্বাধীন আচরণের ক্ষেত্রটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেই বিষয়টিকে সমর্থন করেছেন।

ল্যাস্কি তিন ধরনের স্বাধীনতার কথা বলেছেন, এই তিন ধরনের স্বাধীনতা হল ঃ (১) ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, (২) রাজনীতিক স্বাধীনতা ও (৩) অর্থনীতিক স্বাধীনতা। জীবনের যে সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যক্তির কাজ বা আচরণ কেবল ব্যক্তিকেই প্রভাবিত করে, অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে না, তাকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলে। জীবনের নিছক ব্যক্তিগত সম্পর্কের সঙ্গে এই স্বাধীনতা জড়িত বলে একে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলা হয়। ধর্মাচরণ করা বা না করার অধিকার হল এই ধরনের স্বাধীনতার অন্যতম উদাহরণ। তবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়বে যদি রাষ্ট্রীয় আইন উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা না করে।

দ্বিতীয়ত, সরকারী কাজ কর্মে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করাকে ল্যাস্কি রাজনীতিক স্বাধীনতা বলে অভিহিত করেছেন। এই ধরনের স্বাধীনতাকে কার্যকর করতে হলে দু'টি শর্ত মেনে চলা দরকার — মতপ্রকাশের শিক্ষা গ্রহণ এবং সংবাদ প্রকাশের স্বাধীনতা। রাষ্ট্রের পরিচালনা ব্যবস্থা সম্পর্কে মত প্রকাশ করতে হলে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা থাকা দরকার, যার সাহায্যে নাগরিক নিজের মত অপরকে বোঝাতে পারে। সৎ এবং সঠিক সংবাদপত্র প্রকাশ রাজনীতিক স্বাধীনতার ভিত্তি।

---

[১] Quoted in Frank Thakurdas, p. 32.

[২] "By Liberty I mean the eager maintenance of the atmosphere in which men have the opportunity to be their best selves. Liberty, therefore, is a product of rights" — H. J. Larki, A Grammar of Politics, p. 142.

তৃতীয়ত, ল্যাস্কির মতে, রুটি রোজগারের নিরাপত্তা এবং সুযোগ থাকাটা হল অর্থনীতিক স্বাধীনতা। বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাবে নাগরিক যদি জর্জরিত হয় এবং বেকার সমস্যা নাগরিককে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তোলে তাহলে, ল্যাস্কির মতে, নাগরিক আর্থনীতির স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়। আর্থনীতিক স্বাধীনতাকে কার্যকর করে তুলতে হলে শিল্পে গণতন্ত্র আনা প্রয়োজন। শ্রমিকদের সহযোগিতায় শিল্পগুলি পরিচালিত হবে। রাজনীতির ক্ষেত্রে যে নাগরিক হিসাবে স্বাধীনতা পায় শিল্পের ক্ষেত্রে সেই নাগরিক শ্রমিক হিসেবে স্বাধীনতা ভোগ করবে। ল্যাস্কি মনে করেছেন যে, উৎপাদনের উপায় সমূহের ব্যক্তিগত মালিকানা আর্থনীতিক স্বাধীনতা অর্জনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। তাঁর মতে ব্যক্তি-মালিকানা ও শ্রেণী কাঠামো উভয়কে বিদায় নিতে হবে। তা না হলে পুরো আর্থনীতিক স্বাধীনতা শ্রমিক পাবে না। তাঁর মত অনুসারে আর্থনীতিক স্বাধীনতার ওপর অন্যান্য স্বাধীনতা নির্ভরশীল। বস্তুত, অর্থনীতিক স্বাধীনতা না থাকলে অন্যান্য স্বাধীনতাকে বাস্তবে রূপায়িত করা অসম্ভব।

ল্যাস্কি স্বাধীনতার কয়েকটি রক্ষা কবচের কথা বলেছেন। প্রথমত, স্বাধীনতার স্বার্থে বিশেষ সুযোগ সুবিধার অস্তিত্ব অস্বীকৃত হওয়া দরকার। দ্বিতীয়ত, একজনের অধিকার যদি অন্য জনের মর্জির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে তা হলে স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়তে বাধ্য। সুতরাং স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে কোন গোষ্ঠী যাতে অপরের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে না পারে তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। তৃতীয়ত, স্বাধীনতা সংরক্ষণের স্বার্থে রাষ্ট্রের কাজ কর্ম নিরপেক্ষ হওয়া আবশ্যক। স্বাধীনতা ও অধিকার অবিচ্ছিন্ন বলে রাষ্ট্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটলে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল তা প্রতিরোধ করা। পরিশেষে, স্বাধীনতাকে প্রকৃতই সংরক্ষিত করতে হলে প্রয়োজন নাগরিকদের সদা সতর্ক প্রহরা। ল্যাস্কির মতে নাগরিকদের 'গর্বিত চৈতন্য' সবচেয়ে কার্যকর রক্ষাকবচ। তিনি বলেছেন যে, শুধুমাত্র সাংবিধানিক রক্ষাকবচ দিয়ে স্বাধীনতার ওপর আক্রমণকে প্রতিরোধ করা যাবে না। এর জন্য প্রয়োজন স্বাধীনতার ওপর অবৈধ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার শক্তি বা ইচ্ছা। অবৈধ হস্তক্ষেপে বিরুদ্ধে মানুষের অবশ্যই সতর্ক থাকা প্রয়োজন এবং প্রতিরোধ করার সাহস থাকাও জরুরী।

স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে ল্যাস্কি বলেছেন যে, স্বাধীনতা তখনই প্রকৃত স্বাধীনতা হবে যখন তা সাম্যের মধ্যে নিহিত থাকে। সাম্যের ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা কার্যকরী হয়। তাঁর মতে, স্বাধীনতার মূল কথা সাহস এবং এই সাহস যেসব খাত দিয়ে প্রবাহিত হয়, সেগুলি সবই মিলিত হয়েছে সাম্যের ধারণায়। তাই সাম্য ছাড়া স্বাধীনতা থাকতে পারে না। সাম্য-এর শক্তিশালী বণিয়াদ স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলে। স্বাধীনতা যেখানে দুর্বল বলে প্রতিপন্ন হয়, সেখানে তা সমতা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণেই হয়। স্বাধীনতার ফলাফল সমানভাবে ভোগ করার সুযোগের অভাব থাকলে স্বাধীনতা বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ সুযোগ সুবিধায় পরিণত হয়। ল্যাস্কি পুঁজিবাদের বিকলাঙ্গ চরিত্রটি পর্যবেক্ষণ করে বলেছেন যে, পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে স্বাধীনতা একটি অভিজাত ধারণা মাত্র। তাঁর মতে সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রকট বৈষম্য স্বাধীনতা অর্জনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। সম্পদের ক্ষমতা বলেই এক শ্রেণী রাজনীতিক ক্ষমতা দখল করে রাখে। অন্য শ্রেণী সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবার ফলে যাবতীয় সুযোগ থেকে বহুদূরে সরে যায়। তাই তিনি বলেছেন যে, আর্থিক সাম্য ছাড়া স্বাধীনতা — সকলের জন্য সমান স্বাধীনতা — থাকতে পারে না।[১] ল্যাস্কি মনে করেছেন যে, কাল্পনিক সমাজবাদীরা ধনী-দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য এবং তার কুফল সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু চিন্তা ধারার অবাস্তবতা হেতু তাঁরা সফল হতে পারেননি। মার্কস ও এঙ্গেলস বৈজ্ঞানিক ও বাস্তবসম্মত উপায়ে শ্রেণী শাসনের স্বরূপ উদঘাটন করেছেন। ল্যাস্কি সেটিকে সমর্থন করেছেন। ল্যাস্কির মতে, স্বাধীনতা ও সাম্য নিজেরাই লক্ষ্য নয়, সৃষ্টিশীল জীবন লাভের পূর্বশর্ত।[২]

---

[১] Frank Thakurdas, P. 344.

[২] *I bid.* p. 347

স্বাধীনতা সম্পর্কে ল্যাস্কি ও বার্কারের চিন্তাধারার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উভয়েই স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রিত ও আপেক্ষিক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। উভয়েই স্বাধীনতাকে সামাজিক প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু স্বাধীনতা আলোচনা করতে গিয়ে বার্কার ভাববাদ ও ন্যায়তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করেছেন। ল্যাস্কির আলোচনা একেবারে বাস্তববাদী। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, আর্থনীতিক শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে না পারলে সাধারণ মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়া যায় না। বার্কার স্বাধীনতার নৈতিক দিকটার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন ; কিন্তু ল্যাস্কি গুরুত্ব দিয়েছেন বস্তুবাদী দিকটার ওপর। রলসের ন্যায়তত্ত্বে স্বাধীনতার ব্যাপারে সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে। তিনিও বলেছেন যে, ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতাকে বুঝতে হবে সাধারণের কল্যাণের দিক থেকে। এক্ষেত্রে রলসের তত্ত্বেও ল্যাস্কির স্বাধীনতার ধারণার কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

৪.৭ ঃ উদারনীতিক ধারায় ল্যাস্কির স্থান

উদারনীতিবাদ কখনোই এক রৈখিক পথ ধরে বিকাশ লাভ করেনি। নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনের তা বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে জনসাধারণের কাছে নিজেকে গ্রহন যোগ্য করে তোলার চেষ্টা করেছে। তবে তার মূল চরিত্রটির মৌলিক পরিবর্তন কখনোই ঘটেনি। উদারনীতিবাদের মূল বিষয় হল স্বাধীনতা এবং তা একটি নিদিষ্ট রূপ পায় সপ্তদশ শতকের ইংল্যাণ্ডে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ধ্রপদী উদারনীতিবাদের যে-পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তা তত্ত্ব ও বাস্তবে পরিপূর্ণ রূপ পেয়ে সংশোধনমূলক উদারনীতিবাদে রূপান্তরিত হয়। এই সংশোধনমূলক উদারনীতিবাদের প্রভাবেই ল্যাস্কির উদারনীতিক রাষ্ট্রতত্ত্ব অনেকাংশে গড়ে উঠেছিল।

উদারনীতিক রাষ্ট্রতত্ত্বের ইতিহাসে জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-৭৩) জলবিভাজিকার কাজ করেছেন। তিনি একই সঙ্গেধ্রুপদী উদারনীতিবাদের কোনো কোনো বক্তব্য সমর্থন করেছেন, আবার তার থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন। তিনি গণতন্ত্রে সংখ্যাগুরুর স্বেচ্ছাচার সম্বন্ধে সদা সতর্ক থাকার প্রয়োজনের কথা বলেছেন। তাঁর মতে সংখ্যালঘুর স্বার্থ রক্ষা করা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অন্যতম পবিত্র কর্তব্য। পুঁজিবাদী অর্থনীতিক ব্যবস্থায় অপ্রতিহতভাবে মুনাফা অর্জন করার প্রবণতার প্রতি তিনি নৈতিক বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতানুসারে উদারনীতিক রাষ্ট্রতত্ত্বে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের কোনো নিদির্ষ্ট সীমারেখা টেনে দেওয়া যায় না। ফেবীয় সমাজবাদীরা স্বীকার করেছেন যে, মার্কস্ নয়, বরং মিলের কাছ থেকেই তাঁরা গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রেরণা লাভ করেছেন।

উনিশ শতকের শেষদিকে উদারনীতিক রাষ্ট্রতত্ত্বকে ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্য সংশোধন করে আরো সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করেছেন টি. এইচ. গ্রীন (১৮৩৬-৮২)। হেগেলীয় উদারবাদী হিসেবে পরিচিত এই দার্শনিক ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের নেতিবাচক স্বাধীনতাকে বর্জন করে ইতিবাচক স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। ব্যক্তি ও সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেছেন যে ব্যক্তির আত্মসত্তা মূলত একটি সামাজিক সত্তা। তাঁর মতে উদারনীতিক রাষ্ট্র একটি কার্যকরী সদর্থক এজেন্ট এবং সাধারণ মঙ্গলকর কাজকর্মের মাধ্যমে এই ধরনের রাষ্ট্র ইতিবাচক স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে। ব্যক্তিকে সামাজিক প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করে সমষ্টিবাদী উদারনীতিবাদের তত্ব উপস্থাপিত করেছেন গ্রীন। গ্রীনের সমষ্টিবাদী উদারনীতিবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একদিকে কেইনস, বেভারিজ প্রমুখ চিন্তাবিদের দ্বারা জনকল্যাণকামী উদারনীতিক রাষ্ট্রতত্ত্ব গড়ে ওঠে; অপর দিকে একই সঙ্গে বার্কার, ল্যাস্কি, ম্যাকাইভার প্রমুখ তাত্ত্বিকের দ্বারা সংশোধনমূলক উদারনীতিবাদ গড়ে তোলা হয়।[১] ফ্রিডান উদারনীতিবাদের এই ধারাটিকে 'নিউ লিবার‍্যালিজ্‌ম' (New Liberalism) বলে অভিহিত করেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দিতে পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের একদিকে যেমন অসাম্য ও বৈষম্য বৃদ্ধি

[১] Amal kr. Mukhopadhyay, 'Liberalism : A Dilemma For Indian Political Science', in *Socialist perspective,* vol. 1-2, 2003 p. 4.

পায়, অন্যদিকে তেমনি পুঁজি কর্তৃক শ্রমের শোষণ তীব্র আকার ধারণ করে। এর ফলে বিংশ শতাব্দীর প্রথমে ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ উদারনীতিক ব্যবস্থার ওপর তীব্র আঘাত হেনেছিল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলির মধ্যে উদারনীতিবাদের উপাদান বিলুপ্তপ্রায় হয়েছিল। বিশ্বযুদ্ধ, অর্থনৈতিক মন্দা ও সামাজতান্ত্রিক তত্ত্বের অধিপত্যের দ্বারা পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিল উদারনীতিক তত্ত্ব। এই সংকটের হাত থেকে উদারনীতিক তত্ত্বকে রক্ষা করার উদ্দেশে হবহাউস, বার্কার, ল্যাস্কি প্রমুখ চিন্তাবিদ উদারনীতিবাদকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এঁরা নেতিবাচক রাষ্ট্রের পরিবর্তে ইতিবাচক রাষ্ট্রের তত্ত্ব প্রচার করে রাষ্ট্রের হাতে বিবিধ জনকল্যাণকর কর্মসূচী রূপায়নের দায়িত্ব অর্পণ করার ওপর জোর দেন। জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র, মিশ্র অর্থনীতি ও পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা ছিল এরূপ উদারনীতিবাদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

ল্যাস্কি পুঁজিবাদের বিকলাঙ্গ চরিত্রটি পর্যবেক্ষণ করে বলেছেন যে, পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে স্বাধীনতা একটি অভিজাত ধারণা মাত্র। সমাজতন্ত্রকেই ফ্যাসিবাদের বিকল্প হিসেবে মনে করেছেন তিনি। তিনি মনে করেছিলেন যে, সাবেকী উদারনীতিবাদকে বর্জন করে মার্কসের ধারণাকে স্বাগত জানানো উচিত। সমকালীন অবস্থায় গ্রীনের ইতিবাচক স্বাধীনতার ধারণাকে অধিক মূল্যবান বলে মনে করেছেন তিনি। হবহাউস ও বার্কারের মতো তিনিও স্বাধীনতাকে সংগঠিত রাষ্ট্রনীতিক কর্তৃত্বের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করেছেন। ল্যাস্কি বন্টনমূলক ন্যায় ও সামাজিক ন্যায়ের আদর্শ উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর মতে, সাম্যের ভিতের ওপর দাঁড়িয়েই স্বাধীনতা কার্যকরী হতে পারে। ল্যাস্কি তাঁর তত্ত্বে সাবেকী উদারনীতিক তত্ত্ব বর্জন করেছেন এবং এর দ্বারা ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে মিথ্যা বিরোধিতাকেও পরিহার করেছেন তিনি। তাঁর সমকালীন চিন্তাবিদদের মতো তিনিও সমাজতন্ত্রকে উদারনীতিক তত্ত্বের এক অন্যতম উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে পরস্পর পরিপূরক হিসেবে দেখেছেন।

উদারনীতিবাদকে কীভাবে আরো উন্নত করা যায় — এই ছিল ল্যাস্কির প্রধান লক্ষ্য। ১৯৪২ সালে প্রকাশিত এফ. হায়েক (F. Hayek) এর 'দ্য রোড টু সার্ফডম' (The Road to serfdom) গ্রন্থে নেতিবাচক স্বাধীনতা ও মুক্ত বাজার অর্থনীতির ওপর গুরুত্ব দিয়ে সনাতন উদারনীতিবাদের পুনরুত্থান ঘটাতে চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু ল্যাস্কি মনে করেছেন যে, পরিকল্পিত অর্থনীতির মাধ্যমেই প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করা যেতে পারে। রাষ্ট্রকে মুষ্ঠিমেয় ধনতান্ত্রিক শ্রেণীর হাতিয়ার হিসেবে না ভেবে সামাজিক মঙ্গলের অভিভাবক হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন তিনি। ল্যাস্কির মতানুসারে পরিকল্পিত সমাজ ব্যবস্থাতেই স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র বাস্তবায়িত হতে পারে। তিনি সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার সমর্থক ছিলেন, কিন্তু বিপ্লবের বিরোধী ছিলেন। ল্যাস্কিকে তাই সংস্কারবাদী উদারনীতিক সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদ বলে অভিহিত করা যেতে পারে।[১]

ল্যাস্কির তত্ত্বে একটা সময়ে কাল্পনিক সমাজবাদীদের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের অসঙ্গতি প্রতিফলিত হয়েছিল। কাদের দ্বারা এবং কীভাবে এই সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠবে তার কোনো সুনির্দিষ্ট উত্তর তাঁর অতি সরলীকৃত বক্তব্যের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। ল্যাস্কির রাজনৈতিক দর্শনে অসংগতি লক্ষ্য করা যায়। হার্বার্ট ডীন (Herbert Deane) সমালোচনা করে বলেছেন যে, ল্যাস্কির প্রথম দিকের রচনার মধ্যে যে দার্শনিক বিশ্লেষণ ছিল পরবর্তী কালের রচনায় তা লোপ পেয়েছে।[২] ল্যাস্কির বিরুদ্ধে বিভিন্ন সমালোচনা করা হলেও একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, বাস্তবধর্মী চিন্তাবিদ হিসেবে তিনি সমাজের বৈষম্যকে তুলে ধরেছেন এবং এক শক্তিশালী মানবিক গণতন্ত্রের অনুসন্ধান করেছেন। রাষ্ট্রচিন্তার বিকাশে তাঁর সব থেকে বড় অবদান হল এই যে, তিনি উদারনীতিবাদের সঙ্গে মার্কসবাদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। বহুত্ববাদ, মানবিক সমাজতন্ত্র এবং বিকেন্দ্রীকরণের ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তবে মার্কসবাদের শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব এবং সহিংস বিপ্লবের তত্ত্ব গ্রহণ করতে পারেননি তিনি। তাঁর উদারনীতিবাদের সমাজিকীকরণের ধারণা পরবর্তীকালের রাষ্ট্রচিন্তাবিদদের প্রভাবিত করেছে।

[১] Frank Thakurdas, p. 385

[২] Sukhbir Sigh, vol. 2. p 325

অনুশীলনী - ২

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। ল্যাস্কির মতে স্বাধীনতার বিভিন্ন ধরন কী ?

২। ল্যাস্কি স্বাধীনতার রক্ষাকবচ সম্পর্কে কী বলেছেন ?

৩। ল্যাস্কির মতানুসারে স্বাধীনতার সঙ্গে সাম্যের সম্পর্ক কীরূপ ?

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। স্বাধীনতা সম্পর্কে ল্যাস্কির ধারণা বিশ্লেষণ কর।

২। উদারনীতিক ধারায় ল্যাস্কির স্থান পর্যালোচনা কর।

৪.৮ ঃ প্রধান শব্দগুচ্ছ

একত্ববাদ (Monism) ঃ

সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে আইনানুগ তত্ত্ব সাধারণভাবে একত্ববাদ নামে পরিচিত। এই তত্ত্ব রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতাকে চরম, অবাধ, অসীম ও অবিভাজ্য বলে প্রচার করে। বোঁদা, হবস্ বেন্থাম, অস্টিন প্রমুখ হলেন একত্ববাদের প্রধান প্রবক্তা। অনেকে অস্টিনের মতো কেবল বিশ্লেষণী আইনবিদদের একত্ববাদী বলে চিহ্নিত করেছেন। ল্যাস্কি একত্ববাদের বিরুদ্ধে তাঁর তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন।

বহুত্ববাদ (Pluralism) ঃ

বহুত্ববাদ হল সার্বভৌমিকতার একত্ববাদী তত্ত্ব-বিরোধী একটি বৌদ্ধিক আন্দোলন। এই তত্ত্ব প্রচার করে যে, রাষ্ট্রের মতোই সমাজের বিভিন্ন সংঘ বা গোষ্ঠী সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এটিই সাধারণভাবে বহুত্ববাদ নামে পরিচিত। বহুত্ববাদের প্রধান প্রবক্তাদের মধ্যে ব্রিটেনের ওয়েব দম্পতি, কোল, ল্যাস্কি, লিণ্ডসে, ফিগিস ও বার্কার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ম্যাকআইভার এবং ফ্রান্সের দুগুই প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ল্যাস্কি প্রথম দিকে বহুত্ববাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছিল।

প্রয়োগবাদ (Pragmatism) ঃ

প্রয়োগবাদ হল এক দার্শনিক আন্দোলন, যা উইলিয়াম জেমস্, জন ডিউই (Joh Dewey) প্রমুখের দ্বারা সুসংবদ্ধ রূপ পেয়েছে।[১] এই প্রয়োগবাদ ছিল রাজনীতিক প্রক্রিয়ার আলোচনায় এক বাস্তববধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি। প্রয়োগবাদ, অভিজ্ঞতাবাদের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। প্রয়োগবাদীরা মনে করেছেন যে, যাচাই করার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সত্য নিরূপণ করা যায়। ল্যাস্কি আদর্শবাদের বিরোধী ছিলেন। তাঁকে প্রয়োগবাদী বলে অনেকে চিহ্নিত করেছেন।

জনকল্যাণকর উদারনীতিবাদ (Welfare liberalism) ঃ

জনকল্যাণকর উদারনীতিবাদী তত্ত্ব নূন্যতম কার্যসম্পাদনকারী চৌকীদারী রাষ্ট্রের পরিবর্তে এক জনকল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলে। এ ধরনের রাষ্ট্র জনকল্যাণের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই উদারনীতিবাদ নেতিবাচক স্বাধীনতার পরিবর্তে ইতিবাচক স্বাধীনতার কথা বলে। কেইনস্, বেভারিজ প্রমুখের এই ধরনের উদারনীতিবাদের দ্বারা ল্যাস্কিও প্রভাবিত হয়েছিলেন।

৪.৯ ঃ অনুশীলনী পরখ করার উত্তরমালা

অনুশীলনী — ১

সংক্ষিপ্ত উত্তর ঃ

১। অনুচ্ছেদ ৩ দেখুন।

২। ৪.১ অংশ দেখুন।

৩। ৪.২ অংশ দেখুন।

৪। ৫ অনুচ্ছেদের শেষ অংশ দেখুন।

৫। অনুচ্ছেদে ৫ দেখুন।

৬। অনুচ্ছেদ ৫ দেখুন।

৭। অনুচ্ছেদ ৫ দেখুন।

রচনাত্মক উত্তর ঃ

১। অনুচ্ছেদ ৪, ৪.১, ৪.২, ৪.৩ দেখুন।

২। ৪.৩ অংশ দেখুন।

৩। অনুচ্ছেদ ৫ দেখুন।

অনুশীলনী — ২

সংক্ষিপ্ত উত্তর ঃ

১। অনুচ্ছেদ ৬ দেখুন।

২। অনুচ্ছেদ ৬ দেখুন।

৩। ৬ অনুচ্ছেদ দেখুন।

রচনাত্মক উত্তর ঃ

১। অনুচ্ছেদ ৬ দেখুন।

২। অনুচ্ছেদ ৭ দেখুন।

৪.১০ ঃ নমুনা প্রশ্নাবলী

Short Answer-Type Questions :

1. Why does Laski think that every state is known by the rights it maintains ?
2. How does Laski seek to define liberty in terms of its relation to the authority of the state ?
3. Why did Laski regard authority as federal ?

[১] Britannica : Ready Reference Encyclopedia, 2005, New Delhi, vol. 8, p. 58.

Essay-type Questions :

1. Discuss Laski's views on the place of the state in great society.
2. Attempt a write-up on Harold Laski's views on individual rights.
3. Examine Laski's position in the liberal tradition of Western political thought.

৪.১১ ঃ গ্রন্থ-নির্দেশিকা

1. Harold J. Laski, *A Grammar of Politics*, George Allen and Unwin, London, 1938 (4th edition)
2. হ্যারল্ড লাস্কি, অনুবাদ ঃ বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য, রাজনীতি পরিচয়, ওরিয়েন্ট লংমান্স লিঃ, কলকাতা।
3. Frank Thakurdas, *Recent English Political Theory* (and the Idea of Liberty), The Minerva Associates, Kolkata, 1972.
4. Sukhbir Singh, *History of Political Thought,* vol. 2. Rastogi Publications, Meerut, 1997.
5. Britannica : *Ready Reference Encyclopedia,* 2005, New Delhi.

একক ৫

জন রলস্ ঃ ন্যায়ের তত্ত্ব (John Rawls : Theory of Justice)

গঠন

৫.০ উদ্দেশ্য

৫.১ প্রস্তাবনা

৫.২ প্রেক্ষিত

৫.৩ আলোচনা পদ্ধতি

৫.৪ অনুমান সমূহ

৫.৪.১ আদি অবস্থান

৫.৪.২ অজ্ঞতার অবগুণ্ঠন

৫.৪.৩ ন্যায্যতা হিসেবে ন্যায়

৫.৫ ন্যায়ের দ্বিবিধ নীতি

৫.৬ সাংবিধানিক কাঠামো

৫.৭ ঈর্ষার সমস্যা

৫.৮ রলসের উদারনীতিবাদ

৫.৯ মূল্যায়ন

৫.১০ সারসংক্ষেপ

৫.১১ প্রধান শব্দগুচ্ছ

৫.১২ অনুশীলনী পরখ করার উত্তর মালা

৫.১৩ নমুনা প্রশ্নাবলী

৫.১৪ গ্রন্থ-নির্দেশিকা

৫.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায়ের প্রথম একক দুটিতে উদারনীতিবাদের সঙ্কটের প্রেক্ষিতে নয়া উদারনীতিবাদের উদ্ভব এবং সমকালীন উদারনীতিবাদের বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে বলা হয়েছে। সকমালীন উদারনীতিবাদের একটি অন্যতম দিক হল সমতাবাদী উদারনীতিবাদ। এই ধরনের উদারনীতিবাদের একজন অন্যতম প্রবক্তা হলেন জন রলস (১৯২১-২০০২)। এই এককটির পাঠ শেষ করলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে জানা যাবে ঃ

- রলস্ কীভাবে তাঁর ন্যায় তত্ত্বের মাধ্যমে নৈতিক তত্ত্ব ও রাজনীতিক দর্শনের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন ?
- রলসের ন্যায় তত্ত্বের প্রেক্ষিত।
- রলসের আলোচনা পদ্ধতি।
- রলসীয় ন্যায় বলতে কী বোঝায় ?
- রলসীয় তত্ত্বে কীভাবে উদারনীতিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক সমতাবাদের সহাবস্থান ঘটেছে ?
- রলসীয় তত্ত্বের বিরুদ্ধে সমালোচনা এবং উদারনীতিক রাষ্ট্রদর্শনের বিকাশে এই তত্ত্বেব প্রভাব।

৫.১ ঃ প্রস্তাবনা

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের একজন অন্যতম রাজনীতিক দার্শনিক হিসেবে জন রলস্ উদারনীতিক তত্ত্ব ও ন্যায়ের ধারণা সম্পর্কে নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'এ থিয়েরী অব্ জাস্টিস্' (A Theory of Justice) [১৯৭১] এমন এক সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল যখন উদারনীতিক রাষ্ট্রতত্ত্ব গভীর সঙ্কটের মধ্যে পড়েছিল। ১৯৫০ ও ১৯৬০ এর দশকে যখন অনেকে উদারনীতিক রাষ্ট্রদর্শনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেছিলেন তখন জন রলস প্রমুখ তাত্ত্বিক উদারনীতিক রাষ্ট্রতত্ত্বের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে সাহায্য করেছেন। রলস্ ভাষানুসারী দর্শন (linguistic philosophy) ও যৌক্তিক দৃষ্টবাদ (logical positivism) এর ধারা থেকে সরে এসেছেন এবং তাঁর ন্যায় তত্ত্বের মাধ্যমে নৈতিক তত্ত্ব ও রাজনীতিক দর্শনের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন। রলসের মতে রাজনীতিক দর্শন নৈতিক দর্শনের এক শাখা। রাজনীতিক দর্শনের সাহায্যে একদিকে যেমন সামাজিক কাঠামোর মূল্যায়ন করে সাধারণ নীতি উপস্থাপন করা হয়, অপরদিকে তেমনি যুক্তি সঙ্গত প্রতিষ্ঠান, পদ্ধতি ও নীতি নির্ধারণ করা হয়। বস্তুত রলসের 'থিয়োরী অব্ জাস্টিস্' পাশ্চাত্য উদারনীতিক রাজনীতিক দর্শনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে এবং রাষ্ট্রতত্ত্বকে অচেতন ও সুপ্ত অবস্থা থেকে সঞ্জীবিত করে তুলেছে। রলস্ তাঁর ন্যায়তত্বের মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছেন যে, উদারনীতিক নীতি ও সমাজতান্ত্রিক সমতাবাদের নীতি একসঙ্গে সহাবস্থান করতে পারে। তাঁর নৈতিক দর্শনে স্বাধীনতা ও সাম্যের নীতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা হয়েছে। নতুন সমতাবাদ নামে নতুন ধরনের আন্দোলনের অপরিহার্য অংশরূপে তাঁকে চিহ্নিত করা যেতে পারে।[১] সাম্প্রতিকালের উদারনীতিক চিন্তাবিদগন রলসের তাত্ত্বিক কাঠামোকে ঘিরেই তাঁদের তত্ত্বের বিকাশ ঘটিয়েছেন। সামাজিক চুক্তি মতবাদ ও কান্টের উদারনীতিবাদের সংশোধনের মাধ্যমে ব্যক্তির অধিকারের প্রেক্ষিতে বন্টনমূলক ন্যায় ও জনকল্যানমূলক রাষ্ট্রের তত্ত্ব উপস্থাপিত করে জন রলস্ রাষ্ট্রতত্ত্বের জগতে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন।

৫.২ ঃ প্রেক্ষিত

জন রলস ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা উইলিয়ম রলস (William Rawls) আইনজ্ঞ ছিলেন, এবং মাতা আন্না রলস্ (Anna Rawls) নারীদের ভোটাধিকারকে সমর্থন করে নারীবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪৬ সালে তিনি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈতিক জ্ঞান ও বিচার সম্পর্কে গবেষণা করেন। তখন থেকেই ন্যায়তত্ত্ব সম্পর্কে আগ্রহী হয়েছিলেন তিনি। এর পর ১৯৫২-৫৩ খ্রিস্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার জন্য যান। সেখানে তিনি এইচ. এল. এ. হার্ট (H. L.A. Hart) এর আইনের দর্শন সম্পর্কে

[১] Asok Kr. Mukhopadhyay, John Rawls' Theory of Justice in *Socialist Perspective*, vol. 31, No. 1-2, June to Sept. 2003, p.35

বক্তৃতা এবং ইসাইয়া বার্লিন (Isaiah Berlin) এর আলোচনাচক্রের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তখন থেকেই তিনি রাজনীতিক তত্ত্বের পুনরুজ্জীবনের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১৯৫৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে গিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যপনার কাজে যুক্ত হয়েছিলেন। পুরুষ-শাসিত পৃথিবীতে নারীদের প্রবেশাধিকার অর্জনে সাহায্য করার জন্য ১৯৯৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছিলেন। বস্তুত, জন রলস তাঁর পারিবারিক ও শিক্ষাগত পরিবেশের দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়ে নৈতিক ও মানবিক তত্ত্ব গড়ে তোলার জন্য প্রয়াসী হয়েছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 'মতাদর্শের অবসান' (end of ideology)' এর তত্ত্ব গড়ে ওঠে।[২] রাজনীতিক দর্শনের অবনমনের মূল কারণ হিসেবে অনেকে 'নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ' ('Moral relativism) কে চিহ্নিত করেছেন। এরূপ আপেক্ষিকতাবাদের প্রধান লক্ষ্য হল রাজনীতিক ঘটনার বিশ্লেষণ থেকে মূল্যবোধকে পরিহার করা। নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদীরা রাজনীতিক বিশ্লেষণকে সম্পূর্ণভাবে মূল্যমান-নিরপেক্ষ করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। আর তা করতে গিয়ে তাঁরা কার্যত ইতিহাস-সর্বস্ব হয়ে পড়েছিলেন। রাজনীতিক দর্শনের এই ধবংসসাধন উদারনীতিক গণতন্ত্রের সঙ্কটকে তীব্র করে তুলেছিল। মূল্যমান-নিরপেক্ষ রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে উদারনীতিক গণতন্ত্রের সমর্থনে তত্ত্ব গড়ে তোলা কঠিন হয়। রাজনীতিক দর্শনের অবসানের ফলে বলশেভিকবাদ, ফ্যাসিবাদ প্রভৃতিকে নিন্দা করা যেমন কঠিন হয়, তেমনি উদারনীতিক গণতন্ত্রের মূল্যবোধ্যের যৌক্তিকতা প্রমান করাও দুরূহ হয়ে ওঠে। এই প্রেক্ষিতে রাজনীতিক দর্শনের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল — রাজনীতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের জন্য নয়, উদারনীতিক গণতন্ত্রকে সমর্থন করার জন্য। তাই উদারনীতিক গণতন্ত্রের মূল্যবোধগুলির পুনরুজ্জীবনের জন্য নতুন উদারনীতিক তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন বিভিন্ন চিন্তাবিদ। জন রলস ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

১৯৬০ এর দশকের শেষ থেকে কেইনসীয় নীতির ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়, বৃহদাকার আর্থনীতিক (macro economic) সমস্যার সমাধানে কেইনসীয় অর্থনীতিকে আর যথোপযুক্ত মনে করা হচ্ছিল না। মুদ্রস্ফীতি ও বেকারত্ব বৃদ্ধির মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক ভুল বলে প্রমাণিত হতে থাকল। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, ঘাটতি বাজেট বা মুদ্রাস্ফীতি নীতির মাধ্যমে আর নিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। তাই মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্বজনিত সমস্যাকে কেইনসের জনকল্যানকর নীতিরই ফলশ্রুতি বলে সমালোচনা করা হতে থাকে। কেইনসীয় নীতি গ্রহণকারী দেশগুলিই বেশী দুর্দশাগ্রস্ত হয়েপড়ে। সুইডেন, ডেনমার্ক, ব্রিটেন, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানী, ইতালি, আয়ারল্যান্ড প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক দেশগুলি জনকল্যানকর কর্মসূচি গ্রহন এবং তা সম্পাদনের জন্য আর্থিক বরাদ্দ — বিশেষ করে শিক্ষা জনস্বাস্থ্য, বেকারত্ব দুরীকরণের জন্য বরাদ্দ— ক্রমশ হ্রাস করতে থাকে। জনকল্যানমূলক রাষ্ট্রের প্রাসঙ্গিকতা নিয়েও বিভিন্ন মহলে বিতর্ক শুরু হয়। এই ধরনের রাষ্ট্র কতখানি রাজনীতিক, আর্থনীতিক ও নৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সে সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিতে থাকে। রবার্ট নজিক (Robert Nozick) প্রমুখ নয়া উদারনীতিবাদী সাবেকী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী উদারনীতিক ব্যবস্থার ন্যূনতম রাষ্ট্রতত্ত্বের পক্ষে মত পোষণ করতে থাকেন। অপরদিকে জন রলস্ নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে জনকল্যানকর ব্যবস্থাকে ন্যায়তত্ত্বের নিরিখে বিচার করে নতুন জনকল্যানমূলক উদারনীতিবাদী তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধ, বর্ণবৈষম্য, বেকারত্ব বৃদ্ধি প্রভৃতি সমস্যার ফলে সারা পৃথিবীতে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রেক্ষিতেই রলস এই জনকল্যানকর ব্যবস্থার সপক্ষে যুক্তি খাড়া করেন। তাঁর সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গদের পৌরঅধিকারের জন্য আন্দোলন এবং দারিদ্র্য সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকার দৃষ্টি আকর্ষনও রলসকে ন্যায়ের তত্ত্ব উপস্থাপনে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

[২] Om Bakshi, *The Crisis of Political Theory,* A *Inquiry into contemporray Thought,* OUP, Delhi, 1987, p.44

৫.৩ ঃ আলোচনা পদ্ধতি

রলসের ন্যায়তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল ঃ গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য সর্বাপেক্ষা সুসংগত ন্যায়ের ধারণা কী ? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে তিনি তৎকালীন দর্শনে প্রাধান্য বিস্তারকারী পদ্ধতিগুলি যথা — হিতবাদ, যৌক্তিক দৃষ্টবাদ, অভিজ্ঞতাবাদ, ভাষানুসারী বিশ্লেষণ প্রভৃতিকে অস্বীকার করে সামাজিক চুক্তি ধারণার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন। রাজনীতিক দর্শনে হিতবাদের প্রাধান্যকে তিনি খন্ডন করেছেন। হিতবাদের 'সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক সুখ' নীতিকে পরিহার করেছেন তিনি। হিতবাদে ন্যায়সংগত বন্টনের সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না। এই মতবাদে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থে ব্যক্তি ও সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থকে উপেক্ষা করা হয়েছে। তাই রলস্ বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে লক্, রুশো ও কান্টের উদারনীতিক ও গণতান্ত্রিক সামাজিক চুক্তি'র ধারাকে অনুসরণ করেছেন। সামাজিক চুক্তি মতবাদ অনুসারে আইন যদি সম-অধিকার সম্পন্ন স্বাধীন মানুষের মধ্যে চুক্তির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, তাহলে তা ন্যায়সংগত হবে। সুতরাং আইনকে ন্যায়সংগত হতে গেলে কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থ রক্ষা করলে হবে না, প্রত্যেকের স্বার্থ দেখতে হবে, যাতে গণমঙ্গল সাধিত হয়।

হিতবাদের পাশাপাশি একটি সাধারণ স্বজ্ঞা (intuition) প্রচলিত ছিল যে, ব্যাক্তির অধিকারকে সামাজিক মঙ্গলের স্বার্থে বলি দেওয়া উচিত নয়। অপর দিকে মার্কসবাদীরা অধিকারকে ধনতান্ত্রিক শ্রেণীর অধিকার বলে চিহ্নিত করেছেন। বুর্জোয়াদের শ্রেণী স্বার্থ আর সর্বজনীন মানবিক স্বার্থকে এতে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। রলস্ এই সব চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য 'সামাজিক চুক্তি'র পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। রলস এমন এক উদারনীতিবাদী ধারা গড়ে তুলেছেন, যা লকের তত্ত্ব থেকে অধিকতর সমতাবাদী আবার মার্কসবাদ থেকে অধিকতর ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্যবাদী এবং তাঁর ন্যায়ের তত্ত্বের মধ্যে উদারনীতিক ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শের মধ্যে সুসংবদ্ধ সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন।

স্বজ্ঞাবাদ (Intuitionism) এর ত্রুটি দূর করার জন্যও রলস্ সামাজিক চুক্তির অনুকল্প গ্রহণ করেছেন। স্বজ্ঞাবাদের মধ্যে কতকগুলি ধারণা ও নীতি তালগোল পাকানো থাকে। এর মধ্যে একাধিক প্রাথমিক নীতি থাকে, যেগুলি পরস্পর বিরোধী। স্বজ্ঞাবাদে নীতিগুলি কেন গ্রহণ করা হয় তার কোনো সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। তাই রলস্ ন্যায়ের নীতি গড়ে তোলার জন্য 'সামাজিক চুক্তি'র অনুকল্প গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া, স্বজ্ঞাবাদ একাধিক নীতির মধ্যে দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কোনো সঠিক পথ নির্দেশ করতে পারে না। চুক্তিবাদী পদ্ধতির সাহায্যে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়ে থাকে। যেমন, গুণ অথবা প্রয়োজন — এই দুটির মধ্যে কোনটির ভিত্তিতে বন্টনের মাধ্যমে ন্যায়ের নীতি গড়ে তোলা হবে, তার সমাধান চুক্তিবাদী পদ্ধতির সাহায্যে করা সম্ভব। এই পদ্ধতিতে প্রয়োজনকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। রলস্ তাই স্বজ্ঞাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে চুক্তিবাদী পদ্ধতির সাহায্যে ন্যায়ের নীতি ও ন্যায়সঙ্গত সমাজের কাঠামো গড়ে তোলার জন্য রাজনীতিক তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন।

রলস্ তাঁর ন্যায়তত্ত্ব গঠনে 'প্রতিফলনকারী ভারসাম্য' (reflective equilibrium) এর পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। অ্যারিস্টটল এবং পরবর্তীকালে সিজউইক (Sidgwick) এর চিন্তাধারা এ ব্যাপারে রলসকে প্রভাবিত করেছিল। এই পদ্ধতির সাহায্যে নৈতিক বিশ্বাস ও তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করা হয়। এই বৌদ্ধিক পদ্ধতি হল ভারসাম্য, কারণ এর দ্বারা নীতি ও অভিমত সমস্থানে অবস্থান করে। আবার এটি প্রতিফলনকারী, কারণ জনগণ এব্যাপারে ভাবনা-চিন্তা করে। এই ভারসাম্য অপরিবর্তনীয় নয়। নীতি পুনর্গঠিত করে অথবা অভিমত পরিবর্তন করে প্রতিফলনকারী ভারসাম্য গড়ে তোলা হয়। আদি অবস্থানে 'ন্যায্যতা হিসেবে ন্যায়' গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রলস এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী নৈতিক তত্ত্ব যাচাই করার ক্ষেত্রেও প্রতিফলনকারী ভারসাম্যকে পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করেছেন জন রলস।

রলস তাঁর তত্ত্বে পরম লক্ষ্যবাদী নীতির বিকল্প পদ্ধতি গ্রহণের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, যে তত্ত্বে বিশেষ কল্যাণের প্রেক্ষিতে নৈতিক আচরণ ঠিক করা হয় তা নৈতিক দিক থেকে অবৈধ, কারণ মানবিক কল্যাণ বিভিন্ন

রকমের হতে পারে। রলস মনে করেন যে, কোনো নৈতিক তত্ত্বের উদ্দেশ্য হল আগে সঠিক নৈতিক আচরণ নিরূপণ করা এবং তার ভিত্তিতে নৈতিক মঙ্গল নির্ধারণ করা। রলসের কাছে, যে কোনো সমাজের প্রধান গুণ হল ন্যায় এবং এ কারণে তিনি মঙ্গল বা কল্যাণের ধারণার চেয়ে ন্যায়ের ধারণাটিকে অগ্রাধিকার দেন। (The right is prior to the good)। তবে বলা যেতে পারে যে রলসের ন্যায়ের ধারণা নিঃসন্দেহে এক জনকল্যাণকর ধারণা, যা সমাজে সম্পদের বন্টনের ব্যাপারে এক তাত্ত্বিক বৈধতা দান করে। ন্যায়তত্ত্ব উপস্থাপনে রলস্ পরোৎকর্ষবাদ (perfectionism)-এরও বিরোধী ছিলেন। পরোৎকর্ষবাদ হল এক নৈতিক তত্ত্ব, যাতে বলা হয় যে, কিছু জিনিস সহজাতভাবে ভাল এবং রাষ্ট্রের উচিৎ সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতিবিধান করা। এর পরিবর্তে রলস ন্যায়ের ধারণা বিচারে অগ্রসর হন এবং এ ব্যাপারে তিনি চুক্তিবাদীতত্ত্বের আঙ্গিক-কেই বেছে নেন। তাঁর গৃহীত চুক্তিবাদী পদ্ধতি হিতবাদ ও পরোৎকর্ষবাদের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে।

৫.৪ ঃ অনুমানসমূহ

ন্যায়ের একটি সর্বজনস্বীকৃত ধারণায় উপনীত হওয়ার জন্য জন রলস্ সামাজিক চুক্তি মতবাদের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি লক্, রুশো, এবং কান্টের মতবাদকে আরো উন্নত স্তরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। সামাজিক চুক্তি মতবাদ একসময়ে রাজনীতিক যুক্তি প্রকাশের এক অতি জনপ্রিয় ধরণ বলে বিবেচিত হলেও, দীর্ঘকাল অব্যবহারে তা ইদানীং অপ্রচলিত হয়ে পড়েছিল। জন রলস্ সামাজিক চুক্তির মতবাদকে প্রায় দর্শন শাস্ত্রের যাদুঘর থেকে উদ্ধার করে এনে সামাজিক ন্যায়ের ধারণার কিছু তাত্ত্বিক সমস্যা সমাধানের কাজে ব্যবহার করেছেন। তবে পূর্ববর্তী দার্শনিকদের ধারণা ও উদ্দেশ্য থেকে রলসের ধারণা ও উদ্দেশ্য ছিল একটু ভিন্ন ধরণের। সামাজিক চুক্তি মতবাদের দার্শনিকগণ সাধারণত রাজনীতিক আনুগত্যের সমস্যাটি ব্যাখ্যা করার জন্য সামাজিক চুক্তির অনুমানগুলি ব্যবহার করেছেন। এই মতবাদে মূল ধারণা ছিল এক বিশেষ ধরনের সমাজে প্রবেশ করা এবং এক বিশেষ ধরনের শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা। কিন্তু রলসের ধারণায় সামাজিক চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল সমাজের মৌল কাঠামোর জন্য ন্যায় নীতি নির্ধারণ করা। তিনি মনে করেছেন যে, সামাজিক সহযোগ থেকে উৎপন্ন সুবিধাগুলির ওপর পরস্পর বিরোধী দাবি থেকে ন্যায়ের সমস্যার সৃষ্টি হয়। সুতরাং যারা সামাজিক সহযোগিতায় যুক্ত, তারা যদি সমাজের সকলকে নিয়ে সুবিধাগুলির যথাযথ বন্টনের ব্যাপারে একটি ঐক্যমত্যে পৌঁছাতে পারে, তাহলে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। রলস্ একে ন্যায়ের নীতি সংক্রান্ত সামাজিক চুক্তি বলে মনে করেছেন। সামাজিক চুক্তি মতবাদের মতো রলসের ন্যায় সংক্রান্ত নীতিও কতকগুলি অনুমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

৫.৪.১ ঃ আদি অবস্থান (Original position)

রলস্ সামাজিক চুক্তির ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে একটি 'আদি অবস্থান' — এর কথা ভেবেছেন। সামাজিক চুক্তি মতবাদে যে-ভাবে এক 'প্রাকৃতিক অবস্থা'-র কল্পনা করা হয়েছে তারই এক মার্জিত রূপ হল এই আদি অবস্থান। রলসের কাছে এই 'আদি অবস্থান' কোন ঐতিহাসিক বাস্তব অবস্থান নয়। এটি হ'ল সম্পূর্ণরূপে অনুকল্পিত এক অবস্থা যারা দ্বারা ব্যক্তিবর্গের মধ্যে চুক্তির ন্যায্যতা সুনিশ্চিত হয়।[১] রলসের মতে 'আদি অবস্থান' হল প্রারম্ভিক পরিস্থিতির দার্শনিক ব্যাখ্যা। এক্ষেত্রে রলস্ ব্যক্তিবর্গকে তাদের নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি থেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছেন। তাঁর মতে ব্যক্তিবর্গ তাদের আদি অবস্থায় নিজ নিজ স্বার্থের বিবেচনা দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। স্বার্থের বিবেচনা এখানে এই অর্থে কাজ করে যে, প্রত্যেকের ভাবনা হল নিজের স্বার্থটুকু রক্ষা করা। লক্ষ্য অর্জনে নিজস্ব সামার্থ্য বৃদ্ধি করতে প্রত্যেকে আগ্রহী হয়ে থাকে। কিন্তু একে অন্যের ব্যাপারে অনাগ্রহী থাকে। রলসের ভাষায় এই

[১] John Rawls *A Theory of Justice,* OUP, UK, 1999, p.104

অনাগ্রহ হল পারস্পরিক। তবে ব্যক্তিবর্গ অহংবাদী নয়। তেমনি অনিশ্চয়তার মধ্যেও তারা যেতে চায় না। এই অবস্থায় তারা যুক্তিশীল প্রাণী হিসেবে আচরণ করে বলে ধরে নেওয়া হয়। কারণ উপায় ও লক্ষ্যের সম্পর্ক অনুধাবনে তারা পুরোপুরিভাবে সক্ষম। কী পরিস্থিতিতে তাদের স্বার্থ ভালভাবে সিদ্ধ হতে পারে, কী পরিস্থিতিতে পারে না তা বোঝবার মতো ক্ষমতাও তাদের আছে। যেহেতু তাদের স্বাধীন ও সমানাধিকার সম্পন্ন নাগরিকের প্রতিনিধি হিসেবে ধরা হয়, তাই তারা প্রতিসম অবস্থায় অবস্থিত। এই অবস্থায় অবস্থিত যুক্তিশীল স্বার্থ সচেতন ব্যক্তিবর্গের স্বার্থগুলি মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য রলস চুক্তির ধারণা গড়ে তোলেন।

রলসের মতে, আদি অবস্থান এর ধারণা গড়ে তোলা হয়েছে ন্যায়ের নীতি সম্পর্কে ন্যায্য পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। বিশুদ্ধ পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ন্যায়তত্ত্ব উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্যে এই ধারণা গড়ে তোলা হয়।[২] এই 'আদি অবস্থান' এর ধারণা রলস্ মূলত কান্টের ধারণা থেকে গ্রহণ করেছেন। এই 'আদি অবস্থান' এর ব্যক্তিবর্গ ছিল কান্টের 'স্ববস্তু সম্পর্কিত সত্তা' (noumenal selves)-র মতো। এই অবস্থায় মানুষ ছিল স্বাধীন, নৈতিক, সম-অধিকার সম্পন্ন এবং যুক্তিশীল প্রাণী। এই স্বাধীন ব্যক্তিবর্গের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে না ; কিন্তু তারা তাদের যুক্তি এবং স্ববস্তু সম্পর্কিত সত্তা থেকে উদ্ভূত প্রাথমিক সামাজিক বিষয়াদি পেতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। এই প্রাথমিক সামাজিক বিষয়াদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অধিকার ও স্বাধীনতা সমূহ, বিভিন্ন ক্ষমতা ও সুযোগ, আয় ও সম্পদ, আত্মসম্মানের উপায় সমূহ প্রভৃতি। রলস মনে করেন যে, 'আদি অবস্থান' এ ব্যক্তিবর্গ যখন চুক্তি করে তখন এর দ্বারা তারা প্রাথমিক সামাজিক বিষয় সমূহের সর্বাধিক সুবিধা পেতে চায়।

৫.৪.২ ঃ অজ্ঞতার অবগুণ্ঠন (Veil of Ignorance)

'আদি অবস্থান'-এ ব্যক্তিবর্গের স্বার্থগুলির মধ্যে কীভাবে ন্যায়সঙ্গত সামঞ্জস্য বিধান করা যায় তা ব্যাখ্যা করার জন্য রলস্ 'অজ্ঞতার অবগুণ্ঠন' এর ধারণাটি উদ্ভাবন করেছেন। 'আদি অবস্থান' এর সমস্ত ব্যক্তিকে একটি 'অজ্ঞতার অবগুণ্ঠন' এর আড়ালে অবস্থিত বলে ধরে নেওয়া হয়। 'আদি অবস্থান' হল একটা বিমূর্তকরণ, আর 'অজ্ঞতার অবগুণ্ঠন' হল একটি প্রতীকী ব্যাপার। ধরে নেওয়া হয় যে, আদি অবস্থানে মানুষ স্বার্থবুদ্ধি ও যুক্তিবোধ সম্পন্ন হলেও অজ্ঞতার অবগুণ্ঠনের আড়ালে থাকায় তাদের দেশ-কাল-সমাজ সম্পর্কে কোনো সচেতনতা থাকে না। নিজেদের শক্তি, বুদ্ধি ও সামর্থ্য সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা থাকে না। সমাজে নির্দিষ্ট স্থান, শ্রেণীগত অবস্থান বা মর্যাদা সম্পর্কেও তাদের কোন জ্ঞান থাকে না।। তারা এও জানেনা যে কী ধরণের অবস্থা বা পরিস্থিতি থেকে সমাজে অসাম্য-বৈষম্য ও বিবাদ-বিসংবাদের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তাদের অর্থনীতি ও মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান আছে। তাছাড়া ন্যায় সম্পর্কে একটা বোধও তাদের আছে। তারা রাজনীতিক বিষয় সমূহ ও আর্থনীতিক নীতিগুলি বোঝে। তারা তাদের কল্যাণকে সর্বাধিক করতে চায়। এ ব্যাপারে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কোন রকম হিংসা দ্বেষ থাকে না।

রলসের 'অজ্ঞতার অবগুণ্ঠন' এর ধারণাটি ১৯৫৭-৫৮ সালে তাঁর ন্যায় সম্পর্কিত লেখার মধ্যে ছিল না। ১৯৭১ সালে লিখিত। 'এ থিয়োরী অব্ জাস্টিস্' এর মধ্যে এই ধারণাটিকে ব্যবহার করা হয়, যাতে বংশগত গুণ, উচ্চতর প্রতিভা, সামাজিক আকস্মিক ব্যাপার সমূহ নিজ সুবিধার্থে ন্যায়ের নীতিকে প্রভাবিত করতে না পারে। এই ধারণাটি কান্টের নৈতিক তত্ত্বের মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল। রলস্ এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বলেছেন যে 'আদি অবস্থান'-এ মানুষের জ্ঞানের ওপর কিছুটা সীমাবদ্ধতা আরোপ করা না থাকলে দরকষাকষির সমস্যা জটিল আকার ধারণ করবে। তখন কোন সুনির্দিষ্ট ন্যায়ের নীতি গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। তাই রলস্ এই ধারণা পোষণ করেছেন যে,

[২] John Rawls, *A Theory of Justic*, Ch. III, Sec. 24

'আদি অবস্থান' —এ ব্যাক্তিবর্গ 'অজ্ঞতার অবগুণ্ঠন'-এর আড়ালে ছিল। আদি অবস্থান-এ মানুষের সামাজিক অবস্থান এবং সহজাত গুণ সম্পর্কে জ্ঞানের ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করে রলস্ দেখাতে চেয়েছেন যে, বাস্তব জগতে যে-সব সহজাত বৈষম্য বন্টনমূলক ন্যায়ের পথে বাধার সৃষ্টি করে সেগুলি যেন ন্যায়ের জন্য চুক্তিকে বিকৃত না করতে পারে। যেহেতু ন্যায়ের জন্য চাই ন্যায্য পরিস্থিতিতে দর কষাকষি, তাই 'অজ্ঞতার অবগুণ্ঠন' এর ধারণার মাধ্যমে বৈষম্য সম্পর্কে জ্ঞানকে আড়াল করা হয়েছে।

৫.৪.৩ ঃ ন্যায্যতা হিসেবে ন্যায় (Justice as Fairness)

রলস্ 'আদি অবস্থান' ও 'অজ্ঞতার অবগুণ্ঠন' ধারণা দুটিকে নিয়ে এসেছেন যাতে ন্যায়ের একটি ন্যায্য পদ্ধতি দাঁড়া করানো যায়। এর মাধ্যমে ব্যক্তিবর্গ যে নীতিগুলি মেনে নিতে সম্মত হয় সেগুলিও হয় ন্যায় সঙ্গত। তাঁর মতে, ন্যায়ের জন্য চুক্তি — পদ্ধতি ব্যাপারে ঐকমত্য — হতে হবে ন্যায্য। অর্থাৎ স্বাধীন ব্যক্তিবর্গের সমতার নীতির ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে সম্পাদিত হতে হবে এই চুক্তি। রলসের কাছে ন্যায় হল ন্যায্য পদ্ধতির মাধ্যমে ন্যায্য বন্টন। অর্থাৎ ন্যায় হল ন্যায্যতা। এই ন্যায়ের ধারণা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রলস্ 'প্রতিফলনকারী ভারসাম্য'-র পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। ন্যায়সঙ্গত বন্টনের নীতি হল নৈতিক বিচার-বিবেচনার ফলশ্রুতি এই অর্থে যে, যুক্তিশীল চুক্তি কারকরা ব্যক্তিগত স্বার্থ, ইচ্ছা, ঝোঁক প্রভৃতির ঊর্ধ্বে উঠে এই নীতি ঠিক করে। রলস্ এক সহজ দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করেছেন। ধরা যাক্ কোন জন্মদিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের একটি কেক কে ভাগ করার জন্য কাটতে বলা হল। যদি তাদের না জানানো হয় যে, কোন অংশটি কে পাবে, তা হলে অবশ্যই কেকটিকে যতটা সম্ভব ন্যায্যভাবে কাটার প্রবণতা দেখা যাবে। রলস্ মনে করেছেন যে, যদি ব্যক্তিবর্গ কী পেতে যাচ্ছে তা না জানতে পারে, তাহলে প্রাথমিক সামাজিক বিষয়াদি বন্টনের যে নীতি তারা নির্বাচন করবে তা ন্যায্য হবে। এই ভাবে 'আদি অবস্থান'-এ 'অজ্ঞতার অবগুণ্ঠনের' আড়ালে যে ন্যায়ের নীতি গড়ে ওঠে তা ন্যায্য চুক্তির ফলশ্রুতি। তাই রলস্ একে 'ন্যায্যতা হিসেবে ন্যায়' বলে অভিহিত করেছেন। 'ন্যায়' এবং 'ন্যায্য' ধারণা দুটি একই অর্থে এখানে ব্যবহৃত হয়নি।

রলসের 'ন্যায্যতা হিসেবে ন্যায়' এর ধারণা অনুসারে সমাজের সকল মূল্যবোধ — স্বাধীনতা এবং সুযোগ, আয় এবং সম্পদ ও আত্মসম্মানের ভিত্তি — সমভাবে বন্টন হওয়া আবশ্যক। তবে ক্ষেত্রবিশেষে অসম বন্টন ও সমাজের সকলের সুবিধায় আসতে পারে। কিন্তু এই বন্টনের সময়ে দেখতে হবে যাতে সর্বাধিক দুর্বল ব্যক্তিটিও যথাযথভাবে লাভবান হতে পারে। তাই রলস ধারণা করেছেন যে 'অজ্ঞতার অগুণ্ঠনের' আড়ালে থাকায় প্রত্যেকে নিজেকে কল্পনা করতে চাইবে সবথেকে কম সুবিধাজনক অবস্থানে। এর ভিত্তিতে প্রাথমিক সামাজিক দ্রব্যাদি বন্টনের নীতি আলোচনা করার সময় প্রত্যেকে সবথেকে কম সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য সবথেকে বেশি সুবিধা দেওয়ার দাবি জানাবে।

রলস্ মনে করেন যে, যেহেতু ন্যায়ের নীতিগুলি বিভিন্ন 'ব্যাপক মতের' সমর্থনকারীদের কাছে গ্রহণ যোগ্য হতে হবে, তাই ন্যায্যতা হিসেবে ন্যায় হল একটি স্বনির্ভর ধারণা (free standing view)। এই ধারণা সমাজে বিদ্যমান ব্যাপক মতের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে না, প্রতিফলনকারী ভারসাম্যের পদ্ধতির মাধ্যমে নীতি ও অভিমতের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। এই পদ্ধতির সাহায্যে, বিভিন্ন যুক্তিসঙ্গত ব্যাপক মতের মধ্যে সেতু নির্মানের মাধ্যমে অধিক্রমনকারী ঐকমত্য (overlapping consensus) গড়ার চেষ্টা করা হয়। রলস্ একে 'জনসাধারণের যুক্তি' (public reason) বলেও অভিহিত করেছেন। রলসের ন্যায্যতা হিসেবে ন্যায় হল গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য এক রাজনীতিক ধারণা এবং এর উদ্দেশ্য হল বাস্তব, অধিবিদ্যক নয়।

রলস্ তাঁর ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতিতে দেখিয়েছেন যে যুক্তিশীল চুক্তিকারকরা একদিকে ন্যায় ভিত্তিক সমাজের 'সাধারণ কল্যাণ' সাধনের ইচ্ছা প্রকাশ করে, অপর দিকে তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার রক্ষার জন্য চেষ্টা করে। এর মাধ্যমে রলস্ লকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, রুশোর সাধারণ কল্যাণ এবং কান্টের নৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে মানুষের ধারণাগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। রলসের আলোচনায় রাজনীতিক আনুগত্যের উদারনীতিক ধারণার সঙ্গে পুনর্বণ্টনমূলক সামাজিক ন্যায়ের ধারণার সংমিশ্রণ করার চেষ্টা হয়েছে। রলস্ তাঁর মতবাদকে অবিমিশ্র পদ্ধতিগত ন্যায়ের তত্ত্ব হিসেবে উপস্থাপিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন।[১] পদ্ধতিগত ন্যায়ের অর্থ হল এই যে, ন্যায়ের কতকগুলি নীতি একবার সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হলে, সেগুলির প্রয়োগ সম্ভূত বন্টন অপরিহার্যভাবে ন্যায্য হবে। কিন্তু রলসের ন্যায় সংক্রান্ত ধারণাকে পুরোপুরি পদ্ধতিগত ন্যায়তত্ত্বের পর্যায়ভুক্ত বলে নরম্যান ব্যারি (Norman Barry) প্রমুখ লেখক গণ্য করতে চান না। রলসের ন্যায়তত্ত্বের মধ্যে পদ্ধতিগত ন্যায় এবং সামাজিক ন্যায় এর মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। তাঁর ন্যায়ের পরিকল্পনায় ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ই গুরুত্ব পেয়ে থাকে।[২] তবে রলসের পরিকল্পনায় কল্যাণের ধারণা থেকে ব্যক্তিবর্গের নিজেদের কল্যান-সম্পর্কিত ধারণা নির্ণয় করার স্বাধীনতাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

অনুশীলনী –১

◆ সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী ◆

১। রলস্ কীভাবে রাষ্ট্রতত্ত্বের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন ?

২। প্রতিফলনকারী ভারসাম্য বলতে কী বোঝ ?

৩। রলসের 'আদিবস্থান' কী ?

৪। রলস্ কেন 'অজ্ঞতার অবগুণ্ঠনের' ধারণা গ্রহণ করেছেন ?

৫। রলস্ 'ন্যায্যতা হিসেবে ন্যায়' বলতে কী বুঝেছেন।

◆ রচনাত্মক প্রশ্ন ◆

১। রলস্ কীভাবে 'ন্যায্যতা হিসেবে ন্যায়' এর ধারণা উপস্থাপিত করেছেন তা ব্যাখ্যা কর।

৫.৫ ঃ ন্যায়ের দ্বিবিধ নীতি

রলসের 'ন্যায্যাতা হিসেবে ন্যায়' অধিক্রমনকারী ঐকমত্যের নীতির মূল বিষয়কেই প্রতিভাত করে। তাঁর মতানুসারে সকল সামাজিক মূল্যদ্যোতক সামগ্রী — স্বাধীনতা এবং সুযোগ, আয় এবং সম্পদ ও আত্মসম্মানের ভিত্তি — সমভাবে বন্টন করা আবশ্যক। তবে তিনি মনে করেন যে, ক্ষেত্র বিশেষে অসম বন্টন সমর্থন যোগ্য।[৩] কিছু মানুষের বাড়তি প্রাপ্তির সুবাদে অতিরিক্ত উদ্যোগ আয়োজনের প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত সম্পদের সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ সম্ভব। এর ফলে সকলের লাভ হবে। কিন্তু রলসের মতে ন্যায়-সম্পর্কিত এই সাধারণ ধারণা খুব অস্পষ্ট। একে ন্যায়ের সম্পূর্ণ মতবাদ বলা যায় না। কারণ বিভিন্ন প্রাথমিক সুবিধা সমূহ যে সমস্ত নিয়ম-নীতি অনুসারে বন্টিত হয় তার মধ্যেই পারস্পরিক সংঘাত থাকতে পারে। যেমন, কিছু ব্যক্তির আয় বৃদ্ধি'র কারণে অন্যান্যদের স্বাধীনতার হানি ঘটতে পারে। অথবা অসম আয় প্রত্যেকের সুবিধা সৃষ্টি করলেও সুযোগ-সুবিধার অসাম্য সৃষ্টি করতে পারে, এবং তার ফলে অল্প আয়ের ব্যক্তিবর্গের অসুবিধা হতে পারে।

[১] John Rawls, *A Theory of Justic*, Ch. III, Sec. 24

[২] Asok Kr. Mukhopadhyay, John Rawls's Theory of Justic, in *Socialist Perspective,* p.22.

[৩] Rawls *A Theory of Justice,* 1971, Ch. II, Sec. 11, p.54

এই অস্পষ্টতা দূর করার জন্য রলস সমাধানের সূত্র হিসেবে ন্যায়ের দুটি নীতি এবং দুটি অগ্রাধিকারের নিয়ম উপস্থাপিত করেছেন।[১] রলসের ন্যায় সম্পর্কিত প্রথম নীতিটি হল সকলের জন্য সমান মৌল স্বাধীনতা সম্পর্কিত। তাঁর মতে প্রত্যেক ব্যক্তির সর্বাধিক প্রসারিত মৌল স্বাধীনতার ব্যাপারে সমানাধিকার থাকবে। মৌল স্বাধিনতার ব্যাপারে ব্যক্তি মানুষের এই অধিকার অন্যান্য সকলের অনুরূপ স্বাধীনতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া দরকার। প্রথম নীতিটি হল রলসের তত্ত্বের উদারনীতিক মতবাদের মর্মস্থল। নাগরিকদের মৌল স্বাধীনতা হিসেবে রলস্ কতকগুলি স্বাধীনতার কথা বলেছেন। এগুলি হল রাজনীতিক স্বাধীনতা — ভোটাধিকার ও সরকারী পদে নিযুক্তির অধিকার, মতপ্রকাশ ও সমবেত হওয়ার স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার, স্বৈরাচারমূলক গ্রেপ্তার ও আটকের হাত থেকে মুক্তির অধিকার অর্থাৎ আইনের অনুশাসন প্রভৃতি। রলসের মতে, ন্যায়কে বুঝতে হবে ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতার দিক থেকে এবং ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতাকে বুঝতে হবে সাধারণের কল্যাণের দিক থেকে। এক্ষেত্রে রলসের উপর রুশোর সাধারণ মঙ্গলের ধারনা ও কান্টের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সংমিশ্রিত প্রভাব লক্ষ করা যায়।

ন্যায় সম্পর্কিত তত্ত্বে রলসের দ্বিতীয় নীতিটি হল সকলের জন্য সুযোগ — সুবিধার ক্ষেত্রে ন্যায্য সাম্য সম্পর্কিত। এই দ্বিতীয় নীতির দুটি অংশ বর্তমান। প্রথম অংশটি পার্থক্যের নীতি (difference principle) হিসেবে পরিচিত। রলসের মতানুসারে সামাজিক ও আর্থনীতিক বৈষম্যগুলিকে এমন ভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যাতে তারা যুক্তিসঙ্গত ভাবে সকলের সুবিধায় আসে এবং বিশেষ করে সর্বাধিক কম সুবিধাপ্রাপ্তদের সর্বাধিক সুবিধায় আসে। এই নীতিটিকে 'সর্বাধিক নীতি' (maximin principle) বলা হয়। একে সংক্ষেপে ব্যবহার করার জন্য রলস 'ম্যাক্সিমিন' (maximin) শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। এই নীতিটির মূল কথা হল সর্বনিম্ন সুবিধাভোগীদের জন্য সর্বাধিক কল্যাণ। রলসের মতে, এই নীতিটি সবসময়ই ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করবে, কারন ন্যূনতম সুবিধা ভোগী গোষ্ঠীর স্বার্থে যে-কোন ছোটখাটো লাভের জন্য, সম্পন্ন গোষ্ঠীর ওপর যত বড় ক্ষতিই চাপানো হোক না কেন, তা হবে সবসময়ই ন্যায় সঙ্গত। রলসের মতে, ন্যায়ের এই নীতিগুলি উপলব্ধি করার জন্য আবশ্যক হল সমাজকে সহযোগিতার একটি ন্যায্য ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা।

রলসের ন্যায় সংক্রান্ত দ্বিতীয় নীতির দ্বিতীয় অংশের বক্তব্য অনুযায়ী, সামাজিক ও আর্থনীতিক বৈষম্য সমূহকে এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যাতে, সুযোগ-সুবিধার ন্যায্য সাম্যের অবস্থায়, তারা সকলের জন্য উন্মুক্ত বিভিন্ন পদ ও অবস্থানের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। অর্থাৎ অভিন্ন সামর্থ্য ও দক্ষতাযুক্ত ব্যক্তিবর্গের জীবনের সুযোগ-সুবিধা অভিন্ন হওয়া দরকার। ব্যক্তিমানুষ কীরকম আয় সম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন, তা বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত নয়। ন্যায় সম্পর্কিত দ্বিতীয় নীতিটি রলসের মতবাদের সমাজতান্ত্রিক প্রকৃতির মৌল বিষয়কে প্রতিভাত করে।

জন রলসের ন্যায় সম্পর্কিত দু'টি নীতির সঙ্গে অগ্রাধিকারের দু'টি বিধান সংযুক্ত। রলসের মতে, ন্যায়ের ধারণার প্রথম নীতিটি দ্বিতীয় নীতিটির তুলনায় অগ্রাধিকার লাভ করবে। অর্থাৎ স্বাধীনতার অধিকারের ধারণাটি সামাজিক ও আর্থনীতিক সম্পদের ন্যায্য বন্টনের ধারণা থেকে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। রলস মনে করেছেন যে, কেবল মাত্র স্বাধীনতার জন্যই স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। কোন নাগরিকের মৌল স্বাধীনতার বিনিময়ে সমানীকরনের নীতিকে বাতিল করে দিয়েছেন।

জন রলসের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, দ্বিতীয় অগ্রাধিকারের নীতি হল এই যে, সর্বাধিক করন বা 'ম্যাক্সিমিন' এর নীতির জন্য দক্ষ বন্টন অপেক্ষা সুযোগ-সুবিধার ন্যায্য সাম্য অগ্রাধিকার পাবে। অর্থাৎ সুযোগ সুবিধার ন্যায্য সাম্যের নীতি দক্ষ বন্টন ও কল্যানের নীতির এবং সুযোগ-সুবিধার সর্বাধিক করণের নীতির ঊর্ধ্বে স্থান পাবে। রলস্ অগ্রাধিকার বিধানকে পুরোপুরি সঠিক বলে মনে করেন না। তবে কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে এই বিধান আলোকপাত করতে সাহায্য করে।

---

[১] Asok Kr. Mukhopadhyay, in *Socialist Perspective,* p.25.

[২] Michacl H. Lessnoff, *Political Philosophies of the Twentieth Century,* 1999, Oxford : Basil, Blackwell, p.242

জন রলস্ তাঁর পলিটিক্যাল লিবার‍্যালিজ্‌ম' (Political Liberalism) ১৯৯৩, গ্রন্থে ন্যায়সংক্রান্ত নীতিগুলির ওপর সমালোচনার উত্তরে কিছু সংশোধন করেছেন। তাঁর সংশোধনমূলক ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে ন্যায় সম্পর্কিত বিশেষ ধারণা'কে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চারটি নীতির মাধ্যমে উপস্থাপিত করা যেতে পারে : [২]

১. প্রত্যেকের মৌল বস্তুগত প্রয়োজন মেটাতে হবে।
২. প্রত্যেক ব্যক্তির পুরোপুরিভাবে উপযুক্ত মৌল স্বাধীনতার পরিকল্পনায় সমানাধিকার থাকবে।
৩. ব্যক্তিবর্গের ঈপ্সিত সামাজিক অবস্থান অর্জনের সুযোগ-সুবিধাগুলি সামাজিক ব্যবস্থা কর্তৃক এমনভাবে বন্টন করতে হবে যাতে ন্যূনতম সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা লাভ হয়।
৪. আর্থনীতিক বৈষম্যকে এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যাতে দরিদ্রতম গোষ্ঠীর সম্পদ সর্বাধিক হয়।

রলসের বিশ্লেষণ অনুযায়ী চতুর্থ নীতিটি 'পার্থক্যের নীতি' বলে অভিহিত। তাঁর মতে, আর্থনীতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য অনিবার্য এবং কিছু শর্ত সাপেক্ষে ন্যায্য বৈষম্য গড়ে তোলা সম্ভব। যদিও রলস সুনির্দিষ্টভাবে বলেননি, কিন্তু তাঁর প্রথমে বর্ণিত ন্যায়তত্ত্বের প্রথম নীতির মধ্যে নিহিত রয়েছে যে, মৌল স্বাধীনতার আগে মৌল বস্তুগত প্রয়োজন মেটাতে হবে।

৫.৬ ঃ শাসনতান্ত্রিক কাঠামো

জন রলসের ন্যায় সংক্রান্ত ধারণা এক বিশেষ ধরণের সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গড়ে উঠতে পারে। মৌল স্বাধীনতার সমানাধিকারের নীতিটি উদারনীতিক গণতন্ত্রের রাজনীতিক ব্যবস্থাকে সূচিত করে। অন্যান্য নীতিগুলি যে সামাজিক আর্থনীতিক কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করে তার ভিত্তিতে বাজার অর্থনীতি ও জনকল্যানমূলক রাষ্ট্রের সংমিশ্রণের বিধান দেয়। প্রতিষ্ঠানের নীতিগুলি কীভাবে প্রয়োগ করা হবে সে সম্পর্কে রলস্ চারটি পর্যায়ের কথা বলেছেন। প্রথমত, একটি সাংবিধানিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, এই সম্মেলনে কার্যকরী এবং ন্যায্য সংবিধান নির্বাচন করতে হবে। তৃতীয়ত, আইনগত পর্যায়ে সংবিধানের বিষয়গুলি আইনে রূপান্তরিত করতে হবে, এবং চতুর্থ পর্যায়ে আইন ও বিধানগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। এই পর্যায়ে সকল ঘটনা ও তথ্য সম্পর্কে প্রত্যেকের জানার পূর্ণ অধিকার থাকবে। রলসের ন্যায়ের নীতিগুলি একটি কার্যকরী রাজনীতিক ধারণা গড়ে তোলে। যে মৌল কাঠামোর প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে ন্যায় সংক্রান্ত নীতিগুলি কার্যকর হতে পারে সেগুলি হল শাসনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠান।

রলসের ন্যায়তত্ত্ব কোন বিশেষ ধরনের রাষ্টতত্ত্ব উপস্থাপিত করে না ঠিকই; কিন্তু তাঁর ন্যায়তত্ত্ব সমতাবাদী নীতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা উদারনীতিক রাষ্ট্রকে সমর্থন করে। প্রত্যেকের প্রাথমিক প্রয়োজন মেটানো এবং পার্থক্যের নীতি কার্যকার করার জন্য সরকারী হস্তক্ষেপ ও সম্পদের পুনবর্ন্টন প্রয়োজন হয়। এদিক থেকে মনে হয়, যে জন রলস জনকল্যানকর রাষ্ট্রকেই পছন্দ করেছেন। এই রাষ্ট্রের কাজ কেবল আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা নয়, নূন্যতম সুবিধাভোগীদের প্রয়োজনের ওপর সর্বাধিক সামাজিক মূল্য আরোপ করার মাধ্যমে বন্টন মূলক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করা। তাঁর রাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণা হল যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তিবর্গের স্বেচ্ছামূলক সংগঠন, যার উদ্দেশ্য হল সাধারণের সামাজিক কল্যান সাধন করা। জন রলসের এই ধারনায় কান্টের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের চিন্তাধারার সাহায্যে লকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং রুশোর সাধারণ মঙ্গলের ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করার চেষ্টা হয়েছে। যেহেতু রলসের মতে রাষ্ট্রের কাজ হল সমাজের ন্যূনতম সুবিধাভোগীদের সাহায্য করা, তাই তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বকে উদারনীতির গণতান্ত্রিক সমাজবাদের তত্ত্ব বলা যেতে পারে। তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্ব হল মানবতাবাদের নৈতিক তত্ত্ব এবং ব্যক্তির ধারণা হল নৈতিক ব্যক্তিত্বের ধারণা, যার স্বাধীনতা এবং বস্তুগত সামগ্রী উভয়ই প্রয়োজন।

[২] Asok Kr. Mukhopadhyay, p.28.

জন রলসের উদারনীতিক গণতান্ত্রিক সমাজবাদী রাষ্ট্র সমতাবাদী সামাজিক নীতির উদ্দেশে পরিচালিত নয়। রলস ষ্টীমরোলার চালিত সাম্যের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না, সকলের জন্য সম স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। ন্যায্য সুযোগ সুবিধার সাম্যের মাধ্যমে সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন তিনি। তাঁর 'ন্যায্যতা হিসেবে ন্যায়ের' ধারণা হল শাসন তান্ত্রিক গণতন্ত্রের জন্য ন্যায়ের ধারণা।[১] তাঁর মতে, ন্যায় হল রাজনীতিক ও সামাজিক বাস্তব কাজ, আধিবিদ্যক সমস্যা নয়।

৫.৭ ঃ ঈর্ষার সমস্যা

জন রলস্ তাঁর ন্যায়তত্ত্বের সঙ্গে ঈর্ষাজনিত সমস্যার সম্পর্কও বিশ্লেষণ করেছেন।[১] রলসের মতে, ঈর্ষা সমস্যা সৃষ্টি করে, কারণ যারা কম সুবিধা পায় তারা দাবি করে যে তারা আরও বেশি পাওয়ার যোগ্য এবং তারা যা দাবি করে তা অপরের মৌল অধিকারের পরিপন্থী। এর ফলে ন্যায়ের নীতি ব্যাহত হতে পারে। তিনি মনে করেন যে, ঈর্ষা দেখা দেয় তখনই যখন ব্যক্তিবর্গ মনে করে যে অপরের তুলনায় তাদের অবস্থান খুবই নিম্ন এবং অন্যায্য বৈষম্যের ফলে তা ঘটেছে। কিন্তু রলসের আদর্শ সমাজে যেহেতু প্রত্যেকের মৌল অধিকার থাকে এবং ন্যায় সঙ্গত পার্থক্য মেনে চলা হয়, তাই ঈর্ষার সমস্যা প্রকট হতে পারে না।[২] রলসের মতে মানুষ ঈর্ষান্বিত হয় যখন সে তার আত্মমর্যাদা হারায়। ন্যায়-ভিত্তিক সমাজে সহজাত গুণের ভিত্তিতে বন্টন হয় না, পারস্পরিক ন্যায়ের ভিত্তিতে হয়। এর মধ্যে প্রত্যেকের মৌল অধিকারের প্রতি সম্মান দেখানো অন্তর্ভুক্ত থাকে। সুতরাং রলসের বন্টন মূলক নীতি ও মৌল অধিকারগুলি স্বীকার করে নিলে ব্যক্তিবর্গের আত্ম বিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা গড়ে উঠবে এবং এর ফলে ন্যায়ের নীতির মধ্যে তারা যা পাওয়ার যোগ্য, তার বেশী তারা চাইবে না।

৫.৮ ঃ রলসের উদারনীতিবাদ

রলস তাঁর ন্যায়তত্ত্বের মাধ্যমে এমন এক ধরণের রাজনীতিক উদারনীতিবাদকে সমর্থন করেছেন যা সহিষ্ণুতার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং যা উদারনীতিক তত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে যে-কোন ধরনের আধিবিদ্যক ধারণাকে বর্জন করে। জন রলস্ স্বাতন্ত্র্য এবং কান্ট, জে. এস. মিল, ইমারসন প্রমুখ চিন্তাবিদের নৈতিক মতবাদের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। কিন্তু তিনি উদারনীতিবাদকে এক সর্বব্যাপক নৈতিক মতবাদ রূপে গ্রহণ করেননি, কারণ তিনি পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যে মূল্য নির্দিষ্ট করেছেন ন্যায়ের রাজনীতিক ধারণার দ্বারা, সর্বব্যাপক নৈতিক মতবাদের দ্বারা নয়। রলসের 'ন্যায্যতা হিসেবে ন্যায়' এর ধারণা 'অধিক্রমনকারী ঐকমত্য' এর মূল বিষয়কে চিহ্নিত করে। এর দ্বারা রাজনীতিক উদারনীতিবাদকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। তিনি সঠিক নৈতিক আচরণকে নৈতিক মঙ্গল থেকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁর মতে আগে সঠিক নৈতিক আচরণ ঠিক করতে হবে এবং তার ভিত্তিতে নৈতিক মঙ্গল নির্ধারণ করতে হবে। রলস্ নৈতিক মঙ্গলের ধারণার যুক্তিসঙ্গত বহুত্ববাদকে গুরুত্ব দিয়েছেন। সূতরাং রাষ্ট্র কোন একটি মাত্র মঙ্গলের ধারনাকে অনুমোদন করতে পারে না। ব্যক্তিবর্গ ন্যায্য নীতির মাধ্যমে নিজেদের মঙ্গলের ধারনা অনুসরন করার স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে।

রলস্ স্বাধীনতা ও সাম্যকে উদারনীতিক রাজনীতিক ব্যবস্থার দুটি প্রাধান্য বিস্তারকারী নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এগুলিকে সর্বব্যাপক মতাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতে, স্বাধীনতা ও সাম্য হল দুটি 'স্বনির্ভর'

[১] Asok Kr. Mukhopadhyay, p.28.

[১] John Rawls A *Theory of Justice.* ch. IX, Sec. 80, 81

[২] Ibid. P. 471

মূল্যবোধ যা উদারনীতিক সমাজের রাজনীতিক সংস্কৃতির মধ্যে অন্তর্নিহিত। রলসের মতে এই মূল্যবোধগুলি উদারনীতিক সমাজের 'জনসাধারনের যুক্তি' (Public reason) র দ্বারা সমর্থিত। বিভিন্ন যুক্তিসঙ্গত ব্যাপক মতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে জনসাধারণের যুক্তি গঠিত হয়। এই জনসাধারনের যুক্তি উদারনীতিক রাষ্ট্রের সদস্যদের কাছে গ্রহন যোগ্য, কারণ অধিক্রমনকারী ঐকমত্যের মাধ্যমে তা গড়ে ওঠে। জনসাধারনের যুক্তি দ্বারা শাসিত উদারনীতিক রাষ্ট্র সহিষ্ণু হয় এবং নাগরিকদের পরস্পর বিরোধী নৈতিক মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। রলস্ আন্তর্জাতিক ন্যায়ের পক্ষেও যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন।

অনুশীলনী – ২

◆ সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ◆

১। রলসের ন্যায়তত্ত্ব কোন ধরনের সাংবিধানিক কাঠামো উপস্থাপিত করে ?

২। রলসের ন্যায়তত্ত্ব ঈর্ষার সমস্যার সমাধান কীভাবে হতে পারে ?

৩। রলসের ন্যায়তত্ত্বে বর্ণিত রাজনীতিক উদারনীতিবাদের প্রকৃতি কীরূপ ?

◆ রচনাত্মক প্রশ্ন ◆

১। রলস্ের ন্যায়সংক্রান্ত নীতিগুলি বিশ্লেষণ কর।

৫.৯ ঃ মূল্যায়ন

ন্যায় সম্পর্কিত রলসের তত্ত্ব বহু বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। উদারনীতিবাদী এবং উদারনীতিবাদী নন এমন চিন্তাবিদদের মধ্যে অনেকেই রলসের তত্ত্বের বিরূপ সমালোচনা করে বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করেছেন। প্রথমত, রলসের ন্যায়তত্ত্বের মধ্যে অনেক অসংগতি আছে বলে অনেকে মনে করেন। যদিও তাঁর ন্যায়তত্ত্ব চুক্তিবাদী বলে অভিহিত, কিন্তু মূল অবস্থানে যে অজ্ঞতার অবগুণ্ঠনের কথা তিনি বলেছেন তাতে দেখা যায় যে, প্রত্যেকে সমরূপ অবস্থানে ছিল। সুতরাং তাদের মধ্যে দর কষাকষি করার কোন ভিত্তি ছিল না। এর ফলে চুক্তি করে ন্যায়ের নীতি নির্ধারণ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। ন্যায়ের নীতিগুলি যদি চুক্তির ফলে না গড়ে ওঠে, তাহলে রলসের তত্ত্বকে চুক্তিবাদী বলার কোন যুক্তি নেই।

দ্বিতীয়ত, রলস তাঁর পার্থক্যের নীতি বা সর্বাধিক নীতির সমর্থনে যে-সব যুক্তির অবতারণা করেছেন, সেগুলি বিভ্রান্তি মূলক। রলসের মতে, মূল অবস্থানে সর্বাধিক নীতি যুক্তিযুক্ত, কারণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত কে কত পাবে সে ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তিই খুব কম মাথা ঘামাত। কিন্তু এই যুক্তি রলসের আগের যুক্তির বিরোধী, কারণ তিনি বলেছিলেন যে, দর কষাকষির প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক ব্যক্তিই যত বেশি সম্ভব প্রাথমিক সামাজিক দ্রব্যাদি পেতে চায়। মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিদের পক্ষে দর কষাকষি করা সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত, সমষ্টিবাদীরা মনে করেন যে, রলস্ তাঁর মতবাদের মাধ্যমে পুঁজিবাদকে সমর্থন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, যদি ধনীদের সম্পদ বৃদ্ধি করার স্বাধীনতা থাকে, তাহলে দরিদ্ররা স্বাভাবিক ভাবে উপকৃত হবে। কিন্তু রলসের সুযোগের সাম্য নীতি গ্রহণ করা হলেও ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য প্রকৃত পক্ষে কমবে না। সবথেকে কম সুবিধাপ্রাপ্তদের সামান্য উন্নতি ঘটিয়ে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া সব থেকে কম সুবিধাপ্রাপ্ত গোষ্ঠীদের চিহ্নিত করা খুবই কঠিন।

চতুর্থত, মার্কসবাদীরা সমালোচনা করে বলেছেন যে, মূল অবস্থানে অজ্ঞতার অবগুণ্ঠনের আড়ালে থেকে ব্যক্তিবর্গের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যে ন্যায়ের নীতি গড়ে তোলার কথা রলস্ বলেছেন তা অর্থহীন। বিদ্যমান সামাজিক ও অর্থনীতিক অবস্থার জ্ঞান ছাড়া কোন আলাপ-আলোচনা অযৌক্তিক। তাই মার্কসবাদীরা মনে করেন যে, যে-কোন নৈতিক ব্যবস্থাকে সব সময়ই শ্রেণী সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানার ধরনের আলোকে বিশ্লেষণ করা উচিত।

পঞ্চমত, ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্যবাদীরা মনে করেন যে, রলস্ সাম্যের স্বার্থে স্বাধীনতাকে বলি দিয়েছেন। রবার্ট নজিক (Robert Nozick) লকের ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রলসকে সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, রলসের ন্যায়তত্ত্ব ব্যক্তিকে লক্ষ্য হিসেবে দেখতে ব্যর্থ হয়েছে। ব্যক্তিবর্গের যা আছে তাই দিয়ে তাদের কী করা উচিত সে ব্যাপারে বিবেচনা করার জন্য তাদের স্বাধীনতা থাকা দরকার। নজিক মনে করেন যে ব্যক্তিবর্গকে তাদের প্রতিভা ও গুণ সমষ্টিগত স্বার্থে নিয়োগ করতে বাধ্য করা যেতে পারে না। নজিক ন্যূনতম রাষ্ট্র এবং সৃষ্টিশীল ব্যক্তির সমর্থক ছিলেন।

ষষ্ঠত, কৌমবাদীরা (Communitarians) উল্লেখ করেছেন যে, রলসের ন্যায়তত্ত্ব 'দায়মুক্ত ব্যক্তি'র ওপর গুরুত্ব আরোপ করে মানবসমাজের আত্মা সম্পর্কিত ধারণার বিরোধীরূপে দেখা দিয়েছে। ব্যক্তির সঙ্গে সম্প্রদায়গত আচরণের সম্পর্ককে এতে অস্বীকার করা হয়েছে। ম্যাকইন্টায়ার, স্যান্ডেল প্রমুখ কৌমবাদী রলসের শূন্যগর্ভ ব্যক্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ এবং সম্প্রদায়কে অবহেলার বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে, সম্প্রদায়ই ব্যক্তির পরিচিতি, প্রতিভা এবং জীবনের দিকগুলি গঠন করে। সুতরাং বন্টনমূলক ন্যায় ও রাজনৈতিক সমাজের বিচার্য বিষয় হল সম্প্রদায়ের পক্ষে কোনটি ভাল, বিশেষ ব্যক্তির কোনটি পাওয়া উচিত তা নয়।

সপ্তমত, নারীবাদীরাও রলসের ন্যায়তত্ত্বকে আক্রমন করেছেন। তাঁরা রলসের উদারনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে নারীদের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী বলে মনে করেছেন। প্রাধান্য বিস্তারকারী সামাজিক ও রাজনীতিক ব্যবস্থায় নারীদের ওপর পুরুষদের আধিপত্য সমাজকে বিকৃত করে। তাই যে-কোন ন্যায়তত্ত্ব তখনই গ্রহণ যোগ্য হতে পারে যখন তা এই ধরনের শোষনের বিরোধিতা করে।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্ত বলেছেন যে, রলসের সর্বাধিক নীতিকে অনেকে ধনীর ধন বৃদ্ধির সমর্থনে ব্যবহার করতে পারেন এই বলে যে, এর দ্বারা ধনীরা দরিদ্রতমদের জন্য কিছু ব্যয় করতে পারে। কিন্তু সবথেকে কম সুবিধাপ্রাপ্তদের কিছু পাইয়ে দেওয়ার অর্থ বৈষম্য কমানো নয়। রলস্ উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, আয় পুর্নবন্টনের ফলে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান কিছুটা কমতে পারে ঠিকই, কিন্তু এতে উভয় গোষ্ঠীই একই সঙ্গে লাভবান হতে পারে।[১] অর্মত্য সেন বলেছেন যে, সমাজে যদি রোগ, স্বাস্থ্যহানি, অসামর্থ্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক সমস্যা এবং নিরক্ষরতা, পরিবেশগত অবক্ষয়, লিঙ্গ বৈষম্য প্রভৃতি সামাজিক সমস্যা থাকে, তাহলে জনকল্যানমূলক নীতি কার্যকর করা অসম্ভব। রলসের তত্ত্বে এই দিকের ওপর কোন আলোকপাত করা হয়নি।

পরিশেষে মার্কসবাদী সমালোচকগণ মনে করেন যে, রলসের মতবাদে এমন কিছু শর্ত আছে যা পুঁজিবাদের সহায়ক। তাঁর 'পার্থক্যের নীতি' বাজার অর্থনীতিরই ভিন্নরূপ। রলস তার তত্বে স্বাধীনতার নীতিকেই অধিকতর সমর্থন করেছেন। এ কথা ঠিক যে, সাম্য সম্পর্কেও রলসের উচ্চশাযুক্ত বক্তব্য আছে ; কিন্তু স্বাধীনতার প্রতি তাঁর অধিক আগ্রহ অপ্রকাশিত থাকেনি। রলসের তত্ত্বে স্বাধীনতাই হল প্রথম, বাকি সব তার অনুগামী। মোটা ও সরুনীতি (Thick and thin principle) র ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে রলসের মতবাদে স্বাধীনতাকে করা হয়েছে 'মোটা' এবং সাম্য হয়ে পড়েছে 'সরু'।

[১] Asok Kr. Mukhopadhyay, p.33

উপস্থাপিত করেছেন তিনি। তাঁর তত্ত্বের মাধ্যমে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে নতুন এক মানবিক চেহারা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর ন্যায় তত্ত্ব উদারনীতিবাদকে এক সুদৃঢ় ভিত্তি প্রদান করেছে। নৈতিক গভীরতার অভাব পূরণ করে উদারনীতিবাদের মধ্যে নতুন উৎসাহ ও জীবনিশক্তি সঞ্চারিত করেছেন তিনি।

বস্তুত, জন রলস্ ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্যবাদ, সমতাবাদ ও কৌমবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে তাঁর ন্যায়তত্ত্ব গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তাঁকে ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্যবাদী বলা যেতে পারে, কারণ তিনি বলেছেন যে, মূল অবস্থানে ব্যক্তিবর্গ আত্ম-স্বার্থ সর্বাধিক করতে চায়। তাঁর ন্যায়ের প্রথম নীতিতে স্বাধীনতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। অন্যাদিকে তিনি সমতাবাদী ছিলেন এই অর্থে যে, তাঁর ন্যায়তত্ত্বে সকলের 'সমান' স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি গণতান্ত্রিক সমাজবাদের সমতাবাদকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এদিক থেকে তাঁকে 'নয়া সমতাবাদ'-এর প্রবক্তাও বলা যেতে পারে। আবার রলস যখন বলেছেন যে সমাজের দুর্বলতম অংশকে শক্তিশালী করেই সমাজকে শক্তিশালী করা যায়, তখন তাঁকে কৌমবাদীও বলা যেতে পারে। বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে 'শৃঙ্খল-সংযোগ' (chain connection) এর ধারণা রলসকে কৌমবাদীদের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। রলস্ 'সামাজিক ন্যায়'-এর স্বার্থে 'পদ্ধতিগত ন্যায়' কে উপায় হিসেবে ব্যবহার করেছেন।[১]

৫.১০ ঃ সারসংক্ষেপ

ন্যায়তত্ত্বের বিকাশে রলসের মতবাদের বিরাট অবদানের কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নেওয়া যায়। রলস্ ন্যায়কে সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রথম গুণ হিসেবে দেখেছেন। ভাল সমাজব্যবস্থার মৌল কাঠামোর মধ্যে তিনি ন্যায়ের ধারণা প্রয়োগ করেছেন। তাঁর মতবাদ বিশ্লেষণ করলে কতকগুলি বিষয় স্পষ্টত প্রতিপন্ন হয়। **এক**, রলসের মত অনুযায়ী ন্যায় বলতে ন্যায্যতাকে বোঝায়। **দুই**, সাম্যের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ তাঁর তত্ত্বকে 'হকদারিত্বের তত্ত্ব' থেকে পৃথক করে তুলেছে। **তিন**, সাম্যের নীতি থেকে সরে যাওয়ার পিছনে যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকা প্রয়োজন। **চার**, ন্যায়ের নীতি অনুযায়ী সকল প্রাথমিক দ্রব্যসামগ্রী সমানভাবে বন্টন করতে হবে, যদিনা এই সমস্ত দ্রব্যসামগ্রীর অসম বন্টনে সর্বনিম্ন সুবিধাভোগীর সুবিধা লাভ হয়। বিদ্যমান অসাম্যের কাঠামোর মধ্যে সর্বনিম্ন সুবিধাভোগীর সর্বাধিক লাভের মধ্যেই ন্যায় বর্তমান। **পাঁচ**, স্বাধীনতা ও সাম্যের উপলব্ধির উদ্দেশ্যে উপযুক্ত নীতি নির্ধারণই হল ন্যায়ের উদ্দেশ্য। **ছয়**, স্বাধীনতা ও সাম্যের সহায়ক যথাযথ নীতিসমূহের সৃষ্টি হয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে চুক্তি ভিত্তিতে। পারস্পরিক সুবিধার প্রেক্ষিতে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। **সাত**, রলসের ন্যায়তত্ত্বে এক বিশেষ ধরনের সমাজের কথা বলা হয়েছে। এই সমাজে স্বাধীন ও সমান ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সহযোগিতার ন্যায্য ব্যবস্থা বর্তমান থাকে। **আট**, তাঁর তত্ত্বে মানুষ ও সমাজ কীরকম হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে তিনি এক নৈতিক তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন।

বস্তুত, রলসের ন্যায়তত্ত্বে দু'টি প্রধান অংশ রয়েছে ঃ এক, যে অবস্থার মধ্যে যুক্তিবাদী চুক্তিকারকরা বিচার — বিবেচনা করেন তার বর্ণনা; দুই, তাঁরা যে সব নীতি নির্ধারণ করতে চলেছেন সেগুলির বিষয়বস্তু। রলস্ প্রতিফলনকারী ভারসাম্যের পদ্ধতির মাধ্যমে 'অধিক্রমণকারী ঐকমত্য' এর ধারণা গড়ে তুলেছেন। এই অধিক্রমণকারী ঐকমত্য হ'ল বিভিন্ন যুক্তিসঙ্গত ব্যাপক মত এর মধ্যে সমন্বয় সাধন। সাম্প্রতিককালে সাযুজ্যের রাজনীতির প্রেক্ষিতে এবং ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় পুনরুত্থানের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে রলসের 'অধিক্রমণকারী ঐকমত্য' — এর ধারণা কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। ভারতের মতো বহুত্ববাদী দেশে রলসের এই ধারণা বিশেষ প্রাসঙ্গিক। রলসের ন্যায়তত্ত্বের 'পার্থক্য নীতি' জনকল্যাণকর ধারণাকেই তাত্ত্বিক বৈধতা দান করে। সাম্প্রতিককালে বিশ্বায়নের যুগে খোলাবাজারী অনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে যেভাবে অর্থনীতিক ও সামাজিক সংকট সৃষ্টি করেছে, তাতে রলসের

[১] O.P. Gauba, *Introduction to political theory*, p 385

জনকল্যাণকর উদারনীতিবাদী তত্ত্ব অধিকতর কাম্য বলে বিবেচিত হতে পারে। একথা ঠিক যে, তাঁর ন্যায়তত্ত্বের মাধ্যমে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার তাত্ত্বিক যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু আমাদের মানতেই হয় যে, তিনি কতকগুলি বিশেষ শর্ত সাপেক্ষেই বিদ্যমান ব্যবস্থাকে মানতে প্রস্তুত। এই শর্তগুলি মেনে নিলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যে এক মানবিক রূপ ধারণ করবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

অনুশীলনী – ৩

◆ সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ◆

১। রলসের ন্যায়তত্ত্বের মূল বক্তব্য কী ?

২। রলসের ন্যায়তত্ত্বের বিরুদ্ধে উদারনীতিবাদী সমালোচকগণ কী বলেছেন ?

৩। রলসের ন্যায়তত্ত্ব সম্পর্কে মার্কসবাদী সমালোচকগণ কী মন্তব্য করেন ?

৪। রলসের ন্যায়তত্ত্বের গুরুত্ব কী ?

◆ রচনাত্মক প্রশ্ন ◆

১। রলস্‌ের ন্যায়সংক্রান্ত তত্ত্ব মূল্যায়ণ কর।

৫.১১ ঃ প্রধান শব্দগুচ্ছ

আদি অবস্থান (Original Position) ঃ চুক্তি পূর্ব প্রাকৃতিক অবস্থাকে রলস্ 'আদি অবস্থান' বলে অভিহিত করেছেন। সামাজিক চুক্তি মতবাদে যে 'প্রাকৃতিক অবস্থা'র কল্পনা করা হয়েছে তারই এক মার্জিত রূপ হল 'আদি অবস্থান'।

অজ্ঞতার অবগুণ্ঠণ (Veil of Ingorance) ঃ 'আদি অবস্থান' এর আলোচনার সূত্রেই রলস্ 'অজ্ঞতার অবগুণ্ঠন'এর ধারণাটি ব্যবহার করেছেন। তিনি ধরে নিয়েছেন যে, 'আদি অবস্থান'-এ মানুষ এক 'অজ্ঞতার অবগুণ্ঠন'এর আড়ালে ছিল। ন্যায়ের নীতিগুলি বেছে নেওয়া হয় এই 'অজ্ঞতার অবগুণ্ঠন'-এর আড়ালে।

ন্যায্যতা হিসেবে ন্যায় (Justice as Fairness) ঃ 'ন্যায়' এবং 'ন্যায্য' ধারণা দু'টি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। রলসের মতে, ন্যায়ের জন্য চুক্তি হতে হবে ন্যায্য। ন্যায় হতে হবে ন্যায্য পদ্ধতির মাধ্যমে ন্যায্য বন্টন।

প্রতিফলনকারী ভারসাম্য (Reflective Equilibrium) ঃ আদি অবস্থান'-এ 'ন্যায্যতা হিসেবে ন্যায়' গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রলস প্রতিফলনকারী ভারসাম্যের পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। এই পদ্ধতির সাহায্যে নৈতিক বিশ্বাস ও তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপাড়ার মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করা হয়।

অধিক্রমনকারী ঐকমত্য (Overlapping Consensus) ঃ রলসের রাজনীতিক উদারনীতিবাদের ধারণা অধিক্রমণকারী ঐকমত্যের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই নীতির মাধ্যমে বিভিন্ন যুক্তিসঙ্গত ব্যাপক মতের মধ্যে সংযোগ সাধন করা হয়।

জনসাধারণের যুক্তি (Public Reason) ঃ অধিক্রমনকারী ঐকমত্যের মাধ্যমে 'জনগণের যুক্তি' গড়ে ওঠে। এই 'জনসাধারণের যুক্তি' সমাজের সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য। এতে সকলের মঙ্গল নিহিত। এর দ্বারা শাসিত উদারনীতিক রাষ্ট্র সহিষ্ণু হয় এবং নাগরিকদের পরস্পর বিরোধী নৈতিক মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।

আন্তর্জাতিক ন্যায় (International Justice) ঃ ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত 'দ্য ল অব্ পিপলস্' (The law of Peoples) গ্রন্থে রলস্ আন্তর্জাতিক ন্যায়ের বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে ন্যায় অবলম্বনকারী জাতিগুলি আইনের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত রাষ্ট্রগুলির নির্যাতিত মানুষের রক্ষনার্থে এগিয়ে আসতে পারে। সকল জাতির উচিত শক্তিহীন জাতিগুলিকে সাহায্য করা, যাতে ঐ জাতিগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

'ম্যাক্সিমিন' (Maximin) ঃ ম্যাক্সিমিন হল 'সর্বাধিক নীতি'র সংক্ষিপ্ত রূপ। এর মূল কথা হল সর্বনিম্ন সুবিধাভোগীদের জন্য সর্বাধিক কল্যাণ। একে 'পার্থক্যের নীতি'-ও বলা হয়।

৫.১২ ঃ অনুশীলনী পরখ করার উত্তর মালা

অনুশীলনী-১

সংক্ষিপ্ত উত্তর ঃ

১। ৩.১ ও ৩.২ অংশ দেখুন।
২। ৩.৩ অংশ দেখুন।
৩। ৩.৪.১ অংশ দেখুন।
৪। ৩.৪.২ অংশ দেখুন।
৫। ৩.৪.৩ অংশ দেখুন।

রচনাত্মক উত্তর ঃ

১। ৩.১ ও ৩.৪.৩ অংশ দেখুন।

অনুশীলনী-২

সংক্ষিপ্ত উত্তর ঃ

১। ৩.৬ অংশ দেখুন।
২। ৩.৭ অংশ দেখুন।
৩. ৩.৮ অংশ দেখুন।

রচনাত্মক উত্তর ঃ

১। ৩.৫ অংশ দেখুন।

অনুশীলনী-৩

সংক্ষিপ্ত উত্তর ঃ

১। ৩.১০ অংশ দেখুন।
২। ৩.৯ অংশ থেকে উত্তর করতে হবে।
৩। ৩.৯ অংশ থেকে উত্তর করতে হবে।
৪। ৩.৯ ও ৩.১০ অংশ থেকে উত্তর করতে হবে।

রচনাত্মক উত্তর ঃ

১। ৩.১, ৩.১০ ও ৩.৯ অংশ দেখুন।

৫.১৩ ঃ নমুনা প্রশ্নাবলী

Short Answer-Type Questions :

1. What, according to John Rawls, is meant by 'Original Position' ?
2. Write a short note on 'Veil of Ignorance'.
3. What is meant by the concept "Justice as fairness" as propounded by John Rawls ?
4. Write a note on Rawls's 'maximin principle'.
5. Why did John Rawls adopt the contractual method in propounding the theory of justice ?
6. What is Rawls's view on primary goods ?

Essay-Type Questions :

1. Discuss John Rawls's principles of Justice.
2. Critically examine Rawls's theory of Justice.
3. Discuss, after John Rawls, the type of basic structure needed to simplify the application of the principles of justice.

৫.১৪ ঃ গ্রন্থ-নির্দেশিকা

1. Rawls, John, *A Theory of Justice,* 1999, Oxford University Press, Revised edition, U.K.
2. Smith, G.W. (ed.), *Liberalism : Critical concepts in Political Theory*, vol.III, 2002 Routledge, London.
3. Lessnoff, Michacl H., *Political Philosophies of the Twentieth-Century*, 1999, Oxford : Basil Blackwell.
4. Mukhopadhyay, Asok Kumar, 'John Rawls's Theory of Justice', in *Socialist Perspective*, vol. 31, No.1-2, June-September, 2003.
5. Gauba, O.P., *An Introduction to Political Theory*, 2003 Macmillan, Delhi.
6. Ramaswamy, Sushila, *Political Theory : Ideas and Concepts,* 2003, Macmillan, Delhi.

Secend Paper

দ্বিতীয় পত্র

Secend Half

দ্বিতীয়ার্ধ

Second Half : Marxist

পাঠ - ১

রাষ্ট্র সংক্রান্ত মার্কসীয় তত্ত্ব
(Marxian Theory of the State)

মার্কসীয় রাজনৈতিক আলোচনায় রাষ্ট্রের মত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানই এত গুরুত্ব অর্জন করতে পারেনি। রালফ মিলিব্যান্ড (Ralph Miliband) মনে করেন, মার্কসীয় রাজনীতিতে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানই এত গুরুত্বপূর্ণ নয় কারণ মার্কসবাদ বিশ্বাস করে রাষ্ট্রের সাহায্যেই সমাজের আধিপত্যকারী শ্রেণী শোষণ ও তার আধিপত্য বজায় রাখে।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের উপর ভিত্তি করেই মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব গড়ে উঠেছে। এই কারণে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্র সম্পর্কে আমরা যে ধারণা পাই, মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্বটি ঠিক সেইরকম নয়। কোন কোন পাশ্চাত্য তাত্ত্বিক যেমন সেন্ট থমাস এক্যুইনাস (St. Thomas Aquinas) দেখাতে চেয়েছেন রাষ্ট্র হল ঈশ্বরের সৃষ্টি। আবার হবস্, লক, রুশো প্রমাণ করতে চেয়েছেন রাষ্ট্র সমাজের সমষ্টিগত ইচ্ছার ফলশ্রুতি এর মাধ্যমেই সমাজের সামগ্রিক কল্যান হবে। কিন্তু মার্কসীয় তত্ত্বানুযায়ী রাষ্ট্র কোন ঐশ্বরিক ইচ্ছার ফলশ্রুতিতে গঠিত হয়নি এমনকি সমাজের সামগ্রিক স্বার্থেও প্রতিষ্ঠিত নয়।

রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় তত্ত্ব আলোচনার পূর্বে প্রথমেই একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মার্কস বা এঙ্গেলস্ কোন নির্দিষ্ট গ্রন্থে এসম্পর্কে সুগঠিত আলোচনা করেননি। তাঁরা, বিভিন্ন রচনায় বিচ্ছিন্নভাবে রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মার্কস এঙ্গেলসের যুগ্ম রচনা *The Communist Manifesto* (1848) ও এঙ্গেলস্‌ের *The Origin of the Family, Private Property and the State* (1884) এ সম্পর্কে বেশ কিছু আলোচনা পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে লেনিন *The State and Revolution* (1917) এবং সভ্‌দেরদ্‌লাভ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণ *The State* (1919) এ রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় ব্যাখ্যার ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করেন।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদী তত্ত্বানুযায়ী, রাষ্ট্রের উদ্ভব সমাজের শ্রেণীর উদ্ভবের সাথে ওতপ্রতভাবে জড়িত। মার্কসীয় চিন্তাধারা অনুযায়ী ইতিহাসে এমন একটা সময় ছিল যখন রাষ্ট্র বলে কিছু ছিল না, ছিল না শ্রেণী নামক ধারণাটি। ইতিহাসের এই অধ্যায়টির নাম আদিম সাম্যবাদী সমাজ। এই সমাজে উৎপাদিকা শক্তির মান ছিল নিম্ন ফলে সমাজে মানুষের ন্যুনতম প্রয়োজনটুকু মেটানো সম্ভব হত এ যুগের উৎপাদন ব্যবস্থার দ্বারা—উদ্বৃত্ত উৎপাদনের কোন প্রশ্নই ছিল না। এর পর আস্তে আস্তে দেখা গেল উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ লাভ হয়েছে, মানুষ সামাজিক প্রয়োজনে উদ্বৃত্ত সম্পদ তৈরী করতে পারছে। উদ্বৃত্ত সম্পদ সৃষ্টির ফলে জন্ম নিল সেই সম্পদ করায়ত্ত করে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠার প্রবণতা। আদিম সাম্যবাদী সমাজে যারা মোটামুটি নেতৃস্থানীয় বলে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন তারাই চাইলেন উদ্বৃত্ত সম্পদ আত্মসাৎ করতে এবং এইজন্য তারা উৎপাদন উপকরণের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হলেন। দেখা গেল এই সময় সমাজ দুটি গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠীতে ভাগ হয়েছে ব্যক্তিগত সম্পদকে কেন্দ্র করে—একটি গোষ্ঠীর হাতে উৎপাদন উপকরণ রয়েছে এবং তারা উদ্বৃত্ত উৎপাদন আত্মসাৎ করছে, আর এক দলের হাতে সে সুযোগ নেই। অর্থাৎ উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের ফলশ্রুতিতেই আদিম সাম্যবাদী সমাজের সংহতি বিনষ্ট হয় এবং দুটি শ্রেণীতে সমাজ বিভক্ত হয় যাদের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী। এই অবস্থায়, আদিম সাম্যবাদী সমাজে যে সামগ্রিক ঐক্য ছিল তাকে বজায় রাখতে প্রয়োজন হল বলপ্রয়োগের। আর রাষ্ট্র হল এই বলপ্রয়োগের হাতিয়ার। অর্থাৎ সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যাতে সংখ্যালঘু উদ্বৃত্ত উৎপাদন আত্মসাৎ কারীদের স্বার্থে পরিচালিত হয় ও আরও

বেশী উৎপাদন করে উদ্বৃত্ত উৎপাদনের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করে তার জন্য প্রয়োজন হল ভীতি প্রদর্শন, উৎপীড়ন ও বলপ্রয়োগের আর দমন পীড়নের যন্ত্র হিসাবে গড়ে তোলা হল রাষ্ট্র নামক ধারনাটিকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সমাজে শ্রেণী বিভাজনের ফলশ্রুতিতেই রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে এবং এরা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

রাষ্ট্রকে শোষক শ্রেণী এমনভাবে গড়ে তুলেছিল যার ফলে সে হয়ে উঠল এমন একটি রাজনৈতিক সংগঠন যার প্রাধিকার (authority) সমাজ জীবনের অন্যান্য সংগঠন থেকে পৃথক। রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে অবস্থিত সকল নাগরিকের উপরই এই কর্তৃত্ব প্রযোজ্য। রাষ্ট্রীয় প্রাধিকারকে কার্যকর করবার জন্য তিনটি ব্যবস্থা নেওয়া হয়। প্রথমতঃ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য সাহায্য নেওয়া হয় এক বিশেষ ধরনের ব্যক্তিদের যাদের হাতে যাকে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিচালনার দায়িত্ব, এদের সরকার নামে অভিহিত করা হয়। দ্বিতীয়তঃ সরকার রাষ্ট্র যন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে বিভিন্নভাবে করের আকারে অর্থ আদায় করে। তৃতীয়তঃ সরকার দমনমূলক ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রেখে শাসক শ্রেণীর স্বার্থকে সুরক্ষিত করে।

রাষ্ট্রের দমনমূলক যন্ত্রটির একটু বিস্তারিত উল্লেখ জরুরী। প্রতিটি রাষ্ট্রেরই রয়েছে বেশ কিছু আপাত নিরীহ বৈশিষ্ট্য, যেমন সকল রাষ্ট্রেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য থাকে পুলিশবাহিনী, বিভিন্ন সরকারী নির্দেশ কার্যকর করবার জন্য থাকে আমলাতন্ত্র, এছাড়াও থাকে সামরিক বাহিনী, গোয়েন্দা বিভাগ প্রমুখ। যদিও একথা প্রচার করা হয়ে থাকে যে এরা সামগ্রিক কল্যানে নিয়োজিত তথাপি এদের কার্যকলাপ যদি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয় তাহলে দেখা যাবে এরা সকলেই শোষক শ্রেণীর স্বার্থেই নিয়োজিত রয়েছে। পুলিস শোষক শ্রেণীর যারা বিরোধিতা করছে তাদের শায়েস্তা করছে, আমলারা শোষক শ্রেণীর সুবিধা অনুযায়ী প্রণীত নিয়ম কার্যকর করছে। গোয়েন্দারা শোষক শ্রেণীর উপর গোয়েন্দাগিরি করছে। শোষক শ্রেণীর শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হলে সেনাবাহিনী তা দমন করে। বস্তুতপক্ষে, শোষক শ্রেণী এদের ভয় দেখিয়েই শোষিত শ্রেণীকে আরও শোষিত হতে বাধ্য করছে এবং তারা শোষিত সম্পদ আত্মসাৎ করে আরও স্ফীত হচ্ছে। রাষ্ট্র যে শোষক শ্রেণীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকে তার আরও প্রমান পাওয়া যায় শোষক শ্রেণীর নিরাপত্তা কোন কারনে বিঘ্নিত হলে, সেই সময় তার দমনমূলক চেহারাটা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই কারনেই মনে করা হয় রাষ্ট্র হল শ্রেণী শাসন ও শোষণের একটি হাতিয়ার এবং রাষ্ট্রের আবির্ভাব ও পরিচালন সমাজের সামগ্রিক স্বার্থে নয় মুষ্টিমেয় শ্রেণী স্বার্থে। দাসযুগ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্র পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই এই মূল্যায়ন সত্য। তাই আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রে সরকারের আলোচনা প্রসঙ্গে মার্কস বলেছেন "the executive of the modern state is nothing but a committee for managing the common affairs of the whole bourgeoisie."

মার্কস রাষ্ট্র সংক্রান্ত উপরোক্ত যে মডেলটি পেশ করেছেন সেখানে দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্রের কোন স্বাধিকার নেই, রাষ্ট্র যান্ত্রিকভাবে সমাজের প্রাধান্যকারী শ্রেণীর আজ্ঞাবহ ও 'অনুগত ভৃত্য' হিসাবে কাজ করছে। কিন্তু মিলিব্যান্ড (Miliband) *Marxism and Politics* (1977) গ্রন্থে যথার্থভাবেই বলেছেন, মার্কসীয় রাষ্ট্রকে একতরফা ভাবে দেখা উচিত নয়, রাষ্ট্রে আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সমর্থ। মার্কসের উপরোক্ত উক্তিটির একটি অংশ 'the common affairs of the whole bourgeoisie' পর্যালোচনা করে তিনি দেখাতে চেয়েছেন বুর্জোয়া সমাজ নিশ্চয়ই কতকগুলি সম্ভাব্য ও বিবাদমান উপাদান দ্বারা গঠিত (কারণ মার্কস whole bourgeoisie কথাটি ব্যবহার করেছেন) এবং এদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের স্বার্থ আছে। (সেইজন্য common affairs কথাদুটি ব্যবহৃত হয়েছে)। রাষ্ট্র মিলিব্যান্ডের মতে বিভিন্ন স্বার্থ ও বিবাদমান উপাদানের মধ্যে সমন্বয় ঘটাবার ও মধ্যস্থতা করবার মুখ্য ভূমিকা

গ্রহণ করে। এখানেই রাষ্ট্র তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়। কোন শোষক শ্রেণী যতদিন পর্যন্ত না কেবলমাত্র একটি স্বার্থে সমন্বিত হতে পারছে, যা বাস্তবে কোনদিনই সম্ভব নয়, ততদিন পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কেবলমাত্র সমাজের প্রাধান্যকারী শ্রেণীর হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হবে না, সেও সমাজকে বিভিন্ন ধরনের বিবাদমান উপদলের মধ্যে বিবাদ মীমাংসার সময় চরমভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে। বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে যে বুর্জোয়া শ্রেণী রয়েছে তাদের রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে নেওয়া ব্যতীত কোন গত্যন্তর নেই কারণ বর্তমানে বুর্জোয়া শ্রেণী প্রচণ্ড জটিলাকার ধারণ করেছে, তারা বহু উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের মধ্যে বহু বিপরীতমুখী শ্রেণীস্বার্থ রয়েছে যার মীমাংসা তারা নিজেরা করতে পারছে না। এই বিবাদ মীমাংসা রাষ্ট্র করে দিচ্ছে ও রাষ্ট্রের সেই সিদ্ধান্ত বুর্জোয়া শ্রেণীকে মেনে নিতে হচ্ছে। রাষ্ট্র বর্তমানে বুর্জোয়াদের আদেশে চলছে না—বুর্জোয়ারাই রাষ্ট্রের নির্দেশে চলছে যার ফলে সমাজে রাষ্ট্র তার আপেক্ষিক স্বাধিকার বজায় রাখতে সমর্থ হচ্ছে।

শুধুমাত্র মিলিব্যাণ্ডের এই বিশ্লেষণেই নয় মার্কসের নিজের রচনাতেও প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাধিকারের প্রসঙ্গটি স্পষ্টভাবে বিদ্যমান ছিল। মার্কসের রাষ্ট্র সংক্রান্ত পূর্বে বর্ণিত মডেলটি, অর্থাৎ কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো বর্ণিত মডেলটি, যেখানে রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে শাসক শ্রেণীর উপর নির্ভরশীল এবং রাষ্ট্রের কোন স্বাধিকার নেই, সেটাই চূড়ান্ত নয়। The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (1852) গ্রন্থে মার্কস স্বয়ং আপেক্ষিক স্বাধিকারের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মূলতঃ তিনটি পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র তার আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারে। **প্রথমতঃ** যদি দেখা যায় শাসক শ্রেণীর দুর্বল চরিত্রের জন্য তাদের মধ্যে একতা নেই, তার পরিবর্তে বিরাজ করছে তীব্র গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও অন্তঃকলহ তাহলে শাসকশ্রেণী এককভাবে তার আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না, রাষ্ট্র আপেক্ষিক স্বাধিকার বজায় রাখতে সক্ষম হয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় বিসমার্কের অধীন জার্মানীর কথা। **দ্বিতীয়তঃ** যদি সমাজে প্রধান শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে তীব্র সংগ্রাম চলে এবং সংগ্রামে কোন পক্ষই যদি জয়লাভে সমর্থ না হয় অর্থাৎ একটি ভারসাম্যের অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহলেও রাষ্ট্র তার আপেক্ষিক স্বাধিকার বজায় রাখতে পারে। তৃতীয় নেপোলিয়নের অধীন ফরাসী সমাজ অনুরূপ অবস্থার মুখোমুখি হয়েছিল। **তৃতীয়তঃ** যদি এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয় যেখানে ধনতান্ত্রিক শ্রেণী ক্ষমতা হারিয়েছে কিন্তু শ্রমিক শ্রেণী ক্ষমতা দখল করতে পারছে না, তখনও রাষ্ট্র আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সমর্থ হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কেবলমাত্র শোষক শ্রেণীর শোষণের হাতিয়ার হিসাবে রাষ্ট্রকে দেখা উচিত নয়, রাষ্ট্র আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সমর্থ এবং *Civil War in France* (1870) গ্রন্থে মার্কস আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য সম্পন্ন রাষ্ট্রকে 'Bonapartist State' বলে অভিহিত করেছেন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের ফরাসী সমাজ ও রাষ্ট্র আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন "the State machinery is a frightful parasitic body which surrounds the body of the French Society like a caul and stops all its pores." রাষ্ট্র হল এমন একটি ভীষণ যন্ত্র যা পরাশ্রয়ী প্রাণীর মত সমগ্র সমাজ ব্যবস্থাকে জড়িয়ে থাকে, সে তার জালকে এমনভাবে বিস্তৃত করে যাতে সমাজের সকল ছিদ্র pores বন্ধ হয়ে যায়। বস্তুতপক্ষে, যে সকল ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ যথেষ্ট উন্নত পর্যায়ে গেছে (যেমন বৃটেন) সেখানে রাষ্ট্র তার আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারে না। রাষ্ট্র আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য তখনই বজায় রাখতে পারে যখন শাসক শ্রেণী যথেষ্ট শক্তিশালী ও সংহত হয়ে উঠতে ব্যর্থ হয়।

মিলিব্যাণ্ড যদিও *Marxism and Politics* (1977) গ্রন্থে রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাধিকারের প্রসঙ্গটি মার্কস রচিত *The Communist Manifesto* বিশ্লেষণকালে তুলে ধরেছিলেন কিন্তু তাঁর অপর একটি বিখ্যাত গ্রন্থে, *The State in Capltalist Society* (1969) তে, তিনি বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছেন যে, পাশ্চাত্যের উন্নত পুঁজিবাদী

রাষ্ট্রগুলিতে রাষ্ট্র হল প্রধানতঃ শাসক পুঁজিপতি শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীন একটি হাতিয়ার। তথ্য সহযোগে তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, রাষ্ট্র যন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগ, অর্থাৎ পুলিস, আমলা, সামরিক বাহিনী প্রভৃতি, যাঁদের কর্তৃত্বাধীন তাঁরা প্রায় সকলেই অর্থনৈতিক স্তরের বিচারে পুঁজিবাদী শ্রেণীর প্রতিনিধি। তাছাড়া, রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনায় যাঁরা অংশগ্রহণ করেন, তাঁর মতে, অচিরেই ব্যক্তিগত প্রভাব, পদমর্যাদা ও কর্মস্থলের পরিবেশগুণে তাঁদের সঙ্গে শাসকবর্গের এমন এক গ্রন্থীবন্ধন হয় যে রাষ্ট্রযন্ত্র বিষয়গতভাবে শাসকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী শোষণ যন্ত্ররূপে আবির্ভূত হতে বাধ্য হয়। তাই মিলিব্যাণ্ডের মত অনুযায়ী এই দেশগুলিতে রাষ্ট্রযন্ত্রের শ্রেণী চরিত্র রাষ্ট্রশক্তির পরিচালক মণ্ডলীর শ্রেণীর অবস্থান অনুযায়ী নির্ণীত হয়, অর্থাৎ রাষ্ট্রযন্ত্র একান্তভাবেই শাসক শ্রেণীর অবস্থান নির্ভর।

মিলিব্যাণ্ডের এই বক্তব্যের কঠোর সমালোচনা করেন পুলানৎজাস (Polantzas) *Political Power and Social Classes* (1973) গ্রন্থে। তিনি মিলিব্যাণ্ডের বক্তব্যের প্রায় বিপরীত বক্তব্য রাখেন। তাঁর মতে, ধনতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্রশক্তির বিভিন্ন বিভাগের কর্তৃত্ব যাদের হাতে ন্যস্ত, তাঁরা পুঁজিবাদের প্রতিনিধি বলে রাষ্ট্রও পুঁজিবাদী চরিত্র অর্জন করে একথা ঠিক নয়। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা বিষয়গত ও কাঠামোগত গুণে রাষ্ট্র এমনই এক প্রতিষ্ঠান যার চরিত্র রাষ্ট্রযন্ত্রে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের শ্রেণী অবস্থানের উপর নির্ভর করে না। বরং তারা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে অংশগ্রহণ করার ফলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থান বিষয়গতভাবে পুঁজিবাদের স্বপক্ষে নির্ধারিত হয়ে যেতে বাধ্য হয়, যা তাদের ইচ্ছা নিরপেক্ষ ও যার কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। অর্থাৎ পুলানৎজাসের ভাষ্য অনুযায়ী, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা তার গঠনগত বৈশিষ্ট্যের জন্য যে আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে, তারই প্রভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রে অংশগ্রহণকারীদের সামাজিক অবস্থান নির্ণীত হয়, রাষ্ট্রের চরিত্র রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারীদের সামাজিক অবস্থান দ্বারা নিরূপিত হয় না।

বস্তুতপক্ষে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রকৃতি বিষয়ে মার্কসবাদী মহলে বিতর্কের শেষ নেই। তবে একটা বিষয়ে তাঁরা একমত যে রাষ্ট্রযন্ত্রের উচ্ছেদ সম্ভব। ঐতিহাসিক বস্তুবাদী তত্ত্বানুযায়ী, সমাজের শ্রেণী বিভাজনের সাথে রাষ্ট্রের উৎপত্তির প্রসঙ্গটি ওতপ্রতভাবে জড়িত। সুতরাং তত্ত্বগতভাবে সমাজে শ্রেণীভেদ যদি দূর করা যায়, অর্থাৎ রাষ্ট্রের উদ্ভবের মূল কারণ যদি অপসারিত করা যায়, তাহলে রাষ্ট্রও অবলুপ্ত হবে। সমাজ যদি শ্রেণী ভেদ না থাকে তাহলে সমাজের অভ্যন্তরে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে উৎপাদন সম্পর্ক অবৈর হবে, ফলে সমাজে কোন প্রকার শোষণ থাকবে না। যদি শোষণ না থাকে, তাহলে তাকে নিশ্চিত করবার জন্য রাষ্ট্র নামক শোষণের হাতিয়ারটিরও প্রয়োজন থাকবে না। মার্কসের মতে, এইরকম শ্রেণী ভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে সাম্যবাদী সমাজে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন শুধুমাত্র সাম্যবাদী সমাজে পৌঁছালেই চলবে না, অর্থাৎ সামাজিক শর্তটি পূরণ হলেই চলবে না, রাষ্ট্র অবলুপ্তির জন্য প্রয়োজন হবে সদস্যদের চেতনা ও সংস্কৃতির উচ্চমান, মানুষের চেতনা ও জীবনযাত্রায় পুঁজিবাদের প্রভাব অতিক্রম করা এবং সাম্যবাদী নীতিবোধের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার। অর্থাৎ রাষ্ট্র বিলুপ্তির জন্য একটি মতাদর্শগত পূর্বশর্তেরও প্রয়োজন হবে।

যদিও তত্ত্বগতভাবে এই দুই শর্ত পূরণ হলেই "রাষ্ট্র শুকিয়ে মরবে", কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, রাষ্ট্রের অবলুপ্তির জন্য আর একটি বাহ্যিক পূর্বশর্তের প্রয়োজন। এই শর্তটি পূরণ না হলে রাষ্ট্রের অবলুপ্তি কখনোই সম্ভব নয়। শর্তটি হল, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের পূর্ণ ও চূড়ান্ত বিজয় এবং সাম্রাজ্য বাদের অবসান। কোন সাম্যবাদী সমাজের চারিদিকে যদি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকে তাহলে সেই সাম্যবাদী সমাজকেও রাষ্ট্রব্যবস্থা মেনে নিতে হয় কারণ পার্শ্ববর্তী বুর্জোয়া রাষ্ট্র তাকে আক্রমণ করতে পারে এবং সেই আক্রমণ প্রতিহত করণের ব্যবস্থা সাম্যবাদী সমাজকে অবশ্যই রাখতে হবে। তাই মনে করা হয় রাষ্ট্র কখনোই "শুকিয়ে মরবে না" যতক্ষণ পৃথিবীর অন্তত একটি দেশও পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা বজায় রাখতে পারবে। তাই অনেকে মনে করেন, রাষ্ট্রের অবলুপ্তি তাত্ত্বিকদের

একটি অলীক কল্পনা মাত্র—বাস্তবে সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে অবলুপ্ত করা কখনোই সম্ভবপর নয়।

Suggestions for Further Study :

1. Bottomre, T.(ed), *A Dictionary of Marxist Thought*, Blackwell, Oxford, 1985, pp.464-468.
2. McLellan, D., *The Thought of Karl Marx*, Macmillan London, 1980, pp.206-222.
3. Glezerman, G., and Kursanov, G. (ed)., *Historical Materialism* : *Basic Problems*, Progress, Moscow, 1968, pp.159-191.
4. Afanasyev., N. G., *Marxist Philosophy*, Progress, Moscow, 1980, pp. 281-307.
5. Kolakowski, L., *Main Currents of Marxism : Its Origin, Growth and Dissolution*, Oxford, New York, 1982, Vol.1, pp. 358-363.
6. Miliband, R., *Marxism and Politics*, Oxford, Oxford, 1977, Chaper 3-4.
7. Poulantzas, N., *Political Power and Social Classes*, Verso, London, 1978.
8. Hunt, R.N., *The Theory and Practice of Communism : An Introduction*, Penguin, Middlesex, 1983, pp.94-108.
9. দত্তগুপ্ত, শোভন লাল, **মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তা ঃ মার্কস থেকে মাও ৎসে তুং**, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৮, পৃঃ ১৫৬-১৭৪।

Study Questions :

(a) Essay Type :

1. Analyse Marxian Theory of the state.

(b) Short Answer Type :

1. What according to Marx, is the relationship between the emergence of class division in the society and the birth of the state ?
2. How do you prove that the state is an instrument of class-exploitation ?
3. Why does Marx think that "the executive of the modern state is nothing but a committee for managing the common affairs of the whole bourgeoisie ?
4. Why does Marx think that the state is an 'independent parasite' on the whole society ?
5. Does Marx acknowledge the 'relative autonomy of the state' ? Give reason.
6. What is Marx's view on 'Bonapartist State' ?
7. What is the instrumentalist view of the state ?
8. What according to Marx, are the conditions, the fulfilment of which would lead to the withering away of the state ?

পাঠ - ২

রাষ্ট্র প্রসঙ্গে লেনিনের বক্তব্য
(Lenin on the State)

রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কস-এঙ্গেলস্ যে তত্ত্বটি উপস্থাপিত করেন পরবর্তীকালে সেটিকে সম্প্রসারিত করেন অক্টোবর বিপ্লবের মহানায়ক লেনিন। মার্কস এঙ্গেলস্ রাষ্ট্রের প্রকৃতিকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কোন পরিস্থিতিতে কাদের স্বার্থে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে কোন যুগে কীভাবে তা ক্রিয়াশীল থেকেছে এবং সর্বহারা শ্রেণীর সফল বিপ্লবের পর যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে সেখানে গঠিত হবে সর্বহারার একনায়কত্ব একথা তুলে ধরেছেন। কিন্তু সর্বহারার একনায়কত্ব সম্পর্কে একটি বিস্তৃত তত্ত্ব তাঁরা আমাদের উপহার দিয়ে যেতে পারেননি। আসলে ঐতিহাসিক কারণেই তা সম্ভব হয়নি। তাঁরা তাদের জীবদ্দশায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সফল রূপায়নের কোন পরিণত প্রয়াস দেখে যেতে পারেননি, বিপ্লব তখনও ছিল দুর অস্ত। স্বাভাবিকভাবেই বিপ্লব কীভাবে হতে পারে সে প্রশ্নেই তাঁরা ছিলেন বেশী ভাবিত, বিপ্লবোত্তর সমাজব্যবস্থার রাষ্ট্র সম্পর্কে বেশী চিন্তাভাবনার সুযোগ তাঁদের ছিল না। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনা আশু হয়ে ওঠে লেনিনের সময় যে কারণে তিনি সর্বহারার একনায়কত্বের ধারণাটির সৃষ্টিশীল বিকাশ ঘটান। এদিক থেকে মার্কসীয় রাষ্ট্র তত্ত্বে লেনিনের অবদান যথার্থ অর্থেই মৌলিক।

লেনিনের মতে, ধনতন্ত্র থেকে সাম্যবাদী সমাজে পৌঁছাতে হলে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বে (dictatorship of the proletariat) পরিচালিত একটি রাষ্ট্রীয় স্তর অতিক্রম করতে হয়। তবে এই স্তর ইতিহাসের অন্যান্য স্তরগুলির মত স্থিতিশীল স্তর নয়, এটি একটি রূপান্তরকারী (transitional) স্তর, অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজের শ্রমিকশ্রেণী সফল বিপ্লবের পর যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলে সেখানে রাষ্ট্রের ধারণা অবলুপ্ত হয় না, প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব। এই একনায়কত্ব এক ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা, তবে এই রাষ্ট্রব্যবস্থার কর্ণধার শ্রমিক শ্রেণী। রাষ্ট্র ব্যবস্থা হবার কারণে এটি একটি শ্রেণীর সাথে সম্পৃক্ত হতে বাধ্য, আর এক্ষেত্রে সেটি শ্রমিক শ্রেণীর সাথে সংশ্লিষ্ট। রাষ্ট্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য, সে নিপীড়ন যন্ত্র হিসাবে কাজ করে। সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব কিন্তু এর ব্যতিক্রম, সে নিপীড়ন যন্ত্র হিসাবে কাজ করতে পারে না কারণ, সে নিপীড়িত শ্রেণী স্বার্থেই ক্রিয়াশীল থাকে।

তবে লেনিনের মতে, এই রাষ্ট্র নিপীড়ন যন্ত্র নয় এই আখ্যা দেওয়া সত্যের অপলাপ। রাষ্ট্র ব্যবস্থার সহজাত প্রবণতাই হল নিপীড়ন করা। সমাজতান্ত্রিক এই রাষ্ট্রও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে এই রাষ্ট্রের নিপীড়নের ধরন ধনতান্ত্রিক সমাজের রাষ্ট্রের নিপীড়নের বিপরীত। বুর্জোয়া শ্রেণীর কোন অবশিষ্টাংশ এই সমাজে থেকে গেলে তার সংশোধন ও শুদ্ধিকরণের কাজেই এই রাষ্ট্রীয় নিপীড়নযন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, সর্বহারা শ্রেণী বিপ্লবে জয়লাভ করার পর আর একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা কেন গঠন করতে উদ্যোগী হয় ? উত্তরে বলা যায়, রাষ্ট্র সম্পর্কে তাদের ধারণা যদিও সুখের নয় তবুও কয়েকটি কারণে তাদের আবার রাষ্ট্রব্যবস্থাকেই মেনে নিতে হয়। **প্রথমতঃ** সফল শ্রমিক বিপ্লবের পরও সমাজে বুর্জোয়া শ্রেণীর কিছু প্রতিভু থেকে যায় যারা সুযোগের সন্ধানে থেকে প্রতিবিপ্লব ঘটাতে চায়। এদের দমন করতে হলে রাষ্ট্রব্যবস্থার সাহায্য নিতেই হয়। **দ্বিতীয়তঃ** সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও মানুষের মনে থেকে যায় বুর্জোয়া সংস্কৃতির অবশেষ। বুর্জোয়া সংস্কৃতিকে মুছে ফেলার কাজেও এই রাষ্ট্রকে ব্যবহার করা হয়। **তৃতীয়তঃ** সমাজে যে সকল বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের মানুষ থেকে যায় তাদেরকে সর্বহারা শ্রেণীর স্বপক্ষে আনার জন্যও প্রয়োজন হয় পীড়নযন্ত্রের। **চতুর্থতঃ** বুর্জোয়া

উৎপাদন ব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিণত করলে উৎপাদন উপকরণের মালিকানাটি বর্তায় সমাজের উপর। সেক্ষেত্রে উৎপাদনকে যথাযথভাবে কার্যকর রাখাতে হলে তাকে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীনে আনা ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। **পঞ্চমতঃ** সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে পার্শ্ববর্তী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ করে নিরাপত্তা প্রদান করে এই রাষ্ট্র। সংক্ষেপে বলা যায়, সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বের দায়িত্ব দুপ্রকার ঃ (১) গঠনমূলক ও (২) দমনমূলক। একদিকে সে সামাজিক পুনর্গঠনের কাজে নিয়োজিত, অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রাকে রুদ্ধ করতে যে শক্তিগুলি বদ্ধপরিকর তাদেরকে দমন করতে তৎপর।

সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব এক ধরনের একনায়কত্ব হলেও সমাজতন্ত্র পূর্ববর্তী সমাজ যে ধরনের রাষ্ট্রীয় একনায়কত্বের সাথে পরিচিত এ সে ধরনের একনায়কত্ব নয়। এখানে শ্রমিক শ্রেণীই একনায়ক, যে কারণে একনায়কত্বের কুফল সম্পর্কে তাদের ভীত থাকতে হয় না। বরং শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধ শিবির, যারা এতকাল রাষ্ট্রীয় একনায়কত্বকে নিজ অনুকূলে ব্যবহার করেছে তাদেরকেই ভীত-সন্ত্রস্ত করে এই একনায়কত্ব। বস্তুতঃপক্ষে, প্রচলিত অর্থে যাকে রাষ্ট্র বলা হয় এটি সেই অর্থে রাষ্ট্র নয়, এই রাষ্ট্রের চরিত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বকে লেনিন গুণগত দিক থেকে সর্বোচ্চ স্তরের গণতন্ত্র বলে অভিহিত করেছেন। সাধারণভাবে গণতন্ত্র এবং একনায়কত্ব সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি মতাদর্শ কিন্তু সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব গণতন্ত্র বিরোধী নয় বরং এর আশ্রয়েই গণতন্ত্রকে সর্বোৎকৃষ্টভাবে আস্বাদ করা সম্ভব। বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থায় যে গণতন্ত্রের কথা বলা হয় তা প্রকৃতপক্ষে কাগুজে গণতন্ত্র ; প্রকৃত গণতন্ত্র এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় না। গণতন্ত্রের মূল কথা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে বিরাজ করে না। বস্তুতঃপক্ষে পুঁজিবাদ কয়েক বছর অন্তর এক শাসকের পরিবর্তে অপর শাসককে ক্ষমতায় আনা ব্যতীত সাধারণ মানুষকে আর বিশেষ কিছু ক্ষমতা দেয় না। সাম্য এখানে কেবলমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কিছুটা বিরাজ করলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে থাকে না বললেই চলে। আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য না থাকায় রাজনৈতিক সাম্য শেষ পর্যন্ত প্রহসনে পরিণত হয়। যেমন, পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় হয়ত সকল মানুষই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে কিন্তু তার অর্থনৈতিক ব্যয়ভার বহনের সামর্থ্য প্রত্যেকের না থাকায় অনেককেই শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে আসতে হয়। এইভাবে দেখা যায় পুঁজিবাদী গণতন্ত্র কতটাই মেকি। লেনিনের মতে, সর্বাপেক্ষা উচ্চমার্গের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বে কারণ এখানে সকল প্রকার অসাম্য ও বৈষম্যের অবসান ঘটে। এখানে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে সাম্য বিরাজ করে এবং জনগণ সর্বাধিক পরিমাণে অংশগ্রহণ করে গণতন্ত্রকে 'প্রতীকী' থেকে 'প্রকৃত' এই মর্যাদায় উন্নীত করে। শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের প্রধান উদ্দেশ্য শ্রেণীর মুক্তিসাধন সে কারণেও এই গণতন্ত্র একটি চরম গণতন্ত্র।

লেনিন বারংবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, এই একনায়কত্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়। সমাজ বিকাশের ঐতিহাসিক নিয়মে পুঁজিবাদী সমাজের অবসানের পর এই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এসে থাকে আবার সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে উত্তরণ ঘটলে এই একনায়কত্ব অবলুপ্ত হবে। অর্থাৎ সমাজ বিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যায়েই এই একনায়কত্ব দেখা দেয়। বস্তুতঃপক্ষে, মার্কসবাদীদের মতে, সর্বহারা বিপ্লবের পরই সমাজ সরাসরি সাম্যবাদে উন্নীত হবে না, পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের মধ্যবর্তী স্তর সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এই রাষ্ট্রব্যবস্থা। এই একনায়কত্বের প্রদর্শিত পথে এগিয়ে গিয়েই পুঁজিবাদী সমাজের শোষিত অবহেলিত শ্রমিক শ্রেণী একদিন সাম্যবাদে পৌঁছে যাবে।

সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রব্যবস্থা ব্যক্তির পরিশ্রম অনুযায়ী পারিশ্রমিক নিশ্চিত করে, কিন্তু সাম্যবাদে পৌঁছে ব্যক্তি তার চাহিদা অনুযায়ী সমাজের সম্পদ পাবে, ফলে সমাজের সম্পদ বন্টনের প্রশ্ন থাকে না, তাই এই একনায়কত্বের

আর প্রয়োজন হবে না। তাছাড়া, এই একনায়কত্ব বুর্জোয়া সংস্কৃতির যাবতীয় অবশেষ বিনষ্ট করে ফেলে, যে কারণে আর বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবের ভয় থাকে না। পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিতেও পুঁজিবাদের অবসান ঘটলে তবেই কোন রাষ্ট্র সাম্যবাদে পৌঁছাতে পারে। এদিক থেকে দেখলেও সাম্যবাদে উন্নীত রাষ্ট্র বহিরাক্রমণের ভয়মুক্ত। অর্থাৎ সাম্যবাদে উত্তরণ ঘটলে রাষ্ট্রের প্রয়োজন শেষ হয়ে যাবে। মার্কসবাদ রাষ্ট্রকে কোন কাম্য প্রতিষ্ঠান বলে মনে করে না, এই কারণে যেদিন তার প্রয়োজন শেষ হয়ে যায় সেদিনই তাকে বিলুপ্ত করা হয়। শ্রমিক শ্রেণীর সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান বলে তাকে চিরস্থায়ী করবার কোন চেষ্টা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ করে না।

সাম্যবাদে রাষ্ট্র না থাকার অর্থ সেখানে কোন প্রশাসন থাকবে না, তা কিন্তু নয়। সাম্যবাদী সমাজে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন সামাজিক প্রশাসনে রূপান্তরিত হবে। সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্র যে সকল কল্যাণমূলক কার্য করত সাম্যবাদে সেগুলি সম্পাদন করবে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও ট্রেড ইউনিয়ন। অর্থাৎ সাম্যবাদে রাষ্ট্রের অভাবে কখনোই নৈরাজ্যের পরিস্থিতি গড়ে উঠবে না।

সন্দেহ নেই লেনিনের বক্তব্যে যথেষ্ট অভিনবত্ব রয়েছে। তবে কোন কোন পশ্চিমী সমালোচক লেনিনের বক্তব্যকে মার্কসবাদ থেকে, বিচ্যুতি বলে মনে করেন। কিন্তু বাস্তবে লেনিনবাদ মার্কসবাদের বিচ্যুতি নয় — তার সম্প্রসারণ। কারণ লেনিনের *State and Revolution* (1917) গ্রন্থটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে দেখা যাবে, অত্যন্ত আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে লেখা হলেও তাঁর প্রতিটি বক্তব্যের সমর্থনে তিনি মার্কস-এঙ্গেলস্ এর বিভিন্ন রচনার যথোপযুক্ত উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। মার্কস-এঙ্গেলস্ সফল বিপ্লব দেখে যেতে পারেননি। সফল রুশ বিপ্লব সংঘটিত করার পাশাপাশি বিপ্লবোত্তর রাষ্ট্রের চিত্র তুলে ধরে লেনিন রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় তত্ত্বকেই যুগোপযোগী করেছেন।

Suggestions for Further Study :

1. Lenin, V. I., *The State*, 1919.
2. Lenin, V. I., *The State and Revolution*, 1917.
3. Hunt, C. R., *The Theory and Practice of Communism : An Introduction*, Penguin, Middlesex, 1983, pp. 180-184.
4. Volkov, G. N., *The Basics of Marxist Leninist Philosophy*, Progress, Moscow, 1982, pp. 139-142.
5. দত্তগুপ্ত, শোভনলাল, **মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তা ঃ মার্কস থেকে মাও ৎসে তুং** , পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৮, পৃঃ ২৩১-২৪২।

Study Questions :

(a) Essay Type :

1. What according to Lenin is the nature of proletarian state ? Why did he call the dictatorship of the proletariat the highest form of democracy ?

(b) Short Answer Type :

1. Why does Lenin regard dictatorship of the proletariat as the highest form of democracy ?

পাঠ - ৩

বিপ্লব প্রসঙ্গে লেনিনের বক্তব্য

(Lenin on Revolution)

সমাজ জীবনে নানা ধরনের পরিবর্তন প্রায়শই সূচিত হয়ে থাকে। এদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় যে পরিবর্তনগুলি, সেগুলিই সমাজ বিপ্লব নামে অভিহিত হয়ে থাকে। সমাজ বিপ্লবের ফলে সমগ্র সমাজ ব্যবস্থায় একটি মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়। যদিও সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রায়শই গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়, তথাপি সেই সকল পরিবর্তন সমাজ বিপ্লব নয়, কারণ এধরনের পরিবর্তনের পরেও পূর্ববর্তী সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি অপরিবর্তিত থেকে যায়। প্রকৃত সমাজ বিপ্লব যখন সাধিত হয়, তখন পূর্ববর্তী সমাজের কোন চিহ্নই পরবর্তী সমাজে খুঁজে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ সমাজ বিপ্লব সমাজ বিকাশের একটি গুণগত উল্লম্ফন যা এক ধরনের সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে অপর এক ধরনের ব্যবস্থা আনয়ন করে। লেনিন বলেছেন, সমাজ বিপ্লব হল "এমন একটি পরিবর্তন যা পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিমূল শুদ্ধ উপড়ে দেয়।"

মার্কসীয় তত্ত্বানুযায়ী, বিকাশমান উৎপাদিকা শক্তির সাথে অপসৃয়মান উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতেই সমাজ বিপ্লব সাধিত হয়। অর্থাৎ এই দ্বন্দ্বের পরিণতিতেই একসময় পুরানো সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে গিয়ে নূতন উৎপাদন ব্যবস্থা গঠিত হয়। বিপ্লবের ফলে পুরাতন শ্রেণী যা সমগ্র সমাজব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করত, তার উচ্ছেদ হয় এবং একটি নূতন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণী শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ সমাজ বিপ্লব পুরাতন রাষ্ট্রশক্তিকে উচ্ছেদ করে নূতন রাষ্ট্রশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করে। আবার পুরাতন উৎপাদন সম্পর্কের সাথে নূতন উৎপাদিকা শক্তির সংঘাতে পুরাতন শ্রেণীকে পর্যুদস্ত ও পরাভূত করে নূতন যে শ্রেণী সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। সেই শ্রেণীই পরবর্তীকালে বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে হয়ে ওঠে সমাজ বিপ্লবের মূল চালিকাশক্তি এবং সমাজ বিপ্লবের শ্রেণীগত চরিত্রও তার দ্বারা নির্ধারিত হয়।

যে কোন সমাজ বিপ্লবের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন সমাজ বিপ্লব কোন অবস্থাতেই আকস্মিকভাবে সংঘটিত হয় না। সমাজ বিপ্লব একটি সমাজব্যবস্থার রূপান্তরের সন্ধিক্ষণে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে উৎসারিত হয়। দ্বিতীয়তঃ সমাজ বিপ্লব কোন বিশেষ ব্যক্তির বা নেতার পছন্দ বা খেয়াল মত ঘটে না। সঠিক বাস্তব পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তবেই সমাজ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। তৃতীয়তঃ যে কোন সমাজবিপ্লবের নির্দিষ্ট, বিষয়গত সামাজিক-অর্থনৈতিক অন্তঃবস্তু থাকে যা ব্যক্তির ইচ্ছা বা চেতনা নিরপেক্ষ।

১৮৪৪ সালেই তরুণ মার্কস লেখেন, বিপ্লব ব্যতীত সমাজতন্ত্র আসতে পারে না। পরবর্তীকালে *German Ideology*-তে মার্কস এঙ্গেলস্ ঘোষণা করলেন যে শাসক শ্রেণীকে উচ্ছেদ করবার জন্য প্রয়োজন বিপ্লবের কারণ উচ্ছেদকারী শ্রেণী একমাত্র বিপ্লবের মাধ্যমেই শতাব্দীর পুঞ্জীভূত শোষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করে সমাজকে নূতন করে গড়ে তুলতে পারে। মার্কস এঙ্গেলস্ পুঁজিপতি ও শ্রমিকের অসম দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে, এই সংঘাত নিরসনের জন্য প্রয়োজন সর্বহারা বিপ্লবের যার মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণী পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ করে সমগ্র সমাজব্যবস্থাকে চিরকালের জন্য শোষণমুক্ত করে।

সমাজ বিপ্লবের সাফল্য নির্ভর করে একাধিক শর্তের উপর যেগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায় — (১) বিষয়গত শর্তাবলী (objective conditions) ও (২) বিষয়ীগত শর্তাবলী (subjective conditions)। মার্কস-এঙ্গেলস্ এর বিশ্লেষণের মধ্যে বিষয়গত শর্তগুলির বিশ্লেষণ যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। তবে তাঁরা এব্যাপারে সচেতন ছিলেন যে কতকগুলি বিষয়গত শর্তের বাস্তব পরিণতিতেই বিপ্লব সাফল্যমন্ডিত হতে পারে না। তারা স্পষ্টতই

একথা বলেছেন যে, পুঁজিবাদের সংকটের ফলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব স্বতঃস্ফূর্তভাবে কখনোই সংঘটিত হতে পারে না, যদি না সচেতনভাবে শ্রমিক শ্রেণীকে সেই বিপ্লবের সঠিক পথে পরিচালিত করা যায়। অক্টোবর বিপ্লবের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে লেনিন সমাজ বিপ্লবের প্রশ্নটির আরও সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ করেন। তিনি যেহেতু কঠোর বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে এই প্রশ্নের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিশ্লেষণের সম্মুখীন হয়েছিলেন তাই তিনি মার্কস-এঙ্গেলস্ বর্ণিত ও গুরুত্ব সহকারে আলোচিত বিষয়গত শর্তকে অতিক্রম করে বিষয়ীগত শর্তের কথা স্পষ্টভাবে বলতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং এদের মধ্যে যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক রয়েছে তা নির্ণয়ে সক্ষম হয়েছিলেন। যাই হোক, প্রথমে বিষয়গত ও পরে বিষয়ীগত শর্তগুলির কথা আলোচনা করা হল।

লেনিন বিষয়গত শর্তগুলির, যেগুলির ওপর মার্কস এঙ্গেলস্ অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং লেনিন নিজে তার প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন তার কথা *The Collapse of the 2nd International* (1915), *Left-Wing Communism – An Infantile Disorder* (1920) প্রভৃতিতে সুসংবদ্ধভাবে পেশ করেন। লেনিন অনুসরণে মার্কস-এঙ্গেলস্ বর্ণিত সমাজ বিপ্লবের বিষয়গত শর্তগুলি হল ঃ

(১) সমাজে প্রতিষ্ঠিত শাসক শ্রেণীর সংকট বৃদ্ধি পাবার ফলে অর্থাৎ শোষিত মানুষের অসন্তোষ ও বিক্ষোভের তীব্রতা বৃদ্ধি পাবার ফলে শাসক শ্রেণী যখন তার স্থায়িত্ব সম্পর্কে বিপন্ন বোধ করে তখন তার পক্ষে পুরাতন কায়দায় শাসন বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

(২) যখন শোষিত শ্রেণীর বঞ্চনা ও যন্ত্রণাবোধ এক চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে এবং শোষিত শ্রেণী আর শোষিত হতে চায় না, এবং

(৩) দেশের সমস্ত শ্রমজীবী শোষিত মানুষদের মধ্যে নিজেদের মুক্তির জন্য পরিলক্ষিত হয় সংগ্রামী মানসিকতা।

কিন্তু বাস্তবে পূর্বেই বলা হয়েছে, এই তিনটি শর্ত পূরণ হলেই সমাজ বিপ্লব সংঘটিত হয় না। যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালীন জার্মানী ও তার আগে ১৮৫৯-৬১ সালের রাশিয়ায় এই তিনটি শর্ত পূরণ হয়েছিল কিন্তু সমাজবিপ্লব সংঘটিত হয়নি। কারণটি হল বিষয়ীগত শর্তের অভাব যার কথা লেনিন বারংবার উল্লেখ করেছেন।

লেনিনের বক্তব্য অনুযায়ী বিষয়ীগত শর্তগুলি হল ঃ

(১) শ্রমজীবী মানুষের চিন্তায় বৈপ্লবিক চেতনার উপস্থিতি,

(২) সংগঠিত গণশক্তির বিকাশ, যার ফলে জনগণের পক্ষে সমস্ত শক্তি নিয়ে বিপ্লবে সামিল হওয়া সম্ভব এবং

(৩) জনগণের সংগ্রাম পরিচালনা করবার জন্য একটি বিপ্লবী উপস্থিতি যে সঠিক রণকৌশল রচনা করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সাফল্যমন্ডিত করার প্রয়োজনে যর্থার্থ রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে।

রুশ বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায়ে লেনিন যে জঙ্গী মনোভাব সম্পন্ন বলশেভিক পার্টি গঠনের প্রশ্নকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তা এই চিন্তারই ফলশ্রুতি। বিপ্লবের পক্ষে বিষয়গত পরিস্থিতি যথেষ্ট অনুকূল হলেও বলশেভিক পার্টির সঠিক ও সংগ্রামী নেতৃত্ব ব্যতীত বিপ্লব যে সাফল্যমন্ডিত হতে পারত না, একথা আজ অনস্বীকার্য।

লেনিনের মতে, বিপ্লবের বিষয়গত ও বিষয়ীগত শর্তগুলি, দ্বান্দ্বিক ঐক্যে গ্রথিত। অর্থাৎ তাঁর মতে, এই দুই উপাদানের সম্পর্ক কখনোই এমন নয় যে বিষয়গত উপাদানই মুখ্য ও বিষয়ীগত, উপাদানটি গৌণ বা বিষয়গত উপাদানই বিষয়ীগত উপাদানটিকে নির্ধারণ করে দেয়। বিষয়গত পরিস্থিতি অবশ্যই বিষয়ীগত শর্তগুলির উৎসারণে প্রভাব বিস্তার করে ; কিন্তু একথা সর্বদাই মনে রাখা প্রয়োজন যে বিষয়ীগত উপাদান সবসময়ই আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারে। অর্থাৎ বিষয়গত পরিস্থিতি বিপ্লবের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত নির্ণয় করে দেয় ঠিকই ; কিন্তু

সেই পরিপ্রেক্ষিত যান্ত্রিকভাবে বিষয়ীগত উপাদানকে নিয়ন্ত্রণ করে না। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বাস্তব ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই এই বক্তব্যের সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

এখন প্রশ্ন হল, বিপ্লব কোন পথে হবে, অর্থাৎ বিপ্লব হিংসাত্মক সশস্ত্র হবে নাকি শান্তিপূর্ণ হবে ? উত্তরে লেনিন বলেছেন, বিপ্লব কোন পথে কীভাবে অগ্রসর হবে তার কোন নিয়তিবাদী যান্ত্রিক ফর্মুলা পাওয়া যাবে না। বিপ্লবের রূপ অহিংস হবে নাকি সহিংস হবে কিংবা এই দুই পথের মিশ্রণে বিপ্লব সম্পাদিত হবে, তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে, ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত সমাজের অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক বিকাশের উপর। তবে শ্রমিকশ্রেণী কখনোই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করতে চায় না, কারণ মার্কসবাদী দর্শনে বিপ্লব ও হিংসা সমার্থক নয়। মার্কসবাদী চিন্তায় বিপ্লবের সাথে সন্ত্রাসবাদের বা ভীতিপ্রদর্শনের কোন সম্পর্ক নেই, কারণ জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন মুষ্টিমেয় কিছু আদর্শবাদী বিপ্লবীর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মাধ্যমে শাসক শ্রেণীকে সাময়িকভাবে আতঙ্কিত করা যেতে পারে মাত্র — তার মাধ্যমে তাকে উচ্ছেদ করা যায় না। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্য, পুঁজিবাদী শোষণ ও অত্যাচারের বন্ধনকে ছিন্ন করে সুন্দর নূতন পৃথিবী গড়ে তোলা, তাই তার কাজ শুধু ধ্বংসাত্মক নয়, গঠনমূলকও বটে। সুতরাং সে বিনা প্রয়োজনে রক্তপাত ঘটাতে চাইবে না। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণীর আত্মোৎসর্গ বিপ্লবোত্তর পর্বে সমাজতন্ত্র গঠনের পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হবে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি শ্রমিক শ্রেণীকে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে যেতে বাধ্য করে। শ্রমিক শ্রেণী যখনই শোষক শ্রেণীর শোষণ থেকে নিজেদের মুক্ত করার চেষ্টা করে তখনই শোষক শ্রেণী রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়তায় বলপ্রয়োগ করে রক্তাক্ত ও হিংসাত্মক উপায়ে তাদের বিরত করবার চেষ্টা করে। এই অবস্থা প্রতিরোধের জন্য স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিক শ্রেণীকে সশস্ত্র পন্থা নিতে হয়। আবার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পূর্ববর্তী শাসক শ্রেণী যদি জনগণকে ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার না দিয়ে ভয়াবহ সন্ত্রাসের রাজত্ব চালায়, তাহলেও শ্রমিকশ্রেণীকে বাধ্য হতে হয় সশস্ত্র পথে যেতে। শ্রমিক শ্রেণীকে সশস্ত্র হতে হয় আরও একটি কারণে। প্রায়শই দেখা যায় শ্রমিক শ্রেণী ক্ষমতা দখলের পর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি পুণরায় ফিরে আসার জন্য রক্তাক্ত হিংসা ও সশস্ত্র প্রতিরোধের পথ অনুসরণ করছে। এই অবস্থায় প্রয়োজন হয় সশস্ত্র প্রতিরোধের যা নিঃসন্দেহে শ্রমিক শ্রেণীর সমাজতন্ত্র গঠনের কাজে অপূরণীয় ক্ষতিকারক।

লেনিন বলেছেন, শান্তিপূর্ণ ও হিংসাত্মক এই দুটি পথের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, রয়েছে কেবলমাত্র আকৃতিগত পার্থক্য। উভয় পথই তীব্র শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। উভয় ক্ষেত্রেই শ্রেণী শত্রুর বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীকে শক্তি মজুদ রাখতে হয়। যে পথই অনুসৃত হোক না কেন বিপ্লবের সাফল্য নির্ভর করে শ্রমিক শ্রেণীর বৃহত্তর অংশগ্রহণের উপর, তাদের দেশব্যাপী গণজাগরণ না হলে বিপ্লবে সাফল্য আসে না। তাদের সক্রিয়ভাবে বিপ্লবী প্রক্রিয়ার অংশীদার হতেই হয়। উভয় পথেরই লক্ষ্য রাষ্ট্রশক্তির চরিত্রবদল ও রাষ্ট্রযন্ত্রের ধ্বংসসাধন, যার সাফল্য নির্ভর করে বিপ্লবী পার্টির সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের উপর, তাই লেনিন গুরুত্ব দিয়েছেন শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিপ্লব সম্পাদনের উপর, একান্ত নিরুপায় না হলে বিপ্লবের হিংসাত্মক পথ যেন গৃহীত না হয়।

পরিশেষে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও গণতন্ত্রের ধারণা আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী হলেও মার্কস-এঙ্গেলস্ ও পরবর্তীকালে লেনিন এদের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা বারংবার তুলে ধরেছেন। গণতান্ত্রিক বিপ্লব তাঁদের মতে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্যতম পূর্বশর্ত, তাই তারা গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে দ্ব্যর্থহীনভাবে সমর্থন জানিয়েছেন। মার্কস এঙ্গেলস্ উভয়ের সম্পর্ককে প্রধানতঃ তিনটি স্তরের প্রেক্ষিতে বিচার করেছেন। পুঁজিবাদী যুগের প্রথম স্তরে বিপ্লবের লক্ষ্য হল সামন্ততন্ত্রকে খর্ব করে বুর্জোয়া শ্রেণীকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা ও দ্বিতীয় স্তরে বিপ্লবের উদ্দেশ্য হল একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যা মূলতঃ কৃষক ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর উপকার সাধন করে এবং তৃতীয় স্তরে বিপ্লব সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হয়, যেখানে শ্রমিক শ্রেণীর নিয়ামকের ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পুঁজিবাদীরা বিপ্লবকে সর্বদাই বেঁধে রাখতে চায় প্রথম স্তরে কারণ

দ্বিতীয় স্তরে বিপ্লবের সাফল্য গণতন্ত্রকে করে তোলে প্রকৃত অর্থে গণমুখী এবং সেখান থেকেই উৎসারিত হয় গণতন্ত্রকে সার্থকতম রূপ দেবার প্রয়াস, যার আত্মপ্রকাশ হয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে। লেনিন এই বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার করে নিয়ে বলেন পুঁজিবাদের অবক্ষয়ের কারণে পুঁজিবাদীরা তাদের নিজেদের শ্রেণী স্বার্থ বজায় রাখার জন্য গণতন্ত্র বিরোধী অন্যান্য শক্তির সাথে হাত মেলায় যাতে কোনক্রমেই প্রকৃত অর্থে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে ও জনগণের হাতে ক্ষমতা স্থানান্তরিত না হয়। রাশিয়াতে এই কারণেই পুঁজিবাদের বিকাশ সত্ত্বেও পুঁজিবাদীরা জারতন্ত্রের সাথে আপোষ করেছিল যাতে বিপ্লব দ্বিতীয় পর্যায়ে গিয়ে প্রকৃত ক্ষমতা জনগণের হাতে চলে না যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯০৫ ও ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লব ঐতিহাসিকভাবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক স্তরের বিপ্লব হওয়া সত্ত্বেও বুর্জোয়ারা যেহেতু বিপ্লবের অগ্রগতিকে ব্যহত করতে চেয়েছিল তাই এই গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সাফল্যমন্ডিত করার দায় গিয়ে পড়েছিল শ্রমিক শ্রেণীর উপর, যেহেতু ঐ বিপ্লব সাফল্যমন্ডিত করা না গেলে বিপ্লব তৃতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ে যাবে না। এরপর ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের মাধ্যমে দেশে প্রকৃত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ রুশ বিপ্লব সফল হয়েছিল লেনিনের মতে, দুটি পর্যায়ে বিপ্লব করে, তাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও গণতন্ত্রকে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত একটি বিষয় হিসাবেই দেখা উচিত।

Suggestions for Further Study :

1. Hunt, C. R., *The Theory and Practice of Communism : An Introduction*, Penguin, Middlesex, 1983, pp. 172-179.
2. Afanasyev, V. G., *Marxist Philosophy*, Progress, Moscow, 1980, pp. 308-330.
3. Konstantinov, F. V., *The Fundamentals of Marxist-Leninist Philosophy*, Progress, Moscow, 1982, pp. 311–335.
4. Zarodov, K., *Leninism and Today's Problems of the Transition to Socialism*, Progress, Moscow, 1983, pp. 102-202.
5. Bottomore, T.(ed), *A Dictionary of Marxist Thought*, Blackwell, Oxford, 1985, pp. 425-428.
6. দত্তগুপ্ত, শোভনলাল, **মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তা ঃ মার্কস থেকে মাও ৎসে তুং,** পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৮, পৃঃ ২১৫-২৩১।

Study Questions :

(a) Essay Type :

1. What according to Lenin, are the necessary conditions for the success of a socialist revolution ?

(b) Short Answer Type :

1. Is violence always necessary in a revolution ? Give reason.
2. What are the special characteristics of the proletarian revolution ?
3. What are the objective conditions of a revolution ?
4. What are the subjective conditions of a revolution ?
5. How did Lenin define the two stages of the Russian Revolution ?

পাঠ - ৪

সাম্রাজ্যবাদ প্রসঙ্গে লেনিনের বক্তব্য

(Lenin on Imperialism)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের কাছে লেনিন যে সকল গ্রন্থ রচনা করে স্মরণীয় হয়ে আছেন তার মধ্যে একটি হল *Imperialism, the Highest Stage of Capitalism* (1916), যেখানে সাম্রাজ্যবাদ প্রসঙ্গে তাঁর মনোভাব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। লেনিনই হলেন প্রথম মার্কসবাদী যিনি সাম্রাজ্যবাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি যথাযথভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হন এবং সেটি কীভাবে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রবাহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হচ্ছে তা তুলে ধরেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে মার্কস-এঙ্গেলস্ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে কোন সুশৃঙ্খল তত্ত্ব পেশ করতে সক্ষম হননি। তবে সাম্রাজ্যবাদের ধারণাটি যে তাঁদের কাছে অজ্ঞাত ছিল তা নয়। তাঁরা সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদকে যেরকম একটি রাজনৈতিক ধারণা হিসাবে দেখা হয়, অর্থাৎ অনগ্রসর একটি দেশের উপর শিল্পোন্নত অপর একটি দেশের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকে সাম্রাজ্যবাদ বলে চিহ্নিত করবার প্রবণতার বিরোধী ছিলেন। পরিবর্তে তাঁদের চোখে সাম্রাজ্যবাদ হয়ে ওঠে পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের রাজনৈতিক অভিব্যক্তি, যা প্রকাশ পায় একটি অনগ্রসর পুঁজিবাদী দেশের অপর একটি দেশের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। মার্কস এঙ্গেলস্ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে যে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার অবতারণা করেন সেটাই হয়ে ওঠে লেনিনের তত্ত্বের মূল ভিত্তি।

মার্কস-এঙ্গেলস্ এর আলোচনার সূত্র ধরেই লেনিন দেখিয়েছেন, পুঁজিবাদ যত বিকশিত হবে, ততই পুঁজির কেন্দ্রীভবন হতে থাকবে। পুঁজির কেন্দ্রীভবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল কারটেল বা ট্রাস্ট ব্যবস্থা। এগুলি হল সাম্রাজ্যবাদের উৎস। সাম্রাজ্যবাদ কখনোই পুঁজিবাদের নিম্নস্তরে আসতে পারে না, একমাত্র সর্বোচ্চ স্তরেই তার বিকাশ সম্ভব। কারণ পুঁজিবাদের নিম্নস্তরে সমস্ত পুঁজি একটিমাত্র স্থানে কেন্দ্রীভূত হতে পারে না, যদিও কেন্দ্রীভবনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। পুঁজিবাদের বিকাশের সাথে সাথে শিল্প কলকারখানাগুলি বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হতে থাকে। ছোট কলকারখানাগুলি প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে অবলুপ্ত হয় এবং একচেটিয়া পুঁজিবাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। একচেটিয়া পুঁজিবাদ সৃষ্টি করে অর্থ পুঁজিবাদের (financial capital) যা আবার প্রকৃতিগতভাবে সম্প্রসারণশীল। তাই যে সকল দেশে পুঁজিবাদের বিকাশ চরমসীমায় পৌঁছেছে তারা চেষ্টা করে অন্যান্য দেশে তার প্রভাব বিস্তৃত করতে। শুরু হয়ে যায় সাম্রাজ্যবাদের খেলা। এই কারণেই মনে করা হয় সাম্রাজ্যবাদ হল পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর, যে স্তরের পর থেকেই পুঁজিবাদের অবক্ষয়ের পর্বের সূচনা হয় এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

সাম্রাজ্যবাদকে লেনিন তাই খুব সংক্ষেপে সংজ্ঞায়িত করে বলেছেন, এহল একচেটিয়া যুগের পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদের এটাই হল সর্বোচ্চ তথা সর্বশেষ পর্যায়। সাম্রাজ্যবাদ হল ধনতন্ত্রের চূড়ান্ত বিকাশ, এখানে অর্থ পুঁজির একচেটিয়া প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, পুঁজির রপ্তানি অসম্ভব গুরুত্ব পায়, বিশ্ব বাণিজ্য আন্তর্জাতিক ট্রাস্টের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সমগ্র বিশ্ব ভূখন্ডকে বৃহৎ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নেয়।

ঐতিহাসিকভাবে সাম্রাজ্যবাদের সূত্রপাত ১৮৭০ এর দশক থেকে হয়েছে বলে মনে করা হয়। এই সময় থেকেই পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ শুরু হয়। পুঁজিবাদী শক্তিগুলি তাদের পণ্যের বাজার হিসাবে রাষ্ট্রীয় সীমানার বাইরে অবস্থিত ভূখন্ডকে গণ্য করতে আরম্ভ করে। পুঁজিবাদীদের মধ্যে স্বাভাবিক প্রতিযোগিতার পরিবর্তে এই সময় অতি বৃহৎ দৈত্যাকৃতি একচেটিয়া পুঁজিবাদের উদ্ভব ঘটে। লেনিন দেখিয়েছেন, ১৮৭৬ থেকে ১৯১৪ সালের

মধ্যে বিশ্বের ছয়টি বৃহৎ শক্তি (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, জাপান ও রাশিয়া) ২৫০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার ভূখন্ড নিজেদের দখলে এনেছে। ঐ সময় তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ঔপনিবেশিক ভূখন্ডের পরিমাণ সমগ্র ইউরোপের আড়াই গুণ হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় তারা অর্ধ বিলিয়ন লোকের উপর ঔপনিবেশিক শোষণ কায়েম করতে পেরেছিল এবং গড়ে ঔপনিবেশিক দেশের চারজন মানুষের নিয়ন্ত্রণে ছিল উপনিবেশভুক্ত দেশের পাঁচজন মানুষ। এই সময় বুর্জোয়ারা কোনভাবেই নিজেদের বিশ্বের সামন্ততন্ত্রের অবশেষের উচ্ছেদক হিসাবে তুলে ধরতে পারেনি, বরং সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম শোষক হিসাবে তুলে ধরেছে। এই সময় তাদের চরিত্র সামন্তপ্রভুদের থেকেও ভয়ানক হয়ে উঠেছিল। সামন্তপ্রভুরা কেবলমাত্র নিজেদের ব্যক্তি প্রভু হিসাবেই সীমিত রেখেছিল, কিন্তু বুর্জোয়ারা জাতির প্রভু হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিল। এই সময় পুঁজিবাদের কোন গঠনমূলক ভূমিকা ছিল না সে কেবলমাত্র সুদ এবং উৎপাদনের অপজাতের ভিত্তিতে সজীব থাকে। তাই সাম্রাজ্যবাদ ক্ষয়িষ্ণু ও পরগাছা পুঁজিবাদ এবং এর আইনগত ভিত্তি বেশ দুর্বল।

লেনিনের মনে হয়েছে সমসাময়িককালে পৃথিবীব্যাপী যে সকল অশান্তি ও যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে তার সবই সাম্রাজ্যবাদের প্রসারকেন্দ্রিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তাঁর মতে, আফ্রিকার দখলকে কেন্দ্র করে জার্মান পুঁজিপতি ও বৃটিশ এবং ফরাসী পুঁজিপতিদের সংগ্রামের ইতিহাস। আসলে সাম্রাজ্যবাদের প্রসারের সাথে পুঁজিবাদে সংকট এসে উপস্থিত হয়। সংকট অন্ততঃ তিনটি দিক থেকে আসে। প্রথমতঃ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি এই সময় নিজেদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়, যেমনটি হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। এছাড়াও, এই সময় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং ঔপনিবেশিক শাসনাধীন মানুষদের মধ্যে স্বাধীনতাকেন্দ্রিক বিরোধের সূত্রপাত ঘটে। তাছাড়া পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে উৎপাদনকে কেন্দ্র করে তীব্র বিরোধ শুরু হয়। এই সকল দিক থেকে যে সমস্ত সমস্যা আসে তা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পক্ষে যথাযথভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব হয় না, ফলতঃ পুঁজিবাদ পতনের দিকে এগিয়ে যায় এবং বিপ্লবের সম্ভাবনা প্রখর হয়ে ওঠে।

লেনিন সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ও বিকাশের প্রসঙ্গটিকে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করতে গিয়ে এর তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের প্রতি দিক নির্দেশ করেন। এগুলি হল (১) সাম্রাজ্যবাদ হল একচেটিয়া পুঁজিবাদ (২) সাম্রাজ্যবাদ হল ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ এবং (৩) সাম্রাজ্যবাদ হল মুমূর্ষু পুঁজিবাদ। নিম্নে বিষয়গুলিকে গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হচ্ছে।

(১) সাম্রাজ্যবাদ হল একচেটিয়া পুঁজিবাদ ঃ সাম্রাজ্যবাদকে পুঁজিবাদের একচেটিয়া স্তরে উত্তরণের অভিব্যক্তি হিসাবে তুলে ধরে লেনিন এর পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন।

প্রথমতঃ এই স্তরে পুঁজির কেন্দ্রীয়করণ এমন একটি স্তরে পৌঁছায় যা সৃষ্টি করে একচেটিয়া কারবার যা সমগ্র অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। বৃহৎ সংস্থাগুলি বাজার দখল করে প্রতিযোগীদের হটিয়ে দিয়ে এবং নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নিয়ে উৎপাদিত পণ্যের মূল্যকে নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করে থাকে। একচেটিয়া কারবার হয়ে থাকে মূলতঃ কার্টেল ও ট্রাস্টের মাধ্যমে। কারটেল বলতে বুঝায় কতকগুলি বৃহৎ পুঁজিবাদী সংস্থার মধ্যে এমন ধরনের বোঝাপড়া, যা সমগ্র বাজারকে নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নিয়ে পণ্য উৎপাদনের পরিমাণ, বিক্রয়ের শর্ত, মূল্য নির্ধারণ প্রভৃতি স্থির করে। এর ফলে কার্টেলে অংশগ্রহণকারীরা প্রতিযোগিতাকে সীমাবদ্ধ রেখে অধিক মুনাফা অর্জন করে। বিংশ শতকের প্রারম্ভে জার্মানীতে কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে কার্টেলের প্রাধান্য ছিল সর্বাধিক। অপরদিকে ট্রাস্টের ক্ষেত্রে উৎপাদনের ব্যাপারে সংস্থাগুলির নিজস্ব স্বাধীনতা থাকে না ; ট্রাস্টই সামগ্রিকভাবে পণ্যের উৎপাদন বিক্রয় ও আর্থিক লেনদেন নিয়ন্ত্রণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একচেটিয়া পুঁজির শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে ট্রাস্টকে কেন্দ্র করে।

দ্বিতীয়তঃ একচেটিয়া পুঁজিবাদে উৎপাদনের কেন্দ্রীকরণের পাশাপাশি ব্যাঙ্ক পুঁজির কেন্দ্রীকরণ ঘটে। আসলে একচেটিয়া পুঁজির প্রসারণের সাথে সাথে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থারও প্রসারণ ঘটতে থাকে এবং তার ফলে ব্যাঙ্ক শিল্প নিয়ন্ত্রণেও একচেটিয়াদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে ব্যাঙ্ক পুঁজিকে নিয়ন্ত্রণ করে যে সকল বৃহৎ শিল্পপতিরা, তারা সমগ্র অর্থনীতিকে একচেটিয়াভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। এর পরিণতিতে একচেটিয়া শিল্পপতিদের শিল্প পুঁজি ও ব্যাঙ্কারদের ব্যাঙ্ক-পুঁজির মিলনের মধ্য দিয়ে সমগ্র দেশের অর্থব্যবস্থায় একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৃতীয়তঃ একচেটিয়া পুঁজির দৌলতে বিভিন্ন শিল্পোন্নত দেশে যে বিপুল পরিমাণে পুঁজি সঞ্চিত হয়, তাকে নূতন বাজার লাভের আশায় বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করা হয়। এর ফলে একটি শিল্পোন্নত দেশ অপর একটি দেশের বাজার করায়ত্ত করে সেদেশের উপর অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। অনুন্নত দেশগুলিতে মজুরি ও জমির দাম কম হওয়ায় সেই দেশগুলিতেই পুঁজির রপ্তানি হয়ে থাকে। পুঁজির রপ্তানি হল সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ।

চতুর্থতঃ পুঁজির রপ্তানি ও বাজার দখলের প্রতিযোগিতার তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে সাথে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মধ্যে আঁতাত প্রতিষ্ঠিত হয়। একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মধ্যে আঁতাত হয় বাজার বন্টন, মূল্যনীতি, উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে। সমষ্টিগত স্বার্থে আতাঁত হলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না কারণ মুনাফার স্বার্থে পুঁজিপতিদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব অচিরেই আত্মপ্রকাশ করে।

পঞ্চমতঃ সমগ্র বিশ্বের বাজার নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টায় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কাছে প্রয়োজন দেখা দেয় রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার কারণ তার ফলেই সেদেশের বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করাটি সুনিশ্চিত হয়ে যায়। লেনিন একেই বলেছেন সমগ্র পৃথিবীকে বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগবাটোয়ারা করে নেবার সাম্রাজ্যবাদী নীতি।

(২) সাম্রাজ্যবাদ হল ক্ষয়িষ্ণু বা পরগাছা পুঁজিবাদ ঃ সাম্রাজ্যবাদকে লেনিন ক্ষয়িষ্ণু বা পরাগাছা পুঁজিবাদ হিসাবে দেখে এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

প্রথমতঃ তাঁর মনে হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ হল পুঁজিবাদী অবক্ষয়ের এক চূড়ান্ত রূপ। তিনি দেখিয়েছেন একচেটিয়া পুঁজির বিকাশের ফলে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটলেও সামগ্রিকভাবে তার অগ্রগতি ব্যহত হয়, যার ফলে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। উৎপাদনের প্রয়োজনে প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ফলে উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি ঘটলেও যেহেতু উৎপাদন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে মুষ্টিমেয় কিছু একচেটিয়া পুঁজিপতি, সেহেতু প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ শেষ পর্যন্ত ব্যবহৃত হয় মুষ্টিমেয় শিল্পপতিদের মুনাফা বৃদ্ধির স্বার্থে। এর ফলে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের ফলকে সমাজের প্রয়োজনে সাধারণ মানুষের স্বার্থে ব্যবহার না করে প্রয়োগ করা হয় মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির স্বার্থে ও এর পরিণতিতে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ সামগ্রিকভাবে ব্যাহত হয়।

দ্বিতীয়তঃ সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা অন্যদেশের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে ও রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে এবং এর ফলে তারা যে অবিশ্বাস্য পরিমাণ মুনাফা অর্জনের সুযোগ পায় তাকে কেন্দ্র করে এদের জীবনযাত্রা হয়ে ওঠে ব্যাভিচার অনাচার ও ভোগবিলাসপূর্ণ, লেনিন এই কারণেই এদেরকে পরগাছা বলে আখ্যা দিয়েছেন।

তৃতীয়তঃ একচেটিয়া পুঁজিবাদ শিল্পোন্নত দেশগুলিতে অর্থ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার প্রলোভন দেখিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর একাংশকে শ্রমিক স্বার্থের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে। তাদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় সমস্ত রকম ধর্মঘট ও শ্রেণীসংগ্রামে অসহযোগিতা ও শ্রমিক আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টি করে পুঁজিবাদের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন।

চতুর্থতঃ একচেটিয়া পুঁজিবাদ আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নিজেদের স্বার্থ, স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা সম্পর্কে বিপন্নবোধ করলে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুসরণে সচেষ্ট হয়। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে তাই প্রায়শই দেখা যায় যে,

গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, শ্রমিক আন্দোলন ও অন্যান্য প্রগতিশীল আন্দোলনের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর দমনপীড়ন করা হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী-নীতি শেষ বিচারে তাই শান্তিবিরোধী, আগ্রাসী ও প্রতিক্রিয়াশীল হতে বাধ্য।

(৩) সাম্রাজ্যবাদ হল মুমূর্ষু পুঁজিবাদ ঃ একাধিক কারণে লেনিন সাম্রাজ্যবাদকে মুমূর্ষু পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্ববর্তী স্তর বলে অভিহিত করেছেন।

প্রথমতঃ সীমিত হলেও একচেটিয়া পুঁজির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদিকা শক্তির যে অগ্রগতি ঘটে, তা সমাজতন্ত্রের পূর্বশর্ত রূপে কাজ করে। উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপাদান। একচেটিয়া পুঁজি-মুনাফার স্বার্থে প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করলেও বিষয়গতভাবে তা ভবিষ্যৎ সমাজের ভিত্তি রচনা করতে সহায়তা করে।

দ্বিতীয়তঃ একচেটিয়া পুঁজিবাদের যাবতীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব পুঁজিবাদের ভিত্‌কে দুর্বল করে সমাজতন্ত্রের পথকে প্রশস্ত করে। সাম্রাজ্যবাদ কবলিত শোষিত জনগণের মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব একচেটিয়া পুঁজিবাদের স্থায়িত্বকে ক্রমাগত সংকটাপন্ন করে তুলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে আশু করে তোলে।

তৃতীয়তঃ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটে অসমভাবে। পুঁজির এই অসম বিকাশ সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্দ্বন্দ্বকে তীব্র করে তোলে, তার ফলে সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার কোন কোন দেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। এই দুর্বল ক্ষেত্রগুলিই হয়ে ওঠে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পীঠস্থান। লেনিন এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে জয়যুক্ত করবার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তাঁর মতবাদ প্রতিষ্ঠার সময় লেনিন সোসাল ডেমোক্রাটদের বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেন। জার্মান সোসাল ডেমোক্রাট কার্ল কাউটস্কি (Karl Kautsky) মনে করতেন, সাম্রাজ্যবাদ হল শিল্পোন্নত পুঁজিবাদের অভিব্যক্তি যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে একটি উন্নত পুঁজিবাদী দেশের অপর একটি কৃষিপ্রধান দেশের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। একাধিক দিক থেকে লেনিন এই তত্ত্বের তীব্র সমালোচনা করেছেন। **প্রথমতঃ**, তাঁর মনে হয়েছে, কাউটস্কির বক্তব্য অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদকে শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশের আগ্রাসী নীতি বলে ধরে নেবার অর্থ, সাম্রাজ্যবাদ যে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার রাজনৈতিক রূপ তাকে অস্বীকার করা। **দ্বিতীয়তঃ**, সাম্রাজ্যবাদকে কখনোই অনুন্নত কৃষিপ্রধান দেশের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের মধ্যে সীমিত রাখা উচিত নয় কারণ প্রায়শই দেখা যায় একটি শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশ অনুরূপ আর একটি দেশের উপর আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ লেনিনের মতে আন্তঃ সাম্রাজ্যবাদী বিরোধের ফল। **তৃতীয়তঃ**, কাউটস্কির চিন্তাধারা, লেনিনের মতে, অতি সাম্রাজ্যবাদী তত্ত্বের (ultra-imperialism theory) জন্ম দিয়েছিল। তাঁর বিশ্বাস ছিল পুঁজিবাদের বিকাশের ফলে বিভিন্ন দেশের জাতীয় পুঁজির সম্ভার মিলে একটি অছি ব্যবস্থার সৃষ্টি হবে, তার ফলে বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের নিরসন হয়ে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের অবসান ঘটে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। কাউটস্কির এজাতীয় বক্তব্যকে লেনিন তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন যে এই তত্ত্ব শুধু উদ্ভটই নয়—তা সাম্রাজ্যবাদকে সুরক্ষিত করে পুঁজিবাদ সম্পর্কে মোহ সৃষ্টি করে ও সর্বহারাদের শ্রেণীসচেতনতাকে পঙ্গু করে দেয়।

সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে হিলফারডিং (Hilferding) ও লুকসেমবুর্গ (Luxemburg) যে বিকল্প তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছিলেন তারও তীব্র সমালোচনা করেছিলেন লেনিন। হিলফারডিং এর বক্তব্য ছিল যে, কোন প্রকার সংকট ব্যতীতই পুঁজিবাদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে, তাই যদি পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাকে সঠিক ভাবে সংগঠিত করা যায়, তাহলে পুঁজিবাদী অর্থনীতি সংকটাপন্ন হবে না। তাঁর আরও বিশ্বাস ছিল পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রেখেই

শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে ক্ষমতায় আসা সম্ভব। অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য ছিল উৎপাদন ব্যবস্থার সামাজিকীকরণ ঘটিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পুঁজিতান্ত্রিক দিকগুলিকে অনেকাংশেই খর্ব করা যায়, তাই শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে পুঁজিবাদের সরাসরি বিরোধিতা না করেও শান্তিপূর্ণ পথে ক্ষমতায় আসা সম্ভব।

লুকসেমবুর্গ অতি-বাম (ultra-left) দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্রাজ্যবাদের প্রসঙ্গটি বিবেচনা করে দেখান যে উদ্বৃত্ত মূল্যের বাস্তব উৎপাদনের জন্য পুঁজিপতিদের যেহেতু অপুঁজিবাদী ক্ষেত্রের প্রয়োজন সেহেতু পুঁজির বিনিয়োগের স্বার্থে পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব দেখা দেবে; এই দ্বন্দ্বের পরিণতিতে অ-পুঁজিবাদী ক্ষেত্রগুলির মুষ্টিমেয় কিছু পুঁজিপতির নিয়ন্ত্রণে এসে দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যাবে ও তার ফলে এই দ্বন্দ্বও গভীরভাবে প্রকটিত হবে। এর ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হবে পুঁজিবাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের এক চরম সংকট যার ফলে সর্বহারার হস্তক্ষেপ ব্যতীতই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। লুকসেমবুর্গের বিপ্লবী নিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও তাঁর সাম্রাজ্যবাদী তত্ত্বের সাথে লেনিন একমত হতে পারেননি এবং তিনি তাঁর নিজস্ব তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

পরিশেষে উপসংহার হিসাবে বলা যায়, মার্কস-এঙ্গেলস্ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে যে মূল ভিত্তিটি রচনা করেছিলেন তারই সম্প্রসারণ ঘটান লেনিন। আসলে সাম্রাজ্যবাদের পূর্ণবিকাশ মার্কস এঙ্গেলস্ এর সময় না হওয়ায় তাঁদের পক্ষে এর পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। তাঁদের অসমাপ্ত কাজের দায়িত্বভাব গ্রহণ করেন লেনিন যিনি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী আমলের চিন্তানায়ক। এই কারণে লেনিনবাদকে অনেক সময় সাম্রাজ্যবাদী আমলের মার্কসবাদ বলেও অভিহিত করা হয়।

Suggestions for Further Study :

1. Bottomore, T.(ed), *A Dictionary of Marxist Thought,* Blackwell, Oxford, 1985, pp. 223-227
2. Volkov, G. N., *The Basics of Marxist-Leninist Theory.,* Progress, Moscow, 1982, pp. 121-133.
3. Suvorov, L.N., *Marxist Philosophy at the Leninist Stage* Progress, Moscow, 1982, pp. 106-125.
4. Lichtheim, G., *Imperialism,* Allen Lane, London, 1971.
5. Hunt, R. N., *The Theory and Practice of Communism : An Introduction,* Penguin, Middlesex, 1983, pp. 204-210.
6. দত্তগুপ্ত, শোভনলাল, মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তা ঃ মার্কস থেকে মাও ৎসে তুং, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৮, পৃঃ ২৫৬-২৬৮।

Study Questions :

(a) Essay Type :

1. Do you agree with the view that imperialism is the highest stage of capitalism ? Give reasons.
2. Discuss Lenin's view on imperialism.

(b) Short Answer Type :

1. In what sense, according to Lenin, is imperialism the highest stage of capitalism ?
2. Why did Lenin describe imperialism as monopoly capitalism ?
3. Can it be argued that Leninism is Marxism in the era of imperialism ?
4. Why did Lenin describe imperialism as 'moribund capitalism' ?

পাঠ - ৫

বিষয় ঃ **জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে স্তালিনের তত্ত্ব** —জাতির সংজ্ঞা — জাতীয় সংগ্রামের ধারণা — জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে অস্ট্রোমার্কসীয় তত্ত্বের স্তালিনীয় সমালোচনা — মূল্যায়ন।

১। সূচনা ঃ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে মার্কসবাদেও স্তালিনের জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব এক বিতর্কিত বিষয়। এখনও পর্যন্ত তাঁর পুস্তক "মার্ক্সিজম এ্যাণ্ড দি ন্যাশনাল কোয়েশ্চেন" (১৯১৩) মার্কসবাদীসহ সাম্যবাদীদের কাছে একটি মূল পুস্তক রূপে বিবেচিত হয়। সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের পতন তাঁর তত্ত্বকে এক প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখে দাঁড় করিয়েছে। চিরায়তন মার্কসবাদী স্তালিন বলশেভিক পার্টির পক্ষথেকে এগুলি লিখেছিলেন। তিনি যে ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে সূত্রায়িত করেন সেগুলি নিম্নলিখিতভাবে চিহ্নিত হতে পারে।

(ক) জাতীয়তাবাদের প্রশ্নটি প্রথম এবং প্রধান হয়ে দেখা দেয় রাশিয়ায় প্রতিবিপ্লবের সময়, যখন প্রত্যেকেই নিজের সম্পর্কেই ভাবছিল। অর্থাৎ প্রত্যেকটি জাতিগোষ্ঠী সংকীর্ণ ও আত্মকেন্দ্রিক চিন্তার মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ করেছিল।

(খ) রাশিয়ায় পুঁজিবাদের অগ্রগতির ফলে গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীবৈষম্যের বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ করে সীমান্ত অঞ্চলে এটি আরো প্রকট আকার ধারণ করে। এই প্রক্রিয়া রাশিয়ায় বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীগুলির অর্থনৈতিক অবস্থাকে দ্রুত সংঘবদ্ধ করে।

(গ) রাশিয়ার সাংবিধানিক শাসন জাতি গোষ্ঠীগুলিকে সচেতন করার দিকেই পরিচালিত হয়। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংবাদপত্রগুলির বিস্তার, সাহিত্য পত্রিকার প্রচারবৃদ্ধি, এবং একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত মুদ্রণব্যবস্থায় স্বাধীনতা জাতীয়তাবাদের বৃদ্ধিতে দ্রুত প্রভাব বিস্তার করে। 'ডুমা' এবং তার নির্বাচনীপ্রচার জাতিগোষ্ঠীগুলির বৃহত্তর কাজকর্মের ক্ষেত্রকে আরো প্রসারিত করে এবং জাতিগোষ্ঠীগুলির সংঘবদ্ধতার বিষয়টিকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেবার প্রক্রিয়া হিসাবে একটা বৃহৎ ভূমিকা পালন করে ; এবং

(ঘ) এই সূত্র ধরেই সীমান্ত অঞ্চলে রাষ্ট্রের দমনমূলক আইন কানুন কার্যকরী করা হয়। ফলশ্রুতি হিসাবে যা স্বাধীনতার স্পৃহাকে বাড়িয়ে তোলে।

২। মার্কসবাদ ও জাতীয়তাবাদ

স্তালিন, একজন চিরায়ত মার্কসবাদী হিসাবে, জাতীয়তাবাদের উপর মার্কসবাদের তাত্ত্বিক অবস্থানকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন তাকে যুক্তিনিষ্ঠভাবে আমাদের উপস্থাপনা করতে হবে। আমরা মার্কসবাদ এবং জাতীয়তাবাদের সম্পর্কে নিম্নলিখিতভাবে চিহ্নিত করতে পারি।

(ক) এগুলি বৈপরীত্যমূলক ধারণার উপর গড়ে উঠেছে এবং দার্শনিকভাবে এগুলিকে তুলনা করা যায় না। জাতীয়তাবাদ এই অনুমানের উপর গড়ে উঠেছে যে, জাতি মানবজাতির সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক ভাগ হিসাবে চিহ্নিত। এবং এই প্রক্রিয়া যা মানুষের বিভিন্ন বিষয়কে নিয়ে জাতিগুলিকে অনেক জাতিগোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছে। মার্কসবাদ অনুভূমিক শ্রেণীবিভাজনের ধারণার উপর ভিত্তি করে জাতীয় অংশগুলিকে বিভাজিত করেছে। জাতীয়তাবাদীদের মতে, আনুগত্যের পরীক্ষার প্রশ্নে জাতি সচেতনতা, জাতিগুলির অভ্যন্তরের বিভাজিত অংশ (যেমন শ্রেণী) অপেক্ষা অনেকবেশী শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হয়। মার্কসবাদীরা বলে যে এই অবস্থায় শ্রেণী সচেতনতা অনেক বেশী শক্তিশালী বলে প্রতিভাত হয়।

(খ) জাতিগুলি এবং তাদের মতাদর্শ (জাতীয়তাবাদ) হল পুঁজিবাদের ফল বা উৎপন্ন এবং এটি উপরিকাঠামোর একটি অংশ।

(গ) জাতীয়তাবাদ একটি ক্ষণস্থায়ী ঘটনা যা পুঁজিবাদের পতনের পর বাঁচাতে পারবে না।

(ঘ) বাস্তব পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে জাতীয়তাবাদ প্রগতিশীল অথবা প্রতিক্রিয়াশীলরূপে বিবেচিত হয়, কিন্তু এটি সবক্ষেত্রেই একটি বুর্জোয়া মতাদর্শ।

(ঙ) যদি সবচেয়ে প্রগতিশীল বিকল্প হিসাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে তখনই সাম্যবাদীরা সেই আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারে।

(চ) কিন্তু সাম্যবাদীরা নিজেরা অবশ্যই জাতীয়তাবাদের ঊর্দ্ধে নিজেদেরকে তুলে ধরবেন।

৩। স্তালিনের তত্ত্বঃ

স্তালিন জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তার বক্তব্যের বেশীরভাগটাই লিখেছেন 'মার্ক্সিজম এ্যাণ্ড দি ন্যাশনাল কোয়েশ্চেন' গ্রন্থে কিন্তু প্রায় ১৯৩০ সাল পর্যন্ত তিনি অন্যান্য লেখাতেও এই সমস্যা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত স্তরে লেখাগুলি একত্রে মোট এগারটি লেখায় লিপিবদ্ধ আছে।

জাতি সম্পর্কে স্তালিনের সংজ্ঞা

(ক) "প্রথমতঃ জাতি হলো প্রাথমিকভাবে একটি সম্প্রদায় ; আরো নির্দিষ্টভাবে বললে একটি নির্দিষ্ট জনগণের সম্প্রদায়, এটি জাতিগত বা গোষ্ঠীগত সম্প্রদায় নয়।"

(খ) "ঐতিহাসিকভাবে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সংগঠিত একটি স্থায়ী রূপ হল জাতি। এটি গড়ে ওঠে একই ভাষা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, একই অর্থনৈতিক অবস্থা, মানসিক গঠন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এবং যা প্রতিফলিত হয় একই সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে।"

(গ) "একটি জাতি ও প্রতিটি ঐতিহাসিক ঘটনার মতো পরিবর্তনের নিয়ম মেনে চলে, এর ইতিহাস আছে, এর শুরু এবং শেষও আছে।"

(ঘ) উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের কোন একটিকে আলাদাভাবে পর্যাপ্ত বলে ধরা যাবে না ... যে কোন একটি শর্তের বা বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতির জাতি ধারণাকে অস্পষ্ট করে এবং একটি যান্ত্রিক ধারণায় পর্যবসিত হয়।

৪। জাতি এবং পুঁজিবাদ

স্তালিনকে অনুসরণ করে বলা যায় একটি জাতি হল ঐতিহাসিকভাবে একটি বর্ণ যা পুঁজিবাদীযুগের মধ্যে অবস্থান করে। এর উৎপত্তি এবং বিস্তার পুঁজিবাদের বিস্তারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। বাজার হলো পুঁজিবাদের প্রাণভোমরা এবং প্রথম স্কুল যেখান থেকে বুর্জোয়ারা জাতীয়তাবাদের পাঠ নেয়। বুর্জোয়ারা জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে কারণ এর প্রধান সমস্যাই হচ্ছে বাজার।

জাতীয়তাবাদের সত্ত্বা সবসময়েই পুঁজিবাদী যদিও বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি সে গ্রহণ করতে পারে, কখনও ভাষাকে কেন্দ্র করে এবং কখনও জমি সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে।

জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণী অংশগ্রহণ করতে পারে কিন্তু তা নির্ভর করে প্রোলেতারীয়েতের সচেতনতা বা শ্রেণীবিরোধের স্তর এবং সংগঠনের উপর। কিন্তু জাতীয়তাবাদের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার কোন প্রয়োজনীয়তা প্রোলেতণরীয়েতের নেই। কর্তৃপক্ষের দমননীতি কৃষকদের ভূমি সম্পর্ককে আঘাত করে, তার উপর নির্ভর করে

কৃষকদের অংশগ্রহণ। জাতীয়তাবাদ চায় প্রোলেতারিয়েত এবং কৃষকদের ব্যাপক অংশগ্রহণ যা গণচরিত্রের আকার নেবে। কিন্তু সবসময়ই মনে রাখতে হবে যে এটা একটা বুর্জোয়া সংগ্রাম, যা বুর্জোয়াদেরই সুবিধা দেবে।

৫। তাঁর সংস্থার প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য ঃ

(ক) তিনি একটি বৈশিষ্ট্যের তালিকা প্রস্তুত করেন।

(খ) তিনি জাতীয়তাবাদকে পুঁজিবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন।

(গ) তিনি শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিষয়টিকে অনুধাবন করেন।

(ঘ) তিনি অনুমান করেন জাতীয়তাবাদের অবলুপ্তি সমাজতন্ত্রেই।

৬। বিচ্ছিন্ন হবার সমস্যা

পুঁজিবাদী পরিকাঠামোর ভিতরে সাম্যবাদীরা চেষ্টা করে জাতীয় আন্দোলনকে নিম্নগামী বা সীমিত করতে, তার মূলকে উৎপাটিত করতে যাতে প্রোলেতারিয়েতের স্বার্থহানি না হয় ; একটা জাতির বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার আছে কিন্তু সব পরিস্থিতিতে তা হতে পারে না। এটা বেশীরভাগ মানুষকে সুবিধা দিতে পারবে কিনা তার উপর নির্ভর করে। স্বাধিকার, যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয় এবং বিচ্ছিন্নতা—এগুলি নির্ভর করে জাতিগুলির বিকাশের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে বিবেচনা করে।

৭। জাতীয়তাবাদের অস্ট্রো-মার্কসীয় তত্ত্বের স্তালিনীয় সমালোচনা

(ক) জাতি সম্পর্কে অস্ট্রো-মার্কসবাদীদের অবস্থান — অস্ট্রোমার্কসীয় তাত্ত্বিক যেমন — আর স্প্রিঙ্গার জাতিকে সংজ্ঞায়িত করেন এভাবে :

(১) একটা জাতি হলো সমচিন্তা এবং সমভাষী জনগণের সমষ্টি, এটি হলো আধুনিক মানুষের এক সাংস্কৃতিক সম্প্রদায় যাদের মাটির সঙ্গে কোন বন্ধন নেই।

(২) জাতি হলো এক চরিত্র ভিত্তিক আপেক্ষিক সম্প্রদায়।

(৩) জাতি হলো একই লক্ষ্যের দিকে ধাবিত সম্প্রদায় যা একই চারিত্রিক গুণাবলীর দ্বারা সংঘবদ্ধ মানুষের সমাহার।

৮। জাতীয় সাংস্কৃতিক স্বাধিকার কর্মসূচী (১৮৯৯) এর প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য

(১) জাতির ধারণা হলো ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত ইউনিয়ন নির্দিষ্ট কোন ভূখণ্ডের যোগাযোগ ছাড়া।

(২) জাতিগুলি একটি স্বাধিকার সম্পন্ন মানুষদের প্রতিষ্ঠান যেখানে প্রতিটি মানুষকে একক হিসেবে ধরা হয়েছে এবং সেহেতু জাতীয়তাবাদের সাথে ভূখণ্ডের যোগাযোগের সেরকম কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

(৩) জাতিগুলি হলো ব্যক্তিবর্গের সম্প্রদায় যা কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সার্বভৌমত্ব ভোগ করে না।

(৪) জাতীয়তাবাদ নির্ধারিত হবে ব্যক্তিত্বের নীতির উপর দাঁড়িয়ে এবং ব্যক্তিগত ঘোষণা ও তথ্যাদির দ্বারা।

(৫) আন্তর শ্রেণী জাতীয়তার ইউনিয়নগুলি ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজের সমরূপ হিসাবে কাজ করবে ; এবং

(৬) একটি বহুজাতিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রোলেতারিয়েতের কাজ হবে প্রতিটি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং জাতীয় স্বাধিকার রক্ষা করা এবং তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচীতে তা পরিণত করা।

৯। স্তালিনের সমালোচনা ঃ প্রধান বৈশিষ্ট্য

(১) জাতীয় স্বাধিকারের সমস্ত কর্মসূচীই ব্যাখ্যাতীত এবং অত্যন্ত অযৌক্তিক।

(২) জাতিগুলির বিকাশের সমগ্র ধারাটিই জাতীয় স্বাধিকারের বিরোধী।

(৩) এটি শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রতাকে কমানোর চেষ্টায় নিয়োজিত, এবং

(৪) এটি জাতীয়তাবাদের একটা খণ্ডক বা পাক্ষিক যা শ্রেণী সংগ্রামের নিয়মের বিরোধিতা করে।

১০। মূল্যায়ন ঃ

(১) স্তালিনের তত্ত্বের সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতাকে সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের সঙ্গে যুক্ত করে দেখতে হবে যা আজকের দিনে এই তত্ত্বের যৌক্তিকতাকে প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড় করিয়েছে এবং একই সঙ্গে যে কোন ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীকে প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড় করিয়েছে। দেরীতে হলেও মার্কসবাদীরা স্তালিনতত্ত্বের মৌলিকতাকে এক গভীর গোঁড়ামি হিসাবে চিহ্নিত করেছে। হবসবম (১৯৯০) স্তালিনের তত্ত্বকে রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বললেও এর মৌলিকতাকে মেনে নেন নি।

(২) অন্য একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় হোল যে, স্তালিনের তত্ত্ব বর্তমানে জাতিস্বত্তাগুলির বিদ্রোহের ফলে সোভিয়েত রাশিয়ার যে পতন তা কি ব্যাখ্যা করতে পারে ? সোজাসুজি বলতে গেলে স্তালিনের তত্ত্ব তা ব্যাখ্যা করতে পারে না। এটা ধরে নেওয়া হয়েছে পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়ার পুঁজিবাদ ছিল, বর্তমানে জাতীয়তাবাদের জন্মদিতে যা সাহায্য করেছিল — সেক্ষেত্রে স্তালিনের সমাজতান্ত্রিক পুনগর্ঠনের কাজ বা শ্রেণীর অবলুপ্তি — এই সমস্ত ধারণাই সন্দেহের উদ্রেক করে।

(৩) পদ্ধতিগতভাবে স্তালিনের তত্ত্ব মার্কসের দ্বন্দ্ব তত্ত্ব থেকে একটু দূরেই অবস্থান করছে কারণ তিনি জাতি সম্পর্কে কতকগুলি নির্দিষ্ট শর্ত সমেত একটি 'স্থায়ী' সংজ্ঞা দিয়েছেন।

(৪) রাষ্ট্রের উপস্থিতিকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা এবং জাতির সংস্থাতে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সংঘবদ্ধতার অনুপস্থিতি স্তালিনের রাজনৈতিক অবস্থানকে সুদৃঢ় করলেও, এটা সন্দেহজনক, এবং সত্যিই কি এই তত্ত্ব ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিকভাবে সঠিক ছিল ? স্তালিন আপাত অরাজনৈতিকতার মুখোশে জাতির ব্যাখ্যায় একটি পর্যায়ের রাজনৈতিক সংজ্ঞা দিয়েছেন।

(৫) এটা বলা যায় যে তাঁর তত্ত্ব অযথা জাতীয়তার বিরুদ্ধ ঝোঁকে দুষ্ট এবং জাতি এবং জাতীয়তার অভ্যন্তরে সচলতাকে ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ।

প্রশ্নের নমুনা ঃ

১। স্তালিনের জাতিতত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সনাক্ত কর।

২। জাতীয়তা সম্বন্ধে স্তালিন ও অস্ট্রোমার্কসবাদীদের তত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা কর।

ছোট প্রশ্ন ঃ

১। জাতির সংজ্ঞা দাও।

২। মার্কসবাদ ও জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক বিচার করা।

৩। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মার্কসীয় প্রত্যয় কী কী ?

৪। জাতীয়তাবাদ এবং পুঁজিবাদ-এর সম্পর্ক বিচার কর।

৫। জাতীয়তাবাদ ও বাজার।

৬। সর্বহারা শ্রেণী ও জাতীয় সংগ্রাম।

সহায়ক পুস্তকঃ

১। Stalin — Marxism and the National Question. (Part-II)

২। Davis — Toward a Marxist Theory of Nationalism.

৩। Conner — The Marxist Leninst Theory and Strategy on the National Question.

৪। Hobsbawm — National and Nationalism Since 1750.

———

পাঠ - ৬

বিষয়ঃ ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল - অর্থ এবং সংজ্ঞা - সনাতনী তত্ত্ব এবং সমালোচনাধর্মী তত্ত্বের তুলনামূলক পার্থক্য - মার্কসবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে স্কুলের অবদান।

১। সূচনা ঃ

১৯২০ এর প্রথমদিকে জার্মানীতে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের উৎপত্তি। একটি আধামার্কসবাদী আন্দোলন হিসাবে এবং পশ্চিমীমার্কসবাদের একটি ভিন্ন ধরন হিসাবে এই স্কুলের আবির্ভাব হয়। সমাজ সম্বন্ধীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল। জন্মলগ্ন থেকে স্কুল ছিল একটি গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান যা সমাজ সম্পর্কে নূতন দিকের উন্মোচন ঘটাবে। এই স্কুলের নির্দিষ্ট যে চরিত্রটি ছিল তা সংস্কারমূলক। পশ্চিমীমার্কসবাদের উদ্ভব যে ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে, ঐ একই পরিস্থিতিতে এই স্কুলেরও উদ্ভব, বিশেষ করে এর বিকাশের প্রথম দুটি পর্যায়ে।

২। স্কুলের বিকাশপর্ব ঃ

চারটি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে স্কুল বিকশিত হয়ে ওঠে। প্রথম পর্যায়ে স্কুলের কার্যকলাপ ১৯২৩-১৯৩৩ পর্যন্ত জার্মানীতেই ছিল; দ্বিতীয় পর্যায়ে স্কুল জার্মানী থেকে নির্বাসিত হয়ে আমেরিকা থেকে কাজকর্ম পরিচালিত করেছিল এবং এই সময়টি ছিল ১৯৩৩-১৯৫০ পর্যন্ত। তৃতীয় পর্যায়ে স্কুল আবার জার্মানীতে তার কাজকর্ম ১৯৫০ থেকে শুরু করে নানাবিধ গবেষণার মাধ্যমে। ১৯৭০ এর পর থেকে প্রথাগতভাবে স্কুলের কোন অস্তিত্ব নেই তবুও এই স্কুলের অস্তিত্ব বহন করে চলেছেন বিশিষ্ট তাত্ত্বিক হ্যাবারমাস। উপরোক্ত বিকাশের পর্যায়গুলিতে স্কুলকে নানা বিষয়ের গবেষণায় ব্যস্ত থাকতে হয়। যেমন — ১৯৩০ এবং ৪০ এর দশকে গবেষণার বিষয় ছিল 'জাতীয় সমাজতন্ত্র' এবং 'ইহুদি বিরোধীতা'। ১৯৫০ এর দশকে এঁদের গবেষণার বিষয় ছিল সাংস্কৃতিক দিক, ১৯৬০ এর দশকে মারকিউসের গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু ছিল নানা ধরনের সামাজিক আন্দোলনের, যেমন - ছাত্র আন্দোলন, জাতি স্বত্ত্বার আন্দোলন ইত্যাদি। দীর্ঘ বিস্তৃত যাত্রাপথে স্কুলকে অসংখ্য গবেষণায় নিয়োজিত থাকতে হয়, বিশেষকরে মানুষের জীবনসংক্রান্ত নানাদিক-তার সাথে দর্শন, সমাজতত্ত্ব, সংগীত, সামাজিক মনস্তত্ত্ব, সোভিয়েত অর্থনীতি, সাহিত্যের ইতিহাস, আইনের ইতিহাস ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয়ে।

৩। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল ও মার্কসবাদ ঃ

স্কুল মার্কসবাদকে ১৯৭০ পর্যন্ত গবেষণার অন্যতম বিষয় হিসাবে শুরু করলেও সমকালীন সাংস্কৃতিক ব্যাপারে তাদের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ ছিল। স্কুল কখনোই কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে পরিচিত হতে চায়নি। স্কুল এদিক থেকে কমিউনিজম ও সামাজিক গণতন্ত্র দু পক্ষকেই সমালোচিত করেছে। লুকাস এবং ক্রোচের ব্যাখ্যার দ্বারা স্কুলের মার্কসবাদ সংক্রান্ত বিষয় বিশ্লেষিত হয়েছে। এদের অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল ১৯২০ এর দশকে 'রেইফিকেসন'কে আধুনিক বিশ্বের সমস্যার স্তম্ভ হিসাবে লক্ষ্য করা। স্কুলের এই নির্দিষ্ট সমস্যাটি মার্কসবাদে বিশ্লেষিত হয়েছে তত্ত্বের স্বাধীনতার দ্বারা এবং গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল স্বাধিকারের উপর। যদিও স্কুল এগুলি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার কর্মতত্ত্বের বিরোধীতা করেছে।

৪। স্কুলের গঠন ঃ

স্কুল তার গবেষণার কাজকর্ম পরিচালিত করেছে নির্দিষ্টভাবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর গুরুত্ব প্রদান না করে। স্কুলের বিকাশ পর্যায়গুলিকে আমরা এভাবে দেখতে পারি ঃ নাৎসিবাদের উদ্ভব, বিজয় এবং পতনের

সমসাময়িক হিসেবে। এই স্কুলের সঙ্গে যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী জড়িত ছিলেন তাঁরা হলেন মধ্যবিত্ত ইহুদি। স্কুলের গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল বর্ণগত কুসংস্কার, কর্তৃত্বের প্রয়োজনীয়তা, অর্থনৈতিক সমগ্রতাবাদ এবং মতাদর্শগত সমগ্রতাবাদ-যা সেই সময়কার সাম্প্রতিক বিষয়।

৫। সনাতনী বনাম সমালোচনাধর্মী তত্ত্ব ঃ

সমাজবিজ্ঞানে এই স্কুলের প্রধান অবদান তার সমালোচনাধর্মী তত্ত্ব। সমালোচনাধর্মী তত্ত্বের বিষয়গুলি — যা ১৯৩৭ সালে হরখাইমার বিশ্লেষণ করেন তা সনাতনী তত্ত্বের বিরোধী। এটি হল হরখাইমের চিন্তাপ্রসূত মার্কসবাদ যা রাজনৈতিক অর্থনীতির সমালোচনার দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়েছে। ১৯৩৭ এর পূর্বে স্কুল তত্ত্ব হিসাবে বস্তুবাদকে গ্রহণ করে, যদিও হরখাইমার বস্তুবাদের প্রতি কোন আগ্রহ দেখাননি। কিন্তু বস্তুবাদকে তাত্ত্বিক দিক থেকে ব্যবহার করে মানুষের সচেতনতার দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল।

৬। সমালোচনাধর্মী তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্য ঃ

(১) সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা তত্ত্বের প্রবক্তারা সমস্ত সামাজিক প্রক্রিয়াকে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন। সমালোচনাধর্মী তত্ত্ব ও সনাতনী তত্ত্বের মূল পার্থক্য হল সমালোচনাধর্মী তত্ত্ব সামাজিক পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ায় হয় সাহায্য করে নতুবা এই প্রক্রিয়াকে ধবংস করে। সনাতনী তত্ত্ব প্রচলিত সমাজের অভ্যন্তরে পুনরুৎপাদনজনিত সমস্যার ভিত্তির উপর নিজেকে সংগঠিত করে। সমালোচনাধর্মী তত্ত্ব প্রচলিত সমাজের সমালোচনা করে, যে সমাজ সৃষ্টি হয়েছে পুঁজিবাদী সমাজের মূলদ্বন্দ্ব বা বিরোধগুলিকে সচেতনভাবে পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার বাইরে নিক্ষেপ করার জন্য।

(২) সমালোচনাধর্মী এবং সনাতনী তত্ত্বের পার্থক্য বিষয়ীর (Subject) উপর নির্ভর করে বিষয়ের (Object) তুলনায়। সমালোচনাধর্মী তত্ত্বের উদ্দেশ্য বিকাশ প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করার মাধ্যকে সমাজকে শোষনমুক্ত করা। এই তত্ত্ব শ্রেণীআধিপত্যকে গুরুত্ব দেয় না।

(৩) এই দুটি তত্ত্ব দুটি বিশেষ ধরনের জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। সনাতনী তত্ত্বে জ্ঞানের পদ্ধতি বিশেষীকৃত বিজ্ঞান থেকে আহরিত। নির্দিষ্টভাবে বললে এটি প্রকৃতির বিজ্ঞান এবং এখানে তার প্রয়োগও হয়েছে। সনাতনী তত্ত্বের মাধ্যমে কতকগুলি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত সাধারণ ধারণা গড়ে ওঠে তা এবং এর মাধ্যমে ঘটনাবলীকে বোঝা যায়। সমালোচনাধর্মী তত্ত্ব ইতিহাস সৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষকে বিষয়ী হিসাবে দেখে এবং মানুষের সৃষ্টিশীলতার বিষয়ধর্মীতার সঙ্গে তুলনা করে যার মধ্যে মানুষের সম্ভাবনাপূর্ণ শক্তি সজ্জিত থাকে। ফলতঃ সামাজিক সংগঠন গড়ে ওঠা দরকার যা মানুষের কাজকর্মকে বৈধ করবে। হরখাইমারকে অনুসরণ করে বলা যায় যে একটি সত্য অস্তিত্বশীল ঃ সত্য হল বিষয়, অধিবিদ্যক ধারণানুযায়ী কারণ প্রতিটি ব্যক্তির লক্ষ্য নিহিত থাকে একটি যৌক্তিক সমাজের কাছে।

(৪) সমালোচনাধর্মী তত্ত্বকে তার সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে পৃথক করা যাবে না কারণ তার জ্ঞান ও লক্ষ্যগুলি সামাজিক এবং ঐতিহাসিক উৎপন্নের ফল।

(৫) সমালোচনাধর্মী তত্ত্ব মনে করে না যে প্রচলিত সমাজের নিয়মগুলি স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী। সামাজিক আচরণের এক ধরন হিসাবে সমালোচনাধর্মী তত্ত্ব, তার কাজ ও বিকাশ সম্বন্ধে সচেতন।

(৬) তত্ত্ব অবশ্যই সক্রিয় এবং ধবংসাত্মক হবে; মার্কসীয় দৃষ্টিতে এটি একটি সমালোচনা।

সমালোচনাধর্মী তত্ত্ব এবং সর্বহারাশ্রেণী

এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক বৈপরীত্যমূলক। মার্কসবাদের মৌলিক ধারণা শ্রেণীর ধারণা। শ্রেণীর ধারণা সমগ্র মার্কসবাদেই স্বীকৃত, কিন্তু ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল শ্রেণীর ধারণা থেকে সরে গেছে এবং এরজন্য এদের মার্কসবাদকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে সর্বহারা শ্রেণী ছাড়া মার্কসবাদ। এদের লক্ষ্য সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তি কিন্তু এরা সর্বহারা শ্রেণীকে ইতিহাসের অভ্রান্তচালক বলে মনে করেন না। এঁদের মতে, সর্বহারা শ্রেণী পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজস্ব জ্ঞান সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দিতে পারে না। হরখাইমার বলেছেন এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক পারস্পরিক ঘাতপ্রতিঘাতের দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই তত্ত্ব স্ববিরোধীতায় পূর্ণ। একদিকে প্রতত্ত্ব উপস্থাপিত করে বাস্তব রাজনৈতিক অনুশীলনের এক গঠনকারী অংশ হিসাবে আবার অন্যদিকে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বন্ধনের অভাব এ তত্ত্বে দেখা যায়। এটি হচ্ছে তত্ত্বের অতিরাজনীতিকরণের ফল, এই কারণেই কোলাকভিস্কি মন্তব্য করেন এটি হল মার্কসবাদের এক আংশিক ধারণা যা পরিত্যক্ত বিষয়ের কোন পরিবর্তন সরবরাহ করেনা।

স্কুলের অবদান ঃ

মার্কসীয় তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে স্কুলের অবদান গত অর্ধশতাব্দী ধরে এক বিতর্কের বিষয়। এই বিতর্কের কারণ অনুসন্ধানের জন্য কয়েকটি দিকের উপস্থাপনা অত্যন্ত জরুরী। এই স্কুলের গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল আন্তঃশাস্ত্রীয় গবেষণা, কিন্তু তাদের এই প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়। এছাড়া প্রথম দিকের গবেষণায় এঁরা কেউই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের উপর গুরুত্ব আরোপ করেননি। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর প্রতি গুরুত্ব দেওয়াকেই এঁরা সমাজতন্ত্রের বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং যেকারণে হরখাইমার ও এডর্নোও ইতিহাসকে গুরুত্ব দেননি।

উপরোক্ত অনৈতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির দুটি অনিবার্য্য ফলশ্রুতির কথা বলা যায় ঃ (১) তাৎক্ষণিক এবং স্বল্পস্থায়ী ঘটনার প্রতি স্কুল একটু বেশী মনোযোগ দিয়েছিল। (২) মার্কসীয় তত্ত্বের মৌলিক নীতিগুলিকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেছে। যেমন, পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিকশ্রেণী যে একটি বৈপ্লবিক শক্তি সেকথা স্বীকার করেননি; শ্রমিকশ্রেণীকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দিতে পারেননি। সংক্ষেপে মার্কসের ঐতিহাসিক তত্ত্বের কোন পরিমাপ করার প্রচেষ্টাই সামগ্রিকভাবে রাখেননি, এবং সাধারণভাবে বলা যায় একে উপেক্ষা করেছে।

এই স্কুলের তাত্ত্বিকেরা অর্থনৈতিক বিশ্লেষণকেও গুরুত্ব দেননি। গ্রসম্যানের 'পুঁজিবাদের পতন এবং পুঁজিসম্মত' তত্ত্বে দ্বান্দ্বিক দূরদৃষ্টির অভাব ছিল। পোলক, স্কুলের একমাত্র অর্থনীতিবিদ হিসাবে সোভিয়েত অর্থনীতি পরিকল্পনা এবং অটোমেসনের যে অধ্যয়নে লিপ্ত হয়েছিলেন তা তত্ত্বগত। ঐতিহাসিক দিক থেকে পুঁজিবাদের বিকাশের বিশ্লেষণ ছাড়াই আলোচনার একটি প্রচেষ্টা ছিল। হ্যাবারমাসের 'লেজিটিমেশন ক্রাইসিস' অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের বিষয় উত্থাপিত করে, কিন্তু তিনিও মার্কসীয় অর্থনৈতিক তত্ত্বের উপর সেরকম কোন গুরুত্ব প্রদান করেননি।

উপরোক্ত দুই গুরুত্বপূর্ণ অবহেলা প্রদর্শন স্কুলকে মার্কসবাদ থেকে অনেক স্পষ্টভাবে দূরে ঠেলে দিয়েছিল। এই তত্ত্বে কোন শ্রেণী বিশ্লেষণ হয়নি এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বৈপ্লবিক শক্তি এখন আর দৃশ্যমান নয়—তাঁদের মতে।

বটোমার এই স্কুলের মূল্যায়ন করতে গিয়ে যখন বলেন যে এই গোষ্ঠী মার্কসবাদের একটি গোষ্ঠী হিসাবে মৃত তখন তাও প্রণিধানযোগ্য হয়ে ওঠে।

তা সত্ত্বেও, হ্যাবারমাস তাঁর পূর্বসুরীদের কাছ থেকে সমালোচনাধর্মী তত্ত্বকে গ্রহণ করে তার স্থান খুঁজে পেয়েছেন দর্শন এবং বিজ্ঞান-এর এক মধ্যবর্তী স্থানে যদিও স্কুল মার্কসবাদের মৌলিক নীতি থেকে বিচ্যুত হয়েছে। হ্যাবারমাস দাবী করেন যে তাঁর তত্ত্ব মার্কসবাদের খুব কাছাকাছি অবস্থান করছে কারণ এটি সাম্প্রতিক সমাজবিজ্ঞান

ও সমাজ বাস্তবতা উভয়েরই সমালোচনা করেছেন। তিনি তাঁর নিত্য সমালোচনাধর্মী তত্ত্বের জন্য তিনটি ক্ষেত্রকে গবেষণা পদ্ধতির তুলনামূলক, সমাজতন্ত্র প্রসূত সমাজতাত্ত্বিক ও সামাজিক রাজনৈতিক গবেষণার উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। এই স্ট্রাটেজীকে তিনি অভিহিত করেছেন 'genetic structuralism' হিসাবে। আধুনিক সমাজকে বিশ্লেষণের জন্য এই তিনটি বিষয়ের সমন্বয় প্রয়োজন। বর্তমান সমাজতন্ত্রে যেহেতু আমলাতান্ত্রিক কাঠামো বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় তাই এই ধরনের সমাজতন্ত্র এবং সংগঠিত পুঁজিবাদ — উভয় ব্যবস্থাকে অনুধাবনের জন্য 'genetic structuralism' গবেষণার উপর তিনি বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন।

উপসংহার ঃ

যেহেতু হ্যাবারমাস এখনও জীবিত এবং আধুনিক সমাজ সম্পর্কিত তার আলেচনা বর্তমান সেহেতু এর পূর্ণ তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করার সময় এখনো আসেনি। হ্যাবারমাস, মানবজীবনের নূতন নূতন দিকের সন্ধান দিচ্ছেন যা নানাধরনের বিপ্লবী স্ট্রাটেজীকে তাৎপর্যমন্ডিত করেছে পুঁজিবাদোত্তর পর্যায়। অ্যান্ডারসন চিরায়ত মার্কসবাদকে সমর্থন করেছেন সমালোচনাধর্মী তত্ত্বের চেয়ে। হ্যাবারমাস পরিবর্তিত পুঁজিবাদের পরিস্থিতির আলোকে চিরায়ত মার্কসবাদের বহু সীমাবদ্ধতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

প্রশ্নের নমুনা ঃ

১। আধুনিক পুঁজিবাদকে বোঝার ক্ষেত্রে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের অবদান বিবৃত কর।

২। মার্কসবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের অবদান বিবৃত কর।

৩। সনাতনী তত্ত্ব এবং সমালোচনাধর্মী তত্ত্বের পার্থক্যগুলিকে বিবৃত কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী ঃ

১। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল বলতে তুমি কী বোঝ ?

২। সমালোচনাধর্মী তত্ত্ব-এর সংজ্ঞা-নির্দেশ কর।

৩। জেনেটিক স্ট্রাকচারালিজমের ওপর টীকা লেখ।

৪। সমালোচনাধর্মী তত্ত্ব এবং সর্বহারাশ্রেণীর সম্পর্ক বিচার কর।

৫। সমালোচনাধর্মী তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি কী?

সহায়ক গ্রন্থাবলী ঃ

1. Bottomore, T — The Frankfurt School.
2. Held & Mcecarthy (ed) — Habermas and neo critical theory.
3. Western Marxism : A Critical Reader
4. Anderson, P — Considerations on Western Marxism.
5. Do — In the Tracks of Historical Materialism.
6. Kolakowsi, L — Main Currents of Marxism. Vol-2

পাঠ - ৭

বিষয় ঃ রোজা লুক্সেমবুর্গ (১৮৭১-১৯১৯) — সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তাঁর ধারণা - তাঁর বিপ্লবের তত্ত্ব - তাঁর গণ ধর্মঘটের ধারণার বিশেষ তাৎপর্য।

১। সূচনা ঃ

মার্কসীয় চিন্তার ইতিহাসে রোজা লুক্সেমবুর্গ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন, বিশেষকরে চিরায়ত মার্কসবাদে। একজন চিরায়ত মার্কসবাদী হিসাবে রোজা তাঁর সাম্রাজ্যবাদ এবং বিপ্লবের তত্ত্বকে সূত্রায়িত করেন। ঐ তত্ত্বের মাধ্যমে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রবাহকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন বিশেষকরে পশ্চিমে। মার্কসের লেখার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল থেকেও রোজা সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে নিজ ধারণার বিকাশ ঘটান লেনিন ও তাঁর সমসাময়িক চিন্তাবিদদের প্রবল উপেক্ষাকে বিরোধিতা করেই। যদিও সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনাকে মৌলিক বলা যায় না কিন্তু তাঁর চিন্তাভাবনা মার্কসবাদে প্রাসঙ্গিক এ কারণে যে তাঁর বিপ্লব সম্পর্কে ধারণা, দলীয় সংগঠন এবং নেতৃত্বের ধারণা — এগুলির প্রত্যেকটিই তাঁর মৌলিক চিন্তাভাবনা। সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে বিশেষকরে এডওয়ার্ড বার্নষ্টাইনের সংশোধনবাদী চিন্তাভাবনাকে দৃঢ়ভাবে চ্যালেঞ্জ জানান রোজা লুকেসস বুর্গ। তাঁর বিখ্যাত বই 'Social Reform or Revolution' সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে একটি বলিষ্ঠ দলিল যা বর্তমান সময়েও সমান প্রাসঙ্গিক। রোজা লুক্সেমবুর্গের মার্কসবাদ সংশোধনবাদের বিরোধী হিসাবে বিকল্পভাবে মার্কসবাদেরই প্রতিষ্ঠা। রোজার মার্কসবাদ শুধুমাত্র উপরোক্ত গ্রন্থেই নয় তাঁর আরোও সবিশেষ চিন্তাভাবনা পাওয়া যায় "Organisational Questions of Russian Social Democracy", "The Accumulation of Capital", "The Russian Revolution", Junius Pamphelt, এবং "Mass Strike, Party and Trade Unions"-এ সমস্ত পুস্তিকায় ও গ্রন্থে।

২। সাম্রাজ্যবাদ ঃ পুঁজি সঞ্চয়ন সমস্যা

তাঁর আলোচনার একটি প্রধান ক্ষেত্র সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তাঁর ধারণা। তিনি তাঁর ধারণার বিকাশ ঘটান বিখ্যাত গ্রন্থ Accumulation of Capital (১৯১৩) এবং "The Anti Critique" (১৯১৬) এর মাধ্যমে। তিনি সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে যে ধারণা উপস্থাপিত করেন তাহলো ঃ উদ্বৃত্ত মূল্যের বাস্তব রূপায়নের জন্য পুঁজিপতিদের যেহেতু অপুঁজিবাদী ক্ষেত্রও প্রয়োজন, সেহেতু পুঁজির বিনিয়োগের স্বার্থে পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব দেখা দেবে। সাম্রাজ্যবাদ হলো পুঁজিপতি দেশগুলির মধ্যে বাজার দখলের এক প্রতিযোগিতাপূর্ণ সংগ্রাম।

তাঁর ধারণার বিভিন্ন দিক ঃ

তিনি সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে মার্কসের ধারণাকে সমৃদ্ধ করেন। তাঁর মতে, মার্কসের ধারণা প্রকৃত পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে একইসঙ্গে শ্রমিক, পুঁজিপতি এবং অপুঁজিপতি অবস্থান করে তাঁর সমর্থনযোগ্য নয় কারণ এই পরিস্থিতিতে বর্ধিত পুনরুৎপাদন অসম্ভব হয়ে পড়ে। তিনি মত প্রকাশ করেছেন যে পুঁজিবাদী সমাজ যা উৎপাদন করে তা ভোগ করতে পারে না। এ কারণেই প্রয়োজন পড়ে অপুঁজিবাদী দেশের ভোক্তাদের যারা পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের বাইরে অবস্থান করছে।

তাঁকে অনুসরণ করে বলা যায় পুঁজিবাদ অপুঁজিবাদী সমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নিজেকে বিকশিত করে। পশ্চিমে তা সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে বিকশিত হয় ঃ কৃষক এবং কারিগররা হলো পুঁজিবাদী দ্রব্যের অতিরিক্ত ক্রেতা। পরবর্তী সময়ে পুঁজিবাদ অইউরোপীয় দেশসমূহে নিজেকে বিকশিত করে এবং পরিশেষে উপনিবেশের দেশগুলিতে নিজের দ্রব্যের বাজার খুঁজে পায়। এইভাবে বিশ্ব বিভক্ত হয়ে পড়ে জাতীয় রাষ্ট্র এবং উপনিবেশের মধ্যে কিন্তু

পরবর্তী সময়ে তা নিজেকে আরো বিভাজিত করে পুঁজিবাদী ক্ষেত্র এবং অপুঁজিবাদী ক্ষেত্র হিসাবে। পরবর্তী যে বিভাজন হয় ঐ বিভাজন রোজার কাছে বেশী প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। তাঁর মতে পুঁজিবাদ দেশগুলির দ্বন্দ্বের পরিণতিতে অপুঁজিবাদী ক্ষেত্রগুলি মুষ্টিমেয় কিছু পুঁজিপতির নিয়ন্ত্রণে এসে দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যাবে ও তার ফলে এই দ্বন্দ্বও গভীরভাবে প্রকট হয়ে উঠবে। এর পরিণতিতে সৃষ্টি হবে পুঁজিবাদের আন্তর্দ্বন্দ্বের এক চরম সংকট যার ফলে কোন হস্তক্ষেপ ছাড়াই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে।

মার্কসের এই ধারণাকে রোজা সমালোচনা করেন যে উদ্বৃত্ত মূল্যের বিষয়টি পুঁজিবাদী বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতেই বুঝতে হবে। তিনি এ বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন এবং বলেন পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ার বিকাশের পরিস্থিতিতে উদ্বৃত্ত মূল্যের রহস্য বোঝা যাবে না। সুতরাং আমাদের খুঁজতে হবে অপুঁজিবাদী দেশের পরিস্থিতি যেমন— সামন্ততান্ত্রিক পরিস্থিতি। ইতিহাসগতভাবে আমরা লক্ষ্য করেছি পুঁজিবাদ পাশ্চাত্যবাদ দেশে তার পণ্য বিক্রী করে উদ্বৃত্ত মূল্য আহরণ করে। বিষয়টি তিনি তাঁর বই Accumulation-এ বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও তিনি আরো বলেছেন পশ্চিম ইউরোপে এটা প্রথম দেখা গেছে সামন্ততান্ত্রিক পরিস্থিতিতে এবং পরবর্তী সময়ে সামন্ততান্ত্রিক পরিস্থিতি ধবংসের পর প্রধানতঃ তা টিকে ছিল কৃষক এবং কারিগর সম্প্রদায়ের পরিবেশের উপর এবং ধনতন্ত্রের উন্নতির শেষ পর্যায়ে পুঁজিবাদ অধনতান্ত্রিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে টিকে রয়েছে। রোজার মতে, পুঁজিবাদ তার আবির্ভাব এবং বিকাশ উভয় দিক থেকে ধনতান্ত্রিক পরিবেশের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু ধনতন্ত্রের বিকাশ প্রসঙ্গে মার্কস প্রাক্ ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দেননি।

তাঁর ধারণার রাজনৈতিক তাৎপর্য ঃ

রোজার পুঁজি সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। এই অর্থে এটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া কারণ পুঁজি সঞ্চয়ের প্রক্রিয়ার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে রাষ্ট্রশক্তি যা বলপ্রয়োগ ও প্রতারণার মাধ্যমে তার কাজকে সম্পূর্ণ করে। পুঁজিবাদী অর্থনীতি স্বাভাবিক অসঙ্গতি এবং অর্থনীতির জন্য অপেক্ষা করতে চায় না। তার জন্য তারা ব্যবস্থাকে ভাঙতে বলপ্রয়োগ করতেও দ্বিধাবোধ করে না। এবং সে কারণেই পুঁজিবাদ একইসঙ্গে পশুবৎ আচরণ করে এবং পূর্বের ব্যবস্থার চেয়ে একটি প্রগতিশীল ব্যবস্থা হিসাবে নিজেকে উপস্থাপিত করে। এ সমস্ত ধারণাগুলি মৌলিক নয়। এটা বলা যাবে না যে মার্কস এ সম্পর্কে কোন দৃষ্টি দেননি। বরং তিনি এ সম্পর্কে বহু লেখা লিখেছেন, বিশেষকরে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'পুঁজি'র প্রথম খন্ডে।

সংক্ষেপে রোজার যুক্তির মূল প্রতিপাদ্য হল ঃ সাম্রাজ্যবাদের বীজ লুক্কায়িত আছে পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ার পুনরুৎপাদনের মধ্যে এবং যে কারণেই তার জন্মলগ্ন থেকেই পুঁজিবাদের চরিত্র হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী। সাম্রাজ্যবাদের স্তরে উত্তীর্ণ হবার সময় পুঁজিবাদকে মুমূর্ষু হতে হবে এ ধারণা করা যায় না। রোজার সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে ধারণার অভিনবত্ব এখানেই।

বিপ্লবের তত্ত্ব

১। রোজার তত্ত্বের দুটি ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ ঃ

বিপ্লব সম্পর্কে লুক্সেমবুর্গের তত্ত্ব জার্মানীর বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে উদ্ভুত হয়েছিল। এই তত্ত্ব একইসঙ্গে সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক ও অন্যদিকে তা সংক্ষেপে রাশিয়ার বৈপ্লবিক পরিস্থিতিকেও ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা রাখে। জার্মানির পরিস্থিতি জটিলতায় নিমজ্জিত কিন্তু বিপ্লবের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এর নির্দিষ্ট সমস্যা বোধগম্য। জার্মান স্যোসাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এম. পি. ডি) সংখ্যাগত ও প্রভাব বিস্তারের দিক থেকে পৃথিবীর মধ্যে একটি সফল সমাজতান্ত্রিক দল। নানারকম সাংগঠনিক কাজকর্মের বিস্তৃতির দিক থেকে এই দলের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। কিন্তু এই দল পশ্চিম

জার্মানীতে বিপ্লব ঘটাতে উৎসাহী ছিলনা। এই দল ছিল অতিরিক্ত কেন্দ্রীভূত, রক্ষণশীল এবং নিজেদের সংসদীয় রাজনীতিতে রপ্ত করে তুলেছিল। পরবর্তী সময়ে, বার্নষ্টাইন এবং কাউট্রস্কির নেতৃত্বে দলটি সংস্কারবাদী হয়ে ওঠে। এম.পি.ডি এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নগুলি আমলাতান্ত্রিকতায় অগ্রবর্তী হয়ে নিজে থেকে প্রতিষ্ঠিত করে যারমধ্যে আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পিতৃভূমি হয়ে ওঠে। জার্মানীর শ্রমিক আন্দোলন নানাধরনের বিশেষ সুবিধা ভোগ করেছিল। দিনের অধিকাংশ সময়ে বসে থাকতে অভ্যস্ত আধিকারীকদের নীতিবাক্য ছিল 'সংগঠন'। এবং কাজ করা থেকে বিরত থাকতো শুধু তাই নয় অপরাধ সংগঠনকালে অন্যত্র থাকার ওজর তুলে তারা চিরজীবী ছিল। লুক্সেমবুর্গ এই অবস্থার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিঘাত করেছিল। এই ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিয়ে সমস্ত রক্ষণশীল আধিকারীকদিগকে বিতাড়ন করে তিনি মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টিশীলতার উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন।

লুক্সেমবুর্গ রাশিয়ার বিপ্লবের নেতৃত্ব সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন। বিশেষকরে লেনিনের অতিকেন্দ্রীকতা, আধিপত্য এবং জনপ্রিয় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে যে বাধা সৃষ্টি হয়েছিল তার বিরুদ্ধে। রাশিয়ার বিপ্লবের ক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীনতা এবং সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রে এক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি প্রবলভাবে লেনিনের অতিকেন্দ্রীকতার এবং বিপ্লবের প্রতি অন্তর্মুখী দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেন। তিনি বলেন বিপ্লব কখনো অতিকেন্দ্রীকতা এবং সাংগঠনিক শৃঙ্খলার দ্বারা সোজাসুজি হতে পারে না। তিনি বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের মাত্রার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

তাঁর তত্ত্বের মূল ধারণা ঃ

শ্রেণীসচেতনতায় মার্কসীয় ধারণার উপর রোজা গুরুত্ব দেন। লেনিনের 'শ্রমিকশ্রেণীর রক্ষাকর্তা' হিসাবে দলের ধারণাকে বর্জন করে। যাইহোক তিনি জনগণের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে একটি সংগঠিত অগ্রগামী সৈন্য হিসাবে দলের কথা বলেন। কিন্তু দলের প্রয়োজন বলতে শ্রমিকশ্রেণী শ্রেণীসংগ্রামে যে রাজনৈতিক মাত্রায় আন্দোলিত হয় তার অনুপস্থিতি নয়। এই সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা তৈরী হয় বাস্তব পরিস্থিতির অসংখ্য ঘটনার মধ্যে দিয়ে, এরজন্য প্রয়োজন একটি একতাবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলা। শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব ঐ সমস্ত স্বাধীন সংগ্রামের মধ্যদিয়ে আসতে পারে না। সর্বহারাশ্রেণীর শ্রেণীসংগ্রাম সামাজিক গণতন্ত্রীদের যে সংগ্রাম তার থেকে অনেক পুরাতন। শ্রেণীসংগ্রামের ঐতিহাসিক বিকাশের নিয়মের অভ্যন্তরেই স্বতঃস্ফুর্ততা এবং সংগঠনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে।

রোজা বিপ্লবের জন্য দলের ভূমিকার কতকগুলি সাধারণ সূত্র উপস্থাপিত করেছেন। এগুলি হল ঃ শ্রেণীর অভ্যন্তরে বিষয়ীকে দেখলে দলীয় সংগঠন হিসাবে দল একটি নিয়ন্ত্রণের সাধারণ যন্ত্র হিসাবে প্রতিভাত হয়। বিপরীতপক্ষে সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর রক্ষাকর্তা হিসাবে দল যখন অবস্থান করে তখন তারা নিজেদের মধ্যে একটা বৈধতা প্রতিষ্ঠা করে স্বনিয়ন্ত্রিতভাবে এবং এরফলেই সমগ্র শ্রমিকশ্রেণী দলের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে।

রোজা, লেনিনকে সমালোচনা করেছেন এইজন্য যে তিনি দৃঢ় আবদ্ধ কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাবিশিষ্ট অগ্রগামী দল গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী নিছক বন্ধনে আবদ্ধ হবে। তিনি শ্রমিকশ্রেণীর নিজ উদ্যোগের দ্বারা বিকাশের ধারণাকে তুলে ধরেছেন। রোজা আরও বলেছেন শ্রমিকশ্রেণী নিজস্ব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজেদের সামর্থ্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ত্রুটিগুলিও বুঝতে পারবে। তাঁর কাছে স্বতঃস্ফূর্ততা বলতে শ্রমিকশ্রেণীকে সংগ্রামে প্রায়ই অবতীর্ণ হতে হবে কোনরকম দীর্ঘ প্রস্তুতি, ধর্মঘট তহবিল অথবা ট্রেড ইউনিয়নের ঘোষণা ছাড়াই।

রোজা, লেনিনের দলের মধ্যে কারখানার শৃঙ্খলার ধারণাকে বাতিল করেন। তিনি বলেন এই শৃঙ্খলা আমলাতান্ত্রিকতার জন্ম দেবে খুব সহজে। এবং এই শৃঙ্খলা শ্রমিকশ্রেণীর উপর বুর্জোয়াদের আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবে। তিনি বিশ্বাস করতেন জনগণ নেতৃত্বের তুলনায় অনেক বেশী বিপ্লবী। কেন্দ্রীয় কমিটির যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে জনগণের এবং নেতৃত্বের মধ্যে একটা দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের উপর রোজা গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি উচ্চস্তরের নেতৃত্বের বেশীরভাগ অংশকে স্বকেন্দ্রিকতার নীতিকে মেনে চলতে বলেছিলেন।

রোজার বিপ্লবের তত্ত্বেও কেন্দ্রীয় বিষয় গণ ধর্মঘটের ধারণা। তাঁরমতে সর্বহারা বিপ্লবের এটি একটি উৎকৃষ্ট ধরন। এটা দেখায় ব্যাপক জনগণের সৃষ্টিশীল উদ্যোগের একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া যা একইসঙ্গে আমলাতান্ত্রিক নিষ্ক্রিয়তার প্রতিষেধক। এটা রোজার বিপ্লবের তত্ত্বের একটা কৌশল মাত্র। গণ ধর্মঘটের ধারণা বিপ্লবের ধারণাকে আরোও পুষ্ট করে এবং রোজার মতে বিপ্লব হলো একটা অভিজ্ঞতার বিনিময়। দলের কর্মসূচী এবং সংস্কারমূলক কাজকর্ম সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না। এটা হচ্ছে ভিন্নমতের বিরুদ্ধে ঐক্যমত্য ইচ্ছাপত্র এবং লক্ষ্য বা উপায়ের একটি ঐক্যবদ্ধতা। তাঁরমতে ১৯০৫ সালে রাশিয়ায় বিপ্লবের মতো গণ ধর্মঘট- এর উপস্থিতি বিপ্লবের যে কোন রূপের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব। সেইসময় রাশিয়া গণ ধর্মঘটে জ্বলছিল।

লুক্সেমবুর্গ বার্নষ্টাইনের সংশোধনবাদী তত্ত্বকে আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজের বিপ্লবের তত্ত্বকে উপস্থাপিত করেন। বার্নষ্টাইনের মতে সামাজিক সংস্কার সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য হওয়া উচিত, তিনি পুঁজিবাদের পতনের ধারণাকে বাতিল করেন। বার্নষ্টাইনের মতে, ক্রেডিট এবং কার্টেলস পুঁজিবাদের স্থায়িত্ব এনে দিয়েছে। তিনি সংসদীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের এবং রাজনৈতিক গণতন্ত্রের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। লুক্সেমবুর্গের মতে, বার্নষ্টাইন সমাজতন্ত্রকে হাজির করেছেন তাকে বাতিলের নামে। রোজার মতে সংস্কার এবং বিপ্লব এ দুটি দ্বান্দ্বিকভাবে সম্পর্কযুক্ত ; সংস্কার হলো উপায় যার পরিণতি বিপ্লবে। বার্নষ্টাইনের বিরুদ্ধে তিনি পুঁজিবাদের পতনের তত্ত্বকে তুলে ধরেন। তিনি সেইসঙ্গে এও বিশ্বাস করেন যে ক্রেডিট এবং কার্টেলস পুঁজিবাদকে স্থায়িত্ব দিতে পারে না।

মন্তব্য ঃ

(১) Brouner এর মতে রোজা বিপ্লব সম্পর্কে একটি তৃতীয় পথের সন্ধান দিয়েছেন যা বৈপ্লবিক মানবতাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি তীব্রভাবে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে দলের বা অন্যান্য একগুচ্ছ প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের মেলবন্ধনের বিরোধীতা করেছেন। তিনি শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন দিকের উপর জোর দিয়েছিলেন যা তাদের বন্ধন থেকে মুক্তি দেবে।

(২) রোজার ধারণাকে রাজনৈতিক অদৃষ্ঠবাদ বলে অনেকে অভিযোগ করেছেন। পুঁজিতন্ত্রের পতনের ধারণা এবং জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টায় তাঁর বিশ্বাস অনেককেই উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত করেছে। কিন্তু এটি একটি ত্রুটিপূর্ণ অভিযোজন কারণ তিনি কখনই সংগঠন এবং নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেননি।

(৩) পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতন রোজার তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতাকে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করেছে।

নমুনা প্রশ্ন ঃ

১। লুক্সেমবুর্গের বিপ্লবের তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

২। লুক্সেমবুর্গ কীভাবে দলীয় সংগঠন, গণ ধর্মঘট এবং স্বতঃস্ফূর্ততাকে সংযুক্ত করেছিলেন তাঁর বিপ্লবের তত্ত্বে

সে বিষয়ে আলোচনা কর।

৩। সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে রোজার ধারণাকে নিজের ভাষায় বিবৃত কর।

ছোট প্রশ্ন ঃ

টীকা

১। পুঁজি সঞ্চয়ন সমস্যা।

২। গণ ধর্মঘট।

৩। সংস্কার এবং বিপ্লব।

৪। কেন্দ্রিকতা।

৫। শৃঙ্খলা।

৬। বিপ্লব।

সহায়ক পুস্তক ঃ

1. Mcllelan, D : Marxism After Marx.
2. Nettl, P : Rosa Luxemburg.
3. Datta Gupta, S : Luxemburg and Her Critics.

পাঠ - ৮

বিষয় ঃ জর্জ লুকাস — শ্রেণীসচেতনতার তত্ত্ব — সামগ্রিকতার ধারণা— বিশ্লেষণসহ মূল্যায়ন।

সূচনা ঃ

লুকাসকে পশ্চিমী মার্কসবাদের জনক হিসাবে অভিহিত করা হয়। পশ্চিমী মার্কসবাদের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ আমরা লুকাসের লেখা পত্রেও খুঁজে পাই। লুকাসের লেখাগুলির মধ্যে তত্ত্ব ও বাস্তবের মধ্যে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা অথবা সমন্বয়ের অভাব প্রতিফলিত হয়। তাঁর লেখাগুলি ভীষণ রকমের দর্শন সম্বন্ধীয়। জন্মতত্ত্ব এবং পদ্ধতির প্রশ্ন তাঁর চিন্তাভাবনার সঙ্গে গভীর ভাবে সংশ্লিষ্ট। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি পশ্চিমী মার্কসবাদেও দেখা যায়। লুকাসের মার্কসবাদকে বলা হয় — 'হেগেলের ভাষায় লেনিনবাদের ব্যাখ্যা'। যে মূল গ্রন্থে তাঁর শ্রেণীসচেতনতার ধারণা পাওয়া যায় সেই গ্রন্থটি হলো 'ইতিহাস এবং শ্রেণীসচেতনতা' (১৯২৩)। লুকাসের যে কোন আলোচনার ক্ষেত্রেই তাঁর উপরোক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় (১৯৬৭) সংস্করণের প্রতি দৃষ্টি অবশ্যই নিক্ষেপ করতে হয়। কেননা ঐ গ্রন্থে তিনি তাঁর ধারণার একটি আত্মসমালোচনা উপস্থাপিত করেন।

লুকাসের চিন্তাধারা বা ধারণাকে গড়ে তোলার পিছনে রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক এবং বুদ্ধিমত্তাগত— এ দুই পরিস্থিতি গভীর ভাবে সক্রিয় ছিল।

লুকাস, তাঁর চিন্তাভাবনাকে একসূত্রে গ্রথিত করেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পুঁজিবাদের অস্থায়ীত্ব এবং ১৯১৭য় রুশবিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে। এগুলি যুদ্ধপূর্ব বিশ্ব ব্যবস্থার এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সুব্যবস্থিত মার্কসবাদের ভাঙনকে পরিচালিত করে, যা চিত্রিত হয়েছিল প্রত্যক্ষবাদ এবং যুক্তিহীন দৃঢ় মতবাদের দ্বারা। এগুলির পাশাপাশি পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে মার্কসবাদের এক কঠোর রূপ তার জায়গা গ্রহণ করে। উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিত থেকে, তরুণ মার্কসবাদীরা মার্কসীয় তত্ত্বের কেন্দ্রীয় ধারণাগুলির পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। এগুলি হল : শ্রেণীসংগ্রাম, রাষ্ট্রের কার্যপ্রণালী, সর্বহারাশ্রেণীর গণতন্ত্রের প্রকৃতি, দর্শনের ভূমিকা এবং সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব ইত্যাদি।

এইরকম এক রাজনৈতিক শূন্যতার মধ্যে লুকাস মার্কসবাদকে সূত্রায়িত করেন। যে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁর চিন্তাভাবনাকে সূত্রায়িত করেন তাকে এভাবে লক্ষ্য করা যায় : শ্রমিক আন্দোলনের পর্যায় ক্রমিক ব্যর্থতা, বৈপ্লবিক আন্দোলনের ব্যর্থতা এবং জার্মানি, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরীতে দলগুলি ১৯১৮-১৯১৯ সময়কালে যে সমস্ত আন্দোলন করে। তার ব্যর্থতা। লুকাসের তত্ত্ব উপরোক্ত আদর্শ নিঃসর্গের এক প্রতিফলন। তিনি আত্মবিলোপ করে পরবর্তী সময়ে লেখেন : "ঐ সমস্ত অতিরঞ্জিত সুনিশ্চিত আশা যা আমরা অনেকেই বিপ্লবের স্থায়ীত্ব ও গতিশীলতা সম্পর্কে পোষণ করে থাকি।"

বুদ্ধিমত্তাগত প্রভাব ঃ

লুকাস একগুচ্ছ চিন্তাবিদদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তার মধ্যে প্রধানতঃ জার্মান সমাজবিদ্যা এবং দর্শন সংক্রান্ত ঐতিহ্যই প্রধান। তিনি গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত হন ওয়েবার এবং জিমেলের সমাজবিদ্যার আলোচনা হতে, ডিলথের দর্শনসংক্রান্ত আলোচনা হতে। উপরোক্ত প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বর্জন করেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রণালী এবং এঙ্গেলসের দর্শনসংক্রান্ত উত্তরাধিকার। বিশেষকরে তিনি বর্জন করেন জ্ঞানের প্রতিবিম্বতত্ত্ব, প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা এবং দৃষ্টিবাদকে। ওয়েবারের কাছ হতে তিনি নিরপেক্ষ যুক্তিযুক্ততা (Rationalisation) এবং আরোপিত

শ্রেণীচেতনা, জিমেল হতে তিনি 'রেইফিকেশন', ডিলটে থেকে তিনি 'আরলিবনিস' গ্রহণ করেন। এগুলি তাঁকে সাহায্য করে জীবনের অভিজ্ঞতায় শ্রেণীসচেতনতার মৌলিক উপাদানকে ব্যাখ্যা করতে। তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন শ্রেণীসচেতনতা এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর। তিনি সমাজতান্ত্রিক সমাজের উত্তরনে অর্থনৈতিক উপাদানের ভূমিকার উপর ততটা গুরুত্ব দেননি।

লুকাসের শ্রেণীসচেতনতার পূর্ব ঐতিহ্য ঃ

লুকাসের পূর্বে শ্রেণীসচেতনতা সম্পর্কে চিন্তাভাবনার একটা ঐতিহ্য ছিল। মার্কস 'শ্রেণী হিসাবে শ্রেণী' ও 'শ্রেণীর জন্য শ্রেণীর' মধ্যে পার্থক্য করেছেন। উপরোক্ত পার্থক্য একটি শ্রেণীর বিষয়গত এবং বিষয়ীগত পার্থক্যের বেশী কিছু নয়। লেনিন মনে করেন, শ্রমিকশ্রেণীর পর্যাপ্ত রাজনৈতিক শ্রেণীসচেতনতা একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর মাধ্যমেই আসতে পারে এবং এটি আসবে বাইরে থেকে অগ্রবর্তী শ্রেণী হিসাবে সাম্যবাদী দলের দ্বারা। বিপরীতপক্ষে লুক্সেমবুর্গ সামাজিক অভিজ্ঞতার ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন শ্রেণীসংগ্রামের অভিজ্ঞতা শ্রেণীসচেতনতার বিকাশের মধ্যেই গড়ে উঠবে।

শ্রেণীসচেতনতার ধারণা ঃ

১। তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তবেও লুকাস একগুচ্ছ প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এগুলি শ্রেণীসচেতনতার অর্থ, কাঠামো, তার কার্যাবলী এবং সর্বহারাশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শ্রেণীসচেতনতার গুরুত্ব এবং তাৎপর্য্য সম্পর্কিত।

২। তাঁর শ্রেণীসচেতনতার তত্ত্বের আলোচনায় গুরুত্ব প্রদান করেন সামগ্রীকতার ধারণা ও তার পদ্ধতির উপর যা তাঁর তত্ত্বকে তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে। অধিবিদ্যক এবং প্রথাগত ধারণানুযায়ী, সামগ্রিকতাকে দেখা হয় বিমূর্ত ভাবে, অনুপযুক্ত সময়ে এবং নিষ্ক্রিয় সামগ্রিকতা হিসাবে যেখানে অংশগুলি একটি অপরিবর্তিত এবং স্থিরীকৃত অবস্থায় থাকে। দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জোর দেওয়া হয় গতিময়তার উপর—ব্যাপকতার উপর কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে তা গভীর চিন্তার দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে বস্তুগত বাস্তবতার উপর অবস্থান করে। লুকাসের বক্তব্য অনুযায়ী : "সামগ্রিকতার জড়বাদী দ্বান্দ্বিক ধারণা বলতে প্রথমেই যা বলতে হয় তা হলো পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার একটি নির্দিষ্ট ঐক্য। দ্বিতীয়তঃ সমস্ত সামগ্রিকতা হলো বাস্তবিকপক্ষে নিম্নমুখী এবং উর্ধ্বমুখী। তৃতীয়তঃ সামগ্রিকতার ঐতিহাসিক বাস্তবতা বলতে বোঝায় নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে তা পরিবর্তিত হয় এবং অসংহত একটি চরিত্রের রূপ নেয়।

লুকাস তার সামগ্রিকতার ধারণাকে বিকাশ করেন বুর্জোয়া অভিজ্ঞতাবাদের বিরোধীতায় কারণ এই অভিজ্ঞতাবাদ ইতিহাস ও সমাজ সম্পর্কে বিকৃত ও বিচ্ছিন্ন ধারণা দেয়। লুকাসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ধারণা বর্জন করতে সাহায্য করে শ্রমিকের অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণা যা তার মনস্তাত্ত্বিক চেতনাকে শ্রেণীচেতনা হিসাবে উপস্থিত করে।

আরোপিত শ্রেণীচেতনা ঃ

(ক) এই চেতনা হলো প্রকৃত ও যুক্তিযুক্ত প্রতিক্রিয়া যা আরোপিত হয় উৎপাদন প্রক্রিয়ার একটি নির্দিষ্ট অবস্থায়।

(খ) এটি অভিজ্ঞতালব্ধ ভাবে প্রদত্ত এবং মনস্তাত্ত্বিক ভাবে বর্ণনাযোগ্য যা মানুষের জীবনের বিভিন্ন অবস্থাকে ব্যাখ্যা করে।

(গ) বিমূর্ত এবং প্রথাগতভাবে এর তাৎপর্য হলো একজনের সামাজিক ঐতিহাসিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থায় তার নির্দিষ্ট শ্রেণীচেতনা। কাঠামোগত সম্পর্ক হিসাবে এটা অবস্থান করে।

(ঘ) এর অর্থ কোন একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর সুবিধাজনক অবস্থান থেকে প্রচলিত সমাজের সামগ্রিকতাকে লক্ষ্য করা। এই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হলে ঐ শ্রেণীর ভূমিকা ইতিহাসে গৌণ বলে প্রতিফলিত হবে।

(ঙ) এই শ্রেণীচেতনা আধিপত্যসম্পন্ন প্রকৃতির হয় যার অর্থ শ্রেণীর স্বার্থ ও সচেতনতা সমাজকে সামগ্রিকভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন শ্রেণীসচেতনতা কী প্রবাহে আসে? একটি বিশেষ সিদ্ধান্তের যুগসন্ধিক্ষণের মুহূর্তে শ্রেণীর সামর্থ্য ও সচেতনা সৃষ্টি হয়।

(চ) শ্রেণীসচেতনতার অর্থ এই নয় যে সকল শ্রেণীরই শ্রেণীসচেতনতার আধিপত্যর দিক গড়ে তোলার ক্ষেত্র উপযুক্ত হয়, সাথে সাথে একই প্রকারের অন্তর্নিহিত সংস্থাগত বিন্যাস থাকে। বিষয়টি বহুল পরিমাণে নির্ধারিত হয় কী পরিমাণে শ্রেণীর সদস্যরা তাদের কাজ সম্পর্কে সচেতন হয়। সংগঠিত শক্তি লাভ করবার জন্য কী ধরনের কার্যপ্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়—এ সকল বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে শ্রেণীর শ্রেণীসচেতনতার আধিপত্যের দিকগুলি।

শ্রেণীসচেতনতার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ঃ

লুকাস বিগত চারদশকের শ্রেণীসচেতনতার বিকাশ ও তার সীমাবদ্ধতা এক ঐতিহাসিক বর্ণনা ও বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করেছেন। তার মতে প্রাক্ ধনতান্ত্রিক যুগে যথার্থ শ্রেণীচেতনা আবির্ভূত হতে পারেনি। লুকাস বলেন যথার্থ শ্রেণীচেতনা শিল্পবিপ্লবের সাথে সাথেই আবির্ভূত হয়। শ্রেণীচেতনা প্রাক্ পুঁজিবাদী পর্বে ইতিহাসের গতিকে প্রভাবিত করতে অক্ষম ছিল। কৃষকদের শ্রেণীসচেতনতায় দুর্বলতার জন্যই ১৫২৫ সালে জার্মানীর কৃষক বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। প্রাক্ পুঁজিবাদী সমাজগুলিতে অর্থনৈতিক উপাদানগুলি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উপাদানগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিল।

প্রাচীন গ্রীসে এবং রোমে, মার্কস বলেন, ''শ্রেণীসংগ্রাম সংঘটিত হয়েছে মূলতঃ ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে শ্রেণীবিরোধের ফলে।'' পুঁজিবাদে, শ্রেণীচেতনা অধিকতর সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে, অনেকটা বুর্জোয়া সমাজের দুটি সুস্পষ্ট শ্রেণী হিসাবে বুর্জোয়া ও সর্বহারাশ্রেণীর মতো।

শ্রেণীসচেতনতার কার্যকারিতা ঃ

শ্রেণীসচেতনতার কার্যকলাপ এক কথায় অভিনব রূপ পরিগ্রহ করে। সর্বহারাশ্রেণী সমগ্র হিসাবে সমাজকে কেন্দ্র থেকে পর্যবেক্ষণ করবে। এবং সর্বহারাশ্রেণীর ক্রিয়াকলাপই বৈপ্লবিক রূপান্তরণ হিসাবে সামগ্রিকতার সঠিক উপলব্ধি ঘটাতে পারে। যখন পুঁজিবাদের চূড়ান্ত অর্থনৈতিক সংকট বিকশিত হবে তখন বিপ্লবের ভাগ্য নির্ধারিত হবে সর্বহারাশ্রেণীর মতাদর্শগত পরিণতির উপলব্ধির দ্বারা। এটি হবে ইতিহাসের অন্তিম শ্রেণীসচেতনতা। এই শ্রেণী নিজেকে মুক্ত করতে পারবে না যতক্ষণ না শ্রেণী সমাজকে নিশ্চিহ্ন করে সমগ্র মানবজাতির মুক্তি অর্জন করতে পারবে।

শ্রেণীসচেতনতার পথে বাধা ঃ

(১) শ্রেণীসচেতনতা নিজের অভ্যন্তরেই বিভাজিত। অর্থনৈতিক সংগ্রাম সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে পৃথক।

(২) আপাত এবং চূড়ান্ত লক্ষ্যের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের বিষয়ই শ্রেণীসচেতনতার মধ্যে অনুপস্থিত থাকতে পারে।

(৩) অনেক সময় কোন পৃথক পৃথক উপাদান এবং সামগ্রিকতার বিষয়ের সাথে সমন্বয়সাধনের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

শ্রেণীসচেতনতা এবং শ্রমিক কাউন্সিল ঃ

শ্রেণীসচেতনতা হলো কোন শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে তার চেতনা। এ সচেতনতা একপ্রকারে আরোপিত সচেতনতা অর্থাৎ এ সচেতনতা সম্ভব হয় যদি সর্বহারাশ্রেণী তার নিজস্ব স্বার্থ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকে। শ্রেণীসচেতনতার একটি প্রকার হচ্ছে বৈপ্লবিক শ্রমিক কাউন্সিল গঠন করা। প্রতিটি সর্বহারা বিপ্লব এই ধরনের কাউন্সিল গঠন করেছে। কাউন্সিলের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে পেতে তা একসময় রাষ্ট্রের অংশে পরিণত হয় যা সর্বহারার শ্রেণীচেতনতার একটি উৎকৃষ্ট লক্ষণ। এর মাধ্যমে বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দের আধিপত্যকে শিথিল করা যায়।

চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসাবে ক্ষমতা দখলের সংগ্রামের ক্ষেত্রে সর্বহারার দুটি দায়িত্ব এসে যায় : সময় এবং স্থানের দিক থেকে সর্বহারাশ্রেণীর মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতার মানসিকতা থাকে তাকে অতিক্রম করা। দ্বিতীয়তঃ অর্থনৈতিক (তাৎক্ষণিক লক্ষ্য) এবং রাজনৈতিক (রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা) লক্ষ্যের মধ্যে বিষয়টি সমৃদ্ধ করতে হবে এবং তাৎক্ষণিক লক্ষ্য (স্বার্থ) এবং চূড়ান্ত লক্ষ্যের (স্বার্থের) মধ্যে যে দ্বান্দ্বিক সংঘাতের বিষয় থাকে তার সমাধান করতে হবে। সর্বহারাশ্রেণী নিজেদেরই যথাযথভাবে রূপান্তর করে শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে তোলার মাধ্যমে নিজের শ্রেণীর অবসানের প্রচেষ্টা থাকবে। এবং তারজন্যও সংগ্রাম করতে হবে। এ সংগ্রাম হবে নিজের বিরুদ্ধেই এক সংগ্রাম।

বিশ্লেষণী মন্তব্য সমূহ ঃ

(১) লুকাসের তত্ত্ব প্রথম সমালোচিত হয় কমিনটার্স, বলশেভিক এবং হাঙ্গেরীয় কমিউনিস্ট দল থেকে। তারা বলেন, লুকাস যে তত্ত্বের বিকাশসাধন করেছেন তা শ্রেণীসচেতনতার এক অধিবিদ্যক ধারণা এবং তা মার্কসীয় তত্ত্ব নয়। এর বিরুদ্ধে ফিশারের ন্যায় মার্কসবাদী বলেন, লুকাসের তত্ত্ব লেনিনবাদী, কারণ লেনিনের মতো লুকাসও শ্রেণীসচেতনতার উপাদান সমূহকে বিশ্লেষণ করেন নির্দিষ্ট সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে।

(২) লুকাসের তত্ত্ব হেগেলবাদী (লেফট), যদিও তা সরল বস্তুবাদকে বর্জন করেছে যা ছিল পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের মূলভিত্তি। এই পরিবর্তন প্রধানতঃ রাশিয়াবাসীদের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছিল।

(৩) শ্রমিক কাউন্সিলের চিন্তাধারার উৎস হচ্ছে সিণ্ডিক্যালিজমের প্রভাব। তিনি বলশেভিকীকরণের বিরোধী ছিলেন।

(৪) লুকাস সমালোচিত হন শ্রেণীসচেতনতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়ার জন্য। কারণ সাম্যবাদী দল ছাড়া কিভাবে এই সচেতনতা বিকশিত হবে তার কোন ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারেননি।

(৫) তাঁর '১৯৬৭ সালের প্রস্তাবনায়' নিজস্ব তত্ত্বের আত্মসমালোচনার বিষয় দেখা যায়। এবং তিনি তার জন্য ত্রুটী স্বীকারও করেন। এবং তা সত্ত্বেও তাঁর চিন্তার গুরুত্ব যথেষ্ট রয়েছে।

নমুনা প্রশ্ন ঃ

১। লুকাসের শ্রেণীসচেতনতার তত্ত্বের উৎপত্তি ব্যাখ্যা কর।

২। লুকাসের শ্রেণীসচেতনতার তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

৩। লুকাস কীভাবে সামগ্রিকতার পদ্ধতির সাথে শ্রেণীসচেতনতার সংযোগ ঘটান তা আলোচনা কর।

ছোট প্রশ্ন ঃ

১। শ্রেণীসচেতনতা হল 'আরোপিত শ্রেণীচেতনা'।—এর ওপর টীকা লেখ।

২। সামগ্রিকতার ধারণার ওপর টীকা লেখ।

৩। শ্রেণীসচেতনতার কাজগুলি কী ?

৪। শ্রেণীসচেতনতার বাধাগুলি কী ?

৫। শ্রেণীসচেতনতার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ।—এর ওপর টীকা লেখ।

সহায়ক পুস্তকঃ

1. Lukaes, G : History and Class Consciousness.
2. Meszaros, I : Aspects of Class Consciousness.
3. Maclellan, D : Marxism After Marx.

পাঠ - ৯

বিষয় ঃ জার্জেন হ্যাবারমাস — তাত্ত্বিক পরিকাঠামো — বৈধতার সংকট — রাষ্ট্র-সমাজ সম্পর্ক — মূল্যায়ন।

১। সূচনা ঃ

হ্যাবারমাস (জন্ম ১৯২৯, ১৮ই জুন) সাম্প্রতিককালে বিশ্বের এবং বিশেষকরে পশ্চিমের একজন বিশিষ্ট মার্কসীয় চিন্তাবিদ। তিনিই পৃথিবীর শেষ মার্কসবাদী বলে নিজেকে দাবী করেন। নাৎসী জার্মানীতে তিনি বড় হন, তিনি নিজেকে মৌলিক চিন্তাবিদ হিসাবে দাবী করেন ১৯৫০ সালে। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে এটা বলা যায় যে এডর্নোর প্রভাবে তিনি প্রভাবান্বিত হন এবং নিজেকে তার সহযোগী করে তোলেন। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল সম্পর্কিত গবেষণার সঙ্গে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি তাকে অতিক্রম করে একটি ভিন্নধরনের তাত্ত্বিক পরিকাঠামো গড়ে তোলেন। এডর্নোর সঙ্গে একমত না হয়েও, যিনি বিশ্বাস করতেন জ্ঞান এবং মূল্যের প্রকৃত কোন ভিত্তি নেই। হ্যাবারমাস উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধীতা করেন এবং বলেন যে সমস্যার ভিত্তিকে বিশ্লেষণ করা যায়। তিনি সমালোচনাধর্মী তত্ত্বের দার্শনিক বিশ্লেষণসমূহকে বিকশিত করার চেষ্টা করেন যেগুলি গ্রীক এবং জার্মানদর্শনের কেন্দ্রীয় চিন্তাভাবনার পুনর্গঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এগুলি হল ঃ সত্য এবং সৌন্দর্যর অবিচ্ছেদ্যতা, তথ্য এবং মূল্য এবং তত্ত্ব ও বাস্তবের সম্মিলন। এটা সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন মতকে একসূত্রে গ্রথিত করার একটি প্রচেষ্টা।

জ্ঞানতত্ত্ব ঃ

যে আদর্শবোধ হ্যাবারমাসকে চালিত করেছিল তা হলো সমালোচনাধর্মী তত্ত্বকে পুনর্গঠিত করা বিংশশতাব্দীর ইতিহাসের আলোকে। এগুলি হল ঃ রাশিয়ার বিপ্লবের অধঃপতন এবং স্তালিনবাদের উদ্ভব, এবং প্রকৌশলগত পরিচালনা, পশ্চিমে বিপ্লব ব্যর্থ হওয়া ; সর্বহারাশ্রেণীর জনগণের বিপ্লবী শ্রেণীসচেতনতার অভাব ; এবং মার্কসীয় তত্ত্বের পৌনঃপুনিক ব্যর্থতা — একে বিজ্ঞানের নিয়তিবাদে অথবা হতাশাজনক সংস্কৃতির সমালোচনায় নিমজ্জিত করেছিল।

হ্যাবারমাস সমসাময়িক পুঁজিবাদের অসংখ্য পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রাখেন ঃ মধ্যস্থতাকারী হিসাবে রাষ্ট্রের বর্ধিত ভূমিকা; রাষ্ট্রের সমর্থন এবং বাজারের পরিবর্তে রাষ্ট্রের উদ্যোগে বাজারের বৃদ্ধি ; পুঁজিবাদের 'সাংগঠনিক' ক্ষমতাবৃদ্ধি ; আমলাতন্ত্রের বর্ধিত ভূমিকা যা জনগণের ক্ষেত্রকে ভীতিপ্রদর্শন করে এবং যার মধ্যে নাগরিকদের রাজনৈতিক জীবনের খোলামেলা আলোচনাও পড়ে ; এবং নূতন ধরনের সংকটসমূহের প্রবণতার আবির্ভাব যা সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার বৈধতার পক্ষে বিপদজনক।

হ্যাবারমাসের তাত্ত্বিক পরিকাঠামোর গঠনের মৌলিক অংশটি হলো ঐতিহাসিক—অনুসন্ধান এবং জনগণের ক্ষেত্রের ব্যাপকতা হ্রাস ; পুঁজিবাদী সমাজসমূহে আধুনিক বিজ্ঞান এবং কৃৎকৌশলের পরীক্ষা এবং তাদের দিকনির্ণয় ; সমালোচনাধর্মী তত্ত্বের দার্শনিক পরিকাঠামোর বৃদ্ধি ; কর্মতত্ত্বের (Action theory) বিকাশ, এবং বর্তমানে পুঁজিবাদ যে সমস্ত সংকটের সম্মুখীন তার বিশ্লেষণ। তাঁর চিন্তাধারা বুঝতে গেলে যে সমস্ত রচনা সাহায্য করবে সেগুলি হল ঃ তত্ত্ব এবং বাস্তব (১৯৬৩/৭৩) ; যুক্তিসংগত সমাজের দিকে (১৯৬৮) ; জ্ঞান এবং মানব স্বার্থসমূহ (১৯৭১) ; বৈধতার সংকট (১৯৭৬) ; সংযোগ রক্ষা এবং সমাজের বিবর্তন (১৯৭৯)।

ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলোত্তর বিশিষ্ট চিন্তাবিদ হিসাবে হ্যাবারমাস, তাঁর জ্ঞানতত্ত্বের বিকাশসাধন করেন। তিনি জ্ঞানতত্ত্বের ভিত্তি মানবস্বার্থসমূহের মধ্যে খুঁজে পান। সেই অনুসারে তিনি তিনপ্রকারের জ্ঞানতত্ত্বকে চিহ্নিত করেন যা তিনরকমের জ্ঞানের গঠনমূলক স্বার্থসমূহ।

প্রথমতঃ তিনি বৈশ্লেষিক বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানের কথা বলেছেন, যে ক্ষেত্রটি অভিজ্ঞতাবাদী এবং যার ভিত্তি

হলো প্রকৌশলগত স্বার্থ। এই স্বার্থগুলি আবার বস্তুগত প্রয়োজন এবং শ্রমের উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয় যে ক্ষেত্রটির কথা বলেছেন তার নাম হলো হারমিনিউটিক জ্ঞান। এই জ্ঞানের ভিত্তি হলো ব্যবহারিক স্বার্থ; এই স্বার্থটি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে এবং গোষ্ঠীভূত ব্যক্তির মধ্যে যে পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া চলে তার মধ্যে দিয়ে পরিস্ফুট হয়। তৃতীয়তঃ হ্যাবারমাস সমালোচনাধর্মী জ্ঞান বা আত্মপ্রতিফলিত জ্ঞানের কথা বলেছেন। এই জ্ঞানের ভিত্তি হলো যুক্তিকামী স্বার্থসমূহ যেগুলি ক্ষমতা প্রয়োগজাত কর্মপ্রণালী থেকে উৎসারিত।

স্পষ্টতই ঃ হ্যাবারমাস অভিজ্ঞতাবাদ এবং বিজ্ঞানবাদকে বাতিল করেন; জ্ঞান সম্বন্ধে যে তত্ত্ব তিনি রচনা করেন সেটি দর্শননির্ভর এবং যুক্তিবাদী। এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য হলো কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে যুক্তিবাদী মিথষ্ক্রিয়ার থেকে যে ঐকমত্য বেরিয়ে আসবে সেটিই হবে জ্ঞানের নিগূঢ় অর্থ।

বৈধতার সংকট ঃ

হ্যাবারমাসকে অনুসরণ করে বলা যায় যে বৈধতার সংকট উন্নত পুঁজিবাদের এক প্রধান প্রশ্ন। এটা বর্ণনা করে যে, উন্নত পুঁজিবাদ তার অভ্যন্তরেই আত্মপরিবর্তনের সম্ভাবনাসমূহকে উপস্থিত করে। যদিও উন্নত পুঁজিবাদ তার প্রশ্নের অকাট্য উত্তরদিতে অপারগ। কিন্তু একদিকে অনিশ্চয়তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের মধ্যস্থতাকারী ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং অন্যদিকে এর ফলস্বরূপ শ্রেণীদ্বন্দ্ব হ্রাস পায়। তিনি মতপ্রকাশ করেন উন্নত পুঁজিবাদে শ্রেণীকাঠামো শ্রেণী সমঝোতার মধ্যে দৃশ্যমান হয় যার অভ্যন্তরে শ্রেণীসচেতনতা হ্রাস পায়। তিনি জোর দিয়েছেন অ-অর্থনৈতিক সংকটসমূহের সম্ভাবনার উপর যেগুলি হল-বৈধতার সংকট এবং উদ্দেশ্যহীনতার সংকট।

তাঁর প্রধান যুক্তি হলো ঃ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তার কার্যকরী স্বাধিকার হারিয়ে দেশে বা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থনৈতিক সংকটকে রাজনৈতিক সংকটের দিকে চালিত করা হয়। তাঁর কাছে নয়া সমালোচনাধর্মীতত্ত্বের প্রধান কাজ হলো সেই সমস্ত সংকট সম্ভাবনাসমূহকে বিশ্লেষণ করা যার অভ্যন্তরে সংকট সাময়িকভাবে স্তিমিত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা অমীমাংসিত শ্রেণীবিরোধ।

তিনি পুঁজিবাদের বৈধতার সংকটকে আরো বিস্তৃতভাবে পশ্চিমের উন্নত পুঁজিবাদে রাষ্ট্র এবং সমাজের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁর বিশ্লেষণকে উপস্থাপিত করেছেন।

একচেটিয়া পুঁজিবাদের উদ্ভব পর্যন্ত রাষ্ট্র এবং সমাজের সম্পর্কের পরিবর্তন এবং নির্দিষ্টভাবে বলশেভিক বিপ্লবের পরে — একে বোঝার জন্য প্রথমদিকের 'পশ্চিমী মার্কসবাদী হিসাবে গ্রামশি যেভাবে বুঝেছিলেন তা দেখাবার চেষ্টা করলেন। গ্রামশি দেখালেন রাষ্ট্র এবং সমাজের সম্পর্কের ক্ষেত্রে পশ্চিমী দুনিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার পার্থক্য রয়েছে। তিনি আরোও দেখালেন যে পশ্চিমী দুনিয়ায় লোকসমাজের উপর রাষ্ট্রের ভূমিকা অনেক বেশী যেখানে বিপ্লব পূর্ব রাশিয়ায় লোকসমাজে রাষ্ট্রের ভূমিকা প্রায় ছিলনা বললেই চলে।

হ্যাবারমাস-এর ধারণা এক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পথপ্রদর্শক। কারণ, তিনি যুদ্ধ পরবর্তী পশ্চিমী দুনিয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানকে ব্যবহার করে সবথেকে বেশী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর ধারণা আজকের দিনে পশ্চিমী রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রাণ এবং বিশেষকরে গণতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর ধারণা আজকের দিনে যা বিতর্কের প্রাণকেন্দ্রও।

মূল ধারণা যা বাদ দিয়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা যায়না সেগুলি হল ঃ সংগঠিত অথবা পুঁজিবাদের অন্তিম পর্যায়; সংকট; সংগঠিত পুঁজিবাদের চাররকমের সংকট সম্ভাবনা ; রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম, রাষ্ট্র-বাজার সম্পর্ক, বৈধতা সংকট এবং রাষ্ট্র এবং জনগণ সংক্রান্ত ক্ষেত্র।

সংগঠিত পুঁজিবাদের ধারণা ঃ

মূলগতভাবে এই শতাব্দীর প্রারম্ভে হিলফার্ডিং সংগঠিত পুঁজিবাদের ধারণা প্রাথমিকভাবে অবতারণা করেন পুঁজিবাদী সমাজের পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। তিনি পুঁজিবাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকে নিম্নলিখিতভাবে চিহ্নিত করেন ঃ পুঁজিবাদের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রাধান্য এবং অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা ; এই ধরনের পরিকল্পনাকে আন্তর্জাতিক স্তরে বিস্তৃত করা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ; এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর সম্পর্কের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা। পরবর্তী সময়ে এই পুঁজিবাদের লক্ষ্য হল অর্থনীতিকে এমনভাবে পরিবর্তন করা যাতে বৃহৎ কর্পোরেশনগুলি—এই কাজ পরিকল্পিত এবং সংগঠিত ভাবে করতে পারে এবং যার দ্বারা এই সমস্ত কাজকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। হ্যাবারমাসের সংগঠিত পুঁজিবাদ সম্পর্কে যা ধারণা তা হিলফার্ডিং এরই অবদান। হ্যাবারমাস একে 'রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদ' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। এই ব্যবস্থার সামাজিক অগ্রগতি সংকট এবং দ্বন্দ্বের মধ্যে অগ্রসর হয়।

সংকটের ধারণা ঃ

মার্কসকে দিয়ে শুরু করলে বলা যায় তিনিই প্রথম (পুঁজিবাদী) ব্যবস্থার সংকটের সমাজতাত্ত্বিক ধারণাকে বিকশিত করেন। হ্যাবারমাস মার্কসের ধারণাকে সংস্কারসাধন করেন। মার্কস পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক সংকট সম্পর্কে অনুমান করেছিলেন এই ধারণা থেকে যে পুঁজিবাদী সমাজের এই কুশলতা আছে যাতে সে ধারাবাহিকভাবে উৎপাদিকা শক্তির যান্ত্রিক অগ্রগতি ঘটাতে পারে কিন্তু এতে অর্থনৈতিক উন্নতি সংকটগ্রস্ত হবে এবং এটি এমন এক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত হবে যাতে উপরোক্ত বিষয়টি প্রকাশ্য বা গোপন যাই হোক না কেন এটি একটি ক্ষমতা সম্পর্ক দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে। পুঁজির সামগ্রিক একীভবন একটি ধারাবাহিক এবং পর্যায়ক্রমিক পুঁজির উপাদানগুলির অবমূল্যায়নের মাধ্যমে অগ্রসর হয় যা একটি সংকটের চক্র তৈরী করে। এই প্রসঙ্গে হ্যাবারমাসের মূল প্রশ্ন ঃ তাহলে কি শেষপর্যায়ের পুঁজিবাদও কি প্রাথমিক পর্যায়ের পুঁজিবাদের মতই এই আত্মধ্বংসকারী প্রক্রিয়া অবলম্বন করেই বিকশিত হয় ?

এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি শেষপর্যায়ের পুঁজিবাদী সমাজের কাঠামোর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেন—অর্থনীতির কেন্দ্রীভবনের প্রক্রিয়া এবং সংগঠিত বাজার তৈরীর জন্য পন্য, পুঁজি এবং শ্রমকে সংগঠিত করা যায়। উদ্যোগগ্রহণকারীর কাজ হবে বাজারের ক্রমবর্ধমান ব্যবধানকে পূরণ করা। সরকারের এই হস্তক্ষেপ বা এই সহযোগী এবং আংশিক ভূমিকা—বাজারের ক্ষেত্রে এর অর্থই হল উদারনৈতিক পুঁজিবাদের অবসান। হ্যাবারমাসের তত্ত্বে রাষ্ট্রকে দেখা যাবে কেবলমাত্র প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এবং শেষপর্যায়ের পুঁজিবাদের এটি একটি রাষ্ট্রের অন্যতম কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য বলে তিনি মনে করেন। (অর্থনৈতিক এবং বৈধতা ব্যবস্থা হল অপর দুটি বৈশিষ্ট্য) এছাড়াও তাঁর মতে রাষ্ট্রের দুটি মূলগত ভূমিকা হল — (১) অর্থনৈতিক চক্রকে আন্তর্জাতিক পরিকল্পনার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা এবং (২) পুঁজি ব্যবহারের শর্তগুলিকে উন্নত করা।

পুঁজিবাদের চারটি সংকট সম্ভাবনা সম্পর্কে হ্যাবারমাসের বর্ণনামূলক মডেলগুলি হল ঃ অর্থনৈতিক, যৌক্তিকতা, উদ্যোগ এবং বৈধতা এবং তার পরিণত পুঁজিবাদ সম্পর্কে পুনরালোচনা যা হল পরিণত পুঁজিবাদের একটি স্বপরিবর্তনশীল কৌশল সম্ভাবনা। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তার কার্যগত স্বাতন্ত্র্যকে রাষ্ট্রের হাতে ছেড়ে দেয় এবং এরফলে অর্থনৈতিক সংকট রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে স্থানান্তরিত হয়। এবং বর্ধিত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে এরফলে যুক্তিসিদ্ধতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় (যান্ত্রিক যুক্তিসিদ্ধতার অবমূল্যায়ন সূচিত হয়) এবং উদ্যোগের ক্ষেত্রে সংকটের সৃষ্টি হয়। অপর একটি বিষয় হল শ্রেণীদ্বন্দ্ব হ্রাস পায়। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে উদ্যোগের সংকট দেখা দেয় ; উদ্যোগ তৈরীর ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন—যার ফল রাষ্ট্রের পক্ষে অকার্যকরী হয়। সামাজিক, পারিবারিক এবং কারিগরী ক্ষেত্রে ব্যক্তিমালিকানাবাদ—উদ্যোগ

সংকটের একটি ধরন। বৈধতার সংকট হল বুর্জোয়া দর্শনে বিনিময়ের অনায্যতা এবং বিনিময়ের ধবংসের ফল, এবং বাজারের কার্যগত দুর্বলতাও বৈধতার সংকট তৈরী করে। এক্ষেত্রে হ্যাবারমাসের বক্তব্য হল বৈধতার ক্ষেত্রে আরো বেশী সাহায্য প্রয়োজন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এবং রাষ্ট্রের এক্ষেত্রে আরো বেশী ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। রাষ্ট্রকে পরিচালনা করতে জনগণের বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য বৈধতার পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে এবং একই সঙ্গে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকে এড়িয়ে যেতে হবে যাতে পুঁজিবাদের মূলদ্বন্দ্ব ব্যক্তিগত সম্পদের মালিকানা এবং সামাজিক উৎপাদনের দ্বন্দ্ব সেটি যেন প্রকাশিত না হয়। রাষ্ট্রকে এক্ষেত্রে তার হস্তক্ষেপকে বাড়িয়ে আনার পক্ষে যুক্তিসিদ্ধতা তৈরী করতে হবে।

হ্যাবারমাসের রাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণা ঃ

(১) তিনি সেই সমস্ত রাষ্ট্রতত্ত্বকে সমালোচনা করেছেন যারা মনে করে রাষ্ট্র অর্থনৈতিক সূত্র মেনে চলবে তিনি অনুধাবন করেছেন যে এই প্রক্রিয়া স্বনিয়ন্ত্রিত। (২) তিনি সংশোধনবাদী মার্কসবাদী রাষ্ট্রতত্ত্বকে সমালোচনা করেছেন যারা মনে করে রাষ্ট্র সংগঠিত একচেটিয়া পুঁজির জন্য সচেতনভাবে কাজ করে। এবং সেজন্য রাষ্ট্রই সবচেয়ে বড় পুঁজিবাদী।

হ্যাবারমাস উপরোক্ত দুটি মতকেই অসম্পূর্ণ বলেছেন। তিনি বলেছেন প্রথমটি রাষ্ট্রকে অবজ্ঞা করে এবং দ্বিতীয়টি রাষ্ট্রের ভূমিকাকে চূড়ান্ত মনে করে।

তিনি রাষ্ট্রের ঘটনাগুলিকে দেখিয়েছেন—বৈজ্ঞানিক এবং যান্ত্রিক পদ্ধতির নিয়ন্ত্রিত সংগঠন এবং যৌথ দরকষাকষির ব্যবস্থা হিসাবে যা উৎপাদনের পদ্ধতিকে পরিবর্তিত করে। রাষ্ট্র যখন উৎপাদনের ক্ষেত্রে অধিক সক্রিয় হয় তখন পুঁজি ব্যবহারের পদ্ধতির পরিবর্তনের ক্ষেত্রগুলিকে উন্নত করে। রাষ্ট্র যদিও সক্রিয়ভাবে পরিকল্পনা বা খসড়া তৈরী করে না বা কখনই সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তৈরী করে না যেহেতু প্রশাসনিক ভাবে পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়।

রাষ্ট্রের প্রাথমিক ভূমিকা হল একটি পদ্ধতিকে রক্ষা করা এবং এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কাজ দুটি : মুনাফা এবং আয় থেকে প্রয়োজনীয় কর ধার্য করা এবং সেটিকে দক্ষভাবে কাজে ব্যবহার করা যাতে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিকর মূলধন ব্যবহারের ফলে যে সংকট তৈরী হয় তাকে কাটিয়ে তোলা যায় এবং একটি চিহ্নিত মডেল তৈরী করা যায়—এই অর্থকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে তা তৈরী করা। রাষ্ট্রের প্রচুর কাজ আছে কিন্তু সেগুলি হবে উৎপাদনমূলক এবং নিয়ন্ত্রণমূলক।

রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ এবং জনগণের ক্ষেত্র ঃ

জনকল্যাণের ধারণার উদ্ভব, জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে সংগঠিত করা, বাজার এবং অর্থনীতি জনগণের ক্ষেত্রে কাঠামোগত ব্যবস্থা পরিবর্তনের দিকে পরিচালিত করে এবং জনগণের ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে। জনগণের ক্ষেত্রের উদ্ভব ১৮শ শতাব্দীর জার্মানীর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় এবং এক্ষেত্রে সমালোচনামূলক যুক্তিবাদী আলোচনা সংগঠিত হয় যার ফলে রাষ্ট্রের কার্যক্রম বিবেচিত হয় এবং সমালোচনামূলক মূল্যায়ন তৈরী হয়। জনগণের ক্ষেত্র হ্রাস পেলে বা হারিয়ে গেলে গণতন্ত্রের নির্যাসও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অন্ততঃপক্ষে, জনগণের অংশগ্রহণের মাত্রার হার কমে যায়।

মন্তব্যসমূহ ঃ

হ্যাবারমাসের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই অনেক সমালোচনামূলক বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথমতঃ পেরি এ্যাণ্ডারসন বলেছেন যে, হ্যাবারমাস পুঁজিবাদী বৈধতাকে অতিক্রমের কথা বললেও কীভাবে অর্থাৎ কোন সমষ্টিগত প্রয়াসের মাধ্যমে পুঁজিবাদী বৈধতাকে অতিক্রম করে সমাজতান্ত্রিক বৈধতা রচিত হবে তার কোন ইঙ্গিত তাঁর লেখায় পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, এ্যাণ্ডারসন আরো বলেছেন যে হ্যাবারমাসের লেখার কাঠামো এবং বিষয়ী এই দুইয়ের সম্পর্কজাত যে সমস্যা তার কোন উত্তর নেই, যদিও হ্যাবারমাস ঠাণ্ডা লড়াইয়ের চরমপর্বে অন্যান্য মার্কসবাদীদের মতো স্থিতাবস্থার কাছে নতিস্বীকার করেননি।

তৃতীয়তঃ, টম বটোমোর হ্যাবারমাসের বিরুদ্ধে অনৈতিকহাসিকতার অভিযোগ এনেছেন। হ্যাবারমাস মুখ্যতঃ যে সমাজের আলোচনা করেছেন তাহলো আধুনিক সমাজ, কিন্তু সেই আধুনিক সমাজকে তিনি ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিচার করেননি। হ্যাবারমাসের তত্ত্ব সমগ্র মানবসমাজের গতিপ্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারেনা।

চতুর্থতঃ, বটোমোর আরো বলেছেন যে হ্যাবারমাস তাঁর লেখায় অর্থনৈতিক বিষয়গুলিকে তেমন গুরুত্ব দেননি। হ্যাবারমাস অর্থনৈতিক আলোচনা করে থাকলেও সে আলোচনাকে সমগ্র পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার আলোকে পরিচালিত করেননি।

পঞ্চমতঃ, অনেকেই হ্যাবারমাসের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছেন যে পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী দেশের সমাজ কাঠামোটির বিশ্লেষণ তিনি করেননি, এবং সেই সামাজিক কাঠামোর ভিতর শ্রেণীসচেতনতার অবস্থাটি কীরূপ তারও কোন আলোচনা করেননি।

সবশেষে হ্যাবারমাস যুক্তিবাদী প্রক্রিয়াকে তাঁর আলোচনার ক্ষেত্রে অবস্থান করানোর জন্য অনেকে তাঁর তত্ত্বের মধ্যে ম্যাক্স ওয়েবারের ভাববাদী চিন্তাপদ্ধতির ছাপ খুঁজে পান।

সহায়ক পুস্তক ঃ

1. Habermas, J : —Legitimation Crisis (1976)
2. : —Towards a Rational Society (1970)
3. : Knowledge and Human Interests (1971)
4. : Communication and the Evolution of Society (1979)
5. : Theory and Practice (1979)
6. : The Structure Transformation of the Public Sphere (1992)
7. : Moral Consciousness and Communicative Action (1990)
8. : Life World and system/ A Critique of Functionalist Reason (1987)
9. : The National Revolution. (1990)
10. Calhoun, C (ed) : Habermas and the Public Sphere (1992)
11. Thompson, J. B and Held D eds : Habermas Critical Debates (1982)
12. Bottomore, T : The Frankfurt School (1984)

পাঠ - ১০

বিষয় ঃ আনতোনিও গ্রামশি — গ্রামশিয় মার্কসবাদের তত্ত্বগত এবং পদ্ধতিগত বিচার্য বিষয়সমূহ — গ্রামশিয় ফ্যাক্টরী কাউন্সিলের ধারণা — গ্রামশির হেজিমনির তত্ত্ব।

সূচনা ঃ

বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বিতর্কিত মার্কসবাদী তাত্ত্বিক হলেন আনতোনিও গ্রামশি। তাঁর ধারণাগুলি শুধুমাত্র সমসাময়িক মার্কসীয় বিতর্ককে অনুপ্রাণিত করেনি, একইসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন স্কুলকেও তা অনুপ্রাণিত করেছে। এই ইতালীয় মার্কসবাদী মার্কসবাদের এক বিকল্প পথের বিকাশের প্রচেষ্টা রাখেন। এই বিকল্প পথ যা কেবলমাত্র পশ্চিমের অবস্থাই বর্ণনা করেনি, একইসঙ্গে তা বিংশ শতাব্দীর বিশ্বপুঁজিবাদের অবস্থাকেও বর্ণনা করেছে। এবং সেজন্যই পশ্চিমের এবং সমগ্র বিশ্বের বিপ্লবের জন্য তিনি একটি বিকল্প রণনীতির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর মার্কসবাদের কেন্দ্রীয় ধারণা—হেজিমনির ধারণা যা ইতিমধ্যে বহুল পরিচিত। তাঁর অন্যান্য ধারণাগুলির নিজস্ব স্বকীয়তায় যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

একজন 'পশ্চিমী' মার্কসবাদী ঃ

পেরি এ্যাণ্ডারসন অন্যান্য পশ্চিমী মার্কসবাদীদের মতোই (যেমন—লুকাস, আলথুসার, হ্যাবারমাস) গ্রামশিকে ও পশ্চিমী মার্কসবাদী হিসাবে অভিহিত করেন। তিনি এমন একটা পরিস্থিতিতে তাঁর তত্ত্বকে সূত্রায়িত করেন যখন মার্কসীয় তত্ত্বের সঙ্গে সর্বহারাশ্রেণীর বাস্তবতার এক ফারাক পরিলক্ষিত হয়। যে সাধারণ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে পশ্চিমী মার্কসবাদের জন্ম ঐ একই পরিস্থিতিতেই গ্রামশিয় মার্কসবাদের আবির্ভাব ঘটে। গ্রামশি খুবই ঘনিষ্ঠভাবে ইতালীয় এবং আর্ন্তজাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি, তাঁর তত্ত্বকে সূত্রায়িত করার সময় ফ্যাসিস্ট জেলে আবদ্ধ ছিলেন। স্বভাবতই তিনি বাস্তব রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরে ছিলেন এবং তার সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হন। অন্যান্য পশ্চিমী মার্কসবাদীদের মতোই গ্রামশির তত্ত্বেরও সোভিয়েত মার্কসবাদের বিরুদ্ধে বিশেষকরে স্তালিনীয় বৈচিত্র্যের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হিসাবেই আবির্ভাব ঘটে। গ্রামশি পশ্চিমী ইউরোপের পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লবের বলশেভিক মডেলের বহু সম্ভাবনাকে মৌলিকভাবেই বিরোধীতা করেছেন। মার্টিন জ্যাকস (১৯৮৭) গ্রামশিকে "পশ্চিম ইউরোপের বিপ্লবের তাত্ত্বিক" হিসাবে অভিহিত করেছেন।

গ্রামশির কেন্দ্রীয় অন্বেষণ ঃ

পশ্চিমের বিপ্লবের প্রশ্ন গ্রামশির চিন্তার কেন্দ্রীয় বিষয়। তাঁর কেন্দ্রীয় অন্বেষণ হলো পশ্চিমের বিপ্লবের জন্য একটি প্রকৃত উপযুক্ত রণনীতি গঠন করা। তিনি এই বিষয়ের সঙ্গে অত্যধিক জড়িত কারণ বিপ্লবের বলশেভিক মডেলের বিশ্বজনীন প্রয়োগের সঙ্গে তিনি একমত ছিলেন না। এই অন্বেষণে তিনি প্রচেষ্টা রাখেন একটি বিকল্প পদ্ধতির বিকাশের। তিনি রাশিয়ার (১৯১৭র আগে) এবং পশ্চিমের সামাজিক ঐতিহাসিক অবস্থার যে মৌলিক পার্থক্য তাকে চিহ্নিত করেন। তিনি দাবী করেন : "রাশিয়ায় রাষ্ট্রই ছিল সবকিছু ; পৌরসমাজ ছিল আদিম। পশ্চিমে রাষ্ট্র এবং পৌরসমাজের মধ্যে একটা সাযুজ্য ছিল।" এই পদ্ধতিগত নীতিই হলো তাঁর সমগ্র মার্কসীয় চিন্তার ভিত্তি।

গ্রামশির মার্কসবাদ অনুধাবনের সমস্যা ঃ

প্রথমত ঃ গ্রামশি একগুচ্ছ সমস্যার মধ্যেও পরিশ্রম করে তাঁর তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করেন যা ঐতিহাসিক এবং একইসঙ্গে পদ্ধতিগত দিক থেকে সুবিন্যস্ত। প্রথমেই তাঁর তত্ত্বের ঐতিহাসিক পরিস্থিতির প্রতিষ্ঠার যে সমস্যা তা লক্ষ্য করা যেতে পারে। গ্রামশি ত্রিবিধ পরিস্থিতিতে তত্ত্বকে সূত্রায়িত করেন। আঞ্চলিক পরিস্থিতি অর্থাৎ ইটালীয় পরিস্থিতি; পশ্চিম ইউরোপের পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি। তিনি ঘনিষ্ঠভাবেই রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন যা উপরোক্ত তিনটি ক্ষেত্রকেই স্পর্শ করে। প্রত্যেক পরিস্থিতিকেই তিনি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন। মার্কসীয় রাজনৈতিক বৈজ্ঞানিক যেমন স্টুয়ার্ট হল (১৯৮৭) জোর দেন নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতি এবং গ্রামশির চিন্তার স্বাতন্ত্র্যতার উপর, এবং সতর্ক করেন তত্ত্বের নামে অতি সহজে ঐতিহাসিক সাধারণ রূপের যে পরিবর্তন এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে বা এক যুগ থেকে অন্য যুগে যে পরিবর্তন তার বিরুদ্ধে। জ্যাকস্ (১৯৮৭) জোর দেন গ্রামশির পশ্চিম ইউরোপীয় মাত্রার উপর।

দ্বিতীয়ত ঃ গ্রামশির মার্কসবাদ সম্পর্কে অনেক প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। ইতালীয়—অথবা আন্তর্জাতিক—তাঁর চিন্তার প্রামাণ্য মাত্রা কী ? তাঁর চিন্তার সঙ্গে লেনিনের চিন্তার কী সম্পর্ক ? তাঁর বিভিন্ন সময়ের লেখা পত্রের মধ্যে কি কোন ঐক্যবদ্ধ বন্ধন আছে ? পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিকাশের সঙ্গে তাঁর তত্ত্বের কতটা সম্পর্ক আছে ? তিনি কি প্রকৃতই একটি বিকল্প সাম্যবাদের কথা বলেছেন, যদি বলেন, তাহলে তার প্রামাণ্য মাত্রাগুলি কী? উপরোক্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর অতি সহজে বর্তমানে গ্রামশি সংক্রান্ত যে সমস্ত লেখা পত্র আছে তাতে পাওয়া যাবে না।

তৃতীয়ত ঃ গ্রামশি, পশ্চিমের নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিশেষকরে একচেটিয়া পুঁজিবাদের যুগে রাষ্ট্র এবং সমাজের মধ্যে পরিবর্তিত সম্পর্ককে নির্ধারণ করেছেন, যার ফলে পশ্চিমের ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের উত্তরণের নির্দিষ্ট পদ্ধতির প্রতি তিনি আলোকপাত করেছেন। তিনি লেনিনবাদী এই কারণে যে, লেনিনের মতো তিনিও বাস্তব পরিণতির উপর নির্ভর করে এক বাস্তব বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বিপ্লবের জন্য পশ্চিমের ক্ষেত্রে এক নির্দিষ্ট রণনীতির প্রয়োজনের কথা বলেছিলেন। একচেটিয়া পুঁজিবাদের যুগে তিনি পশ্চিমের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বর্ধিত ভূমিকার প্রতি বিশেষভাবে নজর দিয়েছিলেন।

গ্রামশি সম্পর্কে কোলাকাউস্কির দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

গ্রামশি লেনিনের কর্তৃত্ব সম্পর্কে কোনদিন প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। তবুও তার লেখাগুলি কতকগুলি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে লেনিনের থেকে পৃথক, বিশেষকরে সাম্যবাদের এক বিকল্প ধারণা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে। তাঁর লেখাগুলিতে তত্ত্ব সুসংহত রূপে নিতে পারেনি, কিন্তু তাতে আছে অস্পষ্ট এবং মৌলিক নকশা। তাদের মধ্যে কিছু আছে স্পষ্ট এবং মৌলিক ধারণা যার সাহায্যে যুক্তিসঙ্গত ভাবে একটা স্বাধীন কমিউনিস্ট মতাদর্শ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা ছিল, এবং তা শুধুমাত্র লেনিনবাদী নকশার উপযোগী করে নয়। গ্রামশি এক বিকল্প সাম্যবাদের শ্রেণী মতাদর্শ দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ বিপ্লব, তাঁর কাছে, শুধুমাত্র ক্ষমতা দখলের এক প্রযুক্তিগত কাজ নয়। সাম্যবাদী বিপ্লব হলো একটি গণপ্রক্রিয়া তাঁর দৃষ্টিতে সাম্যবাদ হলো শ্রমিকশ্রেণীর কাউন্সিলের দ্বারা পরিচালিত সরকার, যা লেনিন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

ফ্যাক্টরী কাউন্সিল ঃ

তাঁর অন্যান্য ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত এই ধারণাটিও একটি কেন্দ্রীয় ধারণা। পশ্চিমের রাষ্ট্র এবং সমাজের মধ্যে যে সম্পর্ক এটা হলো তার নূতন করে মুখবন্ধ স্বরূপ। গ্রামশির এই ধারণাটি তাঁর প্রথমদিকের রাজনৈতিক জঙ্গিয়ানা থেকেই উদ্ভুত হয়। তাঁর প্রথমদিককার সোভিয়েত রাশিয়া সংক্রান্ত লেখাতে তিনি নির্দিষ্টভাবে কমিউনিস্ট দলের সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন না। তাঁর প্রবন্ধ 'পুঁজির বিরুদ্ধে বিপ্লব' (১৯১৭, নভেম্বর)-এ তিনি সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবের এক নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলেন যার মধ্যে দলের ভূমিকাকে সংজ্ঞায়িত করেন নি।

তাঁর কাছে, শ্রমিকশ্রেণীর সাংগঠনিক রূপ হলো শ্রমিকদের কাউন্সিল যা তিনটি পরিপ্রেক্ষিতের বিরোধিতা করে : (ক) তিনি ইতালীয় শ্রমিকদের সাংগঠনিক ব্যবস্থার জন্য রাশিয়ার পথের নকশাকে বাতিল করেন। (খ) ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার ট্রেড ইউনিয়ন যুদ্ধোত্তর সংকট পর্বে পর্যাপ্ত ভূমিকা পালন করেননি এবং সমস্ত শ্রমিককে সংগঠিত করতেও অপারগ ছিল। এবং প্রয়োজন ছিল ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির যে সমস্ত অস্তিত্বহীন কমিটিগুলি ছিল তাদেরকে শ্রমিকদের কাউন্সিলে পরিবর্তিত করা, এবং (গ) রাষ্ট্রের বর্ধিত ভূমিকার সাহায্য ছাড়াই উৎপাদিকাশক্তির বিকাশে বুর্জোয়াদের যে অসক্ষমতা তাকে জয় করা।

শ্রমিকদের কাউন্সিল হবে শ্রমিকদের দ্বারা নির্বাচিত এবং সমস্ত শ্রমিকের প্রতিনিধি। এটা ছিল একটা নূতন বিস্তৃত ভূখণ্ড যা দলের পক্ষে রাজনৈতিক মধ্যস্থতার দ্বারা ট্রেড ইউনিয়নের কর্পোরেটিজমকে ভেঙে ফেলে। তারা শ্রমিকদের রাষ্ট্রের মডেলকে সাহায্য করে। শ্রমিকশ্রেণীর জঙ্গিয়ানার রাজনৈতিক স্বতঃস্ফূর্ততার থেকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রস্তুত হয়। পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করার কাজে নিয়োজিত হয় এবং একইসঙ্গে বিপ্লবের মধ্যে তা শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণের এক অঙ্গে পরিণত হয়। গ্রামশি বলেছেন ঃ "সমাজবাদী রাষ্ট্র ইতিমধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অস্তিত্বশীল শোষিত শ্রমিকশ্রেণীর সামাজিক জীবনের প্রতিষ্ঠানগুলির চরিত্রের মধ্যে।" তিনি আরো বলেন, "কাউন্সিল হলো একটি শ্রেণী এবং একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান।" ফ্যাক্টরী কাউন্সিল অসংগঠিত শ্রমিকদের সংগঠিত করতে ট্রেড ইউনিয়নের সাহায্য করবে। এগুলি হল জনগণের অংশ যেখানে ইউনিয়নগুলি ব্যক্তিগত। এ দুইয়ের মধ্যে কোন অধীনতা এবং স্তরবিন্যাসের সম্পর্ক নেই। ফ্যাক্টরী কাউন্সিল হলো দলকে সাহায্য করার এক সহযোগী সংগঠন। কেননা অগ্রবর্তী অংশ হিসাবে দল সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করতে অক্ষম। ফ্যাক্টরী কাউন্সিল দল এবং ব্যাপক যে শ্রমিকশ্রেণী অসংহত অবস্থায় থাকে তাদের মধ্যো এক সেতুবন্ধনের কাজ করে এবং এ দুইয়ের সম্পর্ককে আরো ঘনিষ্ঠ করে তোলে। এগুলি হল বিপ্লবের অংশ হিসাবে এক গণপ্রক্রিয়া।

ফ্যাক্টরী কাউন্সিল ধারণাকে যুক্ত করে গ্রামশি বিপ্লবের সংকটের তত্ত্বকে বাতিল করেন। তাঁর কাছে সমাজতন্ত্রে উত্তোরণ অর্থনৈতিক স্ববিরোধীতার নাটকীয় পতনের সঙ্গে দৃঢ় সংঘবদ্ধ নয়, কিন্তু এটি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রক্রিয়ার মধ্যেই শুরু হয়। তাঁর এই ধারণার পেছনে যে তাৎপর্য্য কাজ করছে তা হলো বিপ্লবের পর দল উপদেশ দিতে পারে, কিন্তু নূতন রাষ্ট্রের মৌলিক স্তরে উত্তীর্ণ হবে না।

'হেজিমনি'র তত্ত্ব ঃ

সূচনা ঃ

গ্রামশির রাজনৈতিক তত্ত্বের কেন্দ্রীয় এবং মৌলিক বিষয় হলো তাঁর হেজিমনির ধারণা। মার্কসবাদে এবং আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এটি হলো তার প্রধান অবদান। বিষটি 'নির্বাচিত কারারচনা' গ্রন্থটিতে দুর্ভাগ্যবশতঃ অস্বচ্ছ,

সীমাবদ্ধ এবং অপর্যাপ্তভাবে সূত্রায়িত। সেকারণে প্রায়ই ক্ষেত্রে এমনকি গ্রামশি নিজেও বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছেন বা ব্যাখ্যা করেছেন। ফলতঃ তা এক তীব্র বিতর্কের জন্ম দিয়েছে এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

গ্রামশির হেজিমনির ধারণাকে বুঝতে গেলে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতি অনুধাবন করতে হবে। ১৯৭০ থেকে বুর্জোয়া আধিপত্য যা নূতনভাবে উপস্থিত হয় এবং একটি ভিন্নধরনের নূতন রণনীতি হিসাবে সর্বোচ্চে অবস্থান করে। এই 'নূতন' বুর্জোয়া অধিপত্য হলো : ইউরোপীয়ান ইকোনমিক কমিউনিটির উদ্ভব ; মার্কিনী ভূমিকার প্রাধান্য পশ্চিম ইউরোপে ; থ্যাচারবাদের উদ্ভব এবং 'নয়া দক্ষিণী'দের অর্থনীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং ইউরোপে। উপরোক্ত পরিস্থিতির উদ্ভবে পশ্চিমী মার্কসবাদীরা প্রথাগত মার্কসবাদকে চ্যালেঞ্জ জানায়, একইসঙ্গে আলথুসারের 'কাঠামোবাদ' এবং মার্কসবাদের রাষ্ট্রকেন্দ্রীক ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানায়। তারা গ্রামশির মানবীয় কর্মতত্ত্বের উপাদান সম্বন্ধীয় গঠনের উপর জোর দেন। আধিপত্যের ধারণার ব্যবহার পশ্চিমী মার্কসবাদীরা বিশ্লেষণ করেছেন নৈতিক এবং দার্শনিক দিক থেকে।

আধিপত্যের ধারণা যুক্ত অবস্থায় ছিল মার্কস, লেনিন এবং প্লেঘাসতের মধ্যে। পরবর্তীতে তা রণনীতি এবং নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। গ্রামশি এ সবগুলিকেই উন্নীত করেন। হেজিমনি শব্দটি মূলতঃ এসেছে ইতালীয় শব্দ 'এজেমোনিয়া' থেকে যার অর্থ এক সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ; একটি মুহূর্ত এবং একটি ব্যবস্থা যার মধ্যে জীবনের এক নির্দিষ্ট অবস্থা প্রাধান্য লাভ করে, যখন একজনের প্রাধান্য সম্পর্কে বাস্তব ধারণা সৃষ্টি হয়। জি. উইলিয়ামস ধারণাটিকে ঐ অর্থে ব্যবহার করেছেন।

গ্রামশির তত্ত্বের কেন্দ্রীয় ধারণা হল হেজিমনির ধারণা, কিন্তু তাঁর 'নির্বাচিত কারারচনা' গ্রন্থে কোথাও হেজিমনি সংক্রান্ত আলোচনা একইসঙ্গে পাঁচ পৃষ্ঠা ধরেও করেননি। তা বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে, তাকে আপাত বিরোধী বলে মনে হয়। গ্রামশি হেজিমনির ধারণাকে সংজ্ঞায়িত করেন এভাবে : 'এজেমানিয়া', 'ডাইরিজায়েম', 'ডোমিনেলন', 'লিডারশিপ' ইত্যাদিভাবে। 'নির্বাচিত কারারচনা' গ্রন্থে দেখা যায় তাঁর হেজিমনির আলোচনা বুর্জোয়া প্রকৃতির যা ব্যবহৃত হয়েছে ফরাসী বিপ্লবে এবং 'রিসর্জিমেনতো' পর্বে। হেজিমনির একমাত্র বিপরীত উদাহরণ তিনি ফ্যাক্টরী কাউন্সিলে রেখেছেন। তাঁর সঙ্গে বুর্জোয়া হেজিমনি হলো শ্রেণীশাসনের শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ যার মধ্যে রাষ্ট্র এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি বলেন বুর্জোয়া শাসনে "হেজিমনি প্রতিষ্ঠিত হয় বলপ্রয়োগের দ্বারা", "হেজিমনি রাষ্ট্রের দ্বারা এক পীড়নব্যবস্থা"।

নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে 'নির্বাচিত কারারচনা' থেকে গ্রামশির হেজিমনির ধারণাকে তুলে ধরা হোল ঃ "কোন একটি সামাজিক গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিফলিত হয় দুটি উপায়ে ; এক, প্রভুত্ব এবং দুই, বুদ্ধিমত্তাগত এবং নৈতিক নেতৃত্ব। বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে একটি সামাজিক গোষ্ঠী প্রভূত্ব কায়েম করে, যারমধ্যে তা তরলীকৃত হয়, অথবা তা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে জয়লাভ করে ; এটা সমজাতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে দৃশ্যমান হয়। একটি সামাজিক গোষ্ঠী বাস্তবিকপক্ষে তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার পূর্বেই ; (এইভাবে ক্ষমতা দখল করাই হচ্ছে মুখ্য অবস্থা) ; পাশাপাশি এটা প্রভূত্বমূলক হতে পারে যখন তা ক্ষমতা প্রয়োগ করে কিন্তু যদি তা দৃঢ়ভাবে ধরে থাকে তাহলে পূর্বের ন্যায় ক্ষমতাকে ধারাবাহিকভাবে ধরে রাখতে পারবে।

উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে হেজিমনির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করা যেতে পারে ঃ

(ক) এটা একইসঙ্গে একটি নির্দেশ এবং প্রভূত্ব ; বিভিন্ন সমস্বার্থবাহী গোষ্ঠীর উপর, এবং শত্রুদের উপরও প্রভূত্ব।

(খ) 'নির্দেশ' এর অর্থ সামাজিক ও নৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং যেটি রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের এক অপরিহার্য্য পূর্বশর্ত।

(গ) এই দ্বৈত দিক যথা নির্দেশ এবং প্রভুত্ব রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পরও বজায় থাকবে। এবং

(ঘ) শ্রেণীশাসন বলপ্রয়োগ এবং সম্মতির উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে থাকে।

গ্রামশির হেজিমনির ধারণা সম্পর্কে পেরি এ্যান্ডারসনের বিশ্লেষণ ঃ

হেজিমনির মৌলিক ধারণাকে স্বীকার করেও এ্যান্ডারসন গ্রামশির ধারণাকে তিনটি মডেলের সাহায্যে চিহ্নিত করেন।

প্রথম মডেল ঃ হেজিমনি পৌরসমাজে অনুশীলিত হয় এবং তা সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক নেতৃত্বের সমাহার।

দ্বিতীয় মডেল ঃ গ্রামশি বলেছেন হেজিমনির প্রয়োগকেন্দ্র হল রাষ্ট্র এবং পৌরসমাজ, এবং সেকারণে শিক্ষাগত পঠনপাঠন এবং পুলিশি কাজকর্ম উভয়ই রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের আওতায় পড়ে।

তৃতীয় মডেল ঃ গ্রামশি রাষ্ট্র এবং পৌরসমাজের পৃথকীকরণকে বাতিল করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন হেজিমনির ক্ষেত্র হলো পৌরসমাজ, রাষ্ট্র এবং ব্যক্তিগত কর্মপরিধি।

প্রথম মডেলের সংশ্লিষ্ট বিষয়কে গ্রামশি গ্রহণ করেছেন এবং এক্ষেত্রে রাষ্ট্র অপেক্ষা পৌরসমাজের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। দ্বিতীয় মডেলে দেখা যাচ্ছে গ্রামশি প্রথম মডেলটি সম্বন্ধে সন্দিহান এবং পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শক্তিশালী মতাদর্শগত ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন। কিন্তু এখানেও তিনি রাষ্ট্র এবং পৌরসমাজের মধ্যে অসম সম্পর্কের প্রকৃতরেখা নির্ধারণ করতে পারেননি। তৃতীয় মডেলে দেখা যাচ্ছে গ্রামশি তার দ্বিতীয় মডেলে রাষ্ট্র ও পৌরসমাজের মধ্যে যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে তাকে আরোও বিস্তৃত করেন। এর অর্থ হলো দ্বিতীয় মডেলটির সংশোধন। এই সংশোধনের ভিত্তি হলো পাশ্চাত্যের পৌরসমাজে রাষ্ট্রের যে বিস্তৃত হস্তক্ষেপ সে সম্বন্ধে তার তীক্ষ্ণ সচেতনতা।

বিশ্লেষণী মন্তব্য সমূহ ঃ

(১) তাঁর রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের বিশ্লেষণে এবং রণনীতিগত বিশ্লেষণে অপর্যাপ্ততা রয়েছে। কতটা পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণী তার হেজিমনিকে বিস্তৃত করতে পারে অথবা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পূর্বে কতটা হেজিমনির বিকাশ ঘটাতে হবে—সে সম্পর্কে কোন দিকপাত করতে পারেননি।

(২) হেজিমনি সৃষ্টির ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট দলের ভূমিকা কি সমরূপ হবে না এককেন্দ্রীক হবে, তার ভূমিকা সমষ্টিগত হবে না অসদৃশ এবং অকেন্দ্রীভূত হবে — এগুলির প্রতিও কোন দৃষ্টি দেননি।

সাম্প্রতিককালে গ্রামশির হেজিমনি তত্ত্ব সম্পর্কে যে বিভিন্ন গবেষণা হয়েছে তাতে এই তত্ত্বের নিম্নলিখিত কার্যকারিতাগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

প্রথমতঃ এটা মেনে নেওয়া হয়েছে গ্রামশির এই ধারণা শুধু প্রচলিত বুর্জোয়া সমাজ বিশ্লেষণেই নয়, এই সমাজ পরিবর্তনের এক বিকল্প বৈপ্লবিক কৌশলগঠনেও একটি ধারণাগত হাতিয়ার।

দ্বিতীয়তঃ গ্রামশির এই ধারণার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে আধুনিক বুর্জোয়া শাসনের তথা রাজনৈতিক আনুগত্যের অনুধাবনের এক নব্য বাণী যার সাহায্যে এই সমাজের প্রকৃতি বিশ্লেষণ আরো সহজ হয়।

তৃতীয়তঃ তাঁর এই ধারণার সাহায্যে প্রচলিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে অভিজ্ঞতাবাদের ন্যায় বিভিন্ন মতাদর্শগত কুফল মুক্ত করে একটি বৈপ্লবিক ভিতের উপর দাঁড় করানো যায়।

নমুনা প্রশ্ন ঃ

১। গ্রামশির হেজিমনির তত্ত্ব বিশ্লেষণ কর।
২। হেজিমনি, রাষ্ট্র এবং পৌরসমাজের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক আলোচনা কর।
৩। গ্রামশির রাজনৈতিক তত্ত্ব অনুধাবনের তাত্ত্বিক সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ কর।

ছোট প্রশ্ন ঃ

১। হেজিমনির সংজ্ঞা দাও।
২। রাষ্ট্র এবং পৌরসমাজের পার্থক্য চিহ্নিত কর।
৩। গ্রামশির 'হেজিমনির' তত্ত্বে এ্যান্ডারসনের মডেলগুলি কী ?
৪। ফ্যাক্টরি কাউন্সিল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

সহায়ক পুস্তক ঃ

1. Gramsci, A : Selections From Prison Notebooks (1971)
2. Bacock, R : Hegemony (1986)
3. Sassoon, A : Gramsci's Politics
4. Anderson, P : 'The Antinomies of Gramsci' [NLR, No-100,1976-77, pp. 5-78]
5. Femia, J : Gramsci's Political Thought. (1981)
6. দত্তগুপ্ত, শোভনলাল (সম্পাদিত) ঃ গ্রামশি ঃ বিচার ও বিশ্লেষণ।

পাঠ - ১১

বিষয় ঃ পৌরসমাজ সংক্রান্ত গ্রামশিয় ধারণা — নিষ্ক্রিয় বিপ্লব, অবস্থায়ী সংগ্রাম, চলিষ্ণু সংগ্রাম।

পৌরসমাজ ঃ

গ্রামশির ধারণার একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হল পৌরসমাজ। হেজিমনির মতোই একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হলো পৌরসমাজের ধারণা। তাঁর পৌরসমাজ ধারণার মধ্যে নিজস্ব রাজনৈতিক তত্ত্বের অভিনবত্ব বর্তমান। তাঁর রাজনৈতিক লেখাপত্রে পৌরসমাজ সম্পর্কিত আলোচনাসমূহ এক উচ্চস্থান দখল করে আছে, বিশেষকরে সমাজবাদী রূপান্তরের অনুধাবনের সঙ্গে বিষয়টি গভীরভাবে জড়িত। 'পৌরসমাজ' শব্দটি একইসঙ্গে গ্রামশির পূর্বে অমার্কসবাদীরা এবং মার্কসীয় চিন্তাবিদদের উভয়ের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিল, কিন্তু গ্রামশির ব্যবহৃত এই শব্দটি প্রতিফলিত করে একটি মৌলিক পরিবর্তনের।

বেশিরভাগ অমার্কসীয় বিশারদদের ধারণা অনুযায়ী, পৌরসমাজের অর্থ হলো পৌর বা নাগরিকদের সরকার— এই ধারণাই তারা ব্যবহার করেছে। হেগেল, পৌর অথবা বুর্জোয়া সমাজ বলতে ব্যক্তি জীবনের ক্ষেত্রকে বুঝিয়েছেন যা পরিবারের একতাকে ত্যাগ করে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় প্রবেশ করেছে। এখানে রাষ্ট্র অথবা রাজনৈতিক সমাজের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হয়েছে। হেগেল পৌরসমাজের ক্ষেত্রে এই সহজাত যুক্তিসম্মত সম্পর্ককে অস্বীকার করেছেন। কেবলমাত্র রাষ্ট্রের মধ্য দিয়েই বিশ্বব্যাপী স্বার্থকে জয় করা যেতে পারে।

তরুণ মার্কস যিনি হেগেলের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, এই শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন সমস্ত সমাজ থেকে বুর্জোয়া সমাজের পরিবর্তনের একটি গজকাঠি হিসাবে। মার্কসের মতে, স্থূল বস্তুবাদ ভিত্তিক আধুনিক সম্পর্ক, প্রত্যেকের বিরুদ্ধে প্রত্যেকের সংগ্রাম । এবং অহংবাদ, এগুলি প্রাধান্য লাভ করেছে। মার্কসকে অনুসরণ করে বলা যায় মধ্যযুগীয় সমাজের পতনের থেকেই পৌরসমাজের উদ্ভব, যারমধ্যে ব্যক্তি ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। স্বার্থপর ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একমাত্র সংযোগ আইনের মাধ্যমে যা মানবীয় সম্পর্কসমূহের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করে। কেননা আইনই পারে ব্যক্তিবর্গকে শাস্তির ভয় দেখাতে। পৌরসমাজের অভ্যন্তরে এই বিচ্ছিন্ন এবং বিরোধমূলক প্রকৃতি অত্যাবশ্যকভাবে এক রাজনীতির জন্ম দেয় যা কখনই তার বিরোধকে প্রকাশিত করে না। কিন্তু তাকে নিষ্কাশন এবং পৃথক করে এথেকে। পৌরসমাজের বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই আধুনিক রাষ্ট্র অত্যাবশ্যকভাবে তার প্রয়োজন মেটায়।

মার্কসের মতো গ্রামশি ধারাবাহিকভাবে এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং তাকে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে অরাষ্ট্রীক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। এবং এক্ষেত্রে অর্থনীতিতেও তা অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাসত্ত্বেও, এই পৌরসমাজের ধারণা রাষ্ট্রের থেকে বিশেষভাবে পৃথক।

গ্রামশির এই শব্দ ব্যবহারের দিকসমূহ ঃ

এই শব্দটি প্রধানতঃ গ্রামশির পদ্ধতিগত বিন্যাসকে বোঝায়। রাষ্ট্র এবং পৌরসমাজের মধ্যে যে পার্থক্য, তারই ভিত্তিতে ঐ একই পার্থক্য তিনি রাশিয়া এবং পশ্চিমের ক্ষেত্রে দেখেছিলেন। উপরোক্ত পার্থক্য তাঁকে পশ্চিমের পরিস্থিতিকে বুঝতে সাহায্য করেছিল। এবং সেজন্যই তিনি পশ্চিমের বিপ্লবের জন্য একটি পৃথক রণনীতির প্রয়োজনীয়তাকে সামনে আনেন।

পদ্ধতিগত অনুধাবনের সমস্যা ঃ

প্রথম এবং প্রধান মৌল সমস্যা হিসাবে গ্রামশির কাছে পৌরসমাজ শব্দটি প্রধান। তিনি প্রায়ই ঐ ধারণার বিপরীতমূলক সংজ্ঞা দিয়েছেন ঃ (১) রাষ্ট্রের নৈতিক আধেয় রূপে, (২) রাজনৈতিক সমাজের বিপরীত অবস্থান হিসাবে ; (৩) অর্থনৈতিক আচরণের সঙ্গে সমতুল করে এবং (৪) হেজিমনির সঙ্গে সমতুল করে এবং এইরকম বিভিন্ন উপায়ে তিনি তাঁর লেখাপত্রে রাষ্ট্র এবং পৌরসমাজের মধ্যে পার্থক্যকরণকে বাতিল করেছেন। তিনি বলেন ঃ বাস্তবে পৌরসমাজ এবং রাষ্ট্র একই ঃ তিনি পৌরসমাজ অথবা রাষ্ট্রের ধারণার কোন একটির মধ্যে প্রকৃত তৃপ্তি খুঁজে পাননি।

সংজ্ঞা সমূহ ঃ

গ্রামশির মতে পৌরসমাজ প্রতিফলিত করে স্বতঃস্ফূর্ত জনগণ, ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং প্রতিষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণ করে যা রাষ্ট্রের বাইরে অবস্থান করে। এগুলি হল ট্রেড ইউনিয়ন, চার্চসমূহ, রাজনৈতিক দল, সম্প্রদায়, সাংস্কৃতিক এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ। গ্রমশি একে সংজ্ঞায়িত করেন "তথাকথিত বেসরকারী সংগঠনের সাহায্যে সমগ্র জাতীয় সমাজের উপর আধিপত্য" যা হলো উপরিশোধের স্তরের প্রধান বিষয়। হেজিমনির অস্তিত্বের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্য সংযুক্ত। তাঁর কাছে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি অবস্থান করে পৌরসমাজের পরিবর্তনের উপর। এবং এই পরিবর্তনই রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

গ্রামশি এক্ষেত্রে যে অনুধাবন পদ্ধতি অনুসরণ করেন তা দ্বন্দ্বমূলক। তিনি বলেন "পৌরসমাজ বাধাদান করে", এবং পৌরসমাজকে বিজয়ী হতে হবে রাষ্ট্রের উপর প্রত্যক্ষ আক্রমণের পূর্বেই। এবং তাসত্ত্বেও তিনি কোন সংস্কারমূলক বিকৃতির প্রতি আসক্ত হননি। এ ধারণার থেকেই তিনি বিপ্লবী রণনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সমস্যাকে অবমূল্যায়ন করেছিলেন। তিনি রাষ্ট্রকে কখনো অস্বীকার করেননি। তাসত্ত্বেও তিনি রাষ্ট্রের বিলোপ সম্পর্কে ভাল ধারণা দিতে কতকগুলি শক্তিশালী দিক নির্দেশ করেছিলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সবথেকে বেশী মনোযোগ দিয়েছিলেন পৌরসমাজের বিকাশকে, যা হলো স্বশাসনের বিকাশের পরিণতি। এবং তিনি পৌরসমাজকে রাষ্ট্রব্যবস্থার বিলোপের ক্ষেত্রে একটি পূর্বশর্ত হিসাবে দেখেছিলেন।

স্যাশূন (Sassoon) মন্তব্য করেছিলেন পৌরসমাজের ধারণা যথেষ্ট প্রয়োজনীয় কারণ এতে আমরা একটা নূতন ধরনের রাজনীতি পাই যা ব্যক্তি এবং সমাজকে একসঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছে। এটা এক নূতন রাজনৈতিক তত্ত্বের ভিত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

নিষ্ক্রিয় বিপ্লব ঃ

গ্রামশির রাজনৈতিক তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হলো নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের ধারণা। এই ধারণাটি নির্দিষ্টভাবে বুর্জোয়া হেজিমনির বিশ্লেষণের প্রাসঙ্গিকতাকে বহন করে। যদিও এর তাৎপর্য একটি বিকল্প অর্থাৎ সর্বহারাশ্রেণীর হেজিমনিকে গড়ে তোলা।

গ্রামশি এই শব্দটি প্রধানতঃ ব্যবহার করেছেন বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্য যারা রণনীতি হিসাবে অবস্থায়ী সংগ্রামকে গুরুত্ব দেয়। এমন এক রাজনৈতিক অবস্থা তৈরী হয় যারমধ্যে একটি আধিপত্যকারী শ্রেণী তার ক্ষমতাকে বজায় রাখে কারণ তার প্রতিদ্বন্দ্বী দুর্বল অবস্থায় থাকে, আধিপত্যকারী শ্রেণী পুরসমাজের সঙ্গে রাজনৈতিক সমাজের মিশ্রণে জনসমর্থন আদায় করে এবং নিষ্ক্রিয় রাখে জনগণের সক্রিয় সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকাকে তার ইতিবাচক হেজিমনির দ্বারা।

এই নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের ধারণা ব্যাখ্যা করে গ্রামশি বলেন ইতিহাসগত কারণে রাষ্ট্রশক্তির প্রাবল্যের উপস্থিতি এবং একটি সংহত বুর্জোয়াশ্রেণীর অনুপস্থিতি, শ্রমিকশ্রেণীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রণকৌশল হিসাবে নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের জমি তৈরী হয়।

রিসর্জিমেন্তোর পর্বে নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের উল্লেখ গ্রামশির একটি অপূর্ব উদাহরণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় ঘটনাসমূহ হলো নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের ফল। ফরাসী বিপ্লব সঙ্গে সঙ্গে তা আরো বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। একটি বুর্জোয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় জনসমর্থনকে ভিত্তি করেই এবং সেইসঙ্গে তা পুরাতন সামন্তশ্রেণীগুলির সঙ্গেও সহঅবস্থান তৈরী করে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই। কিন্তু নিষ্ক্রিয় বিপ্লবে, যা তিনি প্রায়ই বলতেন যে বিপ্লবের পুনঃস্থাপনার ক্ষেত্রে পুরাতন সামন্তশ্রেণীসমূহ একটি রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করতো। সামন্ত শাসকবর্গ পুরাতন শাসনক্ষমতা থেকে বর্জিত হয়ে একধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জাতে পরিণত হয়।

এই ধরনের বিপ্লব জনগণের জনপ্রিয় অংশগ্রহণ ব্যতিরেকেই তার স্থান করে নেয়। ভিত্তিমূলে সবরকমের গণউদ্যোগের প্রভাব এর দ্বারা বিনষ্ট হয়, কৃষিকার্যের সংস্কার হয় না এবং একটি আর্থসামাজিক পরিবর্তনের প্রবাহ যা রাজনৈতিক ঐক্যর দুর্বলতা ব্যাখ্যা করে যা একইসঙ্গে দুর্বল আর্থসামাজিক পরিবর্তনের কারণ ও ফল হিসাবে বিবেচিত হয়।

এই নূতন রাষ্ট্র একই রণনীতিকে ব্যবহার করে টিকে থাকে। এই পদ্ধতিতে বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতা অর্জনের জন্য নানানধরনের টালবাহানার সুযোগ পেয়েছে — যার মূল লক্ষ্য ছিল সামগ্রিক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এড়িয়ে সীমিত স্বার্থের উপযোগী করে সমাজের সংস্কার সাধন। নিষ্ক্রিয় বিপ্লব এইভাবে একটি কৌশলের রূপ নেয় যা বুর্জোয়ারা প্রয়োগ করার প্রচেষ্টায় রত থাকে যখন তাদের হেজিমনি দুর্বল হয়ে পড়ে। উদীয়মান বুর্জোয়ারা রাজনৈতিক বিপ্লবের নিষ্ক্রিয় দিক হসাবে পুরাতন রাজনৈতিক শ্রেণীগুলির ছোটখাট পরিবর্তনকে ব্যবহার করে এবং একইসঙ্গে তুলনামূলকভাকে কিছু প্রগতিশীল শ্রেণীকে ব্যবহার করে উক্ত ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য।

অবস্থায়ী সংগ্রাম ঃ

সংগ্রামের একটি কৌশল হিসাবে এবং কোন এক অবস্থায় হেজিমনি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এটি ব্যবহৃত হয়। বিশেষকরে যেখানে পৌরসমাজ, রাষ্ট্রের ন্যায় সমানভাবে বিকশিত। এটি সংগ্রামের এক কৌশল যা পশ্চিম ইউরোপের বিপ্লবের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার কথা গ্রামশি বলেছেন। সংগ্রামের এক কৌশল হিসাবে হেজিমনির এই ধারণাকে বোঝায় যা পৌরসমাজের উপর নৈতিক, বুদ্ধিমত্তাগত এবং দার্শনিক ভাবে নেতৃত্বকে বজায় রাখবে। এটি হল গ্রামশির বিপ্লবের তত্ত্বের প্রথম স্তর বা অংশ। তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আক্রমণের বিষয়টি শেষপর্বে হবে। কিন্তু তার আগে অবস্থায়ী সংগ্রামের রণনীতি গ্রহণ করতে হবে। গ্রামশি বলেন চূড়ান্ত আক্রমণের আগে এটা একটা অপরিহার্য শর্ত। পশ্চিমের রাষ্ট্র এবং পৌরসমাজের নির্দিষ্ট অবস্থান এবং পরিস্থিতিতে এই রণনীতি এক বর্ধিত তাৎপর্য্য উপস্থাপিত করে।

চলিষ্ণু সংগ্রাম ঃ

হেজিমনির প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের এক কৌশল হিসাবে তা ব্যবহৃত হয়। এটা প্রতিফলিত করে সরকারের বা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রত্যক্ষ এবং সামনাসামনি আক্রমণ। এই কৌশল বা রণনীতি বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ায় বলশেভিকদের দ্বারা ব্যবহৃত হয় এবং তারা সুচারুভাবে তা সম্পন্ন করে। এই রণনীতি রাষ্ট্রশক্তির প্রকৃতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংযোজিত। রাশিয়ায়, এই রণনীতি সফল হয় কারণ রাষ্ট্রই রাশিয়ায় ছিল সবকিছু, চরম হিংস্র এবং

কেন্দ্রীভূত। এই কৌশল ভিন্ন একটি আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে সফল হতে পারে না—এ ব্যাপারে গ্রামশি নিশ্চিত ছিলেন। সেজন্যই তিনি পশ্চিমের উদাহরণ দিয়েছেন এবং বলেছেন পশ্চিমের জন্য একটি ভিন্ন রণনীতি বা কৌশলের প্রয়োজন। প্রত্যেকটি সংগ্রামই যথা চলিষ্ণু সংগ্রাম এবং অবস্থায়ী সংগ্রাম হলো সামরিক ঘটনাবলীর উপমা, কিন্তু গ্রামশি তাঁর নয়া মার্কসীয় তত্ত্বের রচনার সীমারেখায় তাদের সৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের কথা বলেছেন।

নমুনা প্রশ্ন ঃ

১। গ্রামশির পৌরসমাজের ধারণাটি বিশ্লেষণ কর।

২। গ্রামশি বিপ্লবকে 'নিষ্ক্রিয়' আখ্যা দিয়েছিলেন কেন—ব্যাখ্যা কর।

ছোট প্রশ্ন ঃ

১। গ্রামশির পৌরসমাজের সংজ্ঞা।

২। গ্রামশির পার্থক্যকরণ রাষ্ট্র এবং পৌরসমাজের মধ্যে গ্রামশি কীভাবে পার্থক্য করেছেন?

৩। অবস্থায়ী সংগ্রাম ও চলিষ্ণু সংগ্রামের মধ্যে পার্থক্য কী?

সহায়ক পুস্তক ঃ

1. Gramsci, A : Selections From Prison Notebooks (1971)
2. Sassoon, A : Gramsci's Politics (1980)
3. Femia, J : Gramsci's Political Thought. (1981)
4. দত্তগুপ্ত, শোভনলাল (সম্পাদিত) ঃ গ্রামশি ঃ বিচার ও বিশ্লেষণ।

পাঠ - ১২

বিষয় ঃ মাওবাদ এবং নয়া গণতন্ত্র প্রসঙ্গ

১.১ সূচনা ঃ

১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পর গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৯ সালের চীন বিপ্লবের মাধ্যমে। এই বিপ্লবে নেতৃত্বপ্রদান করেছিল চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এবং এই বিপ্লবের রণকৌশল রচনার প্রশ্নে মুখ্য-ভূমিকা পালন করেছিলেন মাও ৎসে তুং (Mao-Tse-Tung) । তাই মাও ৎসে তুং এর সমগ্র রাষ্ট্র চিন্তা চীন বিপ্লবের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিভিন্ন পর্যায়ের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

১.২ মাওবাদের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য ঃ

মার্কস এঙ্গেলস প্রতিষ্ঠিত মূলনীতিগুলিকে অনুসরণ করে লেনিন তাঁর ঔপনিবেশিক থিসিসে উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রামের যে কর্মসূচী ও কর্মপন্থা ব্যাখ্যা করেছিলেন চীনা বিপ্লবের পটভূমিকায় মাও-ৎসে-তুং তার একাধিক মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেন ও চীনা বিপ্লবের নিজস্ব প্রয়োজনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও গঠন প্রসঙ্গে কয়েকটি মৌলিক তত্ত্ব উচ্চারণ করেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদে মাও-ৎসে-তুং এর এই তাত্ত্বিক সংযোজনগুলি সামগ্রিকভাবে মাওবাদ (Maoism) নামে পরিচিত। অর্থাৎ অন্যভাষায় মাওবাদ হল লেনিনবাদ এবং প্রচলিত চীনা চিন্তাধারার একটি মিশ্রণ, যেখানে চীনা অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার একটি ছাপ পরিলক্ষিত হয়। তাই মাওবাদে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় যা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে স্বতন্ত্র। **প্রথমতঃ** মাওবাদ শিল্পক্ষেত্র ও কলকারখানার এবং কৃষির বিকাশকে সমগুরুত্ব দিয়ে থাকে, তাই চীনা কমিউনিস্ট পার্টি (CPC) এমন ভাবে গড়ে তোলা হয়েছিল যা কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিতে পরিণত না হয়, কৃষকদেরও তাতে স্থান থাকে, **দ্বিতীয়তঃ** মাওবাদ সচেতনতার উপর গুরুত্বারোপ করেছিল। কৃষক ও শ্রমিক উভয় শ্রেণীকে মার্কসীয় চিন্তাধারায় দীক্ষিত করতে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আয়োজন করা হয়েছিল। **তৃতীয়তঃ** গেরিলা যুদ্ধ সংক্রান্ত মাওবাদের বক্তব্যগুলি কৃষকদের সহযোগিতায় ১৯৩০ এর দশকে গড়ে উঠেছিল যা তৃতীয় বিশ্বভুক্ত দেশগুলিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল। **চতুর্থতঃ** মাওবাদ আমলাতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে যার বাস্তব পরিচয় আমরা পাই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় এবং **পরিশেষে** মাওবাদ নৈতিক উন্নতি, সাধারণের কল্যান প্রভৃতির কথা বলে যা আমাদের রুশোর কথা স্মরণ করায়।

১.৩ নয়া গণতন্ত্রের ধারণার পটভূমি ঃ

চীনা বিপ্লবের গতিপ্রকৃতি এবং চীনা কমিউনিস্ট পার্টির রণকৌশলের ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ১৯৩৭ সালে মাও -ৎসে তুং এর উদ্যোগে কমিউনিস্ট পার্টি এবং জাতীয়তাবাদী কুয়োমিন্টাং দলের সদস্যরা সম্মিলিত ভাবে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা করে। এই ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠার পিছনে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির দুটি প্রধান রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। **প্রথমতঃ** সেসময়ে চীনে জাতীয়তাবাদী কুয়োমিন্টাং দলের প্রভাব ছিল ব্যাপক। তাই তাদেরকে পাশে না রেখে একক ভাবে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে সংকট মোকাবিলার চেষ্টা হয়ে উঠত বামপন্থী হটকারিতার নামান্তর। **দ্বিতীয়তঃ** চীনা কমিউনিস্ট পার্টি চিয়াং-কাই-শেক এর উগ্র কমিউনিস্ট বিরোধিতা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিল। পার্টি চেয়েছিল যুক্তফ্রন্টে গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে এবং চিয়াং-কাই-শেকের কুয়োমিন্টাং দলের জনস্বার্থ বিরোধী চরিত্র উদঘাটিত করতে।

বস্তুতপক্ষে, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে জাতীয়তাবাদী ধারা সম্পর্কে ঐক্য ও সংগ্রামের এই যুক্তফ্রন্টীয় নীতি অনুসরণ করার কথাই লেনিন তার ঔপেনিবেশিক থিসিসে বলেছিলেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সীমিত

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতাকে ও জনমানসে তার ব্যাপক প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়ে এবং জাতীয়তাবাদী ভাবধারা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন না করে কমিউনিস্ট পার্টিকে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে নিজের স্বাতন্ত্রের ভিত্তিতে বিকল্প আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে হবে — লেনিনের এই বক্তব্য সার্থক পরিণতি লাভ করেছিল দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠনের মাধ্যমে।

চীনা কমিউনিষ্ট পার্টি পরিচালিত নির্বাচনের ভিত্তিতে অচিরেই শেন্‌সি-কানসু-লিংশিয়া সীমান্ত অঞ্চলে যুক্তফ্রন্টীয় শাসন ব্যবস্থা চালু হয় এবং এই নতুন ব্যবস্থাকে মাও ৎসে তুং 'নয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' অ্যাখ্যা দেন। এর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মাও ১৯৪০ সালে তাঁর *On New Democracy* গ্রন্থে নয়া গণতন্ত্রের ধারণাটির একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

১.৪ নয়া গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য ঃ

মাও ৎসে তুং যে নয়া গণতন্ত্রের চিন্তা করেছিলেন তার দ্বিবিধ উদ্দেশ্য ছিল। **প্রথমতঃ** কুয়োমিন্টার দলের ছত্রছায়ায় পুঁজিবাদের যে প্রসার ঘটেছিল তার বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলা ছিল এর অন্যতম উদ্দেশ্য। ঐতিহাসিকভাবে চীনে সেসময় প্রয়োজন ছিল একটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের, কারণ অপসৃয়মান সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশীয় বুর্জোয়াদের প্রতিষ্ঠা তখন আরম্ভ হয়েছে। একই সাথে চীনের বেশ কয়েকটি শিল্পোন্নত অঞ্চলে শ্রমিক শ্রেণীর সংঘটিত উন্মেষও পরিলক্ষিত হয়েছিল। তাই চীনের সমাজ ব্যবস্থায় সর্ববৃহৎ শোষিত শ্রেণীটি যদিও কৃষক, শ্রমিক শ্রেণীর শক্তিও একেবারে অকিঞ্চিতকর ছিল না। সেই সঙ্গে জাপানী সাম্রাজ্য বাদের আগ্রাসী নীতি চল্লিশের দশকের প্রারম্ভে চীনকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল। এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট। মাও ৎসে তুং এর উদ্দেশ্য ছিল যুক্তফ্রন্টের পরিচালনায় এই বিপ্লবকে সম্পন্ন করা, কিন্তু এই বিপ্লবের লক্ষ্য হবে পুঁজিবাদকে সুসংহত করা নয়, বরং পুঁজিবাদের বিকল্প একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা যেটি হবে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের অন্তবর্তী কালীন ধাপ। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েও মাও ৎসে তুং 'নয়া গণতন্ত্রের' কর্মসূচী প্রনয়ন করেন।

এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য মাও ৎসে তুং 'নয়া গণতন্ত্রের' ভিত্তিতে একটি নূতন ধরনের রাষ্ট্র শক্তি গঠনের চিন্তা করেছিলেন। এটা ছিল 'নয়া গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্রে উত্তরণ পর্বের উপযোগী এই রাষ্ট্রশক্তির চরিত্রকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি সাধারণভাবে দুটি ভিন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থার উল্লেখ করেছিলেন ঃ (১) সামগ্রিকভাবে শ্রমিকশ্রেণী পরিচালিত শাসনব্যবস্থা এবং (২) একাধিক শ্রেণীর যৌথ একনায়কত্ব, যেটিকে তিনি চীনের পক্ষে সর্বাধিক উপযোগী বলে মনে করেছিলেন।

১.৫ যৌথ একনায়কত্ব ঃ

মাও ৎসে তুং এর বক্তব্য ছিল যে, চল্লিশের দশকে চীনা জনগণের সব থেকে বড় শত্রু ছিল জাপানী সাম্রাজ্যবাদ। যেহেতু সীমবদ্ধতা সত্ত্বেও চীনের দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় সামিল হয়েছিল ও কমিউনিস্টদের সাথে যৌথভাবে যুক্তফ্রন্টে অংশ গ্রহণ করেছিল, তাই তিনি বলেছিলেন যে, যৌথ একনায়কত্ব গঠিত হবে শ্রমিক, কৃষক, পাতি বুর্জোয়া ও জাতীয় বুর্জোয়াদের সমন্বয়ে। মাও ৎসে তুং এর এই বক্তব্যের ভিত্তিটি ছিল এই যে, চীনে প্রধান বিরোধটি ছিল সাম্রাজ্যবাদের সাথে চীনা জনগণের। ফলে একমাত্র মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া (comprador bourgeoisie) ব্যতীত অন্যান্য সকল শ্রেণী যেহেতু সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় অংশগ্রহণ করেছিল, তাই তাদেরকে নিয়ে যৌথ একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের উত্তরণ পর্বে নূতন ধরনের রাষ্ট্রশক্তি গঠন করবার ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তব সম্ভাবনা ছিল।

উপরোক্ত বক্তব্যের সাথে সাযুজ্য রেখে মাও ৎসে তুং ১৯৪৯ সালের বিপ্লবের পর যে নূতন রাষ্ট্রশক্তি ক্ষমতায় এসেছিল তার নেতৃত্বভার দিয়েছিলেন এই চারটি শ্রেণীকে। এপ্রসঙ্গে মাও এর বক্তব্য ছিল চীনা বিপ্লবের পরেও নয়া গণতন্ত্রের স্তরটি অপরিবর্তিত ছিল ও সেকারণেই এই যৌথ একনায়কত্বের ধারণাটি বাতিল করার কোন প্রয়োজন ছিল না। বিপ্লব পরবর্তী পর্যায়ে এই রাষ্ট্রশক্তির নূতন নামকরণ হয় জনগণতান্ত্রিক একনায়কত্ব (People's Democratic Dictatorship)।

১৯৫৪ সালে গৃহীত চীনের নূতন সংবিধানেও এই ধারণাটি প্রতিফলিত হল। যেমন বলা হল, চীনের সাধারণ মানুষ সমাজতন্ত্রকে আকাঙ্খা করে, তেমনি আবার সেখানে ব্যক্তিগত পুঁজির মালিকানাকেও স্বীকৃতি দেওয়া হল। নয়া গণতন্ত্রের এই পর্বের অবসান চীনে কোন বছর হয়েছিল তা নিয়ে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায় এবং এ প্রসঙ্গে স্পষ্ট সঠিক বক্তব্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে সাধারণভাবে একথা মানতে বাধা নেই যে, ১৯৫৬ সালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেস আহ্বানের সময়টিকে নয়াগণতান্ত্রিক স্তরের সমাপ্তিপর্ব রূপে গ্রহণ করা যায়।

এখন প্রশ্ন হল, মাও কেন বিপ্লব পরবর্তী রাষ্ট্রে সর্বহারাদের পাশাপাশি বুর্জোয়াদেরও শাসন ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন ? উত্তরে বলা যায়, মাও এর মনে হয়েছিল, চীনা বিপ্লবের পর দেশীয় পুঁজিপতি ও সর্বহারাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকলেও তার চরিত্রটি অবৈর, কারণ দেশীয় পুঁজিপতিদের শান্তিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করে সমাজতন্ত্রকে তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা সম্ভবপর হয়েছিল। যেকারনেই মাও ৎসে তুং বলেছিলেন যে জনগণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিপ্লব পরবর্তী কালে, প্রকৃত অর্থে সেটি ছিল সর্বহারার একনায়কত্বেরই একটি ভিন্ন রূপ। সর্বহারার একনায়কত্বের মত জনগণতান্ত্রিক একনায়কত্বের মূল কথা সমাজতন্ত্রে উত্তরণকে ত্বরান্বিত করা। চীনের বিশেষ পরিস্থিতিতে এই একনায়কত্ব সর্বহারা শ্রেণীর হাতে ন্যস্ত ছিল না। এই একনায়কত্ব যৌথভাবে চারটি শ্রেণী পরিচালনা করেছিল। এই অর্থে রুশ বিপ্লবের অব্যবহিত পরে সেদেশে যে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কালে পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলিতে যে জনগণতন্ত্র (People's Democracy) গঠিত হয়েছিল, তার সাথে মাও ৎসে তুং উদ্ভাবিত যৌথ একনায়কত্বের ধারণাটির যথেষ্ট মৌলিক পার্থক্য ছিল।

মাও এর মতে, নয়া গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যটি ছিল বৃহৎ ব্যাঙ্ক ও শিল্পগুলির জাতীয়করণ করা। এই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলিকে বেসরকারী পুঁজির হাতে ন্যস্ত করবার অর্থ হবে জনসাধরণকে অর্থনৈতিক দিক থেকে শোষণ করা। কৃষকদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে একথা ঘোষণা করা হল যে, বড় বড় জমিদারদের জমির জাতীয়করণ করা হবে এবং দরিদ্র, ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে তা বন্টন করে দেওয়া হবে।

১.৬ নয়া গণতন্ত্রের সমালোচনা ঃ

সমালোচকেরা একাধিক যুক্তিতে মাও এর এই নয়া গণতান্ত্রিক ধারণাটির যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। **প্রথমতঃ** তাঁরা মনে করেন যে, কৌশলগত কারণে ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণী অবশ্যই যুক্তফ্রন্টে অংশগ্রহণ করতে পারে। স্বয়ং লেনিন এই মতের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু এই শ্রেণী যেহেতু শোষকের ভূমিকা পালন করে তাই বিপ্লবোত্তর যুগে শ্রমিক শ্রেণীর সাথে রাষ্ট্রক্ষমতায় কৃষক ও বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতায় আসীন হয় তাহলে তাদের কর্মপন্থা সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পক্ষে অন্তরায় হয়। তাছাড়া সমালোচকদের মতে, কোন অবস্থাতেই দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সাথে সর্বহারা শ্রেণীর অবৈর দ্বন্দ্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ প্রশ্ন তোলা যায়, যদি সমাজতন্ত্রে উত্তরণ পর্বে শোষক বুর্জোয়াদের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে সেই পর্বে 'জনগণতান্ত্রিক একনায়কত্ব' কার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে ? মাও ৎসে তুং বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়ে যাবার পর চীনা জনগণের মূল শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন বৃহৎ পুঁজিপতিদের এবং তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার কথা বলেছিলেন। কিন্তু সমালোচকরা মনে করেন, বৃহৎ ও দেশীয় পুঁজিপতিদের বিরোধকে কোন সময়ই বাড়িয়ে দেখা উচিত নয়, কারণ দেশীয় পুঁজিপতি রাও পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থারই ফলশ্রুতি ও তারাও শোষণব্যবস্থারই অন্তর্ভুক্ত। সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে নিজেদের শক্তিশালী ও সংগঠিত করে একসময় তারা মূল শোষকে পরিণত হবে।

তৃতীয়ত ঃ নয়া গণতন্ত্রে সমাজতন্ত্রের কিছু কিছু উপাদান থাকলেও পুরোপুরি সমাজতন্ত্র না হওয়ায়, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে যেমনভাবে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রকে পূর্ণমাত্রায় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রনে আনা হয়, এক্ষেত্রে তা করা সম্ভব হল না। নয়া গণতন্ত্র বেসরকারী পুঁজিকে কিছুটা খর্ব ও নিয়ন্ত্রিত রাখতে পারলেও সরাসরি তার অবসান ঘটাতে পারেনি।

১.৭ উপসংহার ঃ

ক্রমশ এই সকল সমালোচনাগুলি প্রকাশ্যে আসতে থাকে এবং চীনা কমিউনিস্ট পার্টিতে এ নিয়ে বাকবিতন্ডা শুরু হয়। সমালোচকদের মূল বক্তব্য ছিল এভাবে চীনে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকে সুনিশ্চিত করা সম্ভব নয়। ১৯৫৬ সালে 'চীনা পথকে' কেন্দ্র করে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে গুরুতর মতপার্থক্য দেখা দেয়। মাও বাধ্য হন ঐ বছর নয়া গণতান্ত্রিক স্তরের সমাপ্তি পর্ব ঘোষণা করতে। এর পর তিনি চীনের বিশেষ পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্রকে কীভাবে সুসংহত করা যেতে পারে সেবিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন এবং 'সর্বহারার মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের' কথা প্রচার করেন, যা আমাদের পরবর্তী পাঠটির আলোচ্য বিষয়বস্তু।

Suggestions for Further Study :

1. Mao Tse Tung — *On New Democracy.*
2. Mohanty, M.— *The Political Philosophy of Mao Tse Tung.*
3. দত্তগুপ্ত, শোভনলাল — *মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তা ঃ মার্কস থেকে মাও ৎসে তুং।*

Study Questions

(a) Essay Type

1. Discuss Mao's Concept of New Democracy. What is its Contribution to Marxism ?

(b) Short Answer Type :

1. What are the basic features of Mao's New Democracy ?
2. What is the ideological basis of Mao's concept of 'New Democracy' ?
3. What is Maoism ?

———

পাঠ - ১৩

বিষয় ঃ মাও ৎসে তুং এর সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ধারণা

মাও ৎসে তুং এর 'নয়া গণতন্ত্রের' প্রসঙ্গটিকে কেন্দ্র করে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে যে মতপার্থক্য দেখা দেয় তার পরিণতিতে মাওকে শেষ পর্যন্ত নয়া গণতান্ত্রিক স্তরের সমাপ্তি ঘোষণা করতে হয় ১৯৫৬ সালে। কিন্তু সাথে সাথে তিনি একথা ঘোষণা করেন যে, যদি চীনের সমাজতান্ত্রিক বনিয়াদকে সুদৃঢ় করতে হয় তাহলে উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি একটি নূতন সাংস্কৃতিক কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন। অর্থাৎ তিনি লিউ-শাও-চি সাথে একমত ছিলেন না, যিনি সমাজতন্ত্রের অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করার স্বার্থে কেবলমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদিকা শক্তির বিকাশকে ত্বরান্বিত করার প্রশ্নটিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

মাও সর্বহারার মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কর্মসূচী ঘোষণা করেন ১৯৬৬ সালে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণকে বুর্জোয়া মতাদর্শ, বুর্জোয়া ভাবধারা ও বুর্জোয়া চিন্তার বিরুদ্ধে সংগঠিত করা। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে মাও বিরোধী লাইনকে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সহায়তায় প্রতিহত করা ও সমাজতন্ত্রের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করা।

মাও এই যুক্তি দিয়ে সাংস্কৃতিক বিপ্লব আরম্ভ করেন যে, বুর্জোয়া শ্রেণীর অনেক প্রতিনিধি এবং অনেক প্রতিবিপ্লবী সরকার, সৈন্যবাহিনী এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অনুপ্রবেশ করেছে এবং এর ফলে বেশীর ভাগ সংগঠন ও বিভাগের নেতৃত্ব ক্ষমতা আর প্রকৃত মার্কসবাদী তথা জনসাধারণের হাতে নেই। ১৯৫৬ সাল থেকে ক্ষমতায় যারা ছিলেন তাঁরা বুর্জোয়া পন্থী এক ধরনের সংশোধনবাদী পথ অনুসরণ করেছেন। এই বুর্জোয়াদের প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপ বন্ধ করতে হলে সর্বাগ্রে এদের উচ্ছেদ করা প্রয়োজন এবং এই জন্যই প্রয়োজন মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে কার্যকর করা।

মাও ঘোষণা করলেন নূতন যে সংস্কৃতি গড়ে তোলা হবে তা হবে জাতীয়, বিজ্ঞানসম্মত ও গণমুখী। সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমন্ডিত চীনের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে যা কিছু সুস্থ ও সৃষ্টিশীল, তাকে গ্রহণ করেই মাও এই সাংস্কৃতিক কর্মসূচী গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি একথাও বলেন যে জাতীয় সংস্কৃতির যা কিছু অবৈজ্ঞানিক তাকেও কঠোরভাবে বর্জন করতে হবে। কর্মসূচী হবে গণমুখী এবং যে সংস্কৃতি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন বা যে সংস্কৃতি জনস্বার্থ বিরোধী তাকে পরিহার করে ও জনস্বার্থের সাথে সঙ্গতি রেখেই নয়া সংস্কৃতিক কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে। নয়া সাংস্কৃতিক কর্মসূচী হবে বৈজ্ঞানিক ভাবাদর্শে পুষ্ট, জনস্বার্থে রচিত এবং এই কর্মসূচী অনুসরণ করলে চীনের মানুষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন হয়ে উঠবেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য; মাও যে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কথা বলেছেন মার্কসবাদের ইতিহাসে তা নূতন কিছু নয়। তাঁর বহু পূর্বেই মার্কস 'সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন শ্রমিক শ্রেণী বিপ্লব সফল করতে পারলেই বুর্জোয়াদের কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারবে না। নূতন যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে সেখানে বুর্জোয়া সংস্কৃতির অবশেষ থেকে যাবে যাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট হবে সমাজে থেকে যাওয়া বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রচ্ছন্ন প্রতিভূরা। তাই বুর্জোয়া সংস্কৃতির অবসানে এগিয়ে আসতে হবে ক্ষমতাসীন শ্রমিক শ্রেণীকে। মাও এই বক্তব্যের যথাযথ সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁর সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংক্রান্ত তত্ত্বে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের লক্ষ্য হিসাবে মাও ঘোষণা করেছিলেন—

(১) সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল ভাবাদর্শ ও সুবিধাবাদকে সমূলে উৎপাটিত করা ;

(২) চিন্তা ও সংস্কৃতির অনুন্নতমান দূরীভূত করা ;

(৩) সর্বহারার সাংস্কৃতিক মানের উন্নতি ;

(৪) আদর্শগত ক্ষেত্রে পার্টি ও জনগণের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা ;

(৫) সাংস্কৃতিক আন্দোলনের স্থায়ী সংগঠন সৃষ্টি করা ;

(৬) শ্রমিক ও জনসাধারণের মধ্যে ঢিলে ঢালা মনোভাব দূর করা ;

(৭) বিপ্লবী আন্দোলনের স্বার্থে উন্নত অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি অর্জন করা ;

(৮) সামরিক বাহিনীর মধ্যে সর্বহারার রাজনীতির চর্চা অব্যহত রাখা ;

(৯) বুদ্ধিজীবী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিবর্গের আদর্শগত মান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা।

১৯৬৬ সালের মে মাস থেকে ১৯৭৬ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত মাও এর নেতৃত্বে চীনে অত্যন্ত কঠোরভাবে সাংস্কৃতিক বিপ্লব কার্যকর করা হয়েছিল। তাঁর জীবদশায় যদিও এই বিপ্লব গৌরবময় বলে ঘোষিত হয়েছিল কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর, বিপ্লবের পুণঃমূল্যায়নের পর, এটি অত্যন্ত নিন্দিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে মাও তাঁর ব্যক্তিগত শত্রুদের এবং আদর্শগত বিরোধীদের দমনের কাজে ধারণাটিকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করেছেন। তাই একে, সেই সময় পার্টি, রাষ্ট্র ও জনগণ যে কঠোরতম দুর্বিপাক এবং প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল তার জন্য বর্তমানে দায়ী করা হচ্ছে। একথাও বলা হচ্ছে যে, মাও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের যে কারণ দেখিয়েছেন তার কোন বাস্তব ভিত্তি ছিল না। তাঁর সমসাময়িক কালে যারা ছিলেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করে হত্যা বা কারারুদ্ধ করাই ছিল এই বিপ্লবের মূল উদ্দেশ্য। এই বিপ্লব জনগণের শত্রুদের বদলে জনগণকে পার্টিকে এবং সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ছত্রভঙ্গ অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিল। সমাজের তৎকালীন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, যাদেরকে পুঁজিবাদী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল, তাদের সমাজতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধার কোন ঘাটতি ছিল না এবং তারা একটি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন।

চীন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর পার্টির ইতিহাসের কতকগুলি প্রশ্ন সম্পর্কে যে প্রস্তাব ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয় তাতে বলা হয়েছিল যে মুষ্টিমেয় দক্ষিণপন্থী কিছু ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের পরিধিকে সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি করে পার্টির অভ্যন্তরে বহু বুদ্ধিজীবী ও দেশপ্রেমিককে যেভাবে শ্রেণী শত্রু রূপে চিহ্নিত করা হয়েছিল, তার ফল হয়েছিল চরম দুর্ভাগ্যজনক। ফলে পার্টির অভ্যন্তরে গণতন্ত্র গুরুতরভাবে খর্ব হয়। লিউ শাও চি-র নেতৃত্বাধীন তথাকথিত "বুর্জোয়া শ্রেণীর সদর দপ্তরের" আদৌ কোন অস্তিত্ব ছিল না এবং তাঁর ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল তা ছিল নিতান্তই ভুল। দক্ষিণপন্থী বিপদকে বড় করে দেখতে গিয়ে মাও যে রাজনৈতিক লাইন গ্রহণ করেছিলেন তার পরিণতিতে জন্ম নেয় বাম ঝোঁকের ভুলগুলি, যার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ "মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লব"।

প্রস্তাবে আরও বলা হয়, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় সংশোধনবাদ বা পুঁজিবাদ বলে নিন্দিত বহু নীতিই প্রকৃতপক্ষেই ছিল মার্কসবাদী ও সমাজতান্ত্রিক নীতি। সেই সময় সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে বিনা কারণে রাজনৈতিক সমালোচনার শিকার হতে হয়েছিল। আসলে জীবনের শেষ বছর গুলিতে তিনি অনেক সময় অনেক সমস্যার নির্ভুল সমাধান করতে পারেননি। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় তিনি সঠিক ও বেঠিক, শত্রু ও জনগণের মধ্যে গোলমাল করে ফেলেছিলেন। তিনি যখন একের পর এক ভুলগুলি করছিলেন তখন তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তিনি যা করছেন তা সঠিক এবং তাঁর তত্ত্ব ও অনুশীলন প্রকৃত মার্কসবাদ এবং সর্বহারার

একনায়কত্বকে সুসংবদ্ধ করার জন্য একান্ত জরুরী। তিনি নিজে এতটাই ক্ষমতাকে কুক্ষীগত করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস কারুর ছিল না এবং তা করলে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবিপ্লবী আখ্যায়িত হয়ে নির্বাসনে যেতে হত কিংবা তাকে হত্যা করা হত।

কোন কোন মহল মনে করে মাও-এর ভুল নীতির জন্য প্রতিবিপ্লবী লিন পিয়াও এবং চিয়াং চিং চক্র নেপথ্যে পার্টির অভ্যন্তরে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। উপরোক্ত প্রস্তাব এই বক্তব্যটি সমর্থন করে। প্রস্তাবে আরও উল্লিখিত ছিল যে, সাংস্কৃতিক বিপ্লব নামেই জনসাধারণের উপর নির্ভর করে পরিচালিত হয়েছিল, বস্তুতঃপক্ষে তা ছিল মাও এবং তাঁর অনুগামীদের সন্ত্রাসের রাজত্ব, প্রকৃতপক্ষে বিপ্লব পার্টিকে জনসাধারণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পার্টিকেই ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল। পার্টির শত্রুদের কিছু হয়নি, তারা সেই সময় সাফল্যের সাথেই পার্টি বিরোধী কর্মে লিপ্ত থেকেছিল। মাও-এর ভুলের জন্য আরও দায়ী ছিল পার্টির অভিজ্ঞতার অভাব, যান্ত্রিকভাবে মার্কসের শ্রেণীসংগ্রামতত্ত্বের প্রয়োগ, সমাজতন্ত্র নির্মাণপর্বে সঠিক মতাদর্শগত প্রস্তুতির অভাব প্রভৃতি।

সমালোচকেরা মাও এর বিচ্যুতিকে "স্বচালনবাদী বিচ্যুতি" বলেও বর্ণনা করেছেন। আসলে সমাজতন্ত্রের সামগ্রিক উপরিকাঠামোটির নির্মাণের সাফল্য নির্ভর করে তার অর্থনৈতিক ভিত্তিকে সাফল্যের সাথে সংগঠিত করার উপর। অর্থনৈতিক ভিত্তিকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে হাতিয়ার করে জনগণকে সাময়িকভাবে উত্তেজিত করা গেলেও সমাজতন্ত্র নির্মাণের প্রচেষ্টা অচিরেই নানা সমস্যার সম্মুখীন হবে। তাছাড়া চীনের মানুষ সেই সময় সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে গ্রহণ করতে মানসিকভাকে প্রস্তুত ছিল কিনা সে প্রশ্ন গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা না করেই তিনি দ্রুততম উপায়ে সমাজতন্ত্রের চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। এখানেই তাঁর বড় ট্র্যাজেডি।

মাও ৎসে তুং এর রাজনৈতিক জীবন বড়ই বিতর্কিত। ১৯৫৮ সালের পূর্বে চীনের ইতিহাসে তাঁর ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল কিন্তু পরবর্তীকালে বিশেষত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় তিনি বামপন্থা থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন একথা স্বীকার করতেই হয়। মাও এর আমলের পুনর্মূল্যায়নের পর চীনে দেখা যাচ্ছে, তাঁর আমলে যারা ছিলেন চরমভাবে নিন্দিত, আজ তাদের অনেকেই পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। সাংস্কৃতির বিপ্লবের নায়করা বিপরীতক্রমে আজ সর্বাধিক নিন্দিত এবং লাঞ্ছিত। মাও এর চিন্তা অভ্রান্ত—এই বক্তব্যকে আজ চীনা কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থন করে না। তাই মাও সম্পর্কে শেষ কথা বলার সময় বোধহয় আজ আসেনি। মার্কসবাদে মাও এর অবদান প্রসঙ্গে আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে।

Suggestions for Further Study

1. Mclellan, D.—*Marxism After Marx*
2. Hunt, R.N.—T*heory and Practice of Communism : An Introduction.*
3. Banerjee, S.N., The Chinese Government and Politics
4. ঘোষ, শিবদাস, **চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব**
5. দত্তগুপ্ত, শোভনলাল, **মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তা ঃ মার্কস থেকে মাও ৎসে তুং।**

Study Questions

(a) Essay Type :

1. Give an assessment of the Cultural Revolution in China with reference to its aims and objectives.

(b) Short Answer Type :

1. Why did Mao call the Cultural Revolution 'essentially a political revolution' ?

পাঠ - ১৪

বিষয় ঃ মার্কসীয় পদ্ধতি সম্পর্কে আলথুসে

৩.১ সূচনা ঃ

লুই আলথুসে (Louis Althusser, 1918-1990) যিনি *For Marx* ও *Reading Capital* গ্রন্থ রচনার জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিচিতি পেয়েছেন, তাঁর গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তের বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৬০ এর দশকের প্রথম দিকে যা ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির বৌদ্ধিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। তিনিই প্রথম ফরাসী যিনি সাম্যবাদী ধারণার মধ্যে অবয়ববাদী (Structural) ধ্যানধারণার অনুপ্রবেশ ঘটান, তাই তাঁর পরিচিতি মূলতঃ একজন অবয়ববাদী মার্কসবাদী হিসাবেই। সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর দুটি তত্ত্ব, অবয়ববাদ ও মার্কসবাদের মধ্যে তিনিই প্রথম সেতুবন্ধ রচনা করেন।

৩.২ অবয়ববাদ ও মার্কসবাদ ঃ

মার্কসবাদের সাথে সম্পর্কিত হবার পূর্বে অবয়ববাদের ধারণাটি সম্পূর্ণ ভিন্নার্থক ছিল এবং তার চর্চা হত মূলতঃ ভাষাবিদ্যা, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির বিভিন্ন শাখায়। ১৯৬০ এর দশকে ফরাসী সমাজ বিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখাতেই এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হতে থাকে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, অবয়ববাদ ফরাসীদের আবিষ্কার ছিল না, ধারণাটি কেবলমাত্র ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে তাদের মাধ্যমে।

অবয়ববাদী ধারণার প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যায় প্রাচীন যুগের পীথাগোরাস রচনায়। এরপর প্লেটোর বক্তব্যেও অবয়ববাদের ছাপ পাওয়া যায় যখন দেখা যায় তিনি 'বিশেষ' এর উপর গুরুত্ব না দিয়ে 'সমগ্র' বিষয়ে চিন্তাভাবনা করছেন। অবয়ববাদের যে আধুনিক ধারণার সাথে আমরা পরিচিত, সেই ঐতিহ্যের সূচনা ঘটেছে সমাজতত্ত্বের জনক অগাস্ট কোঁৎ (August Comte, 1798-1857) এর আবির্ভাবের পর।

অবয়ববাদে বলা হয়, ব্যবস্থা হবে আলোচনার কেন্দ্রীয় অংশ এবং ব্যবস্থা গড়ে উঠবে কতকগুলি আন্তঃসম্পর্কযুক্ত অংশের সমন্বয়ে যাদের নির্দিষ্ট সীমানা আছে। কোন বিশেষ ঘটনা এখানে প্রাধান্য পাবে না, প্রাধান্য পাবে সমগ্র। যে অংশগুলির সমন্বয়ে সমগ্র গড়ে উঠবে তা হবে আত্মনিয়ন্ত্রণকারী ও প্রতিবেদনশীল। যে অংশগুলি নিয়ে সমগ্র গড়ে উঠবে তারাও নিজেরা আবার এক একটি সমগ্র হিসাবে বিবেচিত হবার যোগ্য এবং তাদেরও অংশ থাকবে যারাও নিজেরা সমগ্র।

ষাটের দশকের কাছাকাছি সময়ে অবয়ববাদী ধ্যানধারণা ফ্রান্সে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। শৌশার (Saussare) এবং জ্যাকোবিনসন (Jacobinson) ভাষাবিদ্যায় ভাষার কাঠামো অনুসন্ধানের জন্য, লেভি স্ট্রাস (Levi Strauss) নৃতত্ত্বে আদিম সমাজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে, লাকান (Lacan) এবং ফুকো (foucalt) মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ ঘটান। সুতরাং ফরাসী মার্কসবাদও যে এর প্রভাবমুক্ত থাকবে না, এটাই স্বাভাবিক।

আলথুসেই সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে ফরাসী মার্কসবাদের সাথে অবয়ববাদের মিশ্রণ ঘটান তাত্ত্বিক স্তরে, অবশ্য তিনি একাজ করেছিলেন লুকাস (Lukács), গ্রামসি (Gramci), সার্তে (Sarte) প্রমুখ তাত্ত্বিকদের বিরোধিতা করবার জন্য। অবশ্য আলথুসের পূর্বে মার্কসবাদে অবয়ববাদের কোন চিহ্ন ছিল না, তা কিন্তু নয়। মার্কসের নিজের লেখার মধ্যেও এর ছাপ রয়েছে। শ্রেণী, শ্রমবিভাজন, উৎপাদন পদ্ধতি, শ্রেণী সংগ্রাম প্রভৃতির কোনটিতেই বিশেষ ব্যক্তি গুরুত্ব পায়নি—যৌথ সমগ্রতার কথাই ধ্বনিত হয়েছে বারংবার। অর্থাৎ পরিণত মার্কসের নিজের লেখার মধ্যেও অবয়ববাদের অস্পষ্ট রূপরেখা পাওয়া যায়, যেগুলিকে আলথুসে পরবর্তীকালে প্রকটিত করেছিলেন।

মার্কসবাদের সাথে সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের বুর্জোয়া দর্শন ঘেঁষা একটি মতাদর্শকে অবয়ববাদের সাথে যুক্ত করার ফলে মার্কসবাদ কতকগুলি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিল। অনেকে মার্কসবাদের বিশুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, মার্কসবাদের চরিত্র কলঙ্কিত হয়নি, বরং তার একটি নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে তার মধ্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। আসলে অমার্কসীয় ঐতিহ্যের সাথে মার্কসবাদকে যুক্ত করা পশ্চিমী মার্কসবাদের প্রবক্তাদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে অ্যান্ডারসন (Anderson) মনে করেন। আবার পশ্চিমী মার্কসবাদে তত্ত্ব ও বাস্তবের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান লক্ষ্য করা যায় সেটিও আলথুসের মধ্যে যথেষ্টমাত্রায় রয়েছে। অবশ্য সাথে সাথে একথা স্বীকার করা উচিত যে, আলথুসের তত্ত্ব ও বাস্তবের মধ্যে ব্যবধান থাকলেও দুটি তাত্ত্বিক স্তরে অর্থাৎ বুর্জোয়া ও মার্কসবাদী তত্ত্বের মধ্যে যথেষ্ট ঐক্য আনয়নে আলথুসে সফল হয়েছেন। এছাড়াও, কমিউনিস্ট পার্টিকে অগ্রদূতের ভূমিকা না দেওয়া, শ্রমিক শ্রেণীকে গুরুত্ব না দেওয়া, অর্থনীতির পরিবর্তে দর্শনকে প্রাধান্য দেওয়া, রাষ্ট্র ও আইনের পরিবর্তে সংস্কৃতি, মতাদর্শ, সচেতনতা, পদ্ধতি, কলাবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে চিন্তাভাবনা যা পশ্চিমী মার্কসবাদীদের মধ্যে দেখা যেত, সেগুলির সবই তাঁর তত্ত্বে বর্তমান।

ক্যালিনিকস্ (Callinicos) এর মত কোন কোন তাত্ত্বিক মনে করেন, তাঁর তত্ত্ব মার্কসবাদের বর্তমান পর্যায়ে বৈশ্লেষিক মার্কসবাদের (analytical marxism) উদ্ভবের পরিপ্রেক্ষিত হিসাবে কাজ করছে এবং তিনি নিজেও কিছুটা অবচেতনভাবে বৈশ্লেষিক মার্কসবাদের একতিয়ারে প্রবেশ করেছেন। এই মার্কসবাদীদের প্রধান কর্তব্য ছিল পশ্চিমী মার্কসবাদীদের আমদানিকৃত হেগেলীয় ধারণাকে মার্কসবাদ থেকে নির্বাসিত করা, পরিবর্তে দৃষ্টবাদী সমাজ বিজ্ঞানকে ফিরিয়ে আনা। পশ্চিমী মার্কসবাদী হয়েও আলথুসে কিন্তু হেগেলের সমর্থক ছিলেন না, তিনি হেগেলীয় উপাদান সহ মার্কসবাদ থেকে সকল মানবিক, ঐতিহাসিক ও অভিজ্ঞতাবাদী ধ্যানধারণা বর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং ক্যালিনিকসের বক্তব্যের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা অবান্তর।

৩.৩ আলথুসের বক্তব্যের দার্শনিক পরিপ্রেক্ষিত ঃ

আলথুসের তত্ত্বের দার্শনিক প্রেক্ষাপট হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে সমসাময়িক যুগে প্রচলিত মানবতাবাদী, ঐতিহাসিকতাবাদী এবং অভিজ্ঞতাবাদী ধ্যানধারণার কথা। তাঁর সময়কার ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টিতেও এই বিষয়গুলিকে বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণার পরিচায়ক বলে ধরে নেওয়া হত। কিন্তু তিনি ঐগুলির বিরোধিতার জন্যই তাঁর তত্ত্ব রচনা করেছিলেন। তিনি বলেছেন, ঐগুলির ব্যবহার শ্রেণীসংগ্রামের রাজনৈতিক অনুশীলনের ক্ষেত্রে মারাত্মক ফলদায়ী হতে পারে। সুতরাং ঐগুলি বর্জন করাই উচিত।

মানবতা (humanity) ছিল পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ বেশীরভাগ বলশেভিক কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁরা "Every thing for man" স্লোগানে বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু পশ্চিমী মার্কসবাদী আলথুসে বিষয়টি সমর্থন করেননি। বিষয়টি কোনমতেই অস্বাভাবিক নয় কারণ পশ্চিমী মার্কসবাদীরা সর্বদাই সোভিয়েত বিরোধিতায় নিজেদের নিয়োজিত রাখতেন। পরিবর্তে তিনি ঘোষণা করলেন, মানবতা বিজ্ঞান নয়, ভাবাদর্শ মাত্র। মার্কসবাদ যেহেতু বিজ্ঞান, তাই তার মানবতার সাথে কোন যোগসূত্র রাখা উচিত নয়। পরিবর্তে তিনি মানবিক অনুশীলনের (human praxis) কথা বলেছেন, যা একধরনের ক্রিয়াশীলতা এবং যা অর্থনৈতিক, মতাদর্শগত ও বৈজ্ঞানিক,—নানা ধরনের হতে পারে। এই অনুশীলন অন্যান্য ধরনের অনুশীলনকে নির্ধারিত করতে পারে। তাঁর মার্কসবাদে কার্য কে করছে তা নিয়ে কোন চিন্তাভাবনা নেই, পরিবর্তে কী ধরনের কার্য হচ্ছে সেটাই প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয়তঃ তাঁর মতে, মার্কসবাদ ঐতিহাসিকতাবাদ (historicism) নয়, এ হল মানবিক সমগ্রতার অবয়ববাদী বিশ্লেষণ। সমসাময়িক যুগে প্রচলিত "Man makes History" ধারণাটি তাঁর মনে হয়েছে শ্রেণী সংগ্রামের ধারণার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ নয়। তাঁর বক্তব্য কতকগুলি ব্যক্তির সমন্বয়ে শ্রেণী গড়ে ওঠে এই মতবাদটি গুরুত্বপূর্ণ নয়, যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল শ্রমবিভাজন, উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রভৃতির ভিত্তিতে শ্রেণী গড়ে ওঠে এবং ঐ বিষয়গুলি নিয়েই মার্কসবাদ। তাঁর বিশ্বাস, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের অর্থ কতকগুলি ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে যথাক্রমে উপরিসৌধ এবং ভিত্তির উপর নির্ভরশীল করে তোলা নয়, বরং তা সমগ্রের উপর নির্ভরশীল। তিনি আরও বলেছেন, পুঁজিবাদী সমাজে মার্কসের বিশ্লেষণ মানবতাবাদী, ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের সাথে জড়িত নয়, তা জড়িত উৎপাদন সম্পর্কের সাথে, যা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানুষ কি ভূমিকা নেবে তা নির্ধারণ করে। সুতরাং তাঁর মতে, মার্কসবাদের ক্ষেত্রে মানবতাবাদী—ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন নেই।

তৃতীয়তঃ তিনি অভিজ্ঞতাবাদকেও বর্জন করেছেন। অভিজ্ঞতাবাদে বলা হয়, কতকগুলি তথ্যই জ্ঞান। অভিজ্ঞতাবাদ বিষয় এবং বিষয়ী, মূর্ত এবং বিমূর্ত প্রভৃতি বিষয়ের মধ্যে পৃথকীকরণ করে বুঝবার চেষ্টা করে এই বিশ্বকে খুব সহজেই আয়ত্ত করা সম্ভব। কিন্তু আলথুসের মতে, অভিজ্ঞতাবাদ সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কোন বিষয়কে অধ্যয়নের সুযোগ থেকে আমাদের বঞ্চি ত করছে। আবার অভিজ্ঞতাবাদের ভিত্তিতে জ্ঞানার্জন করলে তার স্বরূপ এক একজনের কাছে এক একরকম হতে পারে যা অসুবিধাজনক। মার্কিন সমাজ বিজ্ঞানের এই প্রভাব কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির পক্ষে খারাপ হচ্ছে। অবশ্য অভিজ্ঞতাবাদ বর্জনের সুপারিশের জন্য থমস্ন (Thompson) তাঁকে এই বলে সমালোচিত করেছেন যে তিনি অভিজ্ঞতাবাদকে বর্জন করতে গিয়ে বাস্তবের সাথে যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছেন।

এছাড়াও, সমসাময়িক যুগে প্রচলিত ইতিহাস গড়ে ওঠার পিছনে কোন মানুষের বিশেষ ভূমিকাকে মেনে নেবার যে ঐতিহ্য বর্তমান ছিল তাকেও তিনি মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। প্রসঙ্গতঃ অষ্টাদশ ব্রুমেয়ারে মার্কস লুই বোনাপার্টকে ইতিহাসের চালিকা শক্তি হিসাবে দেখিয়েছন এবং আপেক্ষিক স্বাধীকার সম্পন্ন ফরাসী রাষ্ট্রের পিছনে বোনাপার্টকেই দায়ী করেছেন। কিন্তু আলথুসের মতে, বোনাপার্টের আবির্ভাব না হলে ফ্রান্সে ঐরকম অবস্থা হত না—একথা বলা যায় না। ব্যক্তি ইতিহাসের ফলশ্রুতি মাত্র, শ্রেণী সংগ্রামই হল তার চালিকাশক্তি। যাই হোক, মানবতাবাদী, অভিজ্ঞতাবাদী, ঐতিহাসিকতাবাদী ও বিশেষ মানুষের ভূমিকার স্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে যে বিশ্লেষণ ধারা গড়ে উঠেছিল তাকে বর্জন করবার জন্যই আলথুসে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং সেগুলিকেই তাঁর তত্ত্বের দার্শনিক প্রেক্ষাপট বলে অভিহিত করা হয়।

৩.৪ আলথুসের বক্তব্যের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত ঃ

আলথুসের তত্ত্বের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি (PCF) র কথা। ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২০ সালে বলশেভিক পার্টিগুলির আদলে এবং ১৯২৮ সাল পর্যন্ত তার সদস্যসংখ্যা খুব সীমিত ছিল। এই সময় মার্কসবাদে তার কোন অবদান ছিল না এবং কোন আন্তর্জাতিক ঘটনার নিজস্ব ব্যাখ্যা পার্টি দেয়নি। পরবর্তীকালে ১৯২৮ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত পার্টির কাঠামোগত পরিবর্তনের ফলে সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং ফ্রান্সের বেশ কিছু বুদ্ধিজীবীকে পার্টি সদস্য হিসাবে পেলেও পার্টির উপর স্টালিনবাদের প্রভাব এত বেশী ছিল যে তার পক্ষে নূতন কিছু করে ওঠা সম্ভবপর ছিল না। ১৯৪০ সালে জার্মান ফ্যাসীবাদীরা ফ্রান্স দখল করবার পর ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টিতে মার্কসবাদ বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। আলথুসে পার্টিতে যোগ দেন ১৯৪৮ সালে, যখন পার্টি হয়ে উঠেছে ইউরোপের বৃহত্তম কমিউনিষ্ট দল এবং জার্মান কমিউনিষ্ট পার্টির অস্তিত্বও বিলুপ্ত হয়েছে। এই সময় পার্টি মার্কসবাদে তাত্ত্বিক অবদান রাখবার মত পর্যায়ে গিয়েছিল কিন্তু আন্তর্জাতিক স্তরে ঠান্ডা লড়াই এবং বিশ্ব শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ জগতে বিভক্ত হয়ে পড়ায় ও স্টালিনের প্রচন্ড প্রভাব চলতে থাকায় তা করে ওঠা সম্ভব হয়নি। বস্তুতঃপক্ষে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত পার্টির পক্ষে নিজস্ব কোন অবদান রাখা

সম্ভব হয়নি, যদিও ঐ সময় মার্কসবাদের ইটালীয় এবং জার্মান সংস্করণ বহুল প্রচলিত ছিল। ফরাসী শ্রমজীবী মানুষের কাছেও মার্কসবাদের চাইতে প্রুঁধোবাদ, ব্লাকিবাদ ও নৈরাজ্যবাদী শ্রমিক সংঘবাদী তত্ত্বসমূহ (anarcho-syndicalism) বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এছাড়াও, প্রচলিত ছিল বেশ কিছু বুর্জোয়া সংস্কারবাদী তত্ত্ব যা শেষ পর্যন্ত জন্ম দিয়েছিল আঞ্চলিকতা এবং ভাবাদর্শের।

কিন্তু ১৯৬০ এর দশকে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থার উন্নতি হয়। ঠাণ্ডা লড়াই কিছুটা প্রশমিত হওয়ায় এবং খ্রুশ্চেভ স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে স্টালিনবাদের অবসান ঘটানোর পর্বের (de-Stalinization) সূচনা করায় ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি স্বাভাবিকভাবে কিছুটা উদার হবার সুযোগ পায় যার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন পার্টির বৌদ্ধিক তাত্ত্বিকরা। আলথুসেও একাজে এগিয়ে আসেন। অর্থাৎ ১৯৪৮ সালে পার্টির সদস্য হয়েও মার্কসবাদে কোন তাত্ত্বিক অবদান রাখার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল দীর্ঘ এক যুগ। এরপর তিনি স্টালিনের বিরুদ্ধাচরণ করে লিখতে আরম্ভ করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি স্টালিন বিরোধী হয়ে ওঠেননি, হয়ে উঠেছিলেন পার্টি বিরোধী কারণ পার্টি তখন প্রচার করত "Everything for Man" এর কথা আর তিনি বলতেন মানবতাবাদ বিরোধী কথাবার্তা।

৩.৫ মার্কসবাদের আলথুসারীয় সংস্করণ ঃ

আলথুসার প্রধানতঃ জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী (Epistemological Aspect) এবং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী (Substantive Aspect) থেকে অর্থাৎ প্রধানতঃ দুটি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মার্কসবাদের অবয়ববাদী বিশ্লেষণ করেছেন। জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী বলতে তিনি বুঝিয়েছেন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন করবার পূর্বেকার বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিকোণকে, আর মার্কসবাদে যা আলোচনা হওয়া উচিত সেটাই হল তাঁর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী।

৩.৫.১ জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী ঃ

জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি কতকগুলি দার্শনিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। অর্থাৎ তাঁর কাছে মার্কসবাদ আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু ছিল কতকগুলি দর্শন সংক্রান্ত প্রশ্ন। *For Marx* (1965, Eng. Edn. 1969) গ্রন্থ অনুযায়ী এই প্রশ্নগুলি হল, মার্কসীয় দর্শন কী ? অস্তিত্ব বজায় রাখবার কোন তাত্ত্বিক অধিকার আছে কী ? যদি সেরকম কিছু থেকে থাকে তাহলে কীভাবে তাকে সংজ্ঞায়িত করা যাবে ? এই সকল প্রশ্নের উত্তর তিনি মার্কসের পরিণত বয়সের রচনা *Capital* গ্রন্থ হতে খুঁজে বার করতে সচেষ্ট হয়েছিল এবং তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন তাঁর *Reading Capital* (1966, Eng. Edn. 1970) গ্রন্থে। তিনি জানিয়েছেন, কোন বিষয়কে দর্শনের অন্তর্গত হতে হলে তার কতকগুলি আন্তঃ সম্পর্কযুক্ত ধারণা থাকতে হবে। মার্কসবাদের মধ্যে তিনি এজাতীয় কতকগুলি আন্তসম্পর্কযুক্ত ধারণার উপস্থিতিকে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেছেন, বিচ্ছিন্নতা, শ্রমবিভাজন, শ্রেণী, শ্রেণী সচেতনতা, উৎপাদিকা শক্তি, উৎপাদন সম্পর্ক, উৎপাদন প্রক্রিয়া এ সমস্ত কিছুই যা মার্কসবাদে বহুল প্রচলিত — তা সবই আন্তঃসম্পর্কযুক্ত ধারণা। সুতরাং মার্কসবাদ দর্শনের অন্তর্গত একটি শাস্ত্র। তবে মার্কসবাদে ব্যবহৃত ধারণাগুলির প্রতিটি সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত নয়, ধারণাগুলির বেশ কিছু অংশের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ আছে, বাদবাকি অংশের রয়েছে মতাদর্শগত দৃষ্টিকোণ। মতাদর্শগত অংশটিকে নির্ণয় করে তাকে বর্জন করে মার্কসবাদকে বিজ্ঞানসম্মত করে তুলতে হবে।

দ্বিতীয়ত ঃ মার্কসকে অধ্যয়ণ করতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন যে দুটি চিন্তাকাঠামোর (problematics) আলোকে তাঁকে বিচার করা উচিত। এর একটি হল ১৮৪৫ সালের পূর্ববর্তী তরুণ মার্কস, যার উপর কাঠামো নয় প্রভাব ছিল হেগেন, ফয়েরবাখ প্রভৃতি ভাবাদর্শবাদীদের। এই মার্কসের মূল আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল মানুষ। মানুষের বিচ্ছিন্নতার কারণ কী, কীভাবে এই বিচ্ছিন্নতা দূরীভূত হতে পারে, মানুষ কীভাবে অন্যের অধীনস্থ হয়ে পড়ে,

কীভাবে তার শোষণ মুক্তি হবে, তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ কোন পথে হতে পারে এই সব বিষয়েই তিনি ছিলেন অধিক চিন্তিত। কিন্তু ১৮৪৫ সালের পরবর্তী মার্কস এই প্রশ্ন থেকে সরে গেছেন। এই মার্কসের মধ্যে মানবতাবাদী হেগেলীয় উপাদান পাওয়া যাবে না। পরিবর্তে দেখা যায় তিনি কতকগুলি বিষয়ীগত কাঠামোকে, যেমন শ্রেণী, শ্রেণীসংগ্রাম, শ্রমবিভাজন, উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রভৃতিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। ১৮৪৫ সালের পরবর্তী মার্কস নিজেকে করে তুলেছেন অনেক বেশী বিজ্ঞান সম্মত, ভাবাদর্শের প্রভাব থেকে নিজেকে অনেক বেশী করে দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। আলথুসে বলেছেন, এই দুই মার্কসের জ্ঞানতাত্ত্বিক বিচ্ছিন্নতা (Epistemological Break) হয়েছে *German Ideology*তে। তবে তিনি একথাও স্বীকার করেছেন, পুরোপুরি বিচ্ছিন্নতা আসেনি। পূর্ববর্তী মার্কসের কতকগুলি ছাপ পরবর্তী মার্কসের মধ্যে থেকে গেছে—উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বিচ্ছিন্নতার প্রশ্নটি *Capital* গ্রন্থে পৃথকভাবে আলোচনা না করলেও প্রচ্ছন্নভাবে তা থেকে গিয়েছিল। প্রকট ও প্রচ্ছন্ন দুটি ধারাকে অনুধাবন করবার জন্য *Reading Capital* গ্রন্থে তিনি Symptomatic Reading এর কথা বলেছেন। এই অধ্যয়ণের ফলে প্রকট অর্থ ও নিহিত অর্থকে যথাযথভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হবে এবং এরপর শুধুমাত্র তাদের বৈজ্ঞানিক দিকগুলি গ্রহণ করতে হবে এবং এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে দার্শনিকদের। প্রসঙ্গতঃ Epistemological Break শব্দটি তিনি গ্রহণ করেছেন ফরাসী দার্শনিক গ্যাসটন ব্যাচেলার্ড (Gaston Bachelard) এর কাছ থেকে এবং Symptomatic Reading শব্দটির মূল প্রবক্তা ছিলেন ফ্রয়েড প্রভাবিত ফরাসী মনস্তাত্ত্বিক লাকান (Lacan)।

তৃতীয়তঃ মার্কসবাদকে জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মানবতাবাদী, অভিজ্ঞানমূলক ও ইতিহাসবাদী বিষয়গুলিকে বর্জন করার কথা বলেছেন কারণ তাঁর মতে, শ্রেণীসংগ্রামের অনুশীলনের ক্ষেত্রে তা মারাত্মক ফলদায়ী হতে পারে। জ্ঞান থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গীগুলি সরিয়ে নেবার পর তাকে তিনি করে তুলেছেন অনুশীলন (praxis) এর সমার্থক। অনুশীলন বলতে তিনি বুঝিয়েছেন একটি রূপান্তরকরণ প্রক্রিয়াকে যার মাধ্যমে অবিশ্লেষিত তথ্য প্রকৃত জ্ঞানে পরিণত হয়। অর্থাৎ অনুশীলনের অর্থ ক্রিয়াশীলতার (activity) সমার্থক। তিনি অনুশীলন গড়ে উঠবার তিনটি পর্যায়ের কথা বলেছেন। এগুলি হল ঃ Generalities I, Generalities II, এবং Generalities III। Generalities I হল সেই স্তর যেখানে অবিশ্লেষিত উপাদানের অনুপ্রবেশ ঘটানো হবে। মার্কসবাদকে পরিশ্রুত করার ক্ষেত্রে এই স্তরের কাজ হবে বিভিন্ন আধাবিজ্ঞান সম্মত ও আধাভাবাদর্শগত উপাদানগুলিকে খুঁজে বার করা। Generalities II তে আধা-বিজ্ঞানসম্মত উপাদানগুলিকে পরিশ্রুত করা হবে এবং ভাবাদর্শগত উপাদানগুলিকে ছাঁটাই করা হবে। তারপর কেবলমাত্র বিজ্ঞানসম্মত উপাদানের সমন্বয়ে একটি বিজ্ঞানসম্মত তাত্ত্বিক কাঠামোর পর্যায় গঠিত হবে। তৃতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ Generalities IIIতে যাবার পর পাওয়া যাবে প্রকৃত জ্ঞান দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ এবং এর সামাজিক প্রয়োগের ফলশ্রুতিতে পাওয়া যাবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।

৩.৫.২ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী ঃ

বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মার্কসবাদের অবয়ববাদী বিশ্লেষণের সময় যে ধারণাগুলির কথা তিনি বলেছেন তার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় মহানির্ধারণের (over determination) কথা। ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব আলোচনার সময় বহুল ব্যবহৃত এই ধারণাটি অলথুসে প্রথম মার্কসবাদে আনেন যা তাঁর মার্কবাদের ব্যবহৃত ধারণাগুলির মধ্যে এক অনন্য স্থান আধিকার করে আছে, মহা নির্ধারণ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আলথুসে বলেছেন যে ঐতিহ্যবাদী মার্কসবাদের ভিত্তি উপরিসৌধকে নির্ধারণ করে বা উভয়ের মধ্যে দ্বিমুখী সম্পর্ক রয়েছে বলে যে দাবী করা হয় তা সত্য নয় কারণ নির্ধারণের বিষয়টি খুবই জটিল এবং বহুমুখী। তিনি বলেছেন, সমাজ কতকগুলি ব্যবহারের সমন্বয় অর্থাৎ ক্রিয়াশীলতার সমন্বয় হিসাবে গড়ে ওঠে যাদের বিভিন্ন স্তর আছে। এঙ্গেলস্ অনুসরণে তিনি তিনটি কাঠামোকে চিহ্নিত করেছেন, যেগুলি হল রাজনীতি, অর্থনীতি ও মতাদর্শ। এদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব স্বকীয়তা

আছে, প্রত্যেকেই এক একটি সমগ্র হিসাবে বিবেচিত হবার যোগ্য এবং প্রত্যেককেই কতকগুলি অংশের সমন্বয় হিসাবে দেখা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, রাজনীতি একটি সমগ্র এবং রাজনৈতিক দল, মতাদর্শ, আইন, আমলাতন্ত্র, সরকার প্রভৃতি তার অংশ। এই প্রতিটি অংশকে আবার সমগ্র হিসাবে ধরা যেতে পারে যেমন রাজনৈতিক দলের অংশ হিসাবে রয়েছে নেতা, সমর্থক, সংবিধান, মতাদর্শ, রণকৌশল প্রভৃতি। এদের প্রত্যেকটি প্রত্যেকটিকে খুব জটিলভাবে নির্ধারণ করে চলেছে, একটি অপরটিকে বা সমগ্র সকল অংশকে নির্ধারণ করতে পারে না। একই কথা প্রযোজ্য অর্থনীতি ও মতাদর্শের ক্ষেত্রে। আবার দেখা যায় একটি কাঠামোর একটি অংশ অপর কাঠামোর একটি অংশকে বা সামগ্রিকভাবে অপর কাঠামোকে নির্ধারণ করতে পারছে। অর্থাৎ জটিল এই প্রক্রিয়া বহুমুখীও হতে পারে। চিরায়ত মার্কসবাদে যেমন কেবলমাত্র অর্থনীতিকেই নির্ধারকের আসন দেওয়া হয়েছিল, তার প্রতিফলন আলথুসের মধ্যে ছিল না কারণ তিনি এব্যাপারে খুব সচেতন ছিলেন যে বর্তমান জটিল পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র অর্থনীতিকে নির্ধারকের আসন দেওয়া উচিত নয়; রাজনীতি, মতাদর্শ এমনকি ধর্মও নির্ধারক হতে পারে। অবশ্য সাথে সাথে আলথুসে একথাও স্বীকার করেছেন যে সকল সমাজে সকল কাঠামো সমানভাবে নির্ধারকের পর্যায়ে যেতে পারে না। যেমন সামন্ততন্ত্রে রাজনীতিই প্রধান ছিল কারণ অর্থনীতির বিভাগ সেযুগে ততটা হয়নি, আবার রাজতন্ত্রে রাজনীতির প্রাধান্য থাকলেও অর্থনীতি তাকে চালিত করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু ধনতন্ত্রে এসে দেখা গেল অর্থনীতিই অন্যান্য সকল কাঠামোকে নির্ধারণ করতে সক্ষম হচ্ছে। আলথুসে আরও বলেছেন, ইতিহাসের এক বিরল মুহূর্তে আসরে সন্ধিক্ষণ (conjuncture) যখন এই তিনটি কাঠামো একই পর্যায়ে এসে সমান হয়ে যাবে। তখন প্রতিটি উপাদানই প্রতিটি উপাদানকে সমানভাবে প্রভাবিত তথা নির্ধারণ করতে পারবে, কোন একটি কাঠামোর বশ্যতা অপর কাঠামোকে স্বীকার করতে হবে না। এই সন্ধিক্ষণ যা অতি অল্প সময়ের জন্য এসে থাকে সেটাই হয়ে ওঠে মহানির্ধারণ।

দ্বিতীয়ত ঃ আলথুসে অবয়ববাদী হেতুবাদের (structural causality) কথা বলেছেন যা মার্কসবাদ চর্চার সময় মনে রাখা প্রয়োজন। Reading Capital গ্রন্থে ব্যবহৃত এই বিষয়টি দার্শনিক স্পিনোজার ঈশ্বরের ধারণার ধর্মনিরপেক্ষ সংস্করণ বলে মনে করা যেতে পারে। স্পিনোজা বলেছেন, God is the immanent, not transient cause of all things। একই রকমভাবে আলথুসে বলেছেন, কিসের জন্য কী ঘটে তা অতি জটিল প্রশ্ন এবং বহুমুখীও বটে। মানুষ ইতিহাসের সৃষ্টিকর্তা নয় — কাঠামো ইতিহাস সৃষ্টি করে এবং মানুষ তার পরিণতি মাত্র। হেতুর ধারণাটি আলথুসে তাঁর তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করেছেন মার্কসবাদের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার বিরোধিতা করবার জন্য যেখানে সকল ঘটনার পিছনে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক কারণ খোঁজা হয়। তাঁর মতে, কোন ঘটনার পিছনে শুধু অর্থনৈতিক কারণ নয়, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, মতাদর্শগত নানান কারণ থাকতে পারে।

তৃতীয়তঃ আলথুসে ইতিহাসকে একটি বিষয়হীন প্রক্রিয়া (a process without a subject) হিসাবে দেখেছেন যা অবয়ববাদী হেতুবাদ থেকে এসেছে বলে মনে করা হয়। তাঁর মতে, ইতিহাস প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভুত্বের সরলরৈখিক ও সমরূপ কোন প্রক্রিয়া নয়। ইতিহাস এগিয়ে যাচ্ছে, তার বিভিন্ন দিকে গতি আছে— সুতরাং মানুষকে তার একমাত্র একক হিসাবে ধরে নেওয়া অন্যায়। তাই মার্কস তাঁর তরুণ বয়সের রচনায় যেভাবে মানুষকে ইতিহাসের বিষয় হিসাবে দেখেছেন, তা ঠিক নয়। তাঁর মতে, উৎপাদন সম্পর্কের কাঠামোই ইতিহাসের বিষয়বস্তু।

এছাড়া তিনি বলেছেন বিকেন্দ্রিত কাঠামোর (decentred Structure) কথা যা লাকানের রচনায় পাওয়া যায়। বিকেন্দ্রিত কাঠামোর ধারণায় বলা হয়, কেন্দ্র বলে কাঠামোয় কিছু থাকতে পারে না, কাঠামো সর্বদাই বিকেন্দ্রিত। বস্তুতঃ পক্ষে, কাঠামোগুলির উৎস হিসাবে তিনি অর্থনীতিকে ব্যবহার করেননি বলে কাঠামোগুলিকে বিকেন্দ্রিত বলে অভিহিত করতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর এই তত্ত্ব ডেরিডার (Derrida) মত অবয়ববাদোত্তর (post-structural) যুগের তাত্ত্বিকদের প্রচণ্ড পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল।

মার্কসবাদকে এই সকল ধারণার সাহায্যে বিশ্লেষণ করে আলথুসে একে বিজ্ঞানসম্মত করে তুলতে চেয়েছিলেন। তবে তিনি বলেছেন এই মার্কসবাদ তার শত্রুদের কাছে বোধগম্য হবে না কারণ এই শাস্ত্র শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ তুলে ধরে যা বুর্জোয়ারা পছন্দ করেনা। আবার তিনি একথাও বলেছেন তার অবয়ববাদী মার্কসবাদ সকলে বুঝতে পারবে না, একমাত্র বুদ্ধিজীবীরাই তাকে আয়ত্ত করতে পারবে । সামাজিক পরিবর্তনের কথাও আলথুসে তুলে ধরেছেন তাঁর অবয়ববাদী আলোচনায়। তিনি বলেছেন, সমাজ হল কতকগুলি কাঠামোর সমাহার যাদের মধ্যে বিরোধ থাকে এই বিরোধ সমাজের বিভিন্ন অংশকে প্রভাবিত করে এবং বিরোধ অতিক্রম করবার জন্য সমাজকে পরিবর্তিত হতে হয়।

৩.৬. আলথুসের তত্ত্বের সমালোচনা ঃ

আলথুসের তত্ত্ব নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে, বিশেষতঃ ১৯৭৮ সালের ফ্রান্সের নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির শোচনীয় পরাজয়ের পর থেকে। সমালোচকরা আজকাল তাঁর চিন্তা কাঠামো নিয়েই প্রশ্ন তুলতে আরম্ভ করেছেন। সমালোচকেরা বলছেন, আলথুসে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে বিজ্ঞান-সম্মত করতে পারবেন বা তাঁর পদ্ধতি ব্যবহার করলে সেটি বিজ্ঞানসম্মত হয়ে উঠবে এরকম দাবি করলেও বৈজ্ঞানিকতা বিচারের মানদন্ড আলথুসে রাখেননি। অর্থাৎ তাঁর পদ্ধতি প্রয়োগের পর যে জ্ঞান অর্জিত হবে তা প্রকৃত জ্ঞান কিনা তা পরীক্ষার কোন উপায় আলথুসে রাখেননি।

দ্বিতীয়ত ঃ আলথুসে বিভ্রান্তির মূল উৎস হিসাবে ভাবাদর্শকে চিহ্নিত করে তাকে পরিহারের কথা বললেও দেখা গেছে বাস্তবে তিনি বারংবার আদর্শবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি ব্যাচেলার্ড, লাকান, ফ্রয়েড, স্পিনোজা প্রমুখের ব্যবহৃত ধারণাগুলিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁর তত্ত্বে প্রবিষ্ট করেছেন। ভাবাদর্শকে শ্রেণী বিভক্ত সমাজের বৈশিষ্ট্য বলে ঘোষণা করলেও পরবর্তীকালে শ্রেণীহীন সমাজেও তা থাকতে পারে একথা বলেছেন এবং পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের শিকার হয়েছেন ও সমালোচকদের সমালোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছেন।

তৃতীয়ত ঃ আলথুসে বলেছেন মার্কসীয় জ্ঞান সকলে আত্মস্থ করতে পারবে না — সামান্য কিছু বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিই এর আস্বাদ গ্রহণ করতে পারবেন। অর্থাৎ তিনি মার্কসীয় জ্ঞানকে সামাজিক সংগঠনের বাইরে রেখে শ্রমিক শ্রেণীকে বৈপ্লবিক কার্য কলাপ থেকে বিচ্যুত করে মার্কসীয় জ্ঞানকে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর চর্চার বিষয়ে পরিণত করতে চেয়েছেন। এর থেকে সমালোচকেরা সিদ্ধান্তে আসেন যে তাঁর মধ্যে খ্রীষ্টবাদের (christianity) প্রভাব রয়েছে এবং মার্কসবাদকে অবরুদ্ধ করেছেন।

চতুর্থত ঃ অভিজ্ঞতাবাদকে বর্জন করে কার্যতঃ তিনি প্রকৃত বিষয়ের অনুসন্ধানের পথ রুদ্ধ করেছেন। আবার মানবতা ও ঐতিহাসিকতাকে বিজ্ঞানের স্বার্থে বর্জন করে মানুষের জীবন কীভাবে চলছে তাকেই উপেক্ষা করেছেন বলে সমালোচকদের দাবি। শ্রেণী সংগ্রামের প্রকৃত চরিত্রও একারণে পুরোপুরি প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এছাড়াও আলথুসে সমালোচিত হয়েছেন এই যুক্তিতে যে তাঁর তত্ত্ব শ্রেণী সংগ্রামের উর্দ্ধে চলে গেছে এবং সেটি ভাবাদর্শের উর্দ্ধেও গেছে। এর ফলে দল ও আমলাতন্ত্র তাদের সুবিধামত তত্ত্বটিকে ব্যবহার করতে পারবে।

পঞ্চমতঃ মহানির্ধারকের কথা আলথুসে বললেও এবং অনুশীলনের গুরুত্বের কথা তিনি স্বীকার করলেও প্রকৃত অনুশীলনের কথা তিনি বলেননি। রেমন্ড উইলিয়ামস্ (Raymond Williams) প্রকৃত অনুশীলন বলতে বুঝিয়েছেন মানবিক অনুশীলনের কথা। আবার থমস্ন (Thompson) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, আলথুসের মহানির্ধারণের ধারণায় আপেক্ষিক স্বাধিকারের কথা বললেও একে তিনি তাঁর তত্ত্বের মৌলিক প্রশ্নে পরিণত করেননি। আসলে তিনি, আপেক্ষিক স্বাধিকার বজায় থাকে এবং একটি কাঠামো খুব জটিল এবং বিভিন্ন দিক থেকে অপর কাঠামোকে

নির্ধারণ করে এ পর্যন্তই বলেছেন, এর বেশী কিছু বলেননি। তিনি বেশী গভীরে যাননি এবং বাস্তব উদাহরণও উপযুক্ত সংখ্যায় দেননি বলে থমস্‌ন মনে করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, আলথুসে অনুশীলনকে গুরুত্ব দিয়েছেন কিন্তু তাকে মানবিক এককের সাথে সম্পর্কিত করেননি। তিনি এই বিষয়টিকে ধারণায় আনেননি যে মানুষ অনুশীলনকে পরিবর্তিত করতে পারে। অনুশীলন ও মানবিক কারকের মধ্যে যে দ্বিমুখী সম্পর্ক থাকে একথা মানতে তিনি অস্বীকার করেছেন।

ষষ্ঠত ঃ হিন্ডেস (Hindess) এর মনে হয়েছে আলথুসে অর্থনীতি এবং অর্থনীতি ব্যতীত অন্যান্য কারকে যেভাবে পৃথকীকৃত করতে সচেষ্ট হয়েছেন শেষ বিচারে তা করা সম্ভব নয়। এছাড়া, এই দুটি কারকের ভূমিকাও খুব স্পষ্ট নয়। এদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব রয়েছে সেটাও আলথুসের তত্ত্ব দূরীভূত করতে সক্ষম নয়। আলোচনার সময় আলথুসে কখনো অর্থনৈতিক উপাদানকে প্রাধান্য দিয়েছেন আবার কখনো তার বিপরীত কাজ করেছেন — অর্থাৎ তাঁর মধ্যে ফুটে উঠেছে দ্বৈত সত্তা।

এই সকল সমালোচনা ব্যতীত আলথুসে নিজেও ১৯৭০ সালে আত্মসমালোচনা করেছেন। সেখানে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন মার্কসীয় তত্ত্ব ও সর্বহারার অনুশীলনের মধ্যে সাযুজ্য বিধান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। আত্মসমালোচনায় তিনি কতকগুলি নূতন ধারণা ব্যবহারের উপযোগিতার কথা বলেছেন যেগুলি তিনি আগে ব্যবহার করেননি। শুধুমাত্র কাঠামোগত বিশ্লেষণ নয়, শ্রেণী সংগ্রাম, জন অংশগ্রহণ প্রভৃতিও প্রয়োজন বিপ্লব সফল করতে — এই স্বীকারোক্তি আমরা পাই তাঁর আত্মসমালোচনা পরবর্তী লেখাগুলির মধ্যে।

৩.৭ আলথুসে কি স্টালিনবাদী ?

আলথুসেকে থমস্‌ন (Thompson) স্টালিনবাদী (Stalinist) বলেও সমালোচিত করতে দ্বিধা করেননি। তিনি বলেছেন "Althussarianism is Stalinism reduced to the paradigm of theory." আসলে আলথুসে নিজেকে স্টালিন বিরোধী বলে দাবি করলেও, স্টালিনবাদের অবসানের যুগে লেখা আরম্ভ করলেও এবং স্টালিনের সমালোচনা করলেও শেষ বিচারে আত্মসমালোচনার পূর্বেই একজন স্টালিনবাদী হয়ে উঠেছিলেন। স্টালিনের সময় পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে বিভিন্ন দমনমূলক ব্যবস্থার আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছিল, তাঁর কাজের সকল প্রকার বিরোধিতা অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছিল। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের পুনর্গঠনের সময় ব্যবহৃত এই সকল কৌশলগুলিকে পরবর্তীকালে সার্বজনীন বলে চালাবার চেষ্টা হয়েছিল ও সে সম্পর্কে কাউকে প্রশ্ন করবার অধিকার দেওয়া হয়নি। থমস্‌নের মতে স্টালিন ব্যবহৃত এই পথেরই তাত্ত্বিক রূপ পাওয়া গেছে আলথুসের মধ্যে। আলথুসে বলেছেন মার্কসবাদের কোন অভিজ্ঞতাবাদী বিশ্লেষণ চলবে না, বিজ্ঞান বলে যা ঘোষণা করা হচ্ছে তাকেই নিঃশব্দে মেনে নিতে হবে, বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিকতা যাচাই-এর কোন উপায়ের সন্ধান তিনি দেননি। আবার নৈতিকতাকে গুরুত্ব দেননি বুর্জোয়া মানসিকতা মার্কসবাদে প্রবেশ করবে এই যুক্তিতে। তাছাড়া, স্টালিনের মধ্যে ইতিহাসের বস্তুবাদী আলোচনার যে অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছে আলথুসের মধ্যেও তা বর্তমান ছিল। এই সকল কারণে থমস্‌ন আলথুসেকে স্টালিনবাদী বলে অভিহিত করা যুক্তিসম্মত বলে মনে করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন স্টালিনবাদকে যদি স্টালিন তাত্ত্বিক রূপ দিতেন তাহলে তার আকার ঐরকমই হত।

৩.৮ উপসংহার ঃ

সন্দেহ নেই আলথুসে একজন বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। তিনি মার্কসবাদে অবয়ববাদের অন্তর্ভুক্তি ঘটিয়ে নিঃসন্দেহে তাতে নূতনত্ব এনেছিলেন। এজন্য তাঁকে একদিকে স্টালিনবাদী বলে নিন্দিত হতে হয়েছিল অপরদিকে তাঁকে সামনে রেখে আফ্রিকায় কিছু কমিউনিস্ট আন্দোলন হয়েছিল। তাঁর অবয়ববাদে প্রভাবিত হয়ে নিকস্ পুলানৎজাস (Nicos

Poulantzas) *Political Power and Social Changes* (1973) গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং একজন মার্কসবাদের অবয়ববাদী বিশ্লেষক হয়ে উঠেছিলেন। শুধুমাত্র সমসাময়িক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে নয়, সমাজ বিজ্ঞানের একটি নূতন শাখা Economic-Anthropology-তেও তাঁর প্রভাব ব্যাপক। আবার মার্কসবাদের বর্তমান অধ্যায়ের অর্থাৎ বিশ্লেষিক মার্কসবাদের জন্মের বীজ আলথুসের মধ্যেই থেকে গিয়েছিল। এই পর্যায়ের মার্কসবাদের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হেগেল বিরোধিতা যা পশ্চিমী মার্কসবাদী হওয়া সত্ত্বেও আলথুসের মধ্যে আশ্চর্যজনকভাবে উপস্থিত ছিল।

Suggestions for Further Study :

1. McLellan, D. — *Marxism After Marx*.
2. Kolakowski, L. — *Main Currents of Marxism*, Vol 3.
3. Bottomore, T. (ed.) — *A Dictionary of Marxist Thought*.
4. Anderson, P. — *Considerations of Western Marxism*.
5. Geras, N. — "*Althusser's Marxism : An Assessment*" (*In Western Marxism : A Critical Reader*).
6. Thompson, E. P. — *The Poverty of Theory and Other Essays*.

Study Questions :

(a) Essay Type :

1. Examine the major aspects of Althusser's Structural Marxism.
2. Can it be argued that Althusser introduced a new methodology in the understanding of Marxism ? Discuss fully.
3. Evaluate Althusser's Marxism in the light of E. P. Thompson's views on the same.

(b) Short Answer Type :

1. What does Althusser mean by 'over determination' ?
2. Why does Althusser call humanism a bourgeois ideology ?
3. What is meant by structural marxism ?

———

পাঠ - ১৫

GRAMSCI'S CONCEPT OF CIVIL SOCIETY

Introduction

Antonio Gramsci's understanding of the concept of civil society is a continuation. albeit critical of the western understanding of the term. It is to be discussed within the over all canvass of the history of the concept in the western social and political thought . Gramsci even as a Marxist thinker made a significant departure in his discussion of the term 'civil society'. Unlike the liberal founders of the concept and also Marx, civil society, for Gramsci is inevitably linked with the issue of hegemony of the ruling classes as well as its overthrow by the Marxist revolutionaries. The most significant aspect of Gramsci's discussion of the concept is that he transforms it into a strategic concept to be pressed into service of socialist revolution. The Gramscian notion of civil society provides an important key to the understanding of the failure of socialism in the former USSR and East Europe, but is far removed from the contemporary understanding of the term as a synonym for NGOs.

Overview of the Term

The term civil society has remained one of the key concepts of modern western social and political thought from around the seventeenth century. In political theory and political sociology, it has been a crucial concept used in close association with the state, which has occupied the centre-stage in western political thought. The term has been used by both the non-Marxist and Marxist thinkers although it has suffered relative neglect in classical Marxism. In the west itself, however, there is no single tradition of thought on civil society. On the contrary there are distinct traditions of thought even in the liberal mode. Today the term has made a dramatic return, somewhat in the wake of globalization, as a key term, like a buzzword, to contemporary understanding of the world. Globalization, as if, has presented the term to the doorsteps of the world. Civil society is today one of the pre-conditions of the donors when giving aid to the third world countries. Most common examples of civil society as far as globalization is concerned, are various Non-Government Organizations (NGOs) involved in various developmental works as well as protection and promotion of human rights of weaker sections of society. The conventional examples will consist of any non-state organizations and associations. The term is used today all over the world in diverse settings, cultures and contexts with varied, often contradictory, meanings. But what is common is that the term is accepted as the idea of the late twentieth and the early twenty-first century.

Intellectual Roots of the Concept

The term 'civil society' is derived from the Latin *societas civitas,* to be exact from Cicero's (Roman thinker) definition of the state (*civitas*) as a partnership in law (societas)

with equality of legal status but not of money or talent among members. Before that, Aristotle's term *koinonia politike* is also thought to be suggestive of civil society. Gradually, it became a generic term of discourse for a secular and political order, as distinct from the religious one.

The term came to be used in Europe from the twelfth century as a nexus of relatively free individuals and groups without reference to the state. It was recorded in people's languages, preferences and behaviour, consciousness and academic writings too. The issues centring around which the term was used were personal security, freedom, security of property, land, house, goods from arbitrary seizure and unlawful violations of the same. Two instruments which proved decisive in the initial development of civil society were : law and legal procedure and justice. The Roman legal system thus played a very important role in the development of civil society. Law was Christian society's instrument for protecting the weak against the strong and securing the personal right of the poor and defenseless. The following brief account indicates the spheres to which the Roman law applied: security of one's own house, family life, personal possession, trade and commerce, ownership and its transferability and so on. The Roman law regulated relatively free-floating relationships in which people were involved in buying, selling, contracting, marrying and entering partnerships.

The final aspect to consider in tracing the intellectual roots of civil society is the issue of government. Government was taken to be an integral part of civil ideology. Civil ideology prescribed the characteristic of proper civil government. The European city-states were seen as embodiments of civic values. The city was defined as the "liberty of citizens or the immunity of inhabitants. City means you dwell safe from violence".

The major conclusion which follows from the above discussion is that the values embedded in the notion of civil society are Greco-Roman combined with the Germanic and the Judeo-Christian influences. These are marked by a religion-culture divide the pluralism of attitudes and a belief (sanctified by law) in associational freedom.

Marxist Tradition

Gramsci's concept of civil society needs to be understood in the overall Marxist tradition on the subject. The Marxist concept of civil society is derived from that of Hegel. The classical Marxist tradition beginning with Karl Marx (1818-83) held generally a negative view of civil society considering it as a bourgeois society, the foundation of the bourgeois state. In his early writings. Marx used the concept of civil society as a yardstick of the change from feudal to bourgeois society. Civil society thus born was the site or crass materialism of modern property relations, of the struggle of each against all of egotism. Marx's civil society was a Hobbesian nightmare of isolated and aggressive individuals bound together by the cash nexus. According to Marx, civil society once composed of collective units such as estates, guilds etc. in the previous ages was dissolved

by the bourgeoisie and transformed into one composed of individuals in which individuals became all-important. Marx's description of civil society was anything but 'social'. Man thus leads a double life, a heavenly and an earthly life. In the heaven of political life he regards himself as a communal being full of public spirit and mindful of the general interest. In the earthly existence of civil society he acts as a private individual treating other human beings as means to his ends and even reducing himself to a means of the plaything of alien market forces Marx hated civil society because the spirit of civil society is the spirit of pure egoism. Civil society is the chief source of human alienation, an expression of the separation of man from his community, from himself and from other men. The followings passage of Marx expresses his negative view of civil society:... the unsocial nature of civic life of private property, trade, industry and the mutual plundering of different civil groups....this debasement, this slavery of civil society is the natural foundation on which the modern state rests.

The relation between civil society and politics, for Marx, was precarious. In the olden days of the guilds, estates and other collectivities there was no separate realm of the civic or the political. The bourgeois civil society is fragmented and conflictual (centring around the private property and greed) necessitating a new type of politics. The politics of state activities in this civil society do not reflect the real conflicts in society but are removed and abstracted from them. The modern bourgeois state is thus necessary by the characteristics of civil society. The state can do little regarding the fragmentation and misery of civil society since its activities are limited to formal negative activities and is rendered impotent by the conflict, which is the essence of economic life.

Unlike the liberal thinkers, who saw in civil society a solution to the problems of modernity. Marx's solution was very straightforward: civil society is to be dissolved if human alienation is to be ended. The dissolution of civil society for Marx meant also the dissolution of the abstract political state.

Some later day commentators have pointed out that Marx's attribution of state-society split to the needs of capitalism is too simplistic. Poggi, for example, has pointed out that the state soiety split in the west had been more complex, and the disentanglement of the western state from Christianity and the Churches had been slow but tortuous. In this story, he argues, it was not economic interests but *raison d'etat* and an autonomous development in religious consciousness that played a leading role. Joseph Femia says that Marx's view of history was partial.... predetermined by his theoretical angle.

Femia also believes that Marx's economic reductionism prevented him from grasping the moral foundations of modern capitalism. He failed to understand that civil society was not simply a neutral space for market exchange. It was primarily an ethical realm of solidarity held together by the force of moral sentiments and natural affections. To the Marxist determinist, this was nothing but a cynical window-dressing designed to hoodwink the masses.

Antonio Gramsci (1891-1937)

Gramsci was a leading and original Italian Marxist thinker known for his concept of hegemony as well as civil society. In fact, the two are interrelated. Unlike the classical Marxists, Gramsci did not hold a negative view of civil society but sought to develop the concept for the cause of socialist revolution. With Gramsci, civil society has found a place in the Marxian lexicon.

Unlike classical Marxism, Gramsci was not entirely happy with the classical Marxian condemnation of civil society. Neither did he accept civil society to be synonymous with commercial and industrial society. Concurring with all Marxists that power was by its very nature asymmetrical and exercised by super ordinate classes over the subordinate classes, he nonetheless was ready to concede that capitalism had an ethical content and that exploitative exchange in it was underpinned by a complex of moral injuctions that make these relationships appear right and proper to all parties involved in the exchange.

Linking his ideas to his central concept of hegemony and seeking to answer the question as why there has not taken place a revolution (socialist) in the West after 1917. Gramsci drew our attention to the role of superstructure, which consisted of two levels. The first is civil society which consists of the "ensemble of organisms commonly called private". The second is the political society or the state. These two levels correspond to the function of hegemony (which the dominant groups exercise throughout society) and the direct domination or command exercised throughout the state and juridical government.

The sphere of civil society (private) contains a set of institutions such as churches, parties, unions, universities, the press and other voluntary associations. Such institutions of civil society perform the vital function of disseminating the ideology of the dominant classes over the subordinate classes, who consent to their own subordination. Civil society thus forms a major basis of the state in the West. According to Gramsci revolution in Russia was facilitated by the fact that in Russia the state was everything and therefore an insurrectionary method of capturing the state by what Gramsci called following a military metaphor, 'a war of movement' or of 'maneuver' i.e. a frontal attack on the state. But in the west where both the state and civil society were developed and there was a proper balance between the two the issue of revolution was complex because here the capture of civil society would be an additional often difficult, task of revolution before the capture of state power or the winning of governmental power. Civil society, which is also termed, again using a military metaphor 'fortresses and earthworks' or 'trench-systems' forms, according to Gramsci, capitalism's second line of defence against revolution. The alternative revolutionary strategy for socialism at least for the west then must grapple with the complex issue of civil society.

A distinction between the state and civil society serves a critical purpose for Gramsci's notion of hegemony and a socialist revolution although the distinction was not very neat

but rather a little blurred. In his oft-quoted statement Gramsci said :

In Russia the State was everything, civil society was primordial and gelatinous : in the west there was a proper relation between the state and civil society and when the state trembled a sturdy structure of civil society was at once revealed. (Selections from Prison Notebooks. 1971)

Perry Anderson, a famous British Marxist scholar has pointed out that there are theoretical lapses in Gramsci's use of the terms 'civil society', 'the state' and 'hegemony'. Despite his attempts at distinctions between them he has often used them almost interchangeably, which has added confusion to a precise understanding of the meaning of the term. But it must be pointed out that Gramsci never sought to equate the state with civil society despite the fact that he was even ready to accord some role to the state in the development of civil society. He once stated that even a policy of *laissez-faire* (i.e. the doctrine of the best state which rules the least!) is established by the state itself. The reason why he objected to the equation between the two is that this might lead to state worship or *statolatry* which leads to the destruction of civil society itself.

On the whole, Gramsci was more receptive to Hegel's concept of civil society than Marx's. In the latter, the term signified a terrain of individual egotism. What impressed Gramsci more was Hegel's discussion of the estates and corporations as "organizing elements of that which represent corporate interests in a collective way in civil society". This is where Gramsci saw great value in civil society for the purpose of socialist revolution.

The common ground between Marx and Gramsci consists in the fact that civil society comprises elements from both the economic base and the non-political aspects of the superstructure. This means the term cannot be fitted neatly into the base-superstructure dichotomy.

According to Joseph Femia, Gramsci's identification of civil society with the 'ensemble' of voluntary associations enabled him to suggest a novel way of withering away of the state in the sense of progressive absorption of state functions by the voluntary transactions and organizations of civil society. Although the term disappeared in later works of Marx, the sphere itself was not entirely lost for Marx. The issue of withering away of politics as a separate sphere controlled by society and its substitution by a new type of democracy reappears in Marx's *The Civil War in France* and also in Lenin's *The State and Revolution, Gramsci*'s discussion is thought to have further developed the above sphere.

References

1. Kaviraj S and Khilnani S eds *Civil Society* : *History and Possibilities* (Cambridge : CUP 2001) Chapters 1-4, 6-7. (These six chapters in this book offer an excellent and up to date examination of the concept of civil society in the leading traditions of political thought in the west.)

2. J. Cohen and A. Arato. *Civil Society and Political Theory* (Cam. Mass. : MIT press. 1992)

3. John Dunn, Locke (Oxford : OUP 1994)

4. M. Reidel Between *Tradition and Revolution : The Hegelian Transformation of Political Philosophy* (Cambridge : CUP. 1984)

5. A. Seligman. *The Idea of Civil Society* (New York : Freepress 1992)

6. Adam Ferguson. *An Essay on the History of Civil Society* (original Edn. Edinburg 1767) edited by Fania Oz-Salberger (Cambridge : CUP 1995)

7. Antonio Gramsci, *Selections from Prison Notebooks* (London : Lawrence and Wishart 1971)

8. A.S. Sassoon. *Gramsci's Politics* (London Crom Helm 1980)

9. L.D. Easton and K.H. guddai (translated and edited). *Writings of the Young Marx on Philosophy and Society* (New York : Doubleday 1967). *Note* The concept of civil society was mostly a preoccupation of early Marx although it did not disappear entirely from the writing of mature Marx. Among his early writings. *The German Ideology* and *On the Jewish Question* particularly contain discussion of the notion.

পাঠ - ১৬

পাশ্চাত্যে মার্কসবাদের বিবর্তনের তিনটি ধারা ও তাদের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

১

১.১ ভূমিকা ঃ

এই পাঠের লক্ষ্য হলো পশ্চিমের দেশগুলিতে গত দেড় শতাব্দীর অধিককাল ধরে মার্কসীয় চিন্তার বিকাশের ধারাগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়া। পশ্চিমে মার্কসবাদের বিকাশের ধারাগুলি সহজে অনুধাবনযোগ্য নয়। সংক্ষিপ্ত পরিসরে ধারাগুলির পর্যাপ্ত আলোচনাও সম্ভব হবে না। পশ্চিমে মার্কসীয় চিন্তার প্রধান প্রধান ধারাগুলির রূপরেখা এ পাঠে পাওয়া যেতে পারে। মার্কসবাদ অনুশীলনে তার বিভিন্ন ধারার সংগে পরিচয় হওয়ার অন্য একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। মার্কসবাদ পাঠে আমরা বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও চিন্তাবিদের সংগে পরিচিত হই, অথচ তাঁদের চিন্তনের নিজস্ব প্যারাডাইমের সংগে পরিচয় না থাকার দরুন তাঁদের চিন্তার বিশেষত্ব আমাদের কাছে ধরা পড়ে না। উদাহরণস্বরূপ, বলা যায়, একই পাঠ্যসূচীতে স্তালিন, গ্রামসী ও কোহেন থাকলেও এঁদের মার্কসবাদী হিসেবেও নিজস্ব ঘরানাটি বুঝতে না পারলে তাঁদের চিন্তাধারার পার্থক্যগুলি পরিষ্কার হয় না। অর্থাৎ স্তালিনকে বুঝতে হবে সনাতনী মার্কসবাদের আলোয়, গ্রামসীকে পাশ্চাত্যে মার্কসবাদী প্যারাডাইমে এবং কোহেনকে বৈশ্লেষিক মার্কসবাদী ঐতিহ্যে. আর একটি বিষয়ও এখানে তাৎপর্যবহ। মার্কসবাদ যেহেতু প্রয়োগের দর্শন তাই একবিংশ শতাব্দীতে যে কোনো রকমের মার্কসবাদ চর্চা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়কে বাদ দিয়ে হতে পারে না। সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের প্রভাব আজ যে কোনো ধরনের মার্কসবাদ চর্চায় পড়তে বাধ্য। যে বিপর্যয়ের তাত্ত্বিক তাৎপর্যও কম নয়।

১.২ মার্কস ও তাঁর সহযোদ্ধা এঙ্গেলস ও অনুগামীদের একটি বিষয় বার বার স্মরণ করিয়ে দিতেন। তাঁরা বলতেন ঃ তাঁদের তত্ত্বের প্রায়োগিক সাফল্য নির্ভর করবে প্রতিটি দেশের 'নিজস্ব পরিস্থিতি'র উপর। তাঁদের এই বক্তব্যের মূল সুর বৈজ্ঞানিক হলেও পরবর্তীকালে ঠিক এই প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেকেই 'নিজের মত' করে মার্কসবাদকে বেঁকিয়েছেন, সংশোধন করেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে এর মূল শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। মার্কসবাদের নামাবলী গায়ে পুরোহিতের সংখ্যা আজ কম নয়। মার্কসবাদের এই প্রায়োগিক দিক মার্কসবাদকে যেমন সারা বিশ্বে বিস্তৃত করেছে তেমনি এটি মার্কসবাদে এনে দিয়েছে নানা জটিলতা ও বৈচিত্র্য। জটিলতা এই কারণে যে সমস্ত মানব-সমস্যাগুলির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সমান গুরুত্ব দিয়ে মার্কস করে যেতে পারেননি। কিছু ক্ষেত্রে আবার তিনি তাঁর চিন্তার পরিবর্তনও ঘটিয়েছেন। সুতরাং জটিলতার সঙ্গে বিতর্কও আছে। অন্যদিকে মার্কসবাদ লালিত-পালিত হয়েছে বিভিন্ন দেশে, সংস্কৃতিতে, ঐতিহ্যে ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশে। আজ মার্কসবাদ যেমন সর্বজনীন তেমনি বৈচিত্র্যময়। স্থানিক বিশেষণযোগে তা ইটালীয় মার্কসবাদ, জার্মান মার্কসবাদ, ফরাসী মার্কসবাদ, সোভিয়েত মার্কসবাদ, চৈনিক মার্কসবাদ, ভারতীয় মার্কসবাদ ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়। বৈধভাবেই বলা হয়ে থাকে, প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নে যা ঘটল তা মার্কসবাদের পরাজয় নয় — এটা হোল সোভিয়েত মার্কসবাদের পরাজয় ও পতন।

পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে মার্কসবাদের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগে যে নানা গুরুতর ভ্রান্তি ঘটেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে পশ্চিমী দুনিয়ায় মার্কসবাদ চর্চার ধারাপ্রবাহের দিকে একবার খোলা চোখে তাকানো যেতে পারে। বিশেষতঃ তার যে সাম্প্রতিকতম রূপ, বৈশ্লেষিক মার্কসবাদ (Analytical

Marxism), তার তাত্ত্বিক কাঠামো আজ নানা গবেষণার বিষয়বস্তু। অবশ্য একথা মনে রাখা দরকার যে মার্কসীয় চিন্তার বিভিন্ন স্তরগুলি, বিশেষকরে তাদের একাধিক উপাদানের, সহাবস্থানও লক্ষ্য করা যায়।

২

২. মার্কসবাদের তিনটি স্তর ঃ

ইউরোপে মার্কসবাদ চিন্তার বিকাশের দিকে তাকালে দেখা যায় মার্কসবাদ যেখানে প্রধানতঃ তিনটি স্তরে আজ পর্যন্ত বিকশিত হয়েছে। এই তিনটি স্তর হল ঃ ক্ল্যাসিক্যাল মার্কসবাদ (কার্ল মার্কসের সময় থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত এর সময়কাল), পাশ্চাত্য মার্কসবাদ (১৯১৮-৬৮) এবং বৈশ্লেষিক মার্কসবাদ (১৯৬৮-)। এই স্তরভেদের ভিত্তি হোল দুটি। এক, কালানুক্রমিক এবং দুই, বিষয়বস্তুগত। উপরোক্ত প্রতিটি স্তরে আমরা দেখতে পাই একগুচ্ছ মার্কসবাদী চিন্তাবিদকে যাঁদের চিন্তার নিজস্বতা সত্ত্বেও কতকগুলি একই সাধারণ বৈশিষ্ট্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কালানুক্রমিক দিক থেকে পাশ্চাত্য ও সনাতনী মার্কসবাদ সেকেলে হলেও, বিষয়বস্তুগত দিক থেকে, প্রতিটি স্তরই বিরাজমান।

২.১ সনাতনী মার্কসবাদ ও তার বৈশিষ্ট্য ঃ

মার্কস (১৮১৮ - ১৮৮৩) ও এঙ্গেলস (১৮২০ - ১৮৯৫)-এর পরবর্তী কয়েকজন বিখ্যাত মার্কসীয় চিন্তাবিদের নাম কালানুক্রমে স্মরণ করা যাক ঃ ল্যাব্রিওলা (১৮৪৩ - ১৯০৪), মেহরিং (১৮৪৬ - ১৯১৯), কাউটস্কি (১৮৫৮ - ১৯৩৮), প্লেখানভ (১৮৫৬ - ১৯১৮), লেনিন (১৮৭০ - ১৯২৪), লাক্সেমবুর্গ (১৮৭১ - ১৯১৯), হিলফারডিং (১৮৭২ - ১৯১৯), ট্রটস্কি (১৮৭৯ - ১৯৪০), স্টালিন (১৮৭৯ - ১৯৫৩), বাওয়ার (১৮৮১ - ১৯৩৮) ও বুখারিন (১৮৮৮ - ১৯৩৮)। এঁরাই ক্ল্যাসিক্যাল মার্কসবাদী হিসেবে অভিহিত। এঁরা বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করে গেছেন যার তালিকা এখানে দেওয়া সম্ভব নয়[১]। কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে দুস্তর মত ব্যবধানের কথা স্মরণে রেখেও এখানে ঐ সকল গ্রন্থে প্রকাশিত তাঁদের চিন্তার তথা ক্ল্যাসিক্যাল মার্কসবাদের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারি।

ক্ল্যাসিক্যাল মার্কসবাদের অন্যতম মৌল বৈশিষ্ট্য হোল মার্কসীয় তত্ত্বের সঙ্গে সর্বহারা আন্দোলনের ঐক্য ও সমন্বয় সাধন। ক্ল্যাসিক্যাল মার্কসবাদীরা সকলেই নিজ নিজ দেশের শ্রমিক তথা কমিউনিস্ট আন্দোলনের নামকরা নেতা বা নেত্রী ছিলেন এবং তাদের তত্ত্ব রচিত হয়েছিল সর্বদাই প্রবহমান আন্দোলনের পক্ষ থেকে অর্থাৎ শ্রমজীবী আন্দোলনকে তাত্ত্বিকভাবে শক্তিশালী করা ও সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে। তাই শ্রমজীবীদের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড যেমন লক্ষ্যহীন ছিল না, মার্কসীয় তত্ত্বও তেমনি ছিল না বৈপ্লবিক কর্মবিমুখ। প্রখ্যাত ব্রিটিশ মার্কসবাদী তাত্ত্বিক পেরী অ্যান্ডারসন (Perry Anderson)। দেখিয়েছেন, ক্ল্যাসিক্যাল মার্কসবাদের তত্ত্ব ও কর্মকাণ্ডের ঐ ঐক্যসাধনের অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল। দু-একটি উল্লেখযোগ্য ঃ মার্কস-এঙ্গেলস-এর ক্ষেত্রেও এমন ঘটেছে যে টানা এক দশক সাংগঠনিকভাবে কোনো আন্দোলনের সঙ্গে যোগবিচ্ছিন্ন ছিলেন ; যে-সকল বড় বড় 'শ্রমিক' আন্দোলনে তাঁরা অংশ নিতেন সেই তথাকথিত 'শ্রমিক'রা প্রকৃত অর্থে শ্রমিক ছিলেনও না ; তাঁরা ছিলেন কৃষক ও কারিগর। ১৮৪৮ সালের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে জার্মানীর ক্ষুদ্র সর্বহারাশ্রেণীর ভূমিকা খুব বৃহৎ ছিল না ; প্যারি কমিউনের সামাজিক উত্থানের চেহারাটা ছিল কারিগরি শিল্পশ্রমজীবীদের, রাজনৈতিক দলের প্রকৃত আবির্ভাব ঘটে মার্কসের মৃত্যুর পর ; মার্কসের বেশিরভাগ লেখা তাঁর জীবিতকালে অপ্রকাশিত থেকে যায় এবং সামান্য যেটুকু প্রকাশিত হয় তাও নানা দেশে, নানা ভাষায় হওয়ায় শ্রমিকদের কাছে তার চিন্তার প্রচারে ও প্রসারে যথেষ্ট বাধা ছিল, এবং মার্কস-এঙ্গেলস্ কোথাও

শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখলের সুস্পষ্ট সম্ভাবনা দেখে যেতে পারেননি।

ক্ল্যাসিক্যাল মার্কসবাদের দ্বিতীয় মৌল বৈশিষ্ট্য হোল ঃ এই মার্কসবাদীরা সকলেই কমিউনিস্ট পার্টির অগ্রগণ্য ভূমিকাকে মেনে নিয়েছিলেন এবং তাতে বিশ্বাসী ছিলেন। শ্রমজীবীশ্রেণীর দল হিসেবে এই দল বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর পুনর্গঠনে নেতৃত্ব দেবে। রাশিয়ায় বিপ্লবের পর অর্থাৎ বলশেভিকবাদের পর ক্ল্যাসিক্যাল মার্কসবাদের এই বৈশিষ্ট্যটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ও সর্বত্র সমাদৃত হয়। এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যে বিতর্কিত বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তাহোল সর্বহারা 'একনায়কতন্ত্র', যেটিকে ক্ল্যাসিক্যাল মার্কসবাদীরা একটি অন্তর্বর্তীকালীন রাষ্ট্র-ব্যবস্থা হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন। এই সর্বহারা 'একনায়কতন্ত্র' আসলে কিন্তু একটি রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং একে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনপর্বে অপরিহার্য এক ব্যবস্থা হিসাবে মেনে নেওয়ার অর্থ দাঁড়ায় রাষ্ট্রকে সমাজের উপর নেতৃত্বের ক্ষমতা অর্পণ করা, সমাজ পরিবর্তনে রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ভূমিকাকে অলঙ্ঘনীয় রূপে মেনে নেওয়া। এখানে ক্ল্যাসিক্যাল মার্কসবাদীরা, সাময়িকভাবে হলেও সমাজ অপেক্ষা রাষ্ট্রকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করেন এবং রাষ্ট্রকে প্রাথমিক হিসেবে গ্রহণ করেন। এই বিষয়টিও যথেষ্ট বিতর্কিত এবং কোন কোন প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশে কমিউনিস্ট দল ও এই 'একনায়কতান্ত্রিক' রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সমন্বয় সমাজতন্ত্রের সর্বনাশের কারণ হয়েছে।

ক্ল্যাসিক্যাল মার্কসবাদের তৃতীয় মৌল বৈশিষ্ট্য, এই মার্কসবাদে 'স্ট্র্যাটেজি' সংক্রান্ত চিন্তার উপস্থিতি। এই স্ট্র্যাটেজি সংক্রান্ত চিন্তা বলতে বোঝায় বিপ্লব তথা সমাজ পরিবর্তন সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনা কারা বৈপ্লবিক শক্তি, কারা কোন্ পর্যায়ে বিপ্লবের শত্রু-মিত্র, কীভাবে বিপ্লব সংগঠিত হবে, বিপ্লবোত্তর পুনর্গঠন প্রক্রিয়া কীরূপ হবে এবং কে কীভাবে তার নেতৃত্ব দেবে ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত ভাবনাকেই স্ট্র্যাটেজি সংক্রান্ত ভাবনা বলা যেতে পারে। মার্কস ও এঙ্গেলসের চিন্তার মধ্যে 'স্ট্র্যাটেজির প্রশ্নে' খুব উন্নত ও সুসংহত তত্ত্বের উপস্থিত না থাকলেও এই ধরনের চিন্তার উপস্থিতি তাঁদের তথা সমগ্র ক্ল্যাসিক্যাল মার্কসবাদকে মার্কসীয় চিন্তার ইতিহাসে একটি অদ্বিতীয় ও বিশিষ্ট মর্যাদা দান করেছে। এ বিষয়টির অন্য একটি তাৎপর্য উল্লেখযোগ্য। আজ এ বিষয়ের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি কোনো চিন্তা প্রকৃত অর্থে আদৌ রাষ্ট্রচিন্তা কিনা তা অনেকাংশে নির্ধারণ করে। যাঁরা মার্কসবাদের আবির্ভাবের পূর্বে রাষ্ট্র চিন্তানায়ক হিসেবে পরিগণিত হতেন, তাঁরা অনেকেই আজ এই বিচারে প্রকৃত রাষ্ট্র চিন্তাবিদ্ হিসেবে পার হবেন না।

৩

২.২ পাশ্চাত্য মার্কসবাদ ও তার বৈশিষ্ট্য ঃ

রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবোত্তর যুগে বিশেষ করে ১৯২০ দশকের শুরু থেকে মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপে, প্রধানতঃ জার্মানী, ইটালী ও ফ্রান্সে যে মার্কসবাদের জন্ম হয় তাকে 'পাশ্চাত্য মার্কসবাদ' বলা হয়ে থাকে। এর বিকাশকাল ১৯৬৮-র পশ্চিম দুনিয়ার বিখ্যাত ছাত্র আন্দোলনের সময় পর্যন্ত। এই মার্কসবাদ ছিল মূলতঃ দার্শনিক ও দর্শনমুখী এবং রাজনৈতিক চরিত্রের। সোভিয়েত মার্কসবাদের বিরুদ্ধে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবেই এই মার্কসবাদের আবির্ভাব ঘটে। এই মার্কসবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে বিখ্যাত কয়েকজনের নাম ঃ লুকাস (১৮৮৫-১৯৭১), কর্সচ (১৮৮৬-১৯৬১), বেঞ্জামিন (১৮৯২-১৯৪০), হর্কাহাইমার (১৮৯৫-১৯৭৩), দেল্লা ভোলপে (১৮৯৭-১৯৬৮), এডর্নো (১৯০৩-৬৯), সার্ত্রে (১৯০৫-১৯৮০), গোল্ডম্যান (১৯১৩-১৯৭০), আলথুসার (১৯১৮-১৯৯১), গ্রামসী (১৮৯১-১৯৩৭), মারকিউস (১৮৯৮-), লেফেবার (১৯০১-) ও কোল্লেত্তি (১৯২৪-)। এই চিন্তাবিদদের লিখিত বিখ্যাত কয়েকটি পুস্তকের নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে

পারে যেগুলির শিরোনামা তাঁদের চিন্তা তথা পাশ্চাত্য মার্কসবাদের বৈশিষ্ট্য অনুধাবনে সাহায্য করবে ঃ নেতিবাচক দ্বন্দ্বতত্ত্ব (এডর্নো), মার্কসবাদ ও দর্শন (কর্সচ), ইতিহাস ও শ্রেণীচেতনা (লুকাস), কারা নোটবুক (গ্রামসী), জ্ঞানদীপ্তির দ্বান্দ্বিক চেহারা (এডর্নো ও হর্কহাইমার), দ্বান্দ্বিক যুক্তির সমালোচনা (সার্ত্রে), সংঘাত ও অতিনির্ধারণের তত্ত্ব (আলথুসার), ইতিবাচক বিজ্ঞান হিসেবে যুক্তিবিদ্যা (ভলপে), পুঁজি পাঠ (আলথুসার ও বলিবর), যান্ত্রিক উৎপাদনের যুগে শিল্প (বেঞ্জামিন), রুচির সমালোচনা তত্ত্ব (ভলপে), নন্দন তত্ত্বে অবদান (লেফেবার), একমাত্রার মানুষ (মারকিউস), সোভিয়েত মার্কসবাদ, যুক্তি ও বিপ্লব এবং যৌনপ্রেম ও সভ্যতা (মারকিউস), ও লুকোন ঈশ্বর (গোল্ডম্যান)।

২.২.১ আবির্ভাবের পটভূমি ঃ

১৯১৭ সালে সোভিয়েত বিপ্লবের পর মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিবাদের শক্তিশালী দেশগুলিতে বিপ্লবের সম্ভাবনা ও প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও বিপ্লব ব্যর্থ হোল। ঐ অঞ্চলের প্রতিটি দেশে সর্বহারা অভ্যুত্থান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হোল। বিপ্লব তো হোল না, উপরন্তু ঐ সব দেশে আবির্ভূত হচ্ছিল চরম প্রতিক্রিয়াশীল ও নিপীড়নমূলক ফ্যাসিবাদের। এই ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগঠিত জনশক্তিও সফল হোল না। ফ্রান্স ও স্পেনে পপুলার ফ্রন্টের পরাজয় (১৯৩০-এর দশকে) এবং ১৯৪০-এর দশকে কমিউনিস্ট দলের নেতৃত্বে সংগঠিত 'প্রতিরোধ' (Resistance) ও ব্যর্থ হোল। 'প্রতিরোধ' শেষপর্যন্ত কোন স্থায়ী রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা স্থাপন করতে পারল না। ফলে, 'প্রতিরোধে' অংশগ্রহণকারী বিপুল জনগণকে কমিউনিস্ট দল শেষপর্যন্ত ধরে রাখতে পারেনি।

শ্রমিক আন্দোলনের এই ব্যর্থতার পাশাপাশি এবং কিছুটা বৈপরীত্যে ঘটল রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে স্ট্যালিনবাদের আবির্ভাব ও জয়জয়কার।

ঠিক তার পাশাপাশি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেই সময় দেখা যায়নি সমাজের নীচুতলা থেকে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে কোনো বড় রকমের চ্যালেঞ্জ। এই দুই দেশে বরং বজায় ছিল পুঁজিবাদী শান্তি ও স্থায়িত্ব। এই দুই অঞ্চলের মধ্যবর্তী জায়গায় জন্ম নিল ও বিকশিত হোল পাশ্চাত্য মার্কসবাদ। এ-বিষয়টিকে অ্যান্ডারসন খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ "এই সবদেশে, এই দুইয়ের মধ্যবর্তীস্থান থেকে গড়ে উঠল এক সনাতনী পর্বোত্তর মার্কসবাদের, যেখানে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে এক বৈপ্লবিক বিকল্প হিসেবে শ্রমজীবীদের আন্দোলন শক্তিশালী ছিলো, যে আন্দোলন গণবৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সূচনাও করতে পারতো (যেটা যেকোনো সমাজতান্ত্রিক চিন্তার আবশ্যিক ভিত্তিভূমি), কিন্তু সে আন্দোলন এমন শক্তিশালী ছিলো না যে প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদের পতন ঘটাতে সক্ষম। ফলতঃ সে আন্দোলন প্রতিটি কঠিন পরীক্ষার মুখে বারবার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।"[৪]

শ্রমিক আন্দোলনের এই ব্যর্থতা ও পরাজয়ের গ্লানি পাশ্চাত্য মার্কসবাদের কেন্দ্রে অবস্থান করছে। মার্কসবাদের সফল প্রয়োগ থেকে যে মার্কসবাদের জন্ম তার চরিত্র হয় এক রকম, কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনের ব্যর্থতার ভিত্তিভূমি থেকে উদ্ভূত মার্কসবাদ হয় গুণগতভাবে ভিন্নতর। পাশ্চাত্য মার্কসবাদের একাধিক বৈশিষ্ট্যে ধরা রয়েছে এই ব্যর্থতার ইতিহাস ও ছাপ।

২.২.২ বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

পাশ্চাত্য মার্কসবাদ ছিল অতিমাত্রায় দর্শনমুখী। এই দর্শনমুখিনতার ফলে মার্কসবাদের মধ্যে দর্শন সংক্রান্ত তর্ক-বিতর্ক পুনরুজ্জীবিত হয়, পাশ্চাত্য মার্কসবাদীরা ডুবে যান গভীর দার্শনিক আলোচনা ও পর্যালোচনায়।

একাজে অনেকেই প্রাক্-মার্কসীয় অনেক দার্শনিকের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেন— কান্ট হেগেল, স্পিনোজা, কিয়ার্ক গার্ড, শেলিং কেউই বাদ যান না। এঁদের দার্শনিক চিন্তা একে একে মার্কসবাদে অনুপ্রবেশ করে। এঁদের সঙ্গে পাশ্চাত্য মার্কসবাদীদের ভাব বিনিময় শুরু হয়। যথেচ্ছভাবে এঁদের চিন্তা-ভাবনাকে পাশ্চাত্য মার্কসবাদীরা ব্যবহার করেছেন। ঠিক এর পাশাপাশি সমসাময়িক অমার্কসীয় চিন্তাবিদরাও বাদ যাননি। পাশ্চাত্য মার্কসবাদের প্রতিটি ঘরানা গড়ে ওঠে কোনো না কোনো সমসাময়িক অমার্কসীয় চিন্তার সঙ্গে এক মিথস্ক্রিয়া র মধ্য দিয়ে। এই অমার্কসীয় চিন্তার প্রভাব পড়েছে পাশ্চাত্যবাদীদের উপর গভীরভাবে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় ঃ হেগেল ও ওয়েবারের প্রভাব লুকাসের উপর ; ক্রোচের প্রভাব গ্রামসীর উপর ; ল্যাঁকার প্রভাব আলথুসারের উপর ইত্যাদি। এই মার্কসবাদীদের দর্শন জিজ্ঞাসার অংশ হিসেবে তাঁদের চিন্তায় জ্ঞানতত্ত্বের দুরূহ বিষয় ও পদ্ধতির প্রশ্নগুলি বিরাট স্থান জুড়ে থাকে। বলাই বাহুল্য, মার্কসবাদের সঙ্গে প্রাক্মার্কসীয় ও অমার্কসীয় চিন্তাবিদদের সংমিশ্রণের যে ফলশ্রুতি তা মার্কসবাদ অনুধাবনের জটিলতা যথেষ্ট বৃদ্ধি করে। পাশ্চাত্য মার্কবাদীদের রচনা তাই খুব একটা সুখপাঠ্য নয় ; বরং অনেক স্থানে দুর্বোধ্য।

অনেকটা উপরোক্ত দর্শনমুখিনতার অংশ হিসেবেই পাশ্চাত্য মার্কসবাদীরা তাদের গবেষণায় শীর্ষস্থান দেন উপরি-কাঠামোগত উপাদানগুলিকে — যেমন শিল্প, সংস্কৃতি, সংগীত, মতাদর্শ, চেতনা ইত্যাদি। যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি তাঁদের গবেষণার ক্ষেত্র থেকে বাদ যায় সেগুলি হোল ঃ রাষ্ট্রশক্তি, বিপ্লবসংক্রান্ত ভাবনা-চিন্তা প্রভৃতি। অ্যাণ্ডারসনের মতে, তাঁদের চিন্তা থেকে ঃ "যেটি প্রস্থান করলো তা হলো প্রকৃতপক্ষে কোনো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্থাপনের পথসংক্রান্ত কৌশলগত ভাবনা-চিন্তা।"[৫]

অথচ এঁরা সকলেই একটি মৌল প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করছিলেন, আর তা হোল, পাশ্চাত্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয়নি কেন। তাঁদের চিন্তার এ স্ববিরোধিতা বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আর একটি মৌল প্রশ্নেও পাশ্চাত্য মার্কসবাদীরা ক্ল্যাসিক্যাল মার্কসবাদ থেকে আলাদা। ক্ল্যাসিক্যাল মার্কসবাদে যেখানে কমিউনিস্ট দলকে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগণ্য ও নেতৃস্থানীয় শক্তি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, পাশ্চাত্য মার্কসবাদে সেখানে কমিউনিস্ট দলের ভূমিকাটি এক বিরাট বিতর্কের বিষয় হয়ে রয়েছে। এ ব্যাপারে পাশ্চাত্য মার্কসবাদীদের নিজ নিজ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটটিও কম দায়ী নয়। এঁরা অনেকেই এক সময় সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন বা করতে বাধ্য হন। অনেকে আবার কমিউনিস্ট দলের সদস্য থেকেও রাজনীতিতে কোন সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন না। পাশ্চাত্য মার্কসবাদীরা কমিউনিস্ট দল অপেক্ষা কাউন্সিলের প্রতি বেশি আকৃষ্ট ছিলেন এবং এঁরা সকলেই কমিউনিস্ট দল থেকে এক অদ্ভুত দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেন।

মার্কসবাদ বিজ্ঞান কি না এ প্রশ্নটিও এই সব মার্কসবাদীদের যথেষ্ট বিচলিত করে। এঁরা এই প্রশ্নে যে ব্যাখ্যাগুলিকে বর্জন করেন তা হোল অভিজ্ঞতাবাদ, সাধারণ বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্বের যুক্তি। এঁরা মার্কসবাদকে একটি সমাজতত্ত্ব (A Theory of Society) হিসেবে মেনে নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন।

এঁদের দর্শন-নির্ভর মার্কসবাদ চর্চার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হোল, হেগেলবাদের আলোকে মার্কসবাদ চর্চা। জার্মান ভাববাদীদর্শন, বিশেষকরে হেগেলের চিন্তাভাবনা, এঁরা বিস্তৃতভাবে মার্কসবাদে ব্যবহার করেন। পাশ্চাত্য মার্কসবাদের জনক ছিলেন লুকাস, যিনি ছিলেন অতিমাত্রায় হেগেলপন্থী। লুকাসের প্রভাব পাশ্চাত্য মার্কসবাদে পড়েছে সুদূরপ্রসারীরূপে।

পাশ্চাত্য মার্কসবাদের যুগে মার্কসবাদ চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রও মৌলভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়। কমিউনিস্ট দল ও আন্দোলনের জায়গায় বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে মার্কসবাদ চর্চার পীঠস্থান। কিন্তু তৎসত্ত্বেও পাশ্চাত্য মার্কসবাদীরা কেউই ঠাণ্ডা লড়াই-এর চরম মুহূর্তেও স্থিতাবস্থার কাছে নতি স্বীকার করেননি।

পাশ্চাত্য মার্কসবাদের একটি মৌল বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্বপূর্ণ দুর্বলতা হোল এই মার্কসবাদ মার্কসীয় তত্ত্বের সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়। সেই ঐক্য প্রতিষ্ঠার কোনো দিকনির্ণয়ও তাঁরা করে যেতে পারেননি। পাশ্চাত্য মার্কসবাদে তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তব শ্রমিক রাজনীতির এক ফারাক তৈরি হয়। এঁরা কোনভাবেই তাঁদের তত্ত্বের বাস্তব প্রায়োগিক প্রাসঙ্গিকতার কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ দিতে সক্ষম ছিলেন না। অ্যান্ডারসন বলেন ঃ 'পাশ্চাত্য মার্কসবাদ গণআন্দোলনের মাধ্যমে বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের প্রয়াসের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত না করে, তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।' এর ফলশ্রুতি হিসেবে পাশ্চাত্য মার্কসবাদ হয়ে রইল 'অ্যাকাডিমিক' বা 'ইনটেলেকচুয়াল' চরিত্রের ; হতে পারলো না 'রাজনৈতিক ইনটেলেকচুয়াল (Political-Intellectual) চরিত্রের।

মার্কসবাদ দাবি করে সার্বিকতার, কিন্তু পাশ্চাত্য মার্কসবাদের 'পাশ্চাত্য' শব্দটির মধ্যে নিহিত রয়েছে এক ধরনের আঞ্চলিকতা, ইউরোপের বিশেষ এক অঞ্চলের সঙ্গে ছিল এই মার্কসবাদের আঁতের যোগ। অ্যান্ডারসন সঠিকভাবেই বলেছেন ঃ "এ-মার্কসবাদ যতদূর পাশ্চাত্যচরিত্র সম্পন্ন, ততটাই কম মার্কসীয়। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তার পূর্ণশক্তি তখনই প্রয়োগ করতে পারে যখন সে সবরকম আঞ্চলিকতাবাদ মুক্ত।" পাশ্চাত্য মার্কসবাদের আর একটি দুর্বলতা হোল, মার্কসবাদীরা স্টালিনবাদকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারেন নি, তেমনি তাকে তত্ত্বগতভাবে বা কোনো বাস্তব আন্দোলনের মধ্যে মোকাবিলাও করেননি। এই সকল মার্কসবাদীরা ছিলেন 'তাত্ত্বিক' মার্কসবাদী। তাঁদের সমসাময়িক ইউরোপীয় শ্রমিক আন্দোলন শক্তিশালী ছিলো না, তাই বোধহয়, তাদের তত্ত্ব ছিল ভীষণ শক্তিশালী। অ্যান্ডারসনের মত লেখকরা অবশ্য এ-ব্যবস্থাকে স্থায়ী বলে মনে করেন নি। তিনি বলেছেন ঃ "জনগণ যখন কথা বলে, তাত্ত্বিকগণ তখন চুপ থাকতে বাধ্য!" পাশ্চাত্য মার্কসবাদীরা অবশ্য নানা বিষয়ে আলোকপাত করে মার্কসবাদ গবেষণায় অনেক মৌল দিগন্ত উদ্‌ঘাটন করে গেছেন। কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে বলা যায়, শেষ বিচারে এই মার্কসবাদ এক ব্যর্থ মার্কসবাদ।

৩. বৈশ্লেষিক মার্কসবাদ ঃ

১৯৬৮ সালে ইউরোপের শক্তিশালী ছাত্র আন্দোলন শুধু পুঁজিবাদকে বড় ধাক্কা দেয়নি, এই ছাত্র ও শ্রমিক অভ্যুত্থান পাশ্চাত্য মার্কসবাদকে একটা বড় চ্যালেঞ্জ জানায়। অবশ্য মনে রাখা দরকার, ঠিক ১৯৬৮ সালেই এই মার্কসবাদের পরিসমাপ্তি ঘটেনি। ১৯৭০ দশকের মধ্যভাগকে অনেকে পাশ্চাত্যবাদের পরিসমাপ্তি কাল বলেন। কিন্তু কিছুটা ভিন্ন অর্থে এবং আংশিকভাবে, হ্যাবারমাসের নব্য সমালোচনাধর্মী তত্ত্বে এই মার্কসবাদী ঐতিহ্য আজও জীবিত, যদিও হ্যাবারমাস ইউরোপীয় মার্কসবাদ গবেষণায় সংখ্যালঘু।

১৯৭০-এর দশকে যে বৈশ্লেষিক মার্কসবাদের জন্ম হোল তা ছিল ক্ল্যাসিক্যাল ও পাশ্চাত্য মার্কসবাদের বিরুদ্ধে বড় প্রতিবাদ। ইঙ্গ-মার্কিন মুলুকে এই মার্কসবাদ অনুশীলনের বিষয়টি গভীর তাৎপর্যবাহী। অ্যান্ডারসন বলেছেন ঃ "গত এক দশকে মার্কসবাদ চর্চার ভূগোল যথেষ্ট পাল্টেছে। আজ মার্কসবাদ চর্চার প্রধান কেন্দ্রগুলি ইংরেজীভাষী দেশে অবস্থিত। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে তা ছিল জার্মান, ইউরোপে এবং যুদ্ধোত্তর পর্বে তা ছিল জার্মান ইউরোপে। এই ঘটনাটি এক ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ঐতিহ্যবাহী। মার্কসবাদ চর্চার দিক থেকে পুঁজিবাদের সবচেয়ে অনগ্রসর এলাকা আজ সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে।" অথচ পাশ্চাত্য মার্কসবাদের যুগে, পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের এই দুই শক্তিশালী ঘাঁটি, আমেরিকা ও ব্রিটেন, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ চর্চায় কত বাধাই না দিয়েছিল ! এখন প্রশ্ন হোল, কীভাবে এই দুই দেশে মার্কসবাদ চর্চার এই অভ্যুদয় ঘটলো।

৩.১ আবির্ভাবের পটভূমি ঃ

প্রথমত, কতকগুলি সামাজিক রাজনৈতিক ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। ১৯২০-র দশকের পর বহুদিন ইউরোপে খুব বড় আকারে শ্রমিক অভ্যুত্থান দেখা যায়নি। ইউরোপীয় শ্রমিক আন্দোলনে যেন ভাটা পড়েছিল, শ্রমিকের জঙ্গীয়ানা যেন অতীতের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শ্রমিক আন্দোলনের এই করুণ অবস্থা জন্ম দেয় এক ধূসর মার্কসবাদের যাকে আমরা পাশ্চাত্য মার্কসবাদ হিসেবে উপরে চিহ্নিত করেছি। কিন্তু ১৯৬৮ সালের পর থেকে একটির পর একটি ঘটনা শ্রমিক আন্দোলনের এই স্থবির অবস্থা ভেঙ্গে দেয়, ইউরোপীয় শ্রমিক আন্দোলনে এনে দেয় বড় ঢেউ যার মধ্য দিয়ে ইউরোপের মার্কসবাদও হয়ে ওঠে সজীব ও প্রাণবন্ত। ১৯৬৮ সালের মে মাসে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে এবং পরে পশ্চিমের অন্যান্য দেশে এক বিশাল ছাত্র অভ্যুত্থান ঘটে যা পশ্চিমের পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে কাঁপিয়ে দেয়। এই ছাত্রদের দেখাদেখি শ্রমিকদের বিরাট অংশও আন্দোলনে নেমে পড়ে। ১৯৬৯ সালে ইটালীতে বড় আকারে শ্রমিক অভ্যুত্থান ঘটে। ১৯৭৪ সালে ব্রিটেনে কয়লা-শ্রমিকদের ধর্মঘট 'কনজারভেটিভ' শাসকদলের সরকারের পতন ঘটায়। এর কয়েক মাসের মধ্যেই পর্তুগালে জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়। এই সকল আন্দোলনের একটি বড় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এগুলির সংগঠনে কোনো ক্ষেত্রেই মূল প্রেরণা ও শক্তি প্রতিষ্ঠিত বামদলগুলি বা তাদের নেতৃত্ব ছিল না। বরং একথা বলা যেতে পারে, এ আন্দোলনগুলি তাৎপর্যের দিক থেকে ছিল প্রতিষ্ঠিত বামদলগুলির নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এক ধরনের চ্যালেঞ্জ। এ আন্দোলনগুলির আর একটি তাৎপর্য লক্ষণীয়। বহুদিন যাবৎ ইউরোপে মার্কসীয় তত্ত্বের সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনের যে দুস্তর ব্যবধান তৈরী হয়ে গিয়েছিল তা পূর্ণ হওয়ার এক সম্ভাবনা সৃষ্টি হল এই আন্দোলনগুলির মধ্য দিয়ে। ঠিক এর পাশাপাশি পুঁজিবাদী দুনিয়ার তথাকথিত 'স্থায়িত্ব ও শান্তি' জনমনে সন্দেহের বিষয় হয়ে দাঁড়ালো।

দ্বিতীয়ত, ইঙ্গ-মার্কিন দুনিয়ায় মার্কসবাদী ইতিহাসবিদ্যার আবির্ভাবও বৈশ্লেষিক মার্কসবাদের আবির্ভাবের জন্য দায়ী ছিল। ১৯৫০-এর দশক থেকে ইংলন্ডে মার্কসবাদী ইতিহাসচর্চা ও মার্কসবাদ চর্চা প্রায় সমতুল ছিল। টমসন, রুডে, হিলটন, কিয়ারনান, হবসব্যম ও অন্যান্যরা হলেন বিশ্ববিখ্যাত মার্কসবাদী ঐতিহাসিক। উত্তর আমেরিকায় 'প্রাগম্যাটিজমের' সঙ্গে মার্কসবাদের সংক্ষিপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়া সেখানে মার্কসবাদ চর্চার আর তেমন উল্লেখযোগ্য নজির নেই। মার্কসবাদী ঐতিহাসিক, সমাজতত্ত্ববাদী ও অর্থনীতিবিদগণ পরবর্তীকালে উত্তর আমেরিকায় মার্কসবাদ চর্চার পথ প্রশস্ত করে দেন। জেনোভিস, ফোনার, মন্টগোমারী, ব্রেনার, আব্রাহাম ও অন্যান্যরা হলেন বিখ্যাত মার্কসবাদী মার্কিন ঐতিহাসিক। নব্যমার্কসবাদী ঐতিহাসিক সমাজতাত্ত্বিকরা যেমন ওয়ালারস্টাইন, স্কচপল ও অর্থনীতিবিদ্ যেমন ও'কনোরের কথা এখানে বলা যায়। এককথায় এই দুই দেশে ইতিহাসবিদ্যা মার্কসবাদ চর্চা ও প্রসারের এক গুরুত্বপূর্ণ 'ইডিয়ম' হিসেবে কাজ করেছে।

বৈশ্লেষিক মার্কসবাদীরা তাদের গবেষণার বিষয় হিসেবে বিমূর্ত অপেক্ষা মূর্তের প্রতি বেশি আকৃষ্ট। এ ব্যাপারে পুঁজিবাদী অর্থনীতি, বিশেষকরে উন্নত পুঁজিবাদের প্রকৃতি সংক্রান্ত বিষয়ে ম্যান্ডেল, ব্রেভারম্যান ও আগলিয়েত্তা ; রাজনীতি ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে পুলানৎজা ও মিলিব্যাণ্ড, জার্মানীর 'রাষ্ট্র ও পুঁজি বিতর্ক ; সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রেমণ্ড উইলিয়মসের কাজ এ সবই তাঁদের মূর্তের প্রতি আকর্ষণের উদাহরণ। এক অর্থে এঁরা সকলেই বৈশ্লেষিক মার্কসবাদী।

এই মার্কসবাদের আবির্ভাবের ক্ষেত্রে উপযুক্ত চিন্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে যান ফরাসী 'পাশ্চাত্য' মার্কসবাদী তাত্ত্বিক আলথুসার। বৈশ্লেষিক মার্কসবাদকে অনেকে 'আলথুসারোত্তর মার্কসবাদ' (Post-Althusserian Marxism) বলে থাকেন। আলথুসার এ ব্যাপারে মূল যে কাজটি করে যান তা হল মার্কসবাদ থেকে

হেগেলবাদকে বিতাড়িত করা। তিনি মার্কসবাদকে হেগেল মুক্ত করেন। বৈশ্লেষিক মার্কসবাদ সেই অর্থে 'হেগেলোত্তর মার্কসবাদ'ও বটে। বৈশ্লেষিক মার্কসবাদের চিন্তা-কাঠামো থেকে আলথুসারের চিন্তা-কাঠামো ছিল একেবারে আলাদা। তথাপি আলথুসার মার্কসবাদকে হেগেল মুক্ত করে যে জায়গা করে দেন একমাত্র তার মধ্যেই বৈশ্লেষিক মার্কসবাদ জন্ম নেয় ও বিকশিত হয়।

আলথুসার দেখান যে, হেগেলীয় 'চিন্তা-পদ্ধতি', (Method) যাকে স্বয়ং মার্কস থেকে আরম্ভ করে লেনিন পর্যন্ত অনেকেই বৈপ্লবিক সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ক্ষেত্রে অপরিহার্য বলে মেনে নিয়েছিলেন, ভাববাদী দোষ মুক্ত নয়। তিনি দেখান যে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সঙ্গে হেগেলীয় 'চিন্তা-পদ্ধতি' ও 'চিন্তন-ব্যবস্থা' অসংগতিপূর্ণ ও এদের সহাবস্থান সম্ভব নয়। তিনি মার্কসবাদের মৌল নীতিগুলির পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয়ত, 'Reading Capital' গ্রন্থে আলথুসার ও বালিবর অ-হেগেলীয় অর্থে মার্কসবাদ বোঝার চেষ্টা করেন। তাঁরা মার্কসবাদের মৌল নীতিগুলি চিহ্নিত করে তাদের এক সুসংহত তাত্ত্বিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। এই কাজটিকে Wright বৈশ্লেষিক মার্কসবাদী কাজ মনে করেন।

তৃতীয়ত, আলথুসারের এই প্রচেষ্টার ব্যর্থতা একটি নেতিবাচক বক্তব্য তুলে ধরে যে, জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে মার্কসবাদের নিজস্ব কোন বিশিষ্ট পদ্ধতি নেই।

৩.২ বৈশিষ্টসমূহ ঃ

জি. এ. কোহেন হলেন বৈশ্লেষিক মার্কসবাদের সবচেয়ে বিখ্যাত প্রবক্তা। 'তিনি তাঁর সুবিখ্যাত পুস্তক 'Karl Marx Theory of History : A Defence (1978)' -এ এই মার্কসবাদকে একটি সুশৃঙ্খল ও সুসংহত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। অন্যান্য কয়েকজন অতি পরিচিত বৈশ্লেষিক মার্কসবাদীরা হলেন ঃ জে. এলস্টার, জে. রোমার, পি. ভি. পারিস, আর. ব্রেনার, এ. প্রেজরোস্কি, এ. লেভিন ও ই. ও. রাইট। যে মূল কারণের জন্য এই মার্কসবাদকে 'বৈশ্লেষিক মার্কসবাদ' বলা হয় তা হল ঃ মার্কসবাদের অনেক সমস্যা সমাধানে বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত 'বৈশ্লেষিক দর্শনের' (Analytical Philosophy) চিন্তা পদ্ধতি, ধ্যান-ধারণা ও আলোচনা কাঠামোর ব্যবহার। কোহেন বলেছেন, দুটি বিষয়ে তিনি বিশেষ করে জানার চেষ্টা করেন। এক স্বয়ং মার্কস কী বলেছেন। দুই, বৈশ্লেষিক দর্শনের সুস্পষ্ট চিন্তার মাপকাঠি কোনগুলি। এখানে দেখা যাচ্ছে, ক্ল্যাসিক্যাল মার্কসবাদের সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর এক অ-মার্কসীয় দর্শনের সংমিশ্রণ ঘটেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাশ্চাত্য মার্কসবাদের একটি ধরন ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলও এই 'বৈশ্লেষিক দর্শনের' ঘোরতর নিন্দুক ছিল যেটা বোঝা যায় তাদের 'ভিয়েনা সার্কলের' বৈশ্লেষিক দর্শনের সমালোচনায়। কোহেনের মূল বক্তব্য হল এই যে, মার্কসবাদ ও অ-মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব ও দর্শনের মধ্যে কোন অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর নেই। বৈশ্লেষিক মার্কসবাদের তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঃ মার্কসবাদে পজিটিভিস্ট সমাজ-বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ ; মার্কসবাদচর্চায় বৈশ্লেষিক দর্শনের ধ্যান-ধারণার ব্যাপক প্রয়োগ ও ব্যবহার ; দর্শন, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, রাজনীতি ইত্যাদি ব্যাপারে এই মার্কসবাদীদের নতুন আগ্রহ।

বৈশ্লেষিক দর্শনের সাহায্যে 'বৈশ্লেষিক মার্কসবাদীরা' মার্কসবাদের মধ্যে নানা ধরনের নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করে চলেছেন এবং কিছু কিছু বিষয়ে নতুন ধরনের মার্কসীয় গবেষণা করেছেন। এর দু-একটি নমুনা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

এঁরা উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়বস্তু রূপে দেখছেন। মার্কসের বক্তব্য অনুযায়ী, কমিউনিস্ট সমাজে যে উৎপাদন সম্পর্কের আবির্ভাব ঘটবে তার বিশিষ্ট চরিত্র এমনই যে এটি হবে সর্বদাই বিকাশেরই একটি ধরন, এবং কখনোই উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ বাধা দেবে না। এ প্রশ্নে এই মার্কসবাদীগণ যে ধরনের প্রশ্নগুলি উত্থাপন করেছেন তা হোল ঃ উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে কীভাবে সীমারেখা টানা হবে? এছাড়া উৎপাদিকা শক্তিসমূহের মধ্যে, উৎপাদন সম্পর্কসমূহের মধ্যে ও উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সংক্রান্ত বিষয়গুলিও এদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়বস্তু।

এ-ব্যাপারে এদের স্বল্প গবেষণা প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নে পরবর্তীকালে সমাজতন্ত্রের পরাজয়ের যথেষ্ট ইঙ্গিতবাহী। 'Rationality and Class Struggle' নামক এক প্রবন্ধে লেভিন ও রাইট (Levine and Wright) বলেছেন যে মার্কসের '1859 Preface'-এর 'উৎপাদিকা' ব্যাখ্যার পরিণতি সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে মারাত্মক হয়েছে ঃ উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের নাম করে এক বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচীর জন্ম হয়েছে, যার ক্ষমতা চূড়ান্ত কেন্দ্রীভবনের সাহায্যে হিংস্রপথে, ভয় দেখিয়ে কৃষির সমবায়ীকরণ করেছে। কলকারখানায় পুরনো আমলের আমলাতান্ত্রিক রীতিনীতি চালু করেছে এবং গোটাদেশে আমলা-তান্ত্রিক স্বৈরাচারের জন্ম দিয়েছে।[১১]

চরম লক্ষ্য-নির্দিষ্ট functionalist-মার্কসবাদী ব্যাখ্যার ঠিক বৈপরীত্য অন্যতম বৈশ্লেষিক মার্কসবাদী জন এলস্টার (Jon Elster) পদ্ধতিগতভাবে 'ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী' ব্যাখ্যা তৈরি করেন। তিনি বলেন, সামাজিক ঘটনাকে ব্যক্তির (individual human agents) শক্তি, চাহিদা ও বিশ্বাসের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে হবে। ব্যক্তিমানবের যে সচেতন প্রয়াস ও পছন্দ তাকে বাদ দিয়ে ইতিহাসের ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। এলস্টার এখানে 'Rational choice' তত্ত্বের প্রয়োগ করেছেন।

রোমার (Romer) 'শ্রেণী ও শোষণে'র সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেছেন। তিনিও এলস্টারের ন্যায় 'Rational choice' তত্ত্ব প্রয়োগ করেন। তাঁর মত, শ্রেণী-শোষণ সবরকম শোষণের ভিত্তি নয় এবং এটি একমাত্র শোষণ ও শাসন নয়। যৌন, বর্ণগত ইত্যাদি অনেক শোষণ আছে যেগুলোকে উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় না।

মার্কসের মানব-প্রকৃতি ও তাঁর তত্ত্বে নীতিবোধের স্থান— এ বিষয়টিও এই মার্কসবাদীদের দৃষ্টি এড়ায়নি। এ বিষয়ের সঙ্গে মার্কসবাদের বৈজ্ঞানিকতার বিষয়টি জড়িত। এ বিষয়ে অসংখ্য লেখা ইতিমধ্যে হয়েছে। বৈশ্লেষিক মার্কসবাদের জনক কোহেন মনে করেন, মার্কসীয় দার্শনিক নৃতত্ত্ব ব্যক্তির সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্কের তথা মানব প্রকৃতি সৃষ্টির বিষয়টির উপর বেশি জোর দিয়েছে। ব্যক্তি যে সমষ্টিগত সত্তায় নিজেকে সংজ্ঞায়িত করে, নিজস্ব রূপ কল্পনা করে আনন্দ পায় এবং যেটাকে শ্রেণী স্বার্থের আলোয় ব্যাখ্যা করা যায় না — এ বিষয়টি অবহেলিত হয়ে এসেছে। কোহেন মনে করেন, সত্তাসংজ্ঞায়নে স্বার্থের সামাজিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কোহেন মনে করেন ঃ "আমি কী করতে পারি নয়, আমি কে সেটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, এই প্রশ্নের সন্তোষজনক সমাধান হয়েছে জাতীয়তাবাদ, বর্ণ, ধর্ম বা সবকিছুর এক সমাহারের মধ্যে, যার মধ্যে ব্যক্তিসত্তার সহিত সমষ্টিগত সত্তার সনাক্তকরণ ঘটেছে। এসবের বহিঃপ্রকাশ সবসময় সুখকর হয়নি, কিন্তু মার্কসবাদ এযাবৎকাল ব্যক্তিসত্তার প্রশ্নটিকে অবহেলা করেছে।"[১৫]

এই মার্কসবাদের তাৎপর্য কী ? যেহেতু এই মার্কসবাদ এখনো বিকাশমান, এর পূর্ণ তাৎপর্য বিশ্লেষণ করার সময় এখনো আসেনি। আমরা শুধু এইটুকু মনে রাখতে পারি, অমার্কসীয় দার্শনিক ঐতিহ্যের সঙ্গে মার্কসবাদের সংমিশ্রণে বৈশ্লেষিক মার্কসবাদীরা কম জটিলতার সৃষ্টি করেননি। যা হোক, তা আমাদের বিচার্য নয়। আমরা এখানে এই মার্কসবাদের একটি বৈশিষ্টের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করবো। উপরোক্ত প্রশ্নটিকে এখন এভাবে করা যায় ঃ হেগেলমুক্ত এই মার্কসবাদের তাৎপর্য কী ? এর উত্তরে প্রথমেই বলে রাখা যায়, এর রাজনৈতিক তাৎপর্য অপরিসীম। এর সহজ তাৎপর্য হল, বিভিন্ন সত্তা, বিশেষকরে জাতিসত্তার অপরিহার্য আধার ও বহিঃপ্রকাশ হিসেবে রাষ্ট্রকে বর্জন করা। জাতির সঙ্গে রাষ্ট্রের অপরিহার্য সংযোগকে বর্জন করা। 'Reconsidering Historical Materialism (1989)' নামক এক প্রবন্ধে কোহেন বলেন ঃ "আমি জাতি সত্তার প্রতি এক ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করি। সুতরাং বলে রাখা ভালো যে রাষ্ট্রই জাতি সত্তার প্রকৃষ্ট ধারক ও বাহক এহেন হেগেলীয় ধারণায় আমার আস্থা নেই। আমার মতে, আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে রাষ্ট্র বিপজ্জনক।"[১৬]

৩.৩ মূল্যায়ন ঃ

প্রথাগতভাবে, মার্কসবাদীরা ব্যক্তিগত সত্তা, জাতিসত্তা, জাতীয়তাবাদ, ধর্ম ও ধর্মীয় সত্তাকে এবং অধুনা বিখ্যাত 'এথনিক' প্রশ্ন ও সত্তাকে অবহেলা করে এসেছেন এবং ঐ সব প্রশ্নের প্রতি অবিচার করেছেন। এ ব্যাপারে ক্ল্যাসিক্যাল মার্কসবাদের অসম্পূর্ণতার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অ্যান্ডারসন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন ঃ "শ্রেণীবিভক্ত সমাজে একটি সামাজিক একক জাতির অর্থ ও অবস্থান কী ? গত দুই শতাব্দী যাবৎ এক প্রাথমিক ও গণচরিত্র বিশিষ্ট শক্তি হিসাবে জাতীয়তাবাদ মার্কসবাদে অবহেলিত থেকে গেছে।"[১৭]

আজও এ প্রশ্নগুলির ব্যাপারে মার্কসবাদে খুব একটা সৃষ্টিশীল গবেষণা নজরে পড়ে না। মার্কসবাদীদের মধ্যে ঐসব প্রশ্নে একটা চাপা সন্দেহ ও অবিশ্বাস এখনো বজায় রয়েছে। ভারতীয় মার্কসবাদীরাও এইসব প্রশ্নের উত্তরে খুব একটা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তা বলা যাচ্ছে না। বরং বলা যায়, জাতি ও 'এথনিক' সত্তার প্রশ্নে মার্কসবাদীদের যে চিরাচরিত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী তা এখনো অটুট রয়েছে। এর তাত্ত্বিক কারণ হিসাবে বলা যায় ঃ "যতদিন জাতিকে একটি বর্গ হিসেবে, শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রামের অধীনস্ত করা হবে, ততদিন জাতি ও শ্রেণীসম্পর্ক সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব থাকবে। জাতি ও রাষ্ট্রের আবশ্যিক ও কার্যকারণগত সম্পর্কের উপর যারা গুরুত্ব আরোপ করেন তাঁরা 'মার্কসবাদী' হ'লেও বিশেষভাবে হেগেলবাদ প্রভাবিত। এরূপ প্রভাব মার্কসবাদে না থাকা বাঞ্ছনীয়।" অর্থাৎ 'জাতি-রাষ্ট্র'কে প্রাথমিক গুরুত্ব প্রদান, একে সমাজের উপর স্থান দেওয়া বা সমাজ সংজ্ঞায়নে অনিবার্য বলে মনে করার মধ্যে রয়েছে এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর মূল এবং এর উৎস রয়েছে হেগেলীয় চিন্তা-ভাবনার মধ্যে। সুতরাং আজও যারা ব্যক্তিগত, জাতি ও 'এথনিক' সত্তাকে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখেন তারা সকলেই সচেতন বা অবচেতনভাবে হেগেলবাদী অর্থাৎ 'রাষ্ট্রবাদী' মার্কসবাদী। রাষ্ট্র-কেন্দ্রিক মার্কসবাদ শেষপর্যন্ত অর্থনৈতিক নিয়তিবাদের দিকে ধাবিত হয়। শ্রেণী-সত্তাই মানুষের একমাত্র সত্তা ও শ্রেণী শোষণই শোষণের একমাত্র ধরন বলে ধরতে হলে শ্রেণীর সংজ্ঞাটিকে যথেষ্ট পরিমাণে বৃহত্তর করতে হয়।

এক অর্থে অবশ্য এই বৈশ্লেষিক মার্কসবাদও ব্যর্থ মার্কসবাদ। অ্যান্ডারসন এই মার্কসবাদের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন ঃ "বস্তুগত সুযোগ তৈরি হলেও বৈপ্লবিক গণআন্দোলনের সঙ্গে মার্কসীয় তত্ত্বের পুনঃ

ঐক্য স্থাপন হ'লো না।'' অর্থাৎ বহুদিন পর মার্কসীয় তত্ত্বের সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনে পুনঃঐক্য স্থাপনের যে বাস্তব পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তা ব্যর্থ হোল। এক অর্থে এই মার্কসবাদ, পাশ্চাত্য মার্কসবাদের মতোই, 'একাডেমিক মার্কসবাদ', কারণ এখনো পর্যন্ত এই মার্কসবাদ অনুযায়ী কোন রাজনৈতিক আন্দোলন সংঘটিত হয়নি। এই মার্কসবাদের উপযুক্ত রাজনৈতিক আন্দোলন ঠিক কী হবে সে ব্যাপারেও যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা দরকার, কারণ তত্ত্বগতভাবে এই মার্কসবাদ বাস্তবে যেভাবে আন্দোলনগুলি চলছে তার বড় সমালোচক। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, এই মার্কসবাদ অনেক মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছে, অনেক পুরনো বিষয়ে নতুনভাবে আলোকপাত করেছে এবং অনেক দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছে — কোন মার্কসবাদই এ মার্কসবাদকে অস্বীকার করতে পারেন না। একটি নতুন প্রেক্ষাপট ও তাত্ত্বিক কাঠামো এই মার্কসবাদে নিহিত রয়েছে যা অনুধাবনযোগ্য ও ব্যবহারযোগ্য।

৩.৪ সামগ্রিক পর্যালোচনা ঃ

পাশ্চাত্যের মার্কসবাদের বিকাশের যে তিনটি ধারার কথা উপরে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হয়েছে তার থেকে দু'একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। প্রথমতঃ, যদিও মার্কসবাদের সাম্প্রতিকতম রূপ হ'লো বৈশ্লেষিক মার্কসবাদ তথাপি একথা মনে রাখা দরকার যে সনাতনী মার্কসবাদের সবকিছুই অচল বা অকেজো হয়ে যায়নি। বিভিন্ন দেশে কম্যুনিস্ট দলের অস্তিত্ব তার ছোট প্রমাণ মাত্র। অনেক বিষয়ে মূল মার্কসের শিক্ষা অনেকের কাছে এখনো অজানা। এর বড় প্রমাণ বৈশ্লেষিক মার্কসবাদের প্রথম প্রতিপাদ্য ঃ প্রথমে স্বয়ং মার্কস কী বলেছেন তা জানা। ইয়ুয়েরজেন হাবেরমাসের চিন্তা এখনো গোটা পৃথিবীতে বেশ শক্তিশালী যদিও তাঁর ঘরানাটি 'পাশ্চাত্য' মার্কসবাদী। হাবেরমাস আজও গোটা পৃথিবীর মার্কসবাদীদের অনেক চিন্তার খোরাক জোগাচ্ছেন। ইটালীয় মার্কসবাদী চিন্তাবিদ এন্টনিও গ্রামসীর চিন্তা মৌলিকতা দাবি করে, যদিও প্যারী অ্যান্ডারসনকে অনুসরণ করে তাঁকে একজন 'পাশ্চাত্য' মার্কসবাদী আখ্যা দেওয়া হয় তাই মার্কসীয় চিন্তার বিকাশের বিশিষ্ট ধারার একটিকে আর একটির বিকল্পরূপে চিহ্নিতকরণ সমীচীন হবে না। শেষবিচারে, মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশে প্রতিটি ধারারই যে অবদান রয়েছে তা অনস্বীকার্য।

প্রসঙ্গ নির্দেশিকা

১। এর জন্য প্যারী অ্যান্ডারসনের সুবিখ্যাত গ্রন্থ ''**কনসিডারেশন্‌স অন ওয়েস্টার্ন মার্কসিজম্‌** (লন্ডন ঃ ১৯৭৯) '' এর প্রথম অধ্যায় দেখতে হবে।

২। প্যারী অ্যান্ডারসন, ''**কনসিডারেশনস্‌ অন ওয়েস্টার্ন মার্কসিজম্‌ (লন্ডন ঃ ১৯৭৯)**'', পৃষ্ঠা ২-৬, দ্রষ্টব্য।

৩। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৪১।

৪। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৪২।

৫। পেরী অ্যান্ডারসন্‌, ''**ইন দ্য ট্রাকস অব হিসটোরিক্যাল ম্যাটিরিয়ালিজম্‌** (লন্ডন ঃ ১৯৮৩)'', পৃষ্ঠা ১৫ দ্রষ্টব্য।

৬। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৬।

৭। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৫।

৮। অ্যান্ডারসন্ (১৯৭৯), পৃষ্ঠা ৯৪।

৯। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০৬।

১০। অ্যান্ডারসন (১৯৮৩), পৃষ্ঠা ২৪।

১১। অ্যালেক্স কলিনিকস (সম্পাঃ), "**মার্কসিস্ট থিওরী**" (অক্সফোর্ড, ১৯৮৯), পৃষ্ঠা ৩।

১২। পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৯৮৯), পৃষ্ঠা ১৯।

১৩। দ্রষ্টব্য, জন এলস্টারের "মার্কসিজম্, ফাংসানালিজম এ্যান্ড গেম থিওরী ঃ দ্য কেস ফর মেথোগেলজিক্যাল ইনডিভিজুয়ালিজম্", দ্রষ্টব্য কলিনিকস (সম্পাদিত) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৮-৮৮।

১৪। জে. রোমার (সম্পাদিত) অ্যানালিটিক্যাল মার্কসিজম্ (কেম্ব্রিজ, ১৯৮৬)।

১৫। দ্রষ্টব্য, কলিনিকম (সম্পাদিত) গ্রন্থে এন. জেরাস, "দ্য কনট্রোভারসি অ্যাবাউট মার্কস এ্যান্ড জাস্টিস"।

১৬। জি. এ. কোহেন, "রিকনসিডারিং হিসটোরিক্যাল ম্যাটিরিয়ালিজম", কলিনিকম (সম্পাদিত) গ্রন্থে, পৃষ্ঠা ১৫৭।

১৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৬৪।

১৮। দ্রষ্টব্য অ্যান্ডারসন (১৯৭৯), পৃষ্ঠা ১০৩।

১৯। দ্রষ্টব্য হরিহর ভট্টাচার্য "কম্যুনিজম, ন্যাশনালিজম এ্যান্ড ট্রাইব্যাল কোয়েশ্চন", ইকনমিক এ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, সংখ্যা ৩৯, ভল্যুম, সেপ্টেম্বর ২৯, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ২২০৯-২২১৪।

২০। দ্রষ্টব্য অ্যান্ডারসন (১৯৮৩), পৃষ্ঠা ২৭।

———————

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আচরণবাদী আন্দোলন
(The behavioural movement in Poliitical Science)

তৃতীয় পত্র ঃ প্রথমার্ধ

প্রথম পাঠ

M.A. Part I

POLITICAL SCIENCE

Third Paper

First Half

Major Approaches

প্রথম পাঠ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আচরণবাদী আন্দোলন
(The behavioural movement in Political Science)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আচরণবাদী আন্দোলন কথাটির অর্থ (*Meaning of the Behavioural Movement in Political Science*) ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আচরণবাদী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু ছিল রাজনৈতিক আচরণ। 'রাজনৈতিক আচরণ' এই পদগুচ্ছ কিন্তু দ্ব্যর্থকতা (ambiguity) মুক্ত নয়। হেইন্‌জ ইউলাউ (Heinz Eulau) লিখেছেন, "রাজনৈতিক আচরণ সংক্রান্ত আলোচনা মানুষের রাজনৈতিক কাজ, দৃষ্টিভঙ্গী, পছন্দ ও প্রত্যাশার সাথে সংশ্লিষ্ট। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, এখানে আলোচনার কেন্দ্রীয় একক হিসাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ব্যক্তি ভূমিকাকে বড় করে দেখা যায়। আচরণবাদীরা তাই ব্যক্তির আচরণকেই পর্যালোচনা করে যা গোষ্ঠীর ক্রিয়াশীলতাকে নির্ধারণ করে।

প্রাথমিকভাবে আচরণবাদী আন্দোলন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে সংস্কার করার উদ্দেশ্যে শুরু হয়েছিল। তাই আন্দোলনের প্রাথমিক পর্বে সকল নয়া-রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকেই আচরণবাদী বলে অভিহিত করার একটা প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছিল, যার ফলে আন্দোলনের মধ্যেই একটি বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছিল। আন্দোলন আরম্ভ হবার কিছুকালের মধ্যেই গবেষকগণ এবিষয়টি সম্পর্কে সচেতন হন এবং ধীরে ধীরে কিছু সাধারণ কৌশল, পদ্ধতি এবং বৈশ্লেষিক সূক্ষ্মতাকে অন্তর্ভুক্ত করেন।

আচরণবাদের বৌদ্ধিক উৎসের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ম্যাক্স ওয়েবার, গ্রাহাম ওয়ালাস, আর্থার বেন্টলী ও চার্লস ই মেরিয়ামের অবদান পর্যবেক্ষণযোগ্য। অন্যান্য বৌদ্ধিক উৎসও আছে। এক্ষেত্রে মার্কস-এর অবদান কম নয়। বস্তুতঃ মার্কস ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি আন্তঃশাস্ত্রীয় আলোচনার উপর, অর্থাৎ নিখিল স্তরে (macro) হলেও অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের কার্যকারণ বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাছাড়া আছেন জে. বি. ওয়াটসন (J.B. Watson) যিনি Stimulus-response-model তৈরী করেছিলেন; সেটিকে আচরণবাদীরা সংশোধিত করে stimulus-organism-response model গড়ে তোলেন, যার মাধ্যমে তাদের প্রধান উদ্দেশ্যগুলিকে রূপায়িত করা সম্ভব হবে।

চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য (***Characteristic Features***) ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আচরণবাদী বিশ্লেষণের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্যসমূহকে কার্ক প্যাট্রিক (Kirk Patrick) সংক্ষিপ্তরূপে নিম্নলিখিত আকারে তুলে ধরেছেন ঃ

(১) আচরণবাদ গবেষণার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে মৌলিক একক হিসাবে গ্রহণ না করে ব্যক্তির রাজনৈতিক আচরণকে বিশ্লেষণের মৌল একক হিসাবে চিহ্নিত করে;

(২) সমাজ বিজ্ঞানগুলিকে আচরণবাদী বিজ্ঞান হিসাবে তুলে ধরে এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অন্যান্য তথাকথিত সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে একতার উপর গুরুত্বারোপ করে;

(৩) তথ্যের পর্যবেক্ষণ, শ্রেণী বিভাজন ও তথ্য পরিমাণের ক্ষেত্রে অধিকতর সূক্ষ্ম কৌশলের সুপারিশ করে এবং সম্ভব হলে পরিসংখ্যানগত সূত্রায়ণ ব্যবহার করতে বলে; এবং

(৪) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের লক্ষ্য হিসাবে অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্ব গঠনের কথা বলে। (Kirk Patrick, E. M., যেমন উল্লিখিত আছে Amal Roy & Mohit Bhattacharyya-র গ্রন্থ *Political Theory—Ideas and Institutions*, World Press, Calcutta ১৯৮৩ pp. ১৮-১৯ এতে)।

অনুমানসমূহ (***Assumptions***) ঃ ইস্টন কতকগুলি অনুমানের কথা তুলে ধরেছেন যা "আচরণবাদী আন্দোলনের বৌদ্ধিক প্রস্তর ভিত্তি" হিসাবে বিবেচিত হয়। আচরণবাদী আন্দোলন যেসকল অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল সেগুলি হল ঃ (১) নিয়মমাফিকতা, (২) সত্যতা প্রমাণ, (৩) কৌশল, (৪) সংখ্যায়ন, (৫) মূল্য নিরপেক্ষতা, (৬) সুশৃঙ্খলাবদ্ধকরণ, (৭) বিশুদ্ধ বিজ্ঞান এবং (৮) অখন্ডতা।

(১) নিয়মানুবর্তিতা (***Regulations***) ঃ আচরণবাদীদের বিশ্বাস ছিল রাজনৈতিক আচরণে কিছু নিয়মমাফিকতা লক্ষ্য করা যায় যেগুলিকে খুঁজে বার করতে হবে এবং ঐগুলিকে যদি তত্ত্বের আকারে প্রকাশ করা যায় তাহলে সেই তত্ত্ব রাজনৈতিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণে এবং পূর্বানুমানে সহায়তা করবে। রাজনৈতিক আচরণ যদিও সবসময় যান্ত্রিকভাবে সমরূপ হয় না, যেহেতু সেগুলি নানা ধরণের কারকের দ্বারা বিভিন্নভাবে প্রভাবিত, তবুও কতকগুলি ক্ষেত্রে মনুষ্যবর্গ কমবেশী একই ধরনের আচরণ করে যায়। উদাহরণ হিসাবে তিনি পেশ করেছেন ভোটদাতার আচরণকে (voting behaviour)। আচরণবাদীরা তাই মনে করেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উচিত হবে মানুষের রাজনৈতিক আচরণের এই ধরনের যাবতীয় নিয়মমাফিকতাগুলিকে চিহ্নিত করা।

(২) সত্যতা প্রমাণ (***Verification***) ঃ আচরণবাদীরা মনে করেন জ্ঞান তখনই বৈধ বলে বিবেচিত হবে যখন প্রতিজ্ঞাগুলির (propositions) সত্যতা প্রমাণ করা যাবে অভিজ্ঞতাবাদী পর্যালোচনার মাধ্যমে এবং পর্যবেক্ষণের পরই একজন গবেষক তথ্য সংগ্রহ করবেন।

(৩) কৌশল (***Techniques***) ঃ গবেষণাকে সার্বজনীন করে তোলার উদ্দেশ্যে আচরণবাদীরা তথ্য পর্যালোচনার যথাযথ কৌশল ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন এবং সেই গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহারের কথা বলেছেন যেগুলি বৈধ, বিশ্বাসযোগ্য এবং তুলনামূলক ধরনের তথ্য সরবরাহ করতে সক্ষম।

(৪) সংখ্যায়ন (***Quantification***) ঃ আচরণবাদীরা বিশ্বাস করতেন কোন সিদ্ধান্ত অস্পষ্ট হবার চাইতে ভুল হওয়া শ্রেয়। তথ্যের পরিসংখ্যান ও পরিমাপনের পদ্ধতি ব্যবহার করলে সিদ্ধান্তে অস্পষ্টতা থাকার কোন সম্ভবনা থাকে না। তাই আচরণবাদীরা সংখ্যায়ণ পদ্ধতি ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

(৫) মূল্য নিরপেক্ষতা (***Value Neutrality***) ঃ আচরণবাদীদের মতে, তথ্য ও মূল্য দুটি সম্পূর্ণ পৃথক বিষয় এবং ঘটনাবলী বিশ্লেষণের সময় উভয়কে সম্পূর্ণ পৃথক রাখাটাই বাঞ্ছনীয়। তাদেরকে পৃথকভাবে পর্যালোচনা করতে বাধা নেই, এমনকি উভয়ের সমাবদ্ধ (combination) করা যেতে পারে। কিন্তু দুটিকে মিশিয়ে ফেলা উচিত হবে না।

(৬) সুশৃঙ্খলাবদ্ধকরণ (***Systematization***) ঃ আচরণবাদীরা দাবি করেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণাকে করে তুলতে হবে সুশৃঙ্খল, অর্থাৎ সেটিকে তত্ত্ব অভিমুখী এবং তত্ত্বের দ্বারা নির্দেশিত অবস্থায় নিয়ে যেতে হবে। তখন সেই তত্ত্ব ও গবেষণা হয়ে উঠবে সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধ জ্ঞানের আন্তঃসম্পর্কযুক্ত অংশ।

(৭) বিশুদ্ধ বিজ্ঞান (***Pure Science***) ঃ আচরণবাদীরা বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীতেও বিশ্বাসী। তাঁরা স্বীকার করেন তত্ত্বের প্রয়োগ বা জ্ঞান মানুষের জীবনের বহু জটিল বিষয়কে সমাধান করতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক ঘটনাবলীর অনুধাবন ও ব্যাখ্যা যুক্তিসম্মতভাবে এগিয়ে চলে এবং সেটি এককভাবে সমাজের ব্যবহারিক সমস্যার দ্রুত সমাধানের ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত হয়। তাই তাঁরা বিশুদ্ধ গবেষণার উপর খুব বেশী গুরুত্বারোপ করেন।

(৮) **অখন্ডতা** (***Integration***) ঃ আচরণবাদীদের বিশ্বাস, মানুষ একটি সামাজিক জীব এবং যদি তার সামাজিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য ক্রিয়াশীলতার মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা অঙ্কন করা হয় তাহলে তার কোন ক্রিয়াশীলতাকেই যথার্থভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হবে না। বস্তুতপক্ষে সামগ্রিক জীবনের আলোকেই মানুষের যে কোন ক্রিয়াশীলতাকে ব্যাখ্যা করা উচিত। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণা হওয়া উচিত জ্ঞানের অন্যান্য শাখার আন্তঃসম্পর্কের ভিত্তিতে।

আচরণবাদী আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা (***Limitations of Behavioural Movement***) ঃ ঐতিহ্যবাদী রাজনৈতিক বিশ্লেষণের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হিসাবে শুরু হলেও আচরণবাদী আন্দোলনকেও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রায়শই এই অভিযোগ করা হতে থাকল যে, নূতন আন্দোলন দুর্বোধ্য ভাষণ (jargon) এবং বিশ্লেষণের কিছু সূক্ষ্ম পদ্ধতি ও কৌশল উদ্ভাবন করলেও একমাত্র তাঁরাই যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করেছেন তা নয়। আচরণবাদের সমালোচকগণ আরও দেখিয়েছেন যে, আচরণবাদীরা, বিজ্ঞানের প্রতি দুর্বলতার কারণে, গুরুত্বহীন তথ্যের মধ্যে পৃথকীকরণে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং বারংবার তাঁদের সূক্ষ্ম পদ্ধতি কার্যক্ষেত্রে কেবলমাত্র মামুলি কিছু তথ্য বিশ্লেষণের কাজেই ব্যবহার করা গেছে। এছাড়াও সমালোচকগণ আরও দাবি করেছেন, যেহেতু প্রকৃতিবিজ্ঞনের পদ্ধতিকে সম্পূর্ণরূপে মানবিক আচরণ বিশ্লেষণের কাজে ব্যবহার করা যায় না, তাই আচরণবাদীদের এই সামগ্রিক প্রচেষ্টাই রাজনৈতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ এলাকাতেই বিচরণ করেছে। তাছাড়া, গবেষণার বিষয়বস্তু, অর্থাৎ মানুষ, কখনোই নিষ্ক্রিয় নয়, আবার তাকে সর্বদাই বাহ্যিক আচরণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে যথাযথভাবে তুলে ধরা সম্ভব নয়।

আচরণবাদের বিরুদ্ধে তীব্রতম সমালোচনাটি করেছিলেন লিও স্ট্রাস (Leo Strauss) এবং তাঁর কিছু অনুগামী। নয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পদ্ধতি, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও মূল্যনিরপেক্ষতার ধারণা ব্যবহারকে ছলনা বলে অভিহিত করে স্ট্রাস লিখেছেন ঃ "রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সাধারণ বিচারবুদ্ধির বিশ্লেষণের ঐতিহ্যবাদী পদ্ধতিতে ভাঙন ধরিয়ে এরা নতুন রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বাধ্য করেছে অন্তর্নিহিত (inherent) রাজনৈতিক ঘটানাবলীর তাৎপর্য বিশ্লেষণের গুরুত্বকে অস্বীকার করতে। ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাজনৈতিক ঘটনাবলীর যথাযথ অনুধাবনের জন্য যে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন সেটি হারাচ্ছে, বিষয়টির যথাযথতা নষ্ট হচ্ছে এবং জ্ঞানের এই শাখাটি অপ্রাসঙ্গিক কিছু আলোচনায় ভারাক্রান্ত হচ্ছে।" (যেমন উদ্ধৃত আছে, Amal Roy & Mohit Bhattacharya-র পূর্বোক্ত গ্রন্থে pp. 18-19)।

আচরণবাদের সমালোচনায় আচরণবাদোত্তর বিপ্লব (***Post Behavioural Movement as a Critique of Behaviouralism***) ঃ ষাটের দশকের শেষ দিকে আচরণবাদী আন্দোলনের উপর শক্তিশালী আঘাত আসে ডেভিড ইস্টনের তরফ থেকে, যিনি নিজে "আচরণবাদী বিপ্লবের" সাথে জড়িত থেকেও ঘোষণা করেন যে, আচরণবাদোত্তর বিপ্লব আসন্ন। আচরণবাদোত্তর বিপ্লবের উদ্ভব ঘটে গতশতকের পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গৃহীত রাজনৈতিক গবেষণা ও শিক্ষণ পদ্ধতির প্রতি গভীর অসন্তোষ থেকে, যা রাজনীতির আলোচনাকে অধিকতর ব্যাপক বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র হিসাবে রূপান্তরিত করতে গিয়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতিগুলিকে

অন্ধভাবে অনুসরণ করেছিল। আচরণবাদোত্তর বিপ্লবের মূলসূত্রগুলি ইস্টনের মতে, প্রাসঙ্গিকতার প্রত্যয় (Credo of Relevance) গড়ে তোলে। এই বিপ্লবের মূল উদ্দেশ্য ছিল আচরণবাদের বিমূর্ত তত্ত্বসমূহের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানানো যা সমসাময়িককালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একতিয়ারভুক্ত নানান প্রাসঙ্গিক সমস্যা যেমন জনবিস্ফোরণ, পরিবেশ দূষণ, পারমাণবিক সংকট প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে আগত নানা ধরনের গভীর সামাজিক সংকট এবং দ্বন্দ্বের সমাধান করতে পারছিল না।

আচরণবাদোত্তর পর্যায়ের দুটি প্রধান দাবি ছিল ঃ প্রাসঙ্গিকতা (relevance) এবং ক্রিয়া (action)। ডেভিড ইস্টন, একসময় যিনি আচরণবাদের আটটি বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরেছিলেন, এখন সন্ধান দিলেন আচরণবাদোত্তর পর্বের সাতটি বৈশিষ্ট্যের। এগুলি হল ঃ

(১) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু অবশ্যই কৌশল পূর্ববর্তী হবে, অর্থাৎ আগে যেমনটি ছিল, কারণ আচরণবাদোত্তর পর্বের সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমত ছিল অপ্রাসঙ্গিক যথাযথতার পরিবর্তে প্রাসঙ্গিক অস্পষ্টতা কিছুদূর পর্যন্ত সমর্থনযোগ্য।

(২) সমসাময়িক রাষ্ট্রবিজ্ঞান গুরুত্ব দেবে সমাজ পরিবর্তনকে, সমাজ সংরক্ষণকে নয়।

(৩) আচরণবাদী পর্বে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রাজনৈতিক বাস্তবতা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করেছে, যে দৃষ্টিভঙ্গী আচরণবাদোত্তর পর্যায় বর্জন করবে, কারণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের প্রধান দায়িত্ব হল মানবজাতির প্রকৃত চাহিদাগুলি ও তার থেকে আগত সমস্যাগুলির সমাধান করা।

(৪) আচরণবাদোত্তর পর্বের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন, জ্ঞানের পিছনে যদি কোন মূল্যবোধের ধারণা না থাকে তাহলে সেই জ্ঞানকে অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে। অর্থাৎ জ্ঞানের মূলস্তম্ভ হবে মূল্যবোধের ধারণা।

(৫) আচরণবাদোত্তর পর্বের সমাজবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, বুদ্ধিজীবী হিসাবে সমাজে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা উচিত।

(৬) বুদ্ধিজীবীরা যদি সামাজিক সমস্যাগুলি বোঝেন ও সেগুলির সঙ্গে নিজেদের অন্বিত করেন, তাহলে তাঁরা নিজেদেরকে ক্রিয়া (সমাজ পুনর্গঠন) থেকে বিরত রাখতে পারবেন না।

(৭) আচরণবাদোত্তর পর্ব দাবি করে যে, পেশার ক্ষেত্রে রাজনীতিকরণ, তা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা পেশাদারী সমিতি যে স্তরেই হোক না কেন, কেবলমাত্র অবশ্যম্ভাবীই নয়, অধিকতর কাম্যও বটে।

উপসংহার (*Conclusion*) ঃ

আচরণবাদোত্তর পর্যায়ের এই সকল সমালোচনা সত্ত্বেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আচরণবাদী বিপ্লবের অবদানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতেই হয়, কারণ সেটি প্রাতিষ্ঠানিক পরিস্থিতিতে মানব আচরণ ব্যাখ্যার মত একটি সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসঙ্গ উত্থান করেছিল। তাছাড়া আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী রাজনৈতিক ক্রিয়ার মূল বিষয়গুলি যথাযথ অনুধাবনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সরবরাহ করে মূল্যের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার সংযত করার কথা বলে, নির্ভরযোগ্য অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানারোহনের পদ্ধতির দিক নির্দেশ করে, অর্থাৎ বিজ্ঞানের সাধারণ চিন্তাধারাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অন্তর্ভুক্ত করে আচরণবাদ স্মরণীয় হয়ে আছে।

Further Readings :

1. Roy, Amal & Bhattacharyya, Mohit, *Political Theory — Ideas and Institutions*, World Press, Calcutta, 1983, pp. 17-20.
2. Verma S. P., — *Modern Political Theory*, Vikas, Delhi, 1975, Chapter 3.

Model Questions :

1. What were the basic assumptions of the behavioural movement in Political Science ?
2. Examine the distinguishing features of the behavioural revolution in Political Science. What in your opinion, are the limitations of the behavioural movement ?

Short Questions :

1. What are the basic differences between the traditional and the behavioural approach to politics ?
2. What are the basic limitations of behavioural approach ?

দ্বিতীয় পাঠ

রাজনীতির ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্ব ঃ ডেভিড ইস্টন

(System Analysis of Politics : David Easton)

ডেভিড ইস্টন (David Easton) তাঁর বিশ্লেষণ আরম্ভ করেছেন একটি মূল প্রশ্নের আলোকে ঃ কীভাবে একটি ব্যবস্থা পরিবর্তনশীল তথা অস্থিতিশীল বিশ্বে তার অস্তিত্ব বজায় রাখে ? তাঁর নিজের কথায়, "যে প্রশ্ন আচরণের একটি ব্যবস্থা হিসাবে রাজনৈতিক জীবনের নিয়মনিষ্ঠ বিশ্লেষণকে একটি সুসংবদ্ধ রূপ দান করে ও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যমুখী করে তোলে তা হল ঃ কীভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থাসমূহ এমন একটি বিশ্বে তার অস্তিত্ব বজায় রাখে যেখানে স্থিতিশীলতা ও পরিবর্তনশীলতা উভয়ই বিদ্যমান?" এই প্রশ্নটির সমাধানের অনুসন্ধান এমন একটি বিষয়কে তুলে ধরে যাকে আমরা রাজনৈতিক ব্যবস্থার 'জীবন প্রবাহ' বলে অভিহিত করতে পারি, যে সকল মৌলিক ক্রিয়াশীলতা না থাকলে একটি ব্যবস্থা তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারত না। (David Easton ; Categories for the System Analysis of Politics' প্রবন্ধটি *A System Analysis of Political Life*, John Wiley & Sons Inc. New York, 1965 গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সংশোধিত রূপ)।

ইস্টন ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে প্রথমেই রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তিনি দেখেছেন, সমাজে যখনই ক্ষমতা বা পদমর্যাদার কৌশলী পরিচালনা (manoeuver) সম্পাদিত হয়, সাধারণ মানুষ তখনই সেটিকে কূটকৌশলপূর্ণ (politicking) বলে মনে করেন। ইস্টনের ব্যবস্থাজ্ঞাপক বিশ্লেষণটি যে সকল মৌলিক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত তা সরাসরি এই অনুমানটিকে সমর্থন করে গড়ে উঠেছে।

রাজনীতির সংজ্ঞা (*Definition of Politics*) ঃ ইস্টন রাজনীতিকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছেন, এ হল সামগ্রিকভাবে সমাজের মূল্যের কর্তৃত্বসম্পন্ন বরাদ্দের সাথে সংশ্লিষ্ট। মূল্য বলতে বুঝায় সেই সকল বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদগুলিকে, যার প্রতি মানবিক আকাঙ্খা আছে। ইস্টন দেখেছেন, প্রতিটি সমাজেরই মূল্য সমাজের সদস্যবর্গের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে এমনভাবে বন্টিত হয়। যখন কোন সমাজের অধিকাংশ সদস্য মূল্যের কোন নির্দিষ্ট বন্টনধারাকে মেনে নেয় তখন সেই বন্টন হয়ে ওঠে কর্তৃত্বমূলক। এই কর্তৃত্বের উৎস বিভিন্ন ধরণের হতে পারে।

মানুষ বন্টনকে কর্তৃত্বমূলক বলে মেনে নেয় ভীতিবশত, অভ্যাসবশত কিংবা প্রথাগত কারণে। কিন্তু কারণ যাই হোক না কেন, ইস্টনের মতে, মূল্যের কর্তৃত্বসম্পন্ন বরাদ্দই সমাজে রাজনীতির কারণ হয়।

ব্যবস্থা বলতে ইস্টন, আন্তঃসম্পর্কযুক্ত অংশের সমন্বয়ে গঠিত একটি সমগ্রকে বুঝিয়েছেন, যার একটি নির্দিষ্ট সীমানা আছে। তাঁর মতে, যেখানে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা শেষ হয়ে অপর একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার সূচনা হয়, সেখানেই কোন নির্দিষ্ট ব্যবস্থার সীমানা বর্তমান থাকে। তাই ইস্টনের মতে, রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল মিথস্ক্রিয়ার সেই ব্যবস্থা যা সমাজস্থ মূল্যের কর্তৃত্বসম্পন্ন বরাদ্দ করে থাকে।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার সীমানার ঠিক বাইরে থাকে তার পরিবেশ (environment)। পরিবেশ দুধরনের হতে পারে ঃ আন্তঃসামাজিক (intrasocietal) এবং বহিঃসামাজিক (extrasocietal)। আন্তঃসামাজিক পরিবেশ কোন নির্দিষ্ট সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থার অনুরূপ বিভিন্ন ব্যবস্থার সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। উদাহরণ হিসাবে কোন নির্দিষ্ট সমাজের আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গী, সংস্কৃতি, সমাজ কাঠামো, ব্যক্তিত্ব, চিন্তাধারা, অর্থনীতি প্রভৃতির কাঠামোসমূহকে ধরা যায়, যা স্ব স্ব ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ব্যবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

পরিবেশের দ্বিতীয় ধরণটি, অর্থাৎ বহিঃসামাজিক পরিবেশ, কোন একটি নির্দিষ্ট সমাজের বাইরে অবস্থিত বিভিন্ন

ব্যবস্থার সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। এগুলিকে আন্তর্জাতিক সমাজের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হয়, অর্থাৎ এমন একটি অধিব্যবস্থার অংশ হিসাবে ধরা হয়, প্রতিটি সমাজ যার অংশ। আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা হল বহিঃসামাজিক ব্যবস্থার একটি দৃষ্টান্ত। এই দুই ধরনের পরিবেশ সম্মিলিতভাবে গড়ে তোলে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবেশ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ইস্টন কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভৌগোলিক সীমারেখার কথা তুলে ধরেননি।

ইস্টন রাজনৈতিক ব্যবস্থার দুটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন।

(১) ব্যবস্থা হল, তাঁর মতে, মুক্ত (open) এবং আত্মনিয়ন্ত্রণকারী (self-regulating) যা স্বাধীনভাবে পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ইস্টন পূর্ববর্তী অধিকাংশ তাত্ত্বিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে একটি বদ্ধ ব্যবস্থা হিসাবে তুলে ধরেছিলেন, যা পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হবার পর তার পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে যেতে সচেষ্ট হত। কিন্তু ইস্টন দেখিয়েছেন, রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হবার পর কিংবা পরিবেশকে প্রভাবিত করে নূতন ভারসাম্য সৃষ্টি করতে পারে।

(২) ইস্টনের মনে হয়েছে, রাজনৈতিক ব্যবস্থা কোন সদস্যভিত্তিক ব্যবস্থা নয়। এটি একটি বৈশ্লেষিক এবং বিমূর্ত ব্যবস্থা যা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়।

ইস্টনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রবাহ মডেল (*Easton's Flow Model of the Political System*) ঃ ইস্টনের মতে, পরিবেশ থেকেই ব্যবস্থায় আসে উপকরণ (input)। উপকরণ হল দাবি (demand) ও সমর্থনের (support) যোগফল। দাবী হল, ইস্টনের মতে, কর্তৃত্বমূলক বন্টনের সময় দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা কী করবেন সে ব্যাপারে কতগুলি মতামতের বহিঃপ্রকাশ। দাবি যেমন পরিবেশ থেকে উদ্ভূত হতে পারে। তেমনি রাজনৈতিক ব্যবস্থার অভ্যন্তর থেকেও উৎসারিত হতে পারে। দাবি যদি রাজনৈতিক প্রবরদের (elite) পক্ষ থেকে, অর্থাৎ রাজনৈতিক ব্যবস্থার অভ্যন্তর থেকে আসে তাহলে সেগুলিকে withinput বলা হয়। সমর্থন হল, সেই সকল প্রবাহ ও প্রক্রিয়ার সমন্বয়, যা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে, ব্যবস্থায় আগত দাবিসমূহকে মোকাবিলা করতে সহায়তা করে। ইস্টন রাজনৈতিক ব্যবস্থার তিনটি আবশ্যিক উপাদানের কথা বলেছেন, যেগুলি হল প্রাধিকার (authority), শাসনতন্ত্র (regime) এবং রাজনৈতিক জনসম্প্রদায় (political community)। জনসম্প্রদায় বলতে বুঝায় রাজনৈতিক কার্যকলাপের শ্রমবিভাজনের ফলশ্রুতিতে উদ্ভূত রাজনৈতিক গোষ্ঠীসমূহকে, যারা সমস্যা সমাধানের সময় রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সহযোগিতা করে। শাসনতন্ত্র বলতে বুঝায়, সেই সকল আইন, নীতি, মূল্যবোধ ও অন্যান্য কাঠামোগুলিকে, যার ভিত্তিতে মূল্যের কর্তৃত্ব সম্পন্ন বরাদ্দের বন্টন করা হয়ে থাকে। আর প্রাধিকারী হল সেই সকল ব্যক্তিবর্গ যারা ক্ষমতায় থেকে প্রত্যক্ষভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। মূলতঃ এই তিন ধরনের কাঠামোর মাধ্যমেই রাজনৈতিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনীয় সমর্থনের একটা বড় অংশ ব্যবস্থায় এসে থাকে। পরিবেশে থেকে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার অভ্যন্তর থেকে আগত সমর্থনগুলিকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার আবশ্যকীয় উপাদান অভিমুখী করা যায়। রাজনৈতিক ব্যবস্থা দাবি ও সমর্থনের সমন্বয়ে গঠিত উপাদানসমূহকে কর্তৃত্বমূলক সিদ্ধান্তে পরিণত করে যা উপপাদ (output) নামে পরিচিত। উপপাদগুলি পরিবেশে প্রেরিত হলেই রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাজ শেষ হয়ে যায় না। পরিবেশে উপপাদ কীরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল, সেগুলি তথ্যপ্রেরক পথের (feedback mechanism) মাধ্যমে নূতন উপকরণের আকারে ব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে আসে। রাজনৈতিক ব্যবস্থা সেই প্রেরিত প্রতিক্রিয়ার আলোকে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। যাইহোক, ইষ্টনের মতে, তথ্যপ্রেরক পথের সনাক্তকরণের মাধ্যমেই ব্যবস্থা কীভাবে চাপের মোকাবিলা করে তা অনুধাবন করা যেতে পারে।

চাপ (Stress) ঃ এইভাবে কর্মসম্পাদন করতে গিয়ে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রায়শই সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। ইস্টন বলেছেন, "চাপের সৃষ্টি হয় তখনই যখন ব্যবস্থার অপরিহার্য পরিবর্তনগুলি (essential variables) সংকটের স্তর (critical range) অতিক্রম করে যায়। সংকটের স্তর বলতে বুঝায় সেই বিপদ সীমারেখাকে যে সীমারেখা অতিক্রম করলে ব্যবস্থা তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে না। চাপ দুরকমের হতে পারে, (১) দাবির আধিক্য থেকে উদ্ভুত চাপ (demand stress) এবং (২) সমর্থনের হ্রাসজনিত কারণে উদ্ভুত চাপ (support stress)। রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর যদি দাবির অতিরিক্ত বোঝা কোন নির্দিষ্ট সময়ে চলে আসে কিংবা যদি কোন গোষ্ঠীর দাবি দীর্ঘকাল ধরে ব্যবস্থা পরিবর্তনে ব্যর্থ হয়, তাহলে দাবির তরফ থেকে ব্যবস্থা সংকটের মধ্যে পড়ে। অন্যদিকে সমর্থনের হ্রাসজনিত কারণেও সংকট আসতে পারে। যদি দেখা যায়, সদস্যদের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে অর্থাৎ ব্যবস্থার অভ্যন্তরে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছে তাহলে সদস্যদের মধ্যে রাজনৈতিক বিভেদ (political cleavage) ঘটে, যার পরিণতিতে ব্যবস্থায় সমর্থনের অভাবজনিত চাপ আসতে পারে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি দাবির আধিক্য ও সমর্থনের হ্রাস যাতে 'সংকটের সীমা' অতিক্রম করতে না পারে তার জন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থা কতকগুলি পদ্ধতি অবলম্বন করে।

(i) **দ্বাররক্ষী (*Gatekeeping mechanism*)** ঃ রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিটি দাবিকে প্রবেশাধিকার দেয় না। রাজনৈতিক দল, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, স্বার্থগোষ্ঠী প্রভৃতি রাজনৈতিক ব্যবস্থার দ্বাররক্ষী হিসাবে কাজ করে, কোন দাবিগুলি রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রবেশাধিকার পাবে তা নির্ধারণ করে।

(ii) **সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা (*Cultural mechanism*)** ঃ রাজনৈতিক সামাজীকরণের মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থা কতকগুলি প্রাতিষ্ঠানিকৃত মূল্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে উৎসাহী হয় যার ফলে সমাজে দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি কমে আসে এবং সমর্থনের ভিত্তি জোরদার হয়।

(iii) **বিরোধ নিবারক ব্যবস্থা (*Conciliatory mechanism*)** ঃ রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রায়শই গোষ্ঠীগুলির মূল দাবিগুলিকে মেনে নিয়ে তাদের সমর্থন করে নিজের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে।

(iv) **হ্রাসকরণ ব্যবস্থা (*Reduction mechanism*)** ঃ যদি এই সকল ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়, তাহলে রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলপ্রয়োগের পথ ব্যবহার করে গোষ্ঠীগুলিকে তাদের প্রাথমিক দাবি থেকে সরে গিয়ে ব্যবস্থার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হতে পারে এমন দাবি পেশ করতে বাধ্য করতে পারে। এইভাবেও ব্যবস্থা দাবির অতিরিক্ত বোঝা থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পারে।

মূলতঃ প্রবাহ মডেল হবার কারণে এবং চাপের নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার উপস্থিতির কারণে রাজনৈতিক ব্যবস্থা, ইস্টনের মতে, পরিবর্তনশীল বিশ্বে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারে। নিম্নের চিত্রটি 'প্রবাহ মডেল' সংক্রান্ত ডেভিড ইস্টনের বক্তব্যটির যথাযথ অনুধাবনের সহায়ক হতে পারে।

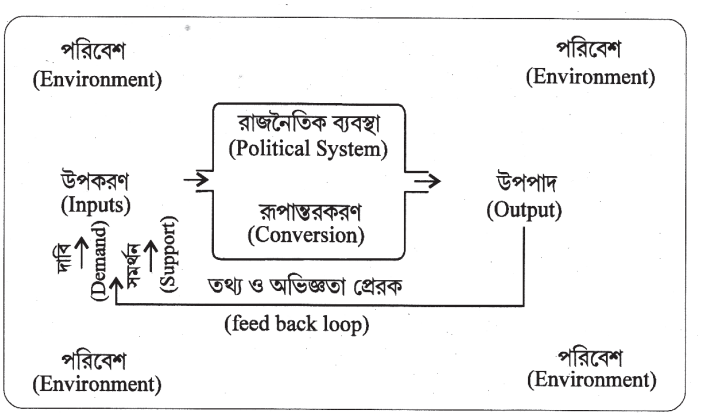

সমালোচনাধর্মী উপলব্ধি (*Critical Appreciation*) ঃ ইস্টন বস্তুতপক্ষে এক বিমূর্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থার কথা বলেছেন। তিনি রাজনৈতিক ব্যবস্থার যে সীমান্তের কথা বলেছেন তা যথেষ্ট বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল। বস্তুতঃপক্ষে, তিনি পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির কথা স্মরণে রেখে তাঁর মডেলটি উপস্থাপিত করেছিলেন, যেগুলির সুস্পষ্ট ভৌগোলিক সীমানা ছিল। কিন্তু বাস্তবে ইস্টন-এর মাধ্যমে আর একবার রাজনৈতিক বিশ্লেষণের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে রাষ্ট্রকে এনে ফেলেছেন। আর এই কারণেই ইস্টন মূল্যের কর্তৃত্বসম্পন্ন বরাদ্দের বন্টনের উপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সীমান্তকে নির্ধারণ করেছিলেন। ফলতঃ তাঁর তত্ত্বে রাজনৈতিক বিশ্লেষণ প্রয়োগযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। দ্বিতীয়তঃ কীভাবে উপকরণ কাঠামোগুলি গড়ে ওঠে অর্থাৎ কেন একটি বিশেষ সামাজিক অর্থনৈতিক পটভূমিতে বিশেষ ধরণের দাবি ওঠে, ইস্টনের পর্যালোচনায় সে সংক্রান্ত প্রশ্নের কোন সমাধান পাওয়া যায় না। তৃতীয়তঃ ইস্টন সামাজিক মিথস্ক্রিয়া থেকে রাজনৈতিক মিথস্ক্রিয়াকে পৃথকীকৃত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যদি সমাজের সকল স্থানেই কর্তৃত্বমূলক বন্টন হয়, তাহলে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সমাজের মত বৃহৎ ব্যবস্থা কিংবা আধা রাজনৈতিক ব্যবস্থার (*Parapolitical system*) মত উপব্যবস্থা থেকে পৃথকীকৃত করার কোন প্রয়োজন থাকে না। মার্কসীয় তত্ত্বানুযায়ী, রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে উপরিকাঠামো (*Super Structure*) হিসাবে বিবেচনা করা যায়, যা সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, যদিও এই দুই-এর মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। কিন্তু ইস্টন রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে এমন একটি water tight compartment-এ পরিণত করেছিলেন যার সাথে সমাজের অন্যান্য ব্যবস্থার কোন সম্পর্ক নেই। স্বাভাবিকভাবে বিষয়টির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে একটা সন্দেহ থেকে যায়।

এতদ্‌সত্ত্বেও উল্লেখ করতেই হয় যে, ইস্টন প্রথম রাজনৈতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি লিখেছেন ঃ "যা বলা হয়েছে তার থেকে এটা স্পষ্ট যে এই ধরনের বিশ্লেষণ রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে গতিশীলতার আলোকে তুলে ধরতে সক্ষম। এক্ষেত্রে আমরা একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার উপপাদের মাধ্যমে কি ধরনের কার্য্য সম্পাদন করে তার সাথেই শুধুমাত্র পরিচিত হব না, বরং একথাও উপলব্ধি করতে পারব যে, ব্যবস্থা আচরণের প্রতিটি পর্য্যায়কেই প্রভাবিত করতে সক্ষম। রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে আচরণের একটি ধারাবাহিক আন্তঃসম্পর্কিত প্রবাহ হিসাবে ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তাকে আমরা সমর্থন করি।" ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত ইস্টনের দুটি গ্রন্থই, *A Framework for Political Analysis* এবং *A Systems Analysis of Political Life* এজাতীয় সাধারণ রাজনৈতিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় উৎসর্গীকৃত। যে কোন রাজনৈতিক তত্ত্বই, ওয়েবারের (Weber) বক্তব্য অনুযায়ী, অসম্পূর্ণ ও পক্ষপাতমূলক হতে বাধ্য। কিন্তু তার পরেও কার্যকারণ সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে একটি অভিজ্ঞতাবাদী সাধারণ রাজনৈতিক তত্ত্ব গড়ে তোলার ইস্টনীয় প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে যথেষ্ট সাহসী পদক্ষেপ।

Further Readings :

1. Young, O.R., *Systems of Political Science*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1968.
2. Davis, M.R. and Lewis, V.A., *Models of Political Science*, Macmillan, London, 1971.

Model Questions :

1. Examine the major concepts in David Easton's systems analysis.
2. Examine the basic assumptions of systems analysis of politics.
3. How according to Easton, a system seeks to adjust itself with changing environment ? Discuss fully.

Short Questions :

1. What do you mean by Easton's concept of 'authoritative allocation of values' ?
2. What is the role of 'support', according to Easton, in the input process ?
3. What is stress ?
4. What according to Easton, are the stress regulatory mechanisms ?
5. What are the functions of feedback mechanism in Easton's system analysis ?
6. What according to Easton, are the functions of gatekeepers of a political system ?
7. What is a political system, according to Easton ?
8. What according to Easton, is the aim of system analysis ?

তৃতীয় পাঠ

অ্যামন্ডের রাজনীতির কাঠামো-কার্যবাদী বিশ্লেষণ

(Almond's Structural-Functionalism in Politics)

রাজনীতি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে কার্যবাদ (functionalism) একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমসাময়িক দৃষ্টিভঙ্গী। কার্যবাদী তাত্ত্বিকরা সাধারণভাবে তিনটি আন্তঃসম্পর্কযুক্ত স্বীকার্য বা পূর্বানুমানের (postulates) কথা বলেন। প্রথমতঃ, তাঁরা সমাজের কার্যগত ঐক্যের ধারণায় বিশ্বাসী। তাঁরা মনে করেন, সমাজব্যবস্থার সকল অংশ একই সাথে কাজ করে, অর্থাৎ কার্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বা সংগতি (harmony) বর্তমান থাকে, যা কার্যগত একতার প্রতিফলন ঘটায়। দ্বিতীয়তঃ কার্যবাদীরা বিশ্বজনীন কার্যবাদের ধারাণায় বিশ্বাসী। এই পূর্বানুমান অনুযায়ী বিশ্বের সকল সমাজ অথবা সাংস্কৃতিক রূপকে একই ধরনের কতকগুলি অত্যাবশ্যক কর্মসম্পাদন করতে হয়। তৃতীয় স্বীকার্যটি অপরিহার্যতার ধারণার সাথে সম্পর্কিত। এই স্বীকার্য অনুযায়ী, সমাজকে এমন কতকগুলি কর্মসম্পাদন করতে হয়, যেগুলি ব্যতিরেকে সমাজ তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। আর এই সকল কর্মসম্পাদনের জন্য প্রতিটি সমাজকেই কতকগুলি বিশেষ ধরনের সামাজিক সাংস্কৃতিক রূপের (form) ব্যবস্থা করতে হয়। অর্থাৎ সমাজকে, তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য, কতকগুলি কার্য বাধ্যতামূলকভাবে সম্পাদন করতে হয়, আর এই কর্মসম্পাদনের উদ্দেশ্যে তাকে কতকগুলি বিশেষীকৃত কাঠামোর ব্যবস্থা করতে হয়। এই তিনটি মূল স্বীকার্যের ভিত্তিতেই বিংশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে ম্যালিনোস্কি (B. Malinouski) এবং র‍্যাডক্লীফ-ব্রাউন (A.R.Radcliff-Brown)-এর সক্রিয় প্রচেষ্টায় কার্যবাদ রাজনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তার স্থান করে নিয়েছিল, যদিও কয়েকটি প্রসঙ্গে দুজনের মতপার্থক্য ছিল। ম্যালিনোস্কি এই ধরনের তত্ত্বের উপযোগিতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, এর মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোকে তার কার্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে এবং একটি কাঠামো কীভাবে অপরটির সাথে সুসম্পর্কিত অবস্থায় থেকে সংস্কৃতির একটি সমগ্র ব্যবস্থা গড়ে তোলে, সেটিও অবগত করবে।[১]

কার্যবাদ এবং রাজনীতির উন্নয়নমূলক দৃষ্টিভঙ্গী (Functionalism and the developmental approach to politics) ঃ

রাজনীতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কার্যবাদের ব্যবহার গ্যাবরিয়েল অ্যামন্ডের (Gabriel Almond) বিশেষ অবদান। মূলতঃ দুটি আন্তঃসম্পর্কিত সমস্যার সমাধান বিষয়ে অ্যামন্ড এবং তাঁর অনুগামীরা ভাবিত ছিলেন। প্রথমতঃ তাঁরা এমন একটি তত্ত্ব রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন, যা রাজনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে সনাতন বা ঐতিহ্যবাদী (traditional) অবস্থা থেকে আধুনিক (modern) অবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে। বিষয়টি তাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল, কারণ তাঁরা অনুমান করেছিলেন আধুনিক ব্যবস্থাগুলি অধিক দক্ষতা সহকারে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারে এবং নিম্নস্তর (কৃষিপ্রধান সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থা) থেকে উচ্চস্তরে (শিল্পপ্রধান সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থা) থেকে অর্থনৈতিক বিকাশ এবং প্রতিসঙ্গী (corresponding) সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উত্তীর্ণ হয়। অর্থাৎ এর মাধ্যমে অ্যামন্ড একটি রাজনৈতিক উন্নয়নের তত্ত্ব রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন।

---

১) Malinewski, B., "Anthropology", *Encyclopaedia Britannica*, First Supplementary Volume, London.

.

দ্বিতীয়তঃ অ্যামন্ড বিভিন্ন ধরনের শাসনতন্ত্র (regime) ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে অর্থপূর্ণ উপায়ে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করে তুলনামূলক রাজনীতিবিজ্ঞান গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। একাজ তিনি করতে চেয়েছিলেন একটি মানদন্ড (scale) প্রণয়নের উদ্দেশ্যে, যে মানদন্ড থেকে সহজেই বুঝা যাবে, কোন ধরনের সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে কী ধরনের কর্মসম্পাদন করতে হয় এবং বিপরীতক্রমে, কোন ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা কী কী বিশেষ ধরনের কার্য অধিক দক্ষতা সহকারে সম্পাদন করতে পারে, কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, রাজনৈতিক ব্যবস্থার শ্রেণী বিভাজনের মাধ্যমে অ্যামন্ড, কোন ব্যবস্থাটি সর্বশ্রেষ্ঠ কিংবা কোনটি নিকৃষ্টতম তা নির্ণয়ে বিন্দুমাত্র উৎসাহী ছিলেন না। তিনি মনে করতেন, যদি কোন রাষ্ট্র বিজ্ঞানীকে তুলনামূলক রাজনীতিবিজ্ঞান গড়ে তুলতে হয়, তাহলে প্রথমেই তাকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলিকে ব্যাখ্যা করতে হবে। তারপর, কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে, বিভিন্ন সমাজের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সমূহকে বর্গীকরণ (classification) করতে হবে।[৩]

আসলে অ্যামন্ড রাজনৈতিক পরিবর্তনের ধারণাকে উন্নয়নের মাপকাঠিতে বর্ণনা করেছিলেন এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে কতকগুলি স্তরে বিভক্ত করা সম্ভব এরকম মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলিকে সাধারণভাবে ঐতিহ্যবাদী (traditional), উত্তরণশীল (transitional) এবং আধুনিক (modern) এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন। অবশ্য তিনি স্বীকার করেছিলেন, সম্পূর্ণ আধুনিক কিংবা সম্পূর্ণ ঐতিহ্যবাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলে কিছু থাকতে পারে না। তবে তিনি দাবি করেছেন, উন্নয়ন প্রক্রিয়া একটি যুক্তিগ্রাহ্য পথে এগিয়ে যায় এবং এই প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, এমনকি, পরিবেশের চাপের (pressure) ফলশ্রুতিতে ছোট এবং বড় মাপের যে সকল পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা থাকে, সেগুলিকেও চিহ্নিত করা যেতে পারে। রাজনৈতিক উন্নয়নের যুক্তিগ্রাহ্য পথটির অনুধাবনের উদ্দেশ্যে অ্যামন্ড রাজনীতি বিশ্লেষণের কাঠামো কার্যবাদী ব্যাখ্যার অবতারণা করেছেন।

অ্যামন্ডের কাঠামো-কার্যবাদী-বিশ্লেষণ (Almond's Structural-Functional Analysis) ঃ

অ্যামন্ড ও কোলম্যান সম্পাদিত *The Politics of Developing Areas* (1960) গ্রন্থের ভূমিকায় অ্যামণ্ড তুলনামূলক রাজনীতির কার্যবাদী দৃষ্টিকোণ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। কাঠামো ও কার্য কাকে বলে সে সংক্রান্ত বিশ্লেষণও যথার্থ গুরুত্বসহকারে তিনি উক্ত গ্রন্থটিতে করেছেন, তবে তিনি আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছেন রাজনৈতিক ব্যবস্থা (political system) বলতে কী বুঝায় তা পর্যালোচনার মাধ্যমে।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে অ্যামন্ড প্রথমেই ম্যাক্স ওয়েবার, মেরিয়ন লেভী, হ্যারল্ড ল্যাসওয়েল, ডেভিডইস্টন, অব্রাহাম কাপলান প্রমুখ প্রদত্ত 'রাজনীতি' এবং 'রাজনৈতিক ব্যবস্থার' সংজ্ঞাগুলিকে উল্লেখ করেন এবং প্রতিটির সীমাবদ্ধতাগুলিকে চিহ্নিত করে সেগুলিকে বাতিল করে দেন। এরপর তিনি রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি নিজস্ব সংজ্ঞা নির্ধারণে ব্রতী হন। তাঁর মতে, রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল এমন একটি পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা, যা সমস্ত স্বাধীন সমাজে দেখা যায়, যেখানে কমবেশী বৈধ দৈহিক বলপ্রয়োগ বা তার ভীতিপ্রদর্শনের মাধ্যমে সমাজে সংহতি বজায় রাখার কাজ এবং আভ্যন্তরীণ বা অন্যান্য সমাজের সাথে অভিযোজিত হবার বা সঙ্গতি রাখবার দায়িত্ব সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল, অ্যামন্ডের মতে, সমাজের বৈধ (legal), শৃঙ্খলারক্ষাকারী (order maintaining) এবং রূপান্তর সাধনকারী (transforming) ব্যবস্থা। তবে তিনি রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈধতাকে চিহ্নিত করতে গিয়ে "কমবেশী" এই মাত্রা নির্দেশকটিকে ব্যবহার করেছেন, কারণ তিনি তাঁর সংজ্ঞা থেকে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী ব্যবস্থাগুলিকে বাদ দিতে চাননি, যেগুলি কতখানি বৈধতা ভোগ করে সে সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। উক্ত পদটির সুকৌশল ব্যবহারের ফলে বৈপ্লবিক ব্যবস্থা (revolutionary systems) গুলিকেও, অর্থাৎ যেগুলির বৈধতার ভিত্তি পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে নিহিত রয়েছে, এবং পশ্চিমী নয় এমন ব্যবস্থাগুলিও (nonwestern systems), যেখানে একাধিক বৈধ ব্যবস্থা কার্যকারী রয়েছে, সংজ্ঞাটির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাঁর মনে হয়েছে একমাত্র "দৈহিক বলপ্রয়োগ" (physical compulsion) পদগুচ্ছের ব্যবহারের মাধ্যমে

রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে অন্যান্য সমাজ ব্যবস্থার পার্থক্য তুলে ধরা সম্ভব কারণ দৈহিক বলপ্রয়োগ বা তার ভীতিপ্রদর্শনের বৈধ ক্ষমতা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ব্যতীত অপর কোন সামাজিক সংস্থা ভোগ করে না। কিন্তু তাই বলে অ্যামন্ড রাজনীতির ধারণাকে সরলীকৃত করে বলপ্রয়োগের সমার্থক করে তুলেছেন, তা কিন্তু নয়। বৈধ বলপ্রয়োগের ধারণা তাঁর মতে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপকরণ (input) ও উপপাদের (output) মধ্যে সংযোগসূত্র হিসাবে কাজ করে, যা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন করে তোলে এবং ব্যবস্থার সংবদ্ধতা (coherence) বৃদ্ধি করে। এছাড়াও মনে রাখা প্রয়োজন, অ্যামন্ড কেবলমাত্র সামাজিক সংহতিকেই রাজনীতির উদ্দেশ্য বলে বর্ণনা করেননি, শৃঙ্খলারক্ষা, যা সময় বিশেষে সামাজিক সংহতি বিরোধীও হতে পারে, তাকে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। রাজনৈতিক ব্যবস্থা অ্যামন্ডের কাছে তাই বৈধ শৃঙ্খলারক্ষাকারী এবং রূপান্তর সাধনকারী ব্যবস্থা হয়ে উঠেছে যা নিজের সাথে কিংবা অন্যান্য সমাজের সাথেও সাযুজ্য বিধান করে। অ্যামন্ড প্রদত্ত সংজ্ঞাটিকে আরও ব্যাখ্যা করে বলা যায়, রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে অন্য সমাজের সাথে অভিযোজিত হবার কার্যও সম্পাদিত হয় এবং প্রত্যেক স্বাধীন সমাজেই এই রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। তবে স্বাধীন সমাজ বলতে অ্যামন্ড কী বুঝিয়েছেন, তার বিস্তারিত বিবরণ তিনি কোথাও দেননি, সুতরাং ঔপনিবেশিক শাসন নেই এমন সমাজকে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

অ্যামন্ডের মতে রাজনৈতিক ব্যবস্থার তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলি হল (১) সমগ্রতা (comprehensiveness), (২) পারস্পরিক নির্ভরশীলতা (Interdependence), এবং (৩) সীমানার অস্তিত্ব থাকা (existence of boundaries)। সমগ্রতা বলতে অ্যামন্ড রাজনৈতিক ব্যবস্থার সর্বব্যাপকতার কথা বলেছেন অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন, রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল একটি মূর্ত সমগ্র যা পরিবেশকে প্রভাবিত করে এবং সময় সময় পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। বৈধ বলপ্রয়োগের শক্তি ব্যবস্থা ও পরিবেশকে একসাথে ধরে রাখে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি বিষয়ের পরিবর্তন অপর বিষয়ে পরিবর্তন আনতে পারে। বিষয়টি প্রতিফলিত হয় পারস্পরিক নির্ভরশীলতার আলোকে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার সীমান্তের অস্তিত্ব থাকার অর্থ, এমন একটি বিন্দু (point) অবশ্যই আছে যেখানে অন্যান্য ব্যবস্থা শেষ হয়ে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, রাজনৈতিক ব্যবস্থা একটি উন্মুক্ত ব্যবস্থা (open system) যা তার সীমানার বাইরে অবস্থিত অন্যান্য ব্যবস্থা ও সত্ত্বার সাথে যোগাযোগ রাখতে সক্ষম।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার সার্বজনীন ধর্মগুলি (The common properties of political systems) ঃ

রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনার পর তিনি কতকগুলি সার্বজনীন ধর্মের কথা বলেছেন, যা বিশ্বের সকল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বর্তমান। প্রথমতঃ, তিনি বলেছেন, আধুনিক এবং আদি সকল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কতকগুলি রাজনৈতিক কাঠামো (structure) থাকে। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন, বিশ্বে এমন কোন সমাজ দেখা যায় না যেখানে আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক শৃঙ্খলা পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বৈধ প্যাটার্ন ব্যতীত অন্য কোনভাবে রক্ষিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, কতকগুলি সাধারণ কার্যাবলী সকল রাজনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারাই সম্পাদিত হয় যদিও সেগুলি হয়ে থাকে বিভিন্ন কাঠামোর দ্বারা, বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে। তৃতীয়তঃ, সকল রাজনৈতিক কাঠামো, যতই সে বিশেষীকৃত হোক না কেন, একাধিক ধরনের কর্মসম্পাদন করে থাকে, যদিও ব্যবস্থাভেদে তার মাত্রা বিভিন্ন হয়। চতুর্থতঃ, প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যবস্থাই সাংস্কৃতিক অর্থে মিশ্র ব্যবস্থা (mixed system)। এদের প্রত্যেকেরই উপাদান হিসাবে আধুনিক ও আদিম সংস্কৃতির ও কাঠামোর মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। এমন কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থা দেখা যায় না, যার উপাদান হিসাবে সম্পূর্ণ আধুনিক বা সম্পূর্ণ আদিম সংস্কৃতি ও কাঠামো পরিলক্ষিত হয়।

কাঠামো ও কার্যের সংজ্ঞা (Definition of Structure and Function) ঃ

এরপর অ্যামন্ড কাঠামো ও কার্যের সংজ্ঞা কী হওয়া উচিত সে বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন। রাজনৈতিক কাঠামো হল, অ্যামন্ডের মতে, মিথস্ক্রিয়ার একটি বৈধ ধাঁচ যার মাধ্যমে কোন সমাজের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়। কাঠামোগুলি সাময়িক (occasional) কিংবা সবিরামযুক্ত (intermittent) হতে পারে এবং যে সকল কাঠামো আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় সেগুলির উপস্থিতি সনাতন এবং পশ্চিমী নয় এমন ব্যবস্থাগুলিতেও পরিলক্ষিত হয়। তাঁর মতে, আধুনিক এবং ঐতিহ্যবাদী সমাজের পার্থক্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভূমিকার বিশেষীকরণের মাত্রার উপর নির্ভরশীল। ঐতিহ্যবাদী সমাজের রাজনৈতিক কাঠামোগুলির অধিকাংশই বিক্ষিপ্ত (diffused) এবং সবিরামযুক্ত ধরনের হয়ে থাকে, কিন্তু আধুনিকসমাজের রাজনৈতিক কাঠামোগুলির অধিকাংশই পৃথকীকৃত ধরনের হয়ে থাকে।

Robert Merton তাঁর *Social Theory and Social Structure* গ্রন্থে দেখিয়েছেন, কার্য কথাটি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, যার ফলে কার্য কথাটির মূল অর্থের বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়েছে। সামাজিক কার্যকে তাই তিনি পুনসংজ্ঞায়িত করবার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন এবং তাকে "পর্যবেক্ষণযোগ্য বিষয়গত ফলাফল" (observable objective consequence) বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ বিষয়ীগত ধারণাসমূহ, যেমন লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় প্রভৃতিকে তিনি কার্যের অন্তর্ভুক্ত করেননি। অ্যামন্ডের মতে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার কার্য হল আন্তঃ সামাজিক ও বহিঃ সামাজিক ক্ষেত্রে সংহতি রক্ষা এবং পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে অভিযোজিত করা।

কার্যের প্রকারভেদ (Almond's functional categories) ঃ

অ্যামন্ডের মতে প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যবস্থাকেই নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য কতকগুলি বিশেষ ধরনের কর্মসম্পাদন করতে হয়, অর্থাৎ ব্যবস্থার চাহিদাগুলি মেটাতে হয়। প্রতিটি ব্যবস্থাকেই দুধরণের কর্মসম্পাদন করতে হয়, (১) উপকরণ কার্যাবলী (input functions) এবং (২) উপপাদ কার্যাবলী (output functions)। বিষয়টিকে বিস্তৃত করে বলা যায়, রাজনৈতিক ব্যবস্থার মিথস্ক্রিয়ার চৌহদ্দি (range) গড়ে ওঠে উপকরণ ও উপপাদের সমন্বয়ে। উপকরণগুলি পরিবেশ অথবা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অভ্যন্তর থেকে উদ্ভূত হয় এবং রূপান্তরকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চালিত হয়ে উপপাদে পরিণত হয়। এই উপপাদগুলি বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্তের আকারে পরিবেশে ফেরত আসে। এই উপপাদগুলি অনেকসময় পরিবেশগত পরিবর্তন আনতে পারে, যা থেকে নূতন দাবির উদ্ভব ঘটতে পারে, এমনকি ব্যবস্থার পরিবর্তনের দাবিও আসতে পারে। তথ্য প্রেরক ব্যবস্থা (feedback mechanism) এই সকল দাবিগুলিকে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নিয়ে আসে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তনের ইঙ্গিত নিয়ে, রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে আরও উন্নত ব্যবস্থার দিকে নিয়ে গিয়ে রাজনীতিক জীবনকে গতিশীল করে তোলে।

রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে, তাঁর মতে, অন্ততঃ সাত ধরনের কর্মসম্পাদন করতে হয়। এর মধ্যে প্রথম চারটিকে তিনি উপকরণ কার্যাবলী ও শেষ তিনটিকে উপপাদ কার্যাবলী বলে অভিহিত করেছেন।

উপকরণ কার্যগুলি হল ঃ

(১) রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ও নিয়োগ (political socialization and recruitment)

(২) স্বার্থের পরিপ্রকাশ (Interest anticulation),

(৩) স্বার্থের সমষ্টিকরণ (Interest aggregation), এবং

(৪) রাজনৈতিক যোগাযোগ (Political communication)।

উপপাদ কার্যগুলি হল ঃ

(৫) নিয়ম প্রণয়ন (Rule Making)

(৬) নিয়ম প্রয়োগ (Rule Application) এবং

(৭) নিয়ম অনুযায়ী বিচার (Rule Adjudication)।

(১) **রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ও নিয়োগ ঃ** রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ভূমিকা সম্পর্কিত জ্ঞান, মূল্যবোধ বা অনুভূতি-এক কথায় রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Political Culture) রাজনৈতিক ব্যবস্থার সদস্যদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। প্রত্যেক রাজনৈতিক ব্যবস্থাই তার সংস্কৃতি ও কাঠামোকে চিরস্থায়ী করতে চায়, মানুষ শৈশবে এবং পরিণত বয়সে যে সকল মুখ্য ও গৌণ কাঠামোর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে তাদের সাহায্যে। তাই রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসাবে পরিবার, চার্চ, বিদ্যালয়, সঙ্গীগোষ্ঠী, রাজনৈতিক দল, সরকারী প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমগুলির কথা বলা যায়। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সমাজকে কতকগুলি রাজনৈতিক মূল্যের নিরিখে ঐক্যবদ্ধ করে, সমাজস্থ মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক ভূমিকার বিকাশ ঘটায়, মানুষকে কতকগুলি বিশেষ ভূমিকার জন্য প্রস্তুত করে। আধুনিক রাাজনৈতিক ব্যবস্থার আবার রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ কেবলমাত্র রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি ব্যক্তির আনুগত্যই সুনিশ্চিত করে না, নিবিড় সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেমন — পরিবার, চার্চ প্রভৃতিরও আনুগত্য পাবার চেষ্টা চালিয়ে যায়। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের কাজ যেখানে শেষ হয় সেখান থেকে শুরু রাজনৈতিক নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলী। রাজনৈতিক নিয়োগ বলতে বুঝায় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাজের সদস্যদের মধ্য থেকে নিয়োগ। রাজনৈতিক নিয়োগের মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ বিশেষীকৃত ভূমিকা পালন করবার জন্য প্রার্থী নিযুক্ত হন। রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে, তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে, প্রথমেই এদুটি কাজকে যথাযথভাবে সম্পাদন করতে হয়।

(২) **স্বার্থের পরিপ্রকাশ ঃ** স্বার্থের পরিপ্রকাশ, বিভিন্ন প্রকার স্বার্থের সূত্রবদ্ধকরণ ও বহিপ্রকাশের সাথে এবং কোন রাজনৈতিক ক্রিয়ার জন্য দাবির সাথে জড়িত। যেহেতু এই সকল ক্রিয়া রাজনৈতিক ব্যবস্থার সীমানায় হয়ে থাকে, তাই যে সকল কাঠামো এই ক্রিয়া সম্পাদন করে থাকে, তারা রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সমাজের মধ্যকার সীমানা নির্ধারণ করে থাকে। অ্যামন্ড চার ধরণের স্বার্থ পরিপ্রকাশ কাঠামোর কথা বলেছেন — (ক) প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ-গোষ্ঠী (institutional interest group), (খ) অনানুষ্ঠানিক স্বার্থ-গোষ্ঠী (non-associational interest group), (গ) বিধিশূন্য স্বার্থ-গোষ্ঠী (anomic interest group) এবং (ঘ) আনুষ্ঠানিক স্বার্থ-গোষ্ঠী (associational interest group)। প্রথম শ্রেণীভুক্ত স্বার্থ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হল আইনসভা, রাজনৈতিক শাসক, আমলাতন্ত্র, সৈন্যবাহিনী প্রভৃতি। এই সকল স্বার্থ গোষ্ঠী তাদের নিজেদের স্বার্থ ও সমাজের অন্যান্য গোষ্ঠীর স্বার্থ উভয়েরই পরিপ্রকাশ ঘটায়। দ্বিতীয় ধরনের গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে আত্মীয় বা জাতি গোষ্ঠী, আঞ্চলিক ও ধর্মীয় গোষ্ঠী, পদমর্যাদানুসারী গোষ্ঠী এবং শ্রেণী গোষ্ঠী। এরা অনানুষ্ঠানিকভাবে এবং সবিরতিযুক্তভাবে স্বার্থের পরিপ্রকাশ করে থাকে ব্যক্তি উপজাতি প্রধান কিংবা পরিবারের মাধ্যমে। তৃতীয় গোষ্ঠী স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে কোন উপায়ে রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাছ থেকে কতকগুলি দাবি আদায় করতে চায়। দাঙ্গা, বিক্ষোভ প্রদর্শন প্রভৃতির প্রাক্কালে সামান্য স্বার্থকে কেন্দ্র করে এধরনের গোষ্ঠী হঠাৎ গজিয়ে ওঠে এবং সেই কাজ হয়ে যাবার পর গোষ্ঠী ভেঙ্গে যায়। তবে যতদিন এই গোষ্ঠী বর্তমান থাকে এবং যদি তাদের যথাযথভাবে সংগঠিত করা যায়, তাহলে এই গোষ্ঠীর কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায়। চতুর্থ ধরনের স্বার্থগোষ্ঠী কতকগুলি বিশেষীকৃত কাঠামো যেমন — শ্রমিক সংঘ, ব্যবসায়ী সংগঠন, পেশাদার বুদ্ধিজীবী নাগরিকগোষ্ঠী নিয়ে গড়ে ওঠে, যারা তাদের নিজস্ব দাবির পরিপ্রকাশ ঘটায় এবং তা অন্যান্য রাজনৈতিক দল, কাঠামো, আইনসভা ও আমলাতন্ত্রের নিকট প্রেরণ করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে স্বার্থ পরিপ্রকাশ নামক উপকরণ কার্যে রাজনৈতিক দলের কোন ভূমিকা অ্যামন্ড স্বীকার করেননি।

(৩) **স্বার্থের সমষ্টিকরণ ঃ** স্বার্থের সমষ্টিকরণ ঘটা প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই জরুরী। স্বার্থের সমষ্টিকরণ বলতে বুঝায় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর তরফ থেকে যে সকল দাবিগুলি আসছে সেগুলির একত্রীকরণ। এই সময় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আগত অসংখ্য দাবির মধ্যে থেকে গুরুত্বপূর্ণগুলিকে বেছে নেওয়া হয় ও অন্যান্যগুলিকে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়। স্বার্থের সমষ্টিকরণ সাধারণত হয়ে থাকে সাধারণ নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে বিশেষীকৃত স্বার্থসমূহের সমন্বয়করণের ভিত্তিতে। অ্যামন্ডের মতে রাজনৈতিক দল ব্যবস্থাই স্বার্থের সমষ্টিকরণের জন্য সুনিশ্চিতভাবে আধুনিক কাঠামো গড়ে তোলে।

(৪) **রাজনৈতিক যোগাযোগ ঃ** উপরোক্ত সকল কার্যাবলী যা একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সম্পাদন করতে হয়, মূলতঃ হয়ে থাকে যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে। স্বার্থগোষ্ঠীর নেতা কিংবা রাজনৈতিক নেতারা স্বার্থের পরিপ্রকাশ ও সমষ্টিকরণ ঘটিয়ে থাকেন দাবিগুলিকে যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে তুলে ধরে এবং নীতি সুপারিশের মাধ্যমে। এছাড়াও, সমাজে যে সকল স্বার্থ সুপ্ত অবস্থায় থেকে যায় সেগুলি যোগাযোগের বিভিন্ন নিরপেক্ষ মাধ্যমের দ্বারা (যেমন — বেতার, দূরদর্শন, সংবাদপত্র প্রভৃতি) রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এসে থাকে। আবার, রাজনৈতিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যে উপপাদগুলি সরবরাহ করছে তা সমাজে কীরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে - ইতিবাচক না নেতিবাচক - সেটি রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে অবহিত করে। অর্থাৎ এটি তথ্য ও অভিজ্ঞতা প্রেরক যন্ত্রাংশ (feedback mechanism) হিসাবেও কাজ করে থাকে।

উপরোক্ত চারটি উপকরণ কার্যের পাশাপাশি রয়েছে আরও তিনটি উপপাদ কার্যাবলী যাকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতে আগ্রহী ছিলেন না। এই উপপাদ কার্যাবলী হল নিয়ম প্রণয়ন, নিয়ম প্রয়োগ এবং নিয়ম অনুযায়ী বিচার। প্রসঙ্গতঃ তিনি আইন (law) কথাটি ব্যবহার করেননি, নিয়ম কথাটির উল্লেখ করেছেন। এর পিছনে কারণ একটাই — আইন শব্দটি ব্যবহার করলে রাষ্ট্রের প্রসঙ্গ আসবেই, যাকে তিনি পরিহার করতে চান। অ্যামন্ডের মতে, উপপাদ কার্যাবলী নিয়ে বহু বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, আর বিস্তারিত আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই, এগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনাই যুক্তিসঙ্গত। আসলে এগুলির বিস্তৃত আলোচনা রাষ্ট্র ব্যতিরেকে করা সম্ভব নয়। তাই তিনি ঐ পথে যাননি। তাঁর মতে, উপপাদ কার্যাবলী সংগঠিত হয় সরকারী কাঠামোর মধ্যে, বেসরকারী বা অরাজনৈতিক কাঠামোর এই কাজে কোন ভূমিকা থাকে না। এই কাজগুলি ঐতিহ্যবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সরকারী কাজের যে তিনটি বিভাগ রয়েছে অর্থাৎ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের নীতির সাথে তুলনীয়।

অ্যামন্ডের বিশ্বাস ছিল, বিভিন্ন রাষ্ট্রের উপরোক্ত কার্যগুলির বাস্তবায়ণ কীরকম হচ্ছে তার তুলনামূলক সমীক্ষার মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা অপরটির তুলনায় কতটা উন্নত তা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

কার্যবাদের সমালোচনা (Critique of Functionalism) **ঃ**

অ্যামন্ডের রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা পর্যালোচনা সব থেকে সেরা জ্ঞাত পদ্ধতি বলে বিবেচিত হয়। কারণ এই তত্ত্বটি ইস্টন প্রদত্ত তত্ত্বের কিছু সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে অ্যামন্ড ইস্টনের মতো একটি এককে পরিণত করেননি, পরিবর্তে তিনি রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সমাজের বাকি অংশের স্বাভাবিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কটি তুলে ধরতে পেরেছেন।

কিন্তু সাম্প্রতিককালে অ্যামন্ডের কাঠামো-কার্যবাদী তত্ত্বকে প্রচুর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, বিশেষতঃ সমাজতাত্ত্বিকদের কাছ থেকে, যারা কিছুদিনের জন্য এই দৃষ্টিভঙ্গী তাদের গবেষণায় ব্যবহার করেছিলেন। প্রথমতঃ, অ্যামন্ডের কাঠামো কার্যবাদী তত্ত্ব এমন কিছু সমস্যায় জর্জরিত যে সমস্যাগুলি জ্ঞানের এক শাখার দৃষ্টিভঙ্গী অপর শাখায় ব্যবহার করতে গেলেই এসে যায়, তার যথার্থ অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। ট্যালকট পারসন্‌স ব্যবহৃত বেশীর ভাগ প্রতিশব্দই অ্যামন্ড ব্যবহার করেছিলেন কিন্তু পারসন্‌স যে দক্ষতায় ব্যবহার করেছেন অ্যামন্ড সেইভাবে

ব্যবহার করতে পারেননি, ফলে তাঁর কাঠামো-কার্যবাদী তত্ত্বে ব্যবহৃত প্রতিশব্দগুলি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে।

দ্বিতীয়তঃ, অ্যামন্ডের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংজ্ঞা খুব স্পষ্ট নয়। সংজ্ঞায় তিনি যে স্বাধীন সমাজের কথা বলেছেন তার অর্থ বিশ্লেষণ করেননি। সংজ্ঞায় তিনি সংহতি ও সাযুজ্যবিধানের যে কথা বলেছেন তার থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক তিনি স্থিতাবস্থার পূজারী ও রক্ষণশীলতার প্রতীক। পরিবর্তনশীলতা, যা প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই কিছুদিন অন্তর লক্ষ্য করা যায়, সে ব্যাপারে তাঁর মূল তত্ত্ব নীরব। আবার কেবলমাত্র দৈহিক বলপ্রয়োগের ভীতির মাধ্যমেই নয়, অভ্যাস, সম্মান, লোভের বশবর্তী হয়ে কিংবা সহযোগিতার মানসিকতার কারণেও মানুষ যে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে মান্য করে সেদিকটির প্রতিও অ্যামন্ড যথাযথ দৃষ্টি দেননি। মিথস্ক্রিয়া কথাটির উল্লেখ বারংবার করলেও সেটিকে কোথাও তিনি স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করেননি।

তৃতীয়তঃ, তত্ত্ব গড়ে তোলার সময় অ্যামন্ড যে ধারণাগুলি পেশ করেছেন সেগুলিও খুব যুক্তিসম্মত নয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থার যে সাতটি কার্যাবলীর কথা তিনি বলেছেন সেগুলিও অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। বিভিন্ন ধরনের স্বার্থ সম্বলিত গোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক এই সীমারেখা নির্ধারণ করা কঠিন। আবার স্বার্থের সমষ্টিকরণ কেন কেবলমাত্র রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই সংগঠিত হবে, অন্যান্য সংগঠনের দ্বারা কেন সম্পন্ন হতে পারে না, স্বার্থের পরিপ্রকাশে কেন রাজনৈতিক দলের কোন ভূমিকা থাকবে না, অ্যামন্ডের তত্ত্বে তা পরিষ্কার নয়।

চতুর্থতঃ, তিনি কেবলমাত্র উপকরণ সংক্রান্ত কাজের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন কিন্তু উপপাদ কার্যাবলী, যা যে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তার প্রতি একেবারেই গুরুত্ব দেননি। তিনি গুরুত্ব দেননি তথ্য ও অভিজ্ঞতা প্রেরক যন্ত্রাংশের উপরও, যা রাজনৈতিক ব্যবস্থার অস্তিত্বকে বজায় রাখার পক্ষে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

এছাড়াও, তিনি রাষ্ট্রকে পরিহার করে যেভাবে আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তাতে মনে হয়েছে রাষ্ট্রের গুরুত্ব শেষ হয়ে গেছে। কিছুদিনের মধ্যেই রাষ্ট্র নামক সত্ত্বাটি অবলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে রাষ্ট্র তাঁর সময়েও ছিল, আজও আছে, ভবিষ্যতেও আরও অন্ততঃ কিছুদিন থাকবে বলেই সমালোচকদের বিশ্বাস।

পরিশেষে, একথার উল্লেখ করতেই হয়, যেকোন রাজনৈতিক বিশ্লেষণের মূল রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন, তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে যথাযথভাবে যা করা সম্ভব নয়। একটি ঘটনাকে সব থেকে ভালভাবে তুলে ধরা যেতে পারে যে পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাটি ঘটেছে তার আলোকে। উন্নয়নশীল দেশগুলির রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে উন্নত দেশগুলির সাথে তুলনা করার যে প্রক্রিয়ার কথা অ্যামন্ড তুলে ধরেছিলেন Politics of Developing Areas (1960) এবং Comparative Politics (1996) গ্রন্থদ্বয়ে, শেষ বিচারে তা লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হয়নি এবং বেশ কিছু সংখ্যক প্রতিভাবান রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে ভুল পথে চালিত করে তাদের জ্ঞানান্বেষণের উদ্যমকে বিনষ্ট করেছিলেন।

Further Readings :

1. Almond, G.A. and Coleman, J.S., *The Politics of the Developing Areas*, Princeton, New Jersey, 1960.
2. Almond, G.A. and Power, G.B., *Comparative Politics*, Little Brown, Boston, 1966.
3. Wiseman, H.V., *Political System*, Routledge and Kegan Paul, London, 1966.

4. Davis, M.R., and Lewis, V.A., *Models of Political systems*, Macmillan, London, 1971.
5. Yound, O.R., *Systems of Political Science*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1968.
6. Verma, S.P., *Modern Political Theory*, Vikas New Delhi, 1975.

Model Questions :

1. Critically Analyse Almond's Structural-Functional approach to the study of politics.

Short Questions :

1. How does Almond define political system ?
2. What according to Almond are the basic universal characteristics of political system ?
3. What is meant by 'structure' according to Almond ?
4. How does Almond define the concept of 'function' ?
5. In what manner Almond's concept of 'function' differs from the sociological concept of function ?
6. What are the input functions according to Almond ?
7. How does Almond classify 'interest groups' ?
8. Can it be argued that Almond's model is a developmental approach ? Give reason.
9. Mention two basic assumptions underlying the functional analysis of politics.

চতুর্থ পাঠ

কার্ল ডয়েশ্চর রাজনীতির যোগাযোগ সংক্রান্ত মডেল

(Karl Deutsch and the Communications Model of Politics)

আচরণবাদী যুগের রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা প্রচলিত ধারার সাথে সাযুজ্য রেখে অর্থাৎ অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারণা ব্যবহার করে কার্ল ডয়েশ্চও (Karl Deutsch) রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার একটি নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। মূলতঃ সাইবারনেটিক্স এবং প্রযুক্তিবিদ্যায় বহুল ব্যবহৃত যোগাযোগ তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর তত্ত্ব রচনা করেন, যেখানে অজস্র ধারণার (concept) ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

যোগাযোগ তত্ত্ব সরকার ও রাজনীতিকে একটি হাল ধারণকারী (steering) যন্ত্র হিসাবে দেখে থাকে, যার মূল লক্ষ্য ভিন্নমুখী মানব প্রচেষ্টার সমন্বয়সাধন, যা শেষবিচারে কতকগুলি লক্ষ্য অর্জনকে সহজসাধ্য করে তোলে। ডয়েশ্চ তাঁর যোগাযোগ তত্ত্ব সংক্রান্ত আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছেন নরবার্ট ওয়াইনার (Norbert Weiner) প্রণীত যোগাযোগ প্রযুক্তিবিদ্যা (communication engineering) এবং শক্তি প্রযুক্তিবিদ্যা (power engineering) পার্থক্যকে সমর্থন করে। ডয়েশ্চ দেখিয়েছেন, শক্তি প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসে থাকে মোটামুটিভাবে প্রযুক্ত শক্তির আনুপাতিক হারে। কিন্তু যোগাযোগ প্রযুক্তিবিদ্যায় প্রযুক্ত শক্তির সামান্য পরিবর্তন প্রায়ই বিশাল পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়, তা গ্রাহক যন্ত্রে (receiver) সংবাদের (message) আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পারে। এই বিশেষ ধর্মের উপর ভিত্তি করেই যোগাযোগ প্রযুক্তিবিদরা একই যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের সংবাদ প্রেরণ করতে পারেন। অর্থাৎ এ ধরনের প্রযুক্তিবিদ্যায় পরিবর্তনশীলতা (change) প্রযুক্ত শক্তির আনুপাতিক হিসাব বিবেচিত হয় না। সুতরাং একটি বিষয় স্পষ্ট তা হল, যোগাযোগ তত্ত্বে পরিবর্তনশীলতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

অনুমান এবং স্বীকার্য (Assumption and postulates) ঃ

যোগাযোগ তত্ত্বানুযায়ী, সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের সাথে রাজনীতি সংশ্লিষ্ট। রাজনীতির গন্ডীর মধ্যেই সমগ্র সমাজকে প্রভাবিত করতে পারে এমন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তা কার্যকর করার ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ রাজনীতির 'মূল বিষয়' বা 'কেন্দ্রীয় এলাকা' (core area) হল বলবৎযোগ্য সিদ্ধান্ত এবং তার মূল নির্যাস (essence) হল সামাজিক লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে মানবিক প্রচেষ্টা সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করা।

দ্বিতীয়তঃ যদিও সাধারণভাবে মনে করা হয়, সরকারী সিদ্ধান্ত দীর্ঘকাল ধরে জনসাধারণ মেনে চলে হয় অভ্যাসবশত কিংবা ভয়বশত; কিন্তু ডয়েশ্চ দাবি করেন রাজনৈতিক ব্যবস্থা, কতকগুলি বিশেষ যন্ত্রাংশের (mechanism) আশ্রয়ে এই ব্যবস্থা করে, তার সুস্থিতি বজায় রাখে। অর্থাৎ তাঁর মতে রাষ্ট্রযন্ত্র সরকারকে মান্য করা উচিত এই অভ্যাস কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করে কতকগুলি কাঠামোর সাহায্যে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তথ্য (information) সংগ্রহকারী যন্ত্র, তথ্য বাছাইকারী (selection) যন্ত্র এবং তথ্য সংরক্ষণকারী যন্ত্র বা স্মৃতিকাঠামো (memory)। বস্তুতপক্ষে, ডয়েশ্চ বলতে চেয়েছেন, রাজনৈতিক ক্ষমতার কতকগুলি অন্তবর্তী উৎস থাকে এবং সুসংবদ্ধ ও দৃঢ় স্মৃতিকাঠামোই মানুষের মধ্যে অভ্যাস, নীতি ও মূল্যবোধ সংক্রান্ত ধারণা গড়ে তোলে। সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থা সেগুলি অতীত থেকে বর্তমান ও বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থা সমসাময়িক কালের ব্যক্তিবর্গের মধ্যেও এগুলির বহুল প্রচার ঘটিয়ে থাকে। অর্থাৎ রাজনৈতিক ব্যবস্থায়, ডয়েশ্চর মতে, "তথ্য নিপীড়ন বা বলপ্রয়োগের পূর্ববর্তী" (information precedes compulsion) হিসাবে বিবেচিত হয়।[১]

মূল ধারণাসমূহ (Basic Concepts) ঃ

তাঁর বিখ্যাত *The Nerves of the Government* (1963) গ্রন্থে ডয়েশ্চ সরকারকে তথ্যের প্রবাহের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা একটি সিদ্ধান্ত প্রণয়নমূলক ব্যবস্থা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। মূলতঃ দুধরনের মূল

১) Davis and Lewis, *Modes of Political Systems*, Macmilan, London, 1971, pp. 72-73.

ধারণার কথা তিনি বলেছেন। যথা (১) ব্যবস্থার কাঠামো পরিচালনা সংক্রান্ত ধারণা (concepts relating to operating structures) এবং (২) বিভিন্ন প্রবাহ ও প্রক্রিয়া সংক্রান্ত ধারণা (concepts relating to various flows and processes)। ডয়েশ্চ প্রথম ধরনের ধারণার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন বিভিন্ন ধরনের গ্রাহক যন্ত্র (receptor) এবং গ্রাহক ব্যবস্থাকে (reception system), যা বাহ্যিক কিংবা আভ্যন্তরীণ পরিবেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করবে। কিন্তু শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহ করেই গ্রাহক যন্ত্রের কাজ শেষ হবে না, তাকে আরও কতকগুলি কর্ম সম্পাদন করতে হবে। প্রথমে সে তথ্যগুলিকে পরীক্ষা করে দেখবে (scanning)। এরপর শুরু হবে বাছাই করার পর্ব (selection)। ব্যবস্থায় বহু তথ্য এসে হাজির হয় যার প্রতিটির পর্যালোচনা ব্যবস্থার পক্ষে অসম্ভব। তাই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলিকে বাছাই করে অন্য তথ্যগুলিকে অপসারিত করবার পদ্ধতি ব্যবস্থার থাকা প্রয়োজন। তথ্য বাছাই এর পর গ্রাহকযন্ত্র তথ্যের প্রতিলিপি তৈয়ারীকরণ ও তথ্যের প্রক্রিয়াকরণ (data processing) জাতীয় কর্মও সম্পাদন করবে।

তথ্য হল ডয়েশ্চর মতে, বিভিন্ন শৃঙ্খলায়িত বন্টন (patterned distribution) অথবা তাদের মধ্যকার শৃঙ্খলায়িত সম্পর্ক (patterned relationship)।[২] গ্রাহকযন্ত্র কতটা কার্যকরীভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে তা নির্ভর করে দুটি পূর্বশর্তের উপর। প্রথমতঃ গ্রাহক ব্যবস্থার অন্তত কিছু অংশকে প্রচন্ড অস্থির অবস্থার মধ্যে রাখতে হবে কারণ একমাত্র তাহলেই খুব সামান্য পরিমাণ শক্তিও পরিবর্তন প্রক্রিয়া সূচনা করবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে। দ্বিতীয় পূর্বশর্তটি গ্রাহক যন্ত্রের বাছাই ক্ষমতার (selectivity) সাথে সংশ্লিষ্ট। ব্যবস্থাটি যে ধরনের তথ্য ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করে ফেলেছে তার পুনঃ প্রবেশে বাধা দেবে এবং শুধুমাত্র এমন ধরনের তথ্যকে প্রবেশাধিকার দেবে যা প্রক্রিয়াকরণের পর কিছু উপপাদ (output) সৃষ্টি করতে পারবে।

তথ্য সংগ্রহের কার্যে নিয়োজিত গ্রাহক যন্ত্র ব্যতীত আরও বহু কাঠামো আছে যার মূল দায়িত্ব গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি কাঠামো তথ্য ও অভিজ্ঞতা প্রেরকের (feedback) কাজ করে, অর্থাৎ ব্যবস্থা কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত পরিবেশে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তা ব্যবস্থাকে অবহিত করে। এই তথ্যগুলি নতুন উপকরণ (input) হিসাবে ব্যবস্থায় আসে এবং ব্যবস্থার ক্রিয়াশীলতা পুনরায় শুরু হয়। সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারী যন্ত্রাংশে তথ্য বিশ্লেষিত হয় পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তের আলোকে যা সরবরাহ করে স্মৃতি কাঠামো (memory) এবং সমাজে প্রচলিত নীতি ও মূল্যবোধের ধারণা। গৃহীত সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে স্মৃতি কাঠামোয় লিপিবদ্ধ হয় এবং এরপর তাকে পাঠানো হয় বাস্তবায়ণ সংক্রান্ত কাঠামোতে (effector)। এইভাবে ডয়েশ্চর মতে, একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা সংগৃহীত তথ্যের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বলবৎ করবার ব্যবস্থা করে। বিষয়টিকে একটি চিত্রের মাধ্যমে সহজভাবে অনুধাবন করা যেতে পারে।

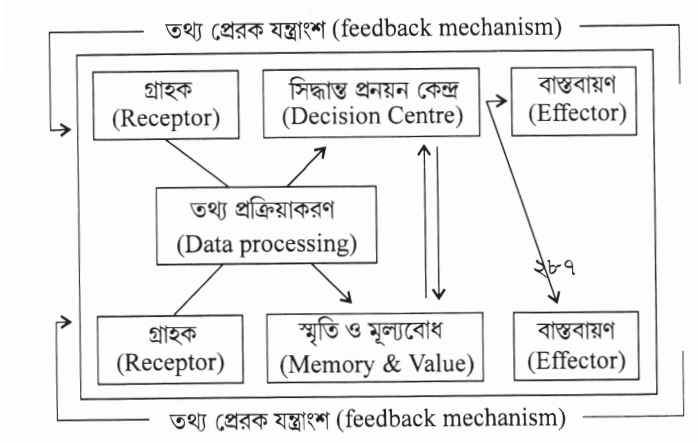

ডয়েশ্চর আলোচনায় ব্যবহৃত দ্বিতীয় শ্রেণীর ধারণাগুলি, তথ্যের প্রবাহ ও প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট। এই শ্রেণীভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলি হল মাধ্যম (channel), ভারবহনের সামর্থ্য (load capacity), ভার (load), পাশ্চাদ্‌পদতা (lag), প্রাপ্তি (gain), অগ্রগামিতা (lead), সদর্থক তথ্য প্রেরক (positive feedback), নঞর্থক তথ্য প্রেরক (negative feedback) এবং লক্ষ্য পরিবর্তনকারী তথ্য প্রেরক (goal changing feedback)। আসলে, পদার্থবিদ্যার একটি অত্যাধুনিক শাখা electronics এ ব্যবহৃত বিভিন্ন ধারণা ব্যবহার করে ডয়েশ্চ রাজনৈতিক ব্যবস্থার দক্ষতা (capacity) এবং কার্যকারিতা (effectiveness) পরিমাপ করতে চেয়েছিলেন।

ভার (load) বলতে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থা যে পরিমাণ তথ্য এককালীনভাবে গ্রহণ করতে পারে তাকে বুঝায়। মনে রাখা প্রয়োজন, রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভার বহনের পরিমাণ সময়ের পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হতে পারে। আবার বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভারবহনের হার বিভিন্ন হয়। ব্যবস্থায় ভারের ধারণ ক্ষমতা (load capacity) ব্যবস্থায় প্রাপ্ত মাধ্যমের (channel) সংখ্যা ও প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। ভারের ধারণ ক্ষমতা এছাড়া আরও কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে যেমন প্রতিবেদনশীলতা (responsiveness), বিশ্বাসযোগ্যতা (fidelity), প্রেক্ষাপটের গোলোযোগ (background noise) এবং বিকৃতি (distortion)। ব্যবস্থা যে দক্ষতার সাথে পরিবেশ থেকে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে পারে তাকেই তার প্রতিবেদনশীলতা বলে অভিহিত করা যেতে পারে। ব্যবস্থা যদি তার বিভিন্ন কাঠামোতে সঠিকভাবে তথ্য বন্টিত করতে পারে তাহলে তার বিশ্বাসযোগ্যতা আছে বলে ধরা যেতে পারে। ব্যবস্থার যদি বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব থাকে তাহলে এক তথ্য অপর তথ্যের সাথে মিশে বিকৃতি ঘটাতে পারে বা প্রেক্ষাপটের গোলোযোগ সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়াও, আরও কিছু ধারণ আছে যা মূলতঃ পুণঃস্মরণ (Recall) এর ধারণার সাথে সংশ্লিষ্ট। পুণঃস্মরণ হল ব্যবস্থার এমন একটি উপায়, যার মাধ্যমে ব্যবস্থা কোন তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক অতীত অভিজ্ঞতাকে চিহ্নিত করতে পারে, তাকে সামনে নিয়ে আসতে পারে এবং নূতন তথ্যের সাথে অতীত অভিজ্ঞতার মেলবন্ধন ঘটাতে পারে।

ডয়েশ্চর দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত অন্যান্য ধারণাগুলি বিভিন্ন সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ার ফলাফল বা পরিণতির সাথে সংশ্লিষ্ট। সিদ্ধান্ত (decision) হল এমন কতকগুলি নির্দেশ যা বাধ্যতামূলকভাবে কার্যকর করা হবে। সিদ্ধান্তের প্রবাহের ফলাফল যদি পর্যালোচনা করতে হয় তাহলে সিদ্ধান্তের মূল লক্ষ্যগুলি জানা প্রয়োজন। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, এই দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য কীভাবে নির্ধারিত হয় সেই প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের দিকে যায় না। এটি সিদ্ধান্ত কীভাবে গৃহীত হয় ও তার বাস্তবায়ন কীভাবে ঘটানো হয়, তা পর্যালোচনায় উৎসাহী। অর্থাৎ ডয়েশ্চর দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য কীভাবে পূরণ হয়, সেটাই বিশেষভাবে তুলে ধরে। স্বাভাবিকভাবেই ডয়েশ্চ সিদ্ধান্ত প্রণয়নমূলক কাঠামোর উপর আরোপিত বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামোর ভূমিকার কথা তুলে ধরেছেন, যা সংশ্লিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের দিকে সিদ্ধান্ত প্রণয়নমূলক কাঠামোগুলিকে যেতে বাধ্য করে। অন্যভাষায় বলা যায়, এই নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামোগুলিই শেষপর্যন্ত সমগ্র ব্যবস্থাটিকে মূল লক্ষ্যাভিমুখী রাখে। তথ্য ও অভিজ্ঞতা প্রেরক যন্ত্রাংশ (feedback mechanism) হল এধরনের একটি নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা।

তথ্য ও অভিজ্ঞতা প্রেরককে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে ডয়েশ্চ নরবার্ট ওয়াইনার প্রদত্ত ব্যাখ্যাটিকে ব্যবহার করে বলেছেন, এ হল প্রকৃত কৃতকর্মের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র। অর্থাৎ ব্যবস্থার যে কার্য করা উচিত তার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই, ব্যবস্থাটি প্রকৃতপক্ষে যে সকল কর্ম সম্পাদন করে তার নিরিখেই এই বিশেষ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাটি কার্যকর হয়। নঞর্থক তথ্য প্রেরক ব্যবস্থা (negative feedback) রাজনৈতিক ব্যবস্থা কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের রূপায়ণ সংক্রান্ত ফলাফল ব্যবস্থায় ফিরিয়ে আনে এবং প্রান্তিক ভুল-ভ্রান্তিগুলিকে চিহ্নিত করে ব্যবস্থাকে সেই ভুল সংশোধনের মাধ্যমে আরও বেশী পরিমাণে লক্ষ্য পূরণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করে। অর্থাৎ নঞর্থক তথ্য প্রেরক, সমগ্র ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে, অর্থাৎ হাল ধারণ

কার্য (steering process) সম্পাদন করে। বিষয়টিকে ডয়েশ্চ এভাবে দেখেছেন কারণ তিনি রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে একটি বৈদ্যুতিক বা যান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুরূপ করে তুলতে চেয়েছেন এবং রেফ্রিজারেটরে থার্মোস্টাট যন্ত্র যেভাবে কম্প্রেসরকে নিয়ন্ত্রিত করে রেফ্রিজারেটরের অভ্যন্তরে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখে, একই রকমভাবে নঞর্থক তথ্য ও অভিজ্ঞতা প্রেরক, রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করবে বলে ধরে নিয়েছিলেন। তথ্য ও অভিজ্ঞতা প্রেরকের ব্যবহার, ডয়েশ্চের কাছে আরও জরুরী হয়ে পড়েছিল, ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ অসাম্যকে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রাখার জন্য, যা ব্যবস্থার একটি চালিকা শক্তি হিসাবে বিবেচিত হয়। ব্যবস্থায় আভ্যন্তরীণ অসাম্য থাকলে ব্যবস্থাটি ক্রমশ ভারসাম্য হারাতে থাকে এবং সে তখন এমন একটি নূতন অবস্থায় যেতে চায়, যেখানে সে কিছুটা ভারসাম্য পুনরায় ফিরে পেতে পারে। ডয়েশ্চের যোগাযোগ তত্ত্বের এই গুরুত্বপূর্ণ স্বীকার্যটির যথার্থ বাস্তবায়ণ হতে পারে না, যদি না নঞর্থক তথ্য প্রেরকের ধারণাটি ঠিকমত কাজ না করে। নঞর্থক তথ্য প্রেরক ব্যবস্থা কতকগুলি বিষয়ে সঠিক তথ্য সরবরাহ করে সাহায্য করে যেমন — (১) লক্ষ্যের অবস্থান (২) লক্ষ্য পূরণের জন্য যে দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে, সে সংক্রান্ত তথ্য এবং (৩) ঐ দূরত্ব নির্দিষ্ট সময়ে অতিক্রম করতে হলে ব্যবস্থাকে কতটা গতিবেগ সম্পন্ন হতে হবে সে সংক্রান্ত নির্দেশ।[৩]

ডয়েশ্চ যোগাযোগ তত্ত্বের ধারণা কাঠামোকে আরও ভারাক্রান্ত করেছেন আলোচনায় আরও চারটি পরিমাণগত ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে। এগুলি হল ভার (load), পশ্চাদপদতা (lag), প্রাপ্তি (gain) এবং অগ্রগামিতা (lead)। ভার (load) বলতে তিনি বুঝিয়েছেন, তথ্য প্রেরক ব্যবস্থা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে এবং লব্ধ মাধ্যমের ক্ষমতানুযায়ী সংগৃহীত তথ্যের পরিমাণের আপেক্ষিকতায় একটি ব্যবস্থা কতখানি ব্যাপকভাবে সাড়া দিতে পারে, তাকেই। ব্যবস্থার কোন তথ্য সংগ্রহ ও তার ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা কার্যকর করা এদুয়ের মধ্যে যে সময়ের ব্যবধান ঘটে তাকেই বলে পশ্চাদপদতা (lag)। রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রাপ্ত সংবাদের প্রতি কতখানি ব্যাপকভাবে সাড়া দিচ্ছে সেটাই ব্যবস্থার প্রাপ্তি (gain) এবং ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত ও কার্যাবলীর ফলাফল সম্পর্কিত পূর্বানুমানের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা কতখানি দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে পারছে সেটাই ব্যবস্থার অগ্রগামিতা (lead)। অগ্রগামিতা থাকলে তবেই একটি উড়ন্ত পাখিকে বন্দুকের সাহায্যে গুলি করে নামানো যেতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই চারটি ধারণার প্রতিটিই নঞর্থক তথ্য প্রেরকের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট।

ডয়েশ্চের মতে, নঞর্থক তথ্য প্রেরক সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারী কাঠামোর কাছে যে তথ্যগুলি প্রেরণ করে সেগুলি বর্তমানে গৃহীত সিদ্ধান্ত বিরোধী হতে পারে, যদি সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারী কাঠামো ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য থেকে দূরে সরে গিয়ে নূতন লক্ষ্য স্থির করে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, নঞর্থক তথ্য প্রেরক ব্যবস্থাকে কিছু বাধা বা বিকৃতির মোকাবিলা করে কর্ম সম্পাদন করতে হয়। এধরনের একটি সমস্যা হল সদর্থক তথ্য প্রেরক (positive or amplifying feedback) এর উপস্থিতি যা নঞর্থক তথ্য প্রেরককে অবদমিত করে এসে থাকে। "সদর্থক তথ্য প্রেরক, ব্যবস্থায় গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিবেশে প্রতিক্রিয়া, গৃহীত সিদ্ধান্তভিমুখী করতে সহায়তা করে এবং সেই প্রতিক্রিয়া মূল ব্যবস্থাকে অবহিত করে ব্যবস্থাকে নূতন লক্ষ্যাভিমুখী রাখে"। সদর্থক তথ্য প্রেরকের উদ্ভব হয় তখনই যখন কোন তথ্য ব্যবস্থায় প্রবিষ্ট হবার পর নূতন ক্রিয়াকে প্রতিস্থাপিত করে মূল ক্রিয়াকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায় বা প্রসারিত করে। এই তথ্য প্রেরক, নঞর্থক তথ্য প্রেরকের মত কোন মতেই একটি নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা বলা যায় না বরং এর ফলে একটি উর্দ্ধমুখী ঘূর্ণায়মান প্রতিক্রিয়া (upward spiral of responses) সৃষ্টি হয়।

এই দুই ধরনের তথ্য ও অভিজ্ঞতা প্রেরক ব্যতীত ডয়েশ্চ আরও এক ধরনের তথ্য ও অভিজ্ঞতা প্রেরক ব্যবস্থার কথা বলেছেন, যেটি হল লক্ষ্য পরিবর্তনকারী তথ্য প্রেরক ব্যবস্থা (goal changing feedback mechanism)। তাঁর নিজের কথায়, এটা খুব স্বাভাবিক যে ব্যবস্থার কোন একটি অংশের মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনের ফলে।" লক্ষ্য পরিবর্তনকারী তথ্য প্রেরক ব্যবস্থা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সমাজের বা পরিবেশের নূতন

লক্ষ্যের প্রতি অনুগামী করতে সহায়তা করে। সাধারণভাবে যখন দেখা যায় রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল লক্ষ্যগুলি অর্জিত হয়েছে অথবা সে লক্ষ্যগুলি অর্জন করা সম্ভব নয় একথা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে, সেক্ষেত্রেই উদ্ভব হয় লক্ষ্য পরিবর্তনকারী তথ্য প্রেরক ব্যবস্থার। এই তথ্য ও অভিজ্ঞতা প্রেরক ব্যবস্থা আবার রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের কারণও হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ ডয়েশ্চ বলেছেন, একটি পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাজতন্ত্রের দিকে যেতে পারে যদি জনগণের সমাজতন্ত্রের প্রতি তীব্র আকাঙ্খা থাকে এবং তা লক্ষ্য পরিবর্তনকারী তথ্য প্রেরক ব্যবস্থার মাধ্যমে মূল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় চলে গিয়ে উপযুক্ত পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

উপসংহার (Concluding Remarks) ঃ

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় রাজনীতি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ডয়েশ্চের যোগাযোগ তত্ত্ব একটি সুসংহত বিশ্লেষণ পদ্ধতি। রাজনৈতিক ব্যবস্থার ধাঁচ (pattern) অনুধাবন করার ক্ষেত্রে তত্ত্বটি একটি পথনির্দেশিকা হিসাবে কাজ করে। সুস্থিতিকে (stability) এই তত্ত্বের মূল উপজীব্যে পরিণত না করা, পরিবর্তনশীলতাকে ব্যবস্থার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা হিসাবে দেখানো, ব্যবস্থার বিভিন্ন কাঠামোর মধ্যে সমন্বয়সাধন প্রক্রিয়ার যথাযথ গুরুত্বারোপ এবং তথ্য ও অভিজ্ঞতা প্রেরক কীভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে সে সংক্রান্ত আলোচনা, ডয়েশ্চের তত্ত্বের নিঃসন্দেহে ইতিবাচক দিক। তত্ত্বটি এছাড়াও বিস্তৃতভাবে বিভিন্ন প্রবাহ ও প্রক্রিয়াকে তুলে ধরেছে এবং বিভিন্ন ধরনের ছোটখাট এবং বিবর্তনবাদী পরিবর্তনের (evolutionary change) সাথে সহজেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। তবে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন (revolutionary change) এবং হিংসাত্মক সংঘর্ষের মোকাবিলা ডয়েশ্চের এই প্রতিরূপ বিশেষ করতে পারে না।

ওরান ইয়াং (Oran Young) মন্তব্য করেছেন, যোগাযোগ তত্ত্ব প্রকল্প বা অনুমান (hypothesis) গুলিকে খুব যথাযথভাবে কার্যকরী করতে পেরেছে এবং পরিমাণগত পর্যালোচনার (quantitative analysis) ক্ষেত্রে তত্ত্বটির গুরুত্ব অপরিসীম।

কিন্তু তা সত্ত্বেও তত্ত্বটির কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা আছে, স্বীকার করতেই হয়। প্রথমতঃ এই তত্ত্বে রয়েছে এক যান্ত্রিক চরিত্র যা নির্মাণ কার্যের মত মানবিক আচরণকেও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু মানুষ যেহেতু যন্ত্র নয়, আর সমাজও যেহেতু কোন যান্ত্রিক ব্যবস্থা নয়, তাই বৈদ্যুতিক নির্মাণ কার্যের মত কারিগরী বিদ্যার পদ্ধতিতে সমাজস্থ মানুষের আচরণ ও তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়তঃ ডয়েশ্চ যে প্রতিরূপ আমাদের উপহার দিয়েছেন তা খুবই জটিল এবং বিভ্রান্তিকর। আমরা সাধারণতঃ প্রতিরূপের সাহায্য গ্রহণ করে থাকি জটিল বিষয়কে সহজভাবে বুঝবার জন্য। কিন্তু ডয়েশ্চর ক্ষেত্রে বিষয়টি বিপরীত ফলদায়ী হয়েছে।

তৃতীয়তঃ ডয়েশ্চ তাঁর তত্ত্বে তথ্যের প্রবাহ ও প্রক্রিয়ার উপর অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন এবং পরিমাণগত দিকের প্রতি আলোকপাত করেছেন কিন্তু তথ্যের উৎকর্ষতা বিচার করার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেননি। এছাড়াও তত্ত্বে রয়েছে মাত্রাতিরিক্ত আনুষ্ঠানিকতা যা তত্ত্বকে শেষ পর্যন্ত বিভ্রান্তিকর অবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

Further Readings **:**

1. Davis, M.A. and Lewis, V.A. *Models of Political Systems*, Macmillan, London, 1971.
2. Deutsch, K., *Nerves of the Government*, The Free Press of Grencol, 1963.

3. Verma, S.P., *Modern Political Theory*, Vikas, Delhi, 1975.

4. Young, O.R., *Systems of Political Science*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1968.

***Model Questions* :**

1. Critically discuss the basic framework of Karl Deutsch's communications approach of politics.

***Short Questions* :**

1. How does Deutsch define the concept of 'lag' in his communication model ?
2. How has Deutsch defined the concept of positive feedback in his communication model ?
3. What is the function of receptor ?
4. What according to Deutsch, is —
   (a) Negative Feedback,
   (b) Goal changing Feedback,
   (c) Load,
   (d) Lead,
   (e) Gain,
   (f) First category of concepts, and
   (g) Second category of concept.
5. What are the major points of criticism raised against communications approach to politics ?

———

পঞ্চম পাঠ

গোষ্ঠিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী

ভূমিকা

রাজনৈতিক বিশ্লেষণের সনাতন প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিবাদ হিসেবে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্ভব ঘটে। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর বৌদ্ধিক উৎস হোল বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ফিগিস, মেট্‌ল্যান্ড, কোল, ল্যাস্কি প্রমুখ কর্তৃক প্রচারিত বহুত্ববাদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, বিশেষতঃ পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ডেভিড ট্রুম্যান, ভি ও কী, বারট্রাম লাথাম প্রমুখ বিশ্লেষণমূলক বহুত্ববাদী 'আধুনিক গোষ্ঠীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী'র ব্যাপক প্রসার ঘটান। তাঁরা ১৯০৮ সালে প্রকাশিত আর্থার বেন্টলের 'দ্যা প্রোসেস অব্ গভর্ণমেন্ট ঃ এ স্টাডি অব্ দ্য সোশ্যাল প্রেসারস্' নামক গ্রন্থখানির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

গোষ্ঠীর সংজ্ঞা

গোষ্ঠীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর কেন্দ্রবিন্দু হোল 'গোষ্ঠী'। কিন্তু গোষ্ঠীর সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবক্তাদের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায় সাধারণভাবে 'গোষ্ঠী' বলতে কিছুসংখ্যক ব্যক্তির সমষ্টিকে বোঝালেও গোষ্ঠীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবক্তাগণ বিশেষ অর্থে শব্দটিকে প্রয়োগ করেছেন। বেন্টলের মতে, গোষ্ঠী হোল কোন সমাজের সেইসব মানুষের একটি অংশ, যাকে কিছুসংখ্যক মানুষের সমষ্টি হিসেবে না দেখে 'স্বার্থ' এর দ্বারা পরিচালিত 'সমষ্টিগত কার্যকলাপ' হিসেবে গণ্য করা হয়। ট্রুম্যান 'গোষ্ঠী বলতে এমন বহুসংখ্যক ব্যক্তির সমষ্টিকে বোঝাতে চেয়েছেন, যা ' এক বা একাধিক অংশীদারী মনোভাব'-এর দ্বারা পরিচালিত হয়ে সেই মনোভাবের মধ্যে নিহিত 'আচরণের প্রতিষ্ঠা, সংরক্ষণ ও পরিবর্ধনের জন্য' অন্যান্য গোষ্ঠীর নিকট কতকগুলি দাবি পেশ করে। এরূপ অংশীদারী মনোভাব স্বার্থের জন্ম দেয়। বেন্টলে ও ট্রুম্যানের সংজ্ঞা দু'টির মধ্যে পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তবে এস পি ভার্মা সংজ্ঞা দু'টির সমন্বয় সাধন ক'রে গোষ্ঠী-তত্ত্বের প্রবক্তাগণ 'গোষ্ঠী' বলতে কী বোঝান, তা চমৎকারভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, গোষ্ঠী হোল স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত সমষ্টিগত কার্যকলাপ এবং বহুসংখ্যক গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত সামাজিক ব্যবস্থা গোষ্ঠীসমূহের কার্যকলাপগত ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্র বলে বিবেচিত হয়।

প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়

আচরণের উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমাদের সাধারণতঃ বেন্টলের গোষ্ঠীতত্ত্বের শরণাপন্ন হতে হয়। কারণ, তিনি প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক সনাতন বা সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তে গোষ্ঠীসমূহের কার্যকলাপের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর মতে, সুনির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থাৎ 'কাঠামো' বা মূল্যবোধ-কে নিয়ে সমাজ গঠিত হয় না ; সমাজ গঠিত হয় 'গতিশীল প্রক্রিয়া' অর্থাৎ 'ক্রিয়া'-কে নিয়ে। কেবলমাত্র 'ক্রিয়া'র সঙ্গে যুক্ত হলেই আদর্শ, চিন্তা-ভাবনা, অনুভূতি, আইন, সাংবিধানিক সভার সিদ্ধান্ত, বক্তৃতা প্রভৃতি অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে। সমাজ, জাতি, সরকার প্রভৃতি সবকিছুই বিভিন্ন গোষ্ঠীকে নিয়ে গড়ে ওঠে। এইসব গোষ্ঠী একে অপরের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কাজে লিপ্ত থাকে। এই ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা কার্যকলাপের উদ্দেশ্য হোল নিজ নিজ 'স্বার্থ'-কে রক্ষা করা। বেন্টলে স্বার্থ-কে একটি বা কতকগুলি গোষ্ঠীর এক বা একাধিক দাবি-সংক্রান্ত 'অংশীদারী মনোভাব' বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, 'স্বার্থ'-ই হোল রাজনীতির কেন্দ্রীয় বিষয়। প্রতিটি গোষ্ঠী অন্যান্য গোষ্ঠীর 'প্রকৃত' ও 'প্রত্যাশিত' ক্রিয়ার ভিত্তিতে নিজ নিজ নীতি ও কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করে এবং নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য একে অপরকে চাপ দেয়। সুতরাং বলা যায়, গোষ্ঠীগত দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্তি কিংবা সমাজের পরিবর্তে 'গোষ্ঠী'-কে রাজনীতি বিশ্লেষণের 'মৌলিক একক' হিসেবে ধরে নিয়ে আলোচনা করে। গোষ্ঠীর আচরণকে বাদ দিয়ে সমাজ বা রাজনীতিকে

কখনই বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয় বলে গোষ্ঠী-তত্ত্বের প্রবক্তাগণ মনে করেন। বেন্টলে সমাজকে গোষ্ঠীসমূহের যৌগিক ফল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ১৯৫১ সালে প্রকাশিত 'দ্য গভর্নমেন্টাল প্রোসেস ঃ পলিটিক্যাল ইন্টারেস্টস অ্যান্ড পাবলিক ওপিনিয়ন' নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে ট্রম্যান গোষ্ঠীসমূহের কার্যকলাপ সম্পর্কে সুসম্বদ্ধ ভাবে আলোচনা করেন। তাঁর পর্যালোচনা সাধারণভাবে 'রাজনীতির গোষ্ঠী-তত্ত্ব' নামে পরিচিত। তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে সমাজব্যবস্থা হোল 'গোষ্ঠীসমূহের এক ধরনের রঙিন আস্তরণ', যার মাধ্যমে তারা তাদের স্বার্থ রক্ষা করে। 'গ্রুপ বেসিস্ অব্ পলিটিক্স' নামক গ্রন্থে লাথাম সমাজকে 'এমন একটি একক গোষ্ঠী-জগৎ, বলে বর্ণনা করেছেন, যেখানে গোষ্ঠীগুলি একত্রিত হয়, ভেঙে যায় এবং বিরামহীনভাবে ক্ষমতার জোট গঠন ও একত্রে অবস্থান করে। তিনি রাজনীতিকে ব্যাপক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, রাজনীতি হোল সমাজের এমন 'প্রক্রিয়া', যা ক্ষমতার কাঠামোর মাধ্যমে 'মূল্যের বন্টন' করতে সমর্থ। গোষ্ঠীগত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবক্তাগণ 'রাজনৈতিক আচরণ' বলতে পরস্পর বিরোধরত গোষ্ঠীগুলির সেইসব আচরণকে বোঝাতে চেয়েছেন, যা ক্ষমতা-প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের দাবির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। সুতরাং বলা যায়, গোষ্ঠীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী গোষ্ঠীর কার্যকলাপকে বাদ দিয়ে সমাজব্যবস্থা, রাজনীতি প্রভৃতি কোন কিছুকেই বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে আর্থার বেন্টলের উক্তিটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, গোষ্ঠীকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা হলে সব কিছুকেই বিশ্লেষণ করা হয়ে যায়।

কিন্তু প্রশ্ন হোল — সমাজের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিরামহীন বিরোধে সরকারের ভূমিকা কী এবং কীভাবেই বা সমাজের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে ? গোষ্ঠী-তত্ত্বের প্রবক্তাদের মতে, গোষ্ঠীসমূহের পারস্পরিক বিরোধে সরকার মধ্যস্থ-এর ভূমিকা পালন করে। আইন কানুন ও বিধি-নিষেধের সাহায্যে সরকার গোষ্ঠীগুলির কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে শৃঙ্খলা বজায় রাখে। লাথামের মতে গোষ্ঠী-বিরোধের ক্ষেত্রে আইনসভা 'রেফারী' হিসেবে কাজ করে এবং বিজয়ী গোষ্ঠীসমূহের দাবিকে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বাস্তব রূপ দেয়। সমাজের ভারসাম্য রক্ষা তথা অগ্রগতি রক্ষার ব্যাপারে গোষ্ঠী-তত্ত্বের প্রবক্তাগণ যুক্তিবাদী কোন ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারেননি। এ বিষয়ে তাঁরা একটি 'অচেতন ভারসাম্য-প্রক্রিয়া'-র কথা বলেন। তাঁরা প্রধানতঃ তিনটি দিক থেকে বিষয়টি আলোচনা করেন ঃ

(১) যেহেতু বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন প্রকার স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে এবং তাদের মধ্যে স্বার্থগত দ্বন্দ্ব প্রতিনিয়তই চলতে থাকে, সেহেতু তারা সব সময়ই একে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। তাছাড়া, গোষ্ঠী-বিরোধের মীমাংসাকারী হিসেবে সরকারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(২) একই ব্যক্তি একই সঙ্গে বহু গোষ্ঠীর সদস্য হওয়ার ফলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে স্বার্থগত দ্বন্দ্ব ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে না বলে ট্রুম্যান মনে করেন। কারণ, একই ব্যক্তি বহুগোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে থাকার ফলে কোন গোষ্ঠীই অত্যাধিক শক্তিশালী হয়ে অন্যান্য গোষ্ঠীর সদস্যদের ক্ষতিসাধন করুক, তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি চাইবে না। এর ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব রক্ষিত হয়।

(৩) রাজনৈতিক ব্যবস্থা তথা সমাজের ভারসাম্য রক্ষা ও অগ্রগতি অব্যাহত রাখার পেছনে গোষ্ঠীসমূহের আচরণ-সংক্রান্ত নির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সব অংশগ্রহণকারীকে যেমন কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয়, তেমনি স্বার্থকে কেন্দ্র ক'রে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বা প্রতিযোগিতার সময় গোষ্ঠীগুলি পারস্পরিক আচরণ-সংক্রান্ত কতকগুলি নিদিষ্ট নিয়ম মেনে চলে। গোষ্ঠীসমূহের এরূপ মানসিকতাকে বেন্টলে 'অভ্যাস-সংক্রান্ত পটভূমি' বলে বর্ণনা করেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবক্তাগণ তথ্য ও পরিমাপের সাহায্যে রাজনৈতিক কার্যকলাপকে বিশ্লেষণ করার পক্ষপাতী। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বেন্টলে বলেছেন যে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে রাজনীতিকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হলে গোষ্ঠীসমূহের 'পরিমাপযোগ্য পরিমাণ' কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করা প্রয়োজন। অন্যভাবে বলা যায়, বেন্টলে-সহ গোষ্ঠী-তত্ত্বের প্রবক্তাগণ সংখ্যায়নভিত্তিক গোষ্ঠীকেন্দ্রিক পর্যালোচনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

সমালোচনা

নানা দিক থেকে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করা যেতে পারে।

(১) **বিভিন্ন শব্দের সুস্পষ্ট সংজ্ঞার অভাব ঃ** তাঁদের তত্ত্বের মধ্যে 'গোষ্ঠী', 'প্রবেশ', 'স্বার্থ', 'ভারসাম্য' প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বার বার প্রযুক্ত হলেও গোষ্ঠীগত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবক্তাগণ সেইসব শব্দের কোন সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশ করেননি। তাছাড়া, ঐসব শব্দের অর্থ নিয়েও তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ হিসেবে 'গোষ্ঠী'র সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে বেন্টলের সঙ্গে ট্রুম্যানের পার্থক্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

(২) **বক্তব্যের অস্পষ্টতা ঃ** অনেক সময় আবার তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ 'গোষ্ঠী' এবং 'স্বার্থ-কে অভিন্ন বলে মনে করতেন। এ প্রসঙ্গে বেন্টলের কথা বলা যায়। তিনি বলেছিলেন যে একটি স্বার্থ হোল একটি গোষ্ঠীর সমতুল্য। কিন্তু 'গোষ্ঠী' এবং 'স্বার্থ'কে কখনই অভিন্ন বলে নেওয়া যায় না। তাছাড়া, গোষ্ঠী-তত্ত্বের প্রবক্তাগণ গোষ্ঠীকে স্বার্থের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু একটি বিশেষ স্বার্থ কতকগুলি গোষ্ঠীর জন্ম দেয় অথবা গোষ্ঠী নিজেই কতকগুলি স্বার্থের জন্মদাতা হিসেবে ভূমিকা পালন করে — সে বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য অস্পষ্টতা দোষে দুষ্ট।

(৩) **সব ব্যক্তি গোষ্ঠীভুক্ত নয় ঃ** বেন্টলে প্রমুখ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, প্রতিটি ব্যক্তি কোন-না-কোন গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত থাকে। কারণ, গোষ্ঠী-বহির্ভূত ব্যক্তির রাজনৈতিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ বা প্রাসঙ্গিক কোন স্বার্থ থাকতে পারে না। কিন্তু এই ধারণাও সর্বাংশে সত্য নয়। প্রতিটি সমাজে এমন কিছু ব্যক্তি থাকে, যারা কোন গোষ্ঠীর সঙ্গে নিজেদের যোগ করে না।

(৪) **সরকারি প্রক্রিয়া সম্পর্কে ভুল ধারণা ঃ** গোষ্ঠী-তত্ত্বের প্রবক্তাদের মতে, গোষ্ঠীগুলির চাপের ফলেই সরকারি সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়। কিন্তু এই অভিমত পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, এই যুক্তিকে মেনে নেওয়ার অর্থ হোল জনকল্যাণ সাধনে সরকারের ইচ্ছা, জনসাধারণের অনুভূতি, চিন্তা-ভাবনা, জাতীয় চরিত্র প্রভৃতিকে উপেক্ষা করা। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে এস পি ভার্মা বলেছেন, গোষ্ঠী-তত্ত্বের প্রবক্তাগণ সরকারি প্রক্রিয়া থেকে যুক্তি, জ্ঞান ও বুদ্ধিকে বিসর্জন দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কেবলমাত্র শক্তি, উত্তেজনা ও চাপের দ্বারাই এরূপ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয় বলে তাঁরা মনে করেন।

(৫) **পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যায় ব্যর্থতা ঃ** সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কীভাবে পরিবর্তন সাধিত হয়, গোষ্ঠীতত্ত্ব তা ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে সমালোচকগণ মনে করেন। তাঁদের মতে, এই তত্ত্ব পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে অপারগ হওয়ায় এর অভিজ্ঞতাবাদী প্রকৃতি নিয়ে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। সমাজ-পরিবর্তনের কারণ নির্দেশ করতে এই তত্ত্ব কেন ব্যর্থ হয়েছে, সে প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে এস পি ভার্মা বলেছেন যে-তত্ত্ব সুনির্দিষ্টভাবে তার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে অক্ষম, সেই তত্ত্ব কখনই সমাজ-পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারে না। এই তত্ত্ব প্রচলিত সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব বজায় রেখে যেটুকু পরিবর্তনের কথা বলে, তাকে কখনই মৌলিক পরিবর্তন বলে চিহ্নিত করা সমীচীন নয়।

(৬) **সব রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া গোষ্ঠীগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নয় ঃ** সমালোচকদের মতে, এই তত্ত্বের প্রবক্তাগণ সব ধরনের রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে গোষ্ঠীগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বলে বর্ণনা ক'রে সত্যের অপলাপ করেছেন। কারণ, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমন সব ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, যেগুলির সঙ্গে গোষ্ঠীর কোনরূপ সম্পর্কই থাকে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি নিকসন তাঁর স্বরাষ্ট্র সচিব হেনরী কিসিংগারের পরামর্শে যেসব রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহন করতেন, সেইসব সিদ্ধান্তকে গোষ্ঠীসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল হিসেবে মেনে নেওয়া যায় না।

(৭) **সমাজের ভারসাম্য-সংক্রান্ত ধারণা ভুল ঃ** গোষ্ঠী-তত্ত্বে সমাজের 'ভারসাম্য' রক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব

আরোপ করা হয়। কিন্তু অবিরত গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চলতে থাকলে 'সদস্যপদের অধিক্রমণ' অর্থাৎ একই ব্যক্তি কর্তৃক একাধিক গোষ্ঠীর সদস্যপদ গ্রহণের মাধ্যমে কীভাবে রক্ষিত হবে, তা উপলব্ধি করা দুষ্কর। গোষ্ঠী-তত্ত্বের প্রবক্তাগণও এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে কোন কিছু আলোচনা করেননি। বস্তুতঃ, বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে স্বার্থ-দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করলে সরকারের হস্তক্ষেপ ছাড়া সেই দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি কিংবা সমাজের 'ভারসাম্য' রক্ষা অসম্ভব।

(৮)**অনুন্নত সমাজের বিশ্লেষণ অসম্ভব ঃ** ইয়ং-কে অনুসরণ ক'রে বলা যেতে পারে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো অতি উন্নত ও অর্থনৈতিক দিক থেকে আধুনিকীকৃত পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় গোষ্ঠী-তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতাকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যে-সমাজ সেরূপ উন্নত ও আধুনিকীকৃত নয় কিংবা যে-সমাজে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো স্বার্থগোষ্ঠীসমূহের অবস্থিতি বা প্রাধান্য নেই, সেইসব সমাজকে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে যথাযথভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। বস্তুতঃ, এরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবক্তাগণ মূলতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে ভিত্তি ক'রে যে-তত্ত্ব গড়ে তুলেছেন, তাকে কখনই সর্বজনীনভাবে প্রয়োগ করা যায় না।

(৯)**'তত্ত্ব' পদবাচ্য নয় ঃ** এস পি ভার্মার মতো কোন কোন সমালোচক গোষ্ঠী-তত্ত্বকে একটি 'তত্ত্বে'র মর্যাদা দিতে রাজী নন। কারণ, একটি তত্ত্ব ধারণা-গঠন ও শ্রেণীবিভক্তকরণ-এর ওপর বিস্তারিতভাবে আলোকপাত কর। তাছাড়া, তা মনুষ্য-আচরণকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করার জন্য নতুন পথের সন্ধান দেয়। কিন্তু তথাকথিত 'গোষ্ঠি-তত্ত্ব' তা করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই একে বড়জোর একটি দৃষ্টিভঙ্গী বলা গেলেও 'তত্ত্ব' বলে কখনই অভিহিত করা যায় না বলে সমালোচকগণ মনে করেন।

বস্তুতঃ, অন্যান্য আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর মতো গোষ্ঠীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীও বুর্জোয়া সমাজের 'ভারসাম্য' বা 'স্থিতাবস্থা' বজায় রাখার ওপরেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক ও অতি মাত্রায় আনুষ্ঠানিক সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তে একটি অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তন ঘটিয়ে এই তত্ত্বের প্রবক্তাগণ যে-ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন, তা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না।

References :

1. Arthur Bentely, *The Process of Government*
2. V O Key, *Politics, Parties and Pressure Groups*
3. David Truman, *The Governmental Process : Political Interests and Public Opinion*
4. S P Verma, *Modern Political Theroy*
5. Bertram Latham, *Group Basis of Politics*
6. James C Charlesworth (ed.), *The Limits of Behaviouralism in Political Science*
7. Alan R Ball, *Modern Politics and Governments*
8. Norman Barry, *An Introduction to Modern Political Theory*
9. Robert Dahl, *Modern Political Analysis*
10. C C Rodee, T J Anderson and C Q Christol, *Introduction to Political Science*

Second Half

Politics of South Asia

প্রথম পাঠ

ভারত এবং পাকিস্তানে রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ রাজের উত্তরাধিকারের (Legacy) প্রভাব ঃ

ভারতে প্রায় দুশ বছরের ব্রিটিশ শাসন নানা দিক থেকেই বহু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করেছে। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে এই ব্রিটিশ শাসন এমনই একধরনের রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তুলেছে যা এই ভূ-খণ্ডের ভৌগোলিক ঐক্যের সাথে সমসীমা বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। আবার ঔপনিবেশিক শোষণের ব্যবস্থা ভারতে শ্রেণী গঠনের (clsss Formation) ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনসাধন করেছে। অথবা বলা যায় যে এই ব্রিটিশ রাজের শাসন গণতন্ত্র সম্পর্কে পশ্চিমী ধারণাসমূহের সাথে এবং গণতন্ত্র সঞ্জাত সব কিছুর সাথে আমাদের পরিচয়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করেছে। এর অর্থ হচ্ছে এই যে এই রাজ (Raj) বা ব্রিটিশ শাসন বহু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ উত্তরাধিকার রেখে গেছে, যা পরবর্তী কালে ভারত ও পাকিস্তান — এই দুই রাষ্ট্রের উন্নয়নের বা বিকাশের (development) গতিকে প্রভাবিত করে। এই দুই স্বাধীন রাষ্ট্রগঠন করা হচ্ছে ব্রিটিশ শাসনের শেষতম বা চূড়ান্ত উত্তরাধিকার, ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ। এই ভারত বিভাগের গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে বোঝাবার জন্য আয়েশা জালাল (Ayesha Jalal) মন্তব্য করেছেন, "১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের মত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এই বিংশ শতাব্দীতে খুব কমই হয়েছে, যা নাটকীয় কায়দায় ইতিহাসের গতি পরিবর্তন করেছে .... আনুষ্ঠানিকভাবে ঔপনিবেশিকতার সমাপ্তি এবং জাতীয় সীমানার পুনর্গঠন ছিল প্রবল দাঙ্গা হাঙ্গামায় পরিপূর্ণ ... অর্থনৈতিক ও সামাজিক যোগাযোগ সমূহ যা শতাব্দী ধরে সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে টিকিয়ে রেখেছিল, সঙ্কট ও পতন সমূহ যা এই উপমহাদেশের জনগণকে একটা শিথিল ধরনের পরস্পর নির্ভরশীলতার কাঠামোর মধ্যে গড়ে তুলেছিল, নিষ্ঠুরভাবে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।" এই ঘটনার একটা প্রভাব প্রশাসন যন্ত্রের বিভাগের উপরেও পড়েছিল, এই প্রশাসনিক যন্ত্র হচ্ছে ভারতীয় প্রশাসনিক পরিষেবা যার বলে ব্রিটিশ রাজ ভারতীয় সমাজের উপরে প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং যার বলে ব্রিটিশ রাজ রাজনৈতিক ঐক্য বজায় রেখেছিল। এর মধ্যে একটা হচ্ছে সর্বভারতীয় আমলাতন্ত্র, সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রশাসন যন্ত্র। এর মধ্যে ছিল ভারতীয় পৌর পরিষেবা (ICS), যা কর্মরত ছিল ভারতীয় আরক্ষা পরিষেবার (IPS) সাথে একযোগে। এই আমলাতন্ত্র নিযুক্ত ছিল আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনার কাজে। সেই সাথে এর কাজ ছিল ভারতে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনকে শক্তিশালী করা এবং ঔপনিবেশিক শোষণকে সাহায্য করা।

যে প্রশাসনিক কাঠামো ব্রিটিশ শাসন তার নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য গঠন করেছিল তার ভূমিকার গভীর প্রভাব ছিল ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের (state formation) বিষয় ও প্রক্রিয়ার উপরে। বাস্তবিক পক্ষে এটা ভবিষ্যৎ দর্শন করেছিলেন ১৯২২ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ (Loyed George)। তখন তিনি ভবিষ্যৎ বাণীর মত এই মত প্রকাশ করেছিলেন, "আমি দেখতে পাচ্ছি যে তারা (ভারতীয়রা) কখনই ব্রিটিশ পৌর পরিষেবার (British civil service) দ্বারা ভারতে ব্রিটিশ আধিকারিকদের নিয়ে তাদের পথ নির্দেশ ও সহযোগিতা চালাতে পারবে না। এরা সমগ্র কাঠামোর লৌহ আবেষ্টনী। তোমরা এর উপরে যাই গড়ে তোল না কেন, তাকে গ্রাহ্য করি না।" বাস্তবিক পক্ষে দেশ বিভাগের সময়ে ভূ-খণ্ড ও অর্থভাণ্ডারের মত অন্যান্য জিনিষের সাথে কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্র, ব্রিটিশ রাজ্যের অন্যতম গভীর উত্তরাধিকার, বিভক্ত হয়েছিল। তবুও এই আমলাতন্ত্র এর সার বিষয়কে ধরেই রেখেছিল। এর অর্থ হচ্ছে এই যে এই আমলাতন্ত্রের মূল প্রকৃতি যথারীতিই বজায় ছিল।

এখন এটা মনে হয় যে এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মতামতে কোন পার্থক্য নেই যে ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রশাসন-কাঠামো বিভক্ত হবার প্রভাব এই দুই দেশের রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিকাশের ক্ষেত্রে অবশ্যই পৃথক-পৃথক। পৃথক ভাবে, ভারতে গণতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করা এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া গঠন করা ও বজায় রাখাটা (অন্ততঃপক্ষে আনুষ্ঠানিক অর্থে) বর্তমান কাল পর্যন্ত (১৯৭৫-৭৮ পর্যন্ত জরুরী অবস্থার সময়ে কঠোর — একনায়কতন্ত্র হলেও সেটা ছিল সাংবিধানিক সংস্থানের ভিত্তিতে।) অন্যান্য বিষয়ের মত প্রশাসনিক কাঠামোতেও আরোপিত হয়েছে যে কাঠামো ভারত দেশ বিভাগের সময়ে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে এবং যাকে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ব্যবহার করেছ। অপর পক্ষে, একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের অস্তিত্বের প্রায় অর্ধেক সময় নির্বাচিত সরকার থাকলেও পাকিস্তানে যে স্বৈরতন্ত্রের প্রবণতা, বরং বলা যায় বাস্তবিকতাই রয়েছে, সেটা সম্পূর্ণ ভাবে না হলেও প্রধানতঃ আরোপিত হয়েছে সেখানকার আমলাতন্ত্রের উপরেও যে আমলাতন্ত্র ব্রিটিশদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া গেছে। অবশ্য এটা উল্লেখ করা দরকার যে নিম্নস্তর সমূহ থেকে কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা ছাড়াই ভারতই ইংরেজদের কাছ থেকে এককেন্দ্রিক কেন্দ্রীয় প্রশাসন কাঠামো লাভ করেছে, অপর পক্ষে, পাকিস্তানকে প্রদেশ, জেলা এবং সমাজের স্থানীয় স্তর সমূহের সাথে সংযোগ রক্ষার জন্য সম্পূর্ণভাবে নতুন কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করতে হয়েছে। ভারত উত্তরাধিকার সূত্রে কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ ICS আধিকারিকগণকেই লাভ করেনি, ব্রিটিশ ভারতে ইংরেজদের স্থলাভিসিক্ত হওয়া এবং ব্রিটিশ ভারতেরই আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের (international personality) ওয়ারিশান হওয়ার ঘটনা স্বাধীন ভারতে বিষয়সমূহকে বহুল পরিমাণেই সহজ করে তুলেছে। অপরপক্ষে, উপযুক্ত এবং পদস্থ আধিকারিকের ব্যাপক অভাব (অধিকাংশ মুসলিম ICS আধিকারিকগণ পাকিস্তানে যাবার জন্য তাদের পছন্দ প্রকাশ করা (opted) সত্বেও এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়া সার্বভৌমের মর্যাদা (Status) লাভ করার জন্য পাকিস্তানের সমস্যা সমূহ আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইতিপূর্বেই আভাস দেওয়া হয়েছে, যে ভারতীয় নেতৃত্ব গণতন্ত্র ও সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এর মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সাথে প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত রয়েছে আনুষ্ঠানিক ভাবেই আমলাতন্ত্র এবং নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রশাসকদের মধ্যে একটা স্বতন্ত্রীকরণ। ব্রিটিশ রাজের শাসন কালে ব্রিটিশদের হাতে নিয়ন্ত্রণ ও পীড়নের যন্ত্র স্বরূপ আমলাতন্ত্র ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের ঘনিষ্ঠ হতে পারতো না এবং ঘনিষ্ঠ ছিলও না। কিন্তু লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারাদের খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, দেশীয় রাজ্য সমূহকে সংহত করা এবং এমনকি, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে (Government of India Act, 1935) যে সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল, তাকে পরিচালনা করার মত তৎকালীন বাস্তব প্রয়োজন থাকায় আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ এবং কেন্দ্রীভবনের সাথে ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে কোনক্রমে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছিল। তবে তার অর্থ অবশ্যই এই নয় যে দেশ বিভাগের পরেও, তাদের শাসনের (rule) বৈধতার প্রয়োজনের সাথেও, যার অর্থ হচ্ছে আমলাতন্ত্র সমেত শাসন বিভাগের ঊর্দ্ধে আইন বিভাগকে প্রতিষ্ঠিত করা এইভাবে ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে কোন মতে খাপ খাইয়ে নিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তবুও এক্ষেত্রে কর্তৃত্বপূর্ণ আমলাতন্ত্র সমেত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো অপরিবর্তিত অবস্থায় যথারীতি রয়েই গেল। এই অবস্থা সময়ের তাগিদে আরো জোরদার হয়ে কেবলমাত্র পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দকেই নয়, ভারতীয় নেতৃবৃন্দকেও পরিচালিত করলো এই আমলাতন্ত্রের সাথে সুবিধাবাদী মৈত্রী স্থাপন করার দিকে। বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে বিবেচনাই কাজ করেছে, এই ব্যবস্থা গ্রহণের মূলে। কিন্তু এটা বলেই স্বাধীনতার পরে শাসনকারী সম্ভ্রান্ত শ্রেণীকে যে পর্বতপ্রমাণ সমস্যা সমূহের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, সেগুলিকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যেভাবেই হোক, ভারতে আমলাতন্ত্র সুযোগের ভাগ বাটোয়ারা এবং পৃষ্ঠপোষকতা ভিত্তিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যবস্থার হাতিয়ার হিসাবেই ব্যবহৃত হয়েছিল। স্বাধীন ভারতের আমলাতন্ত্র সম্পর্কে একজন পর্যবেক্ষক B B Misra এই মত প্রকাশ করেছেন, "আইনের শাসন (Rule of Law) বরাবরই হয় প্রশাসনের কার্যনির্বাহী তৎপরতার, নয়তো বা সমাজের আধিপত্যকারী গোষ্ঠীর ইচ্ছার-অধীনস্থ হবার দিকে ঝাঁকেছে।" এই প্রসঙ্গে আমরা পার্থ চ্যাটার্জীর

বক্তব্যও উল্লেখ করতে পারি। তাঁর মতে "... অন্যান্য আরো বহু ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক যুগের শাসন-ব্যবস্থার জের সরাসরি ভাবেই উত্তর ঔপনিবেশিক যুগে প্রবাহিত হয়ে এসেছে; এক্ষেত্রে যৌক্তিকতার ভিত্তি হচ্ছে সহায়কতা ও বাস্তবতা। এই ভাবে আমলাতন্ত্রের কাঠামো ও আধিকারিকদের একটা বিরাট অংশ, সেনাবাহিনী, আরক্ষাবাহিনী (Police) এবং বিচার বিভাগ অপরিবর্তিত অবস্থায় রাখা হয়েছিল, এইভাবেই অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইনের কাঠামোকেও। সরকারের এই সব ক্ষেত্রে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে এবং জনগণের কিছু মৌলিক প্রয়োজন মেটাবার ব্যাপারে উন্নয়নের নতুন ধারণায় ঔপনিবেশিক শাসনের ভিত্তিই বজায় রাখা হয়েছে ...। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক সংখ্যক সরকারী কাজ কর্মের বৈধতার ভিত্তি সম্পর্কে ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে এখানেই। যেটা গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে এই যে ... ঔপনিবেশিক যুগ থেকে ধারাবাহিকতাকে বর্ণনা দেওয়া যায় গুণগত পরিবর্তনের পরিবর্তে এবং পরিমাণগত সম্প্রসারণ হিসাবেই ... আর সরকারের কাজকর্মের মূল্যায়ন করা যায় গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ ও সামাজিক ন্যায়ের পরিবর্তে অর্থনৈতিক সহায়তা (instrument) এবং দক্ষতার ভিত্তিতে।"

এই সব বলে এবং এটা স্বীকার করে নিয়ে যে উল্লিখিত যুক্তিগুলি যথেষ্ট নয়, আরো বলতে হয় যে, 'উৎপাদন ও ন্যায়' (Growth and equity) নীতি অনুসরণ করায় ভারতের নেতৃবৃন্দের আমলাতন্ত্রকে এবং উন্নয়ন বা বিকাশের (development) কর্মসূচীকে রূপায়ণের ক্ষেত্রে এর ভূমিকাকে আরো সম্প্রসারিত করতে হবে। এছাড়া দেশ বিভাগের সময়ে কার্যতঃ শত শত দেশীয় রাজ্যকে সংহত করার কাজ সম্পাদন করতে হয়েছিল। এই সব দেশীয় রাজ্যের ভূ-খণ্ডের পরিমাণ ছিল সমগ্র ভারতের মোট ভূখণ্ডের ৪৫ শতাংশ। প্রথম দিকে এই রাজ্য গঠনের কাজ ছিল খুবই কঠিন। এক্ষেত্রে সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তবে এই ব্যাপারে আমলা V.P. Menon–এর ভূমিকাও খুব উল্লেখযোগ্য। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে সম্প্রসারিত আমলাতন্ত্র, বিশেষতঃ ভারতীয় প্রশাসনিক পরিষেবা (IAS) আধিকারিকগণের প্রয়োজন হয়েছিল এবং তারা দেশীয় রাজ্যগুলিকে সংহত করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিল।

যে ভাবেই হোক, ভারতীয় আমলাতন্ত্র আমলাতান্ত্রিক অনুশাসনের সময় পায়নি, যেমন পেয়েছে পাকিস্তানের আমলারা। এর কারণ হচ্ছে এই যে ভারত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানিকীকরণের পথে অবিচল ছিল, এর প্রকাশ দেখা যায় প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার, মৌলিক অধিকার (এর সাথে ছিল স্বাধীন বিচার বিভাগ), নিয়মিত ও নির্দিষ্ট সময়ান্তরে নির্বাচন সমূহ এবং এই রকম আরো সব কিছু। এই সব কিছু প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক কার্যনির্বাহীদের রেখেছিল সামনের দিকে। তা ছাড়া, রাজনৈতিক নেতারা নিজেরাই স্থানীয় পর্যায়ে ভোটাদাতাদের সাথে সংযোগ রক্ষা করতে চেয়েছেন। ব্রিটিশ রাজের শাসন কালে এই কাজটা সম্পর্কিত হতো সরকারী কার্যনির্বাহীদের (civil survents) দ্বারা বর্তমানে এই প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠানগত হয়েছে পঞ্চায়েতীরাজ সংস্থা সমূহের দ্বারা। তবে যদিও এই সংস্থা সমূহ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারিত করেছে, তবুও ভারতে গৃহীত আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্রের হাত অদৃশ্যভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। প্রকৃতিগতভাবেই ভারত যুক্তরাষ্ট্রীয় আঞ্চলিক পার্থক্য এবং বিস্ময়করভাবে সংস্কৃতিগত, ভাষাগত এবং ধর্মীয় বৈচিত্র্য থাকবার জন্য জাতীয় ঐক্যের সাথে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছে। স্বাভাবিক ভাবেই ক্ষমতা বন্টনের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক সভা বা গণপরিষদ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনকে (Government of India Act, 1935) নকল করেই থেমে গিয়েছে। ফলতঃ কেবলমাত্র যুক্ত রাষ্ট্রীয় তালিকাই নয়, তার সাথে যুগ্ম তালিকাতেও যেখানে কেন্দ্রের প্রাধান্য রয়েছে, আইনগত ক্ষমতার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ রয়েছে। এই ব্যবস্থাতে আবার অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কর (tax) সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে কেন্দ্রের হাতে। এই ঘটনা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার ভিত্তিই কেবলমাত্র শক্তিশালী করেনি, সর্বভারতীয় আমলাতন্ত্রের ক্ষমতার ভিত্তিও শক্তিশালী করেছে। এই ঘটনা স্থায়ী স্বাতন্ত্র্যকে বিঘ্নিত করেছে যা জাতীয়

সংহতির ক্ষেত্রে মোটেই শুভ হয়নি। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে দেশ বিভাগের উত্তর কালে বিদ্যমান নানা গোলমালে পরিপূর্ণ অবস্থায় অন্যান্য সংস্থার সাথে আমলাতন্ত্রের সাহায্যে সমগ্র দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখবার জন্য শক্তিশালী কেন্দ্র ছিল অপরিহার্য। বর্তমানে আমরা সকলেই স্বীকার করব যে সাধারণভাবে ভারতীয় আমলাতন্ত্র দুর্নীতিপরায়ণ, প্রতিবেদনহীন (unresponsive) এবং দায়বদ্ধতাহীন। সেই সাথে এই পরামর্শ দেওয়াও সঙ্গত নয় যে সমস্ত অভিযোগের বোঝা আমলাতন্ত্রের ঘাড়ে চাপান হোক। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং রাজনৈতিক দলসমূহ, বাস্তবিকপক্ষে, সব রাজনৈতিক দলই, অত্যধিক পরিমাণে আমলাতন্ত্রের উপরে নির্ভর করে, ক্ষমতায় থাকবার জন্য এবং নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য আমলাতন্ত্রকে পরিচালনা করে। খুব স্বাভাবিকভাবেই আমলাতন্ত্রও তার পাওনা আদায় করে নিতে ছাড়েনা। এর ফলশ্রুতি হচ্ছে রাজনীতিবিদ ও আমলাতন্ত্রের মধ্যে অশুভ আঁতাত। এই অবস্থায় একটি স্বাস্থ্যকর পৌরসমাজ গড়ে উঠতে বাধা দেয়, রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে দূষিত করে এবং অর্থনৈতিক বিকল্পকে প্রতিহত করে। সংক্ষেপে, এই অবস্থায় একটা স্বাস্থ্যকর রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারছে না যা ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বপ্ন। তবুও এই ব্যাপারে কেবলমাত্র ভারতকে এককভাবেই এই রূপে চিহ্নিত করা ঠিক হবে না। এই ব্যাপারে বহু তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রের অবস্থাই ভারত থেকে খারাপ।

ঠিক বিপরীতভাবে; সামরিক আমলাতন্ত্রসমেত পাকিস্তানের আমলাতন্ত্র প্রথম দিন থেকেই অনুশীলনের সময় পেয়েছে। এর ফলে প্রথম থেকেই আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদ ঐ দেশকে করায়ত্ব করেছে। অবশ্য এই অবস্থার উদ্ভব ঘটার পেছনে বহু কারণ রয়েছে। এটা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে পাকিস্তানকে তাৎক্ষণিকভাবে নতুন করে (de novo) কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করতে হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে পাকিস্তান নির্ভর করতে পেরেছে কেবলমাত্র মুসলিমলীগের নেতৃবৃন্দের উপরে এবং সেই সব ICS আধিকারিকদের উপরে যারা পাকিস্তানে যাবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন (opted)। ব্রিটিশ ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর অংশ পাকিস্তানও লাভ করেছিল। একটা সম্পূর্ণ নতুন রাষ্ট্রকে গঠন করার কাজের সম্মুখীন হয়ে জিন্নাহ্ দেখলেন যে পাকিস্তান নামে তিনি লাভ করেছেন একটা কীটদষ্ট (moth eaten) অস্তিত্ব, উপমহাদেশের মুসলিমদের ইসলামীয় নিজদেশ।

পাকিস্তানের পূর্ব অংশ পূর্বপাকিস্তান এর পশ্চিমাংশ থেকে অধিকতর জনবহুল অংশ; এই পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রায় এগারশ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। এই এগারশ মাইলের সম্পূর্ণটাই ভারতীয় ভূখণ্ডের অন্তর্গত। তাছাড়া পাকিস্তানের এই দুই অংশের মধ্যে অভিন্ন ছিল খুব কম বিষয়ই। সেই আনন্দ-চঞ্চল অবস্থায় তথাকথিত দ্বি-জাতি তত্ত্বে, যার ভিত্তিতে পাকিস্তানের উদ্ভব ঘটল, একমাত্র ইসলাম ধর্মই ছিল ঐক্যসাধনকারী শক্তি (cementing force)। তবুও এই দুইটি অংশকে একটি রাষ্ট্রে সংহত হতে হয়েছিল। সেই সাথে, পাকিস্তানের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণ পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীদেরকে প্রথম থেকেই কোন প্রকার ক্ষমতায় অংশগ্রহণ থেকে দূরে রাখা হয়েছিল। পূর্বপাকিস্তানের জনসংখ্যা যদিও পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৫% ছিল তবুও জনগণের সার্বভৌমিকতা, রাষ্ট্র গঠনের জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ছিল অর্থহীন। এই ঘটনাটি যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে ১৯৭০-১৯৭১ সালের ঘটনা এবং যা পাকিস্তানকে তীব্র আঘাত হেনেছিল, এর কারণ এই ঘটনায় পাকিস্তান হারিয়েছিল প্রায় অর্ধেক ভু-খণ্ড এবং অর্ধেকের বেশি লোক সংখ্যা, এইসব অনুধাবন করতে অসুবিধা হবে না। তবে পাকিস্তানের উদ্ভব এবং ১৯৭০ সালে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটার মধ্যবর্তীকালে আমলাতান্ত্রিক আধিপত্যেরই (মূলত পশ্চিম পাকিস্তানী, বরং বলা যায় পাঞ্জাবী আমলারাই সামরিক ও বেসামরিক এই উভয়ই) প্রাধান্য ছিল, বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানে।

সেই সাথে এটা মেনে নিতেই হবে যে প্রথম থেকেই আমলাতন্ত্র এবং সামরিক বাহিনী পাকিস্তানে অনুশীলনের সময় পেয়েছে, এর কারণ রাজনৈতিক ও নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত শূন্যতা যা পাকিস্তানকে নিদারুণ যন্ত্রণায় ফেলে ছিল (afflicted);

পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল মুসলিম লীগের পতাকাতলে পরিচালিত আন্দোলনের এক চরম অবস্থায়। বাস্তবিক পক্ষে মুসলিমলীগের প্রায় সব নেতৃবৃন্দই ছিলেন ব্রিটিশ শাসিত ভারতের মুসলিম সংখ্যালঘু বিশিষ্ট প্রদেশ সমূহের। তাই তারা পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন এবং পাকিস্তান শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাদের জনসমর্থনের কোন ভিত্তি ছিল না, বিশেষতঃ পশ্চিম পাকিস্তানে যা ছিল পাকিস্তানের ক্ষমতা-কাঠামোর মূল কেন্দ্রস্থল। পূর্ব পাকিস্তানকে, যেখানে লীগের কিছু সংগঠন ও সমর্থন ছিল, সুচিন্তিভাবেই পাকিস্তানের রাজনীতির ক্ষমতা সম্পর্কিত হিসাব নিকাশের বাইরে রাখা হল। সংবিধান সভা বা গণপরিষদের যে অংশটি পাকিস্তান উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিল, এবং যা দেশের আইনসভা হিসাবে কাজ করতে আরম্ভ করেছিল তাই কোন বিবেচনাতেই প্রতিনিধিত্ব মূলক ছিল না। এটা কেবলমাত্র বিদেশী ভূ-খণ্ডে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল মাত্র। ভারতের গণ-পরিষদ বা সাংবিধানিক সভা সম্পর্কে কিন্তু একথা বলা যায় না। যাইহোক, এর ফলশ্রুতি হিসাবে যে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা পূরণ করতে হয়েছিল এবং পূরণও হয়েছিল সেনাবাহিনী ও আমলাতন্ত্রের দ্বারা, আপাতভাবে পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হিসাবে দুইটি স্তম্ভ। এই অবস্থার সাথে যুক্ত হয়েছিল দুইটি উপাদান। ১৯৪৮ সালে জিন্নাহ্‌র মৃত্যু এবং কাশ্মীরে পাকিস্তানের সামরিক অভিযান। প্রথম উপাদানটির জন্য পাকিস্তানে উদ্ভব ঘটল জাতিগত অস্থিরতা এবং দ্বিতীয়টির জন্য সামরিক বাহিনীর সাথে বেসামরিক আমলাতন্ত্রের স্থায়ী ভাবে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার পথ প্রস্তুত হল। এইভাবে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতিই ছিল মূল কারণ যার ফলে পাকিস্তানে আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদ সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে ক্রমবর্ধমান ভাবে জোরদার হয়ে উঠেছে। ঘটনাক্রমে সামরিক বাহিনীর স্ব-শাসন (Autonomy) প্রথম দিকে গড়েপিটে তোলা হয়েছিল রাজনৈতিক শূন্যতা ও স্থায়ী ভারত বিরোধী মতবাদের (Anit-Indianism) জন্য পাকিস্তানের পরিচয়ের (identity) ভিত্তি গঠনের জন্য), সেই সামরিক বাহিনীকে সামরিক একনায়ক পারভেজ মোশারফ প্রতিষ্ঠানগত করতে চেয়েছিলেন। পাকিস্তানের জীবন কালের অর্ধেকের বেশি কাল ধরে পাকিস্তান রয়েছে সামরিক শাসনের অধীনে। এটা খুবই সুস্পষ্ট যে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ব্যবস্থার এই চিত্র রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে অনুকূল হয়নি।

রাজনৈতিক শূন্যতার উদ্ভব ঘটিয়েছে এর অনিবার্য সহজ নীতির (Policy)। আগেই বলা হয়েছে যে ভারতে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় জনকল্যাণের আদর্শ গড়ে তোলার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে বিষয়টা এইরকম ছিল না। বাস্তবিক পক্ষে প্রথম থেকেই পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ পরিচালিত হয়েছে ব্যর্থতার দিকে। এমন কি, পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ এই ব্যাপারেও নিশ্চিত ছিল না যে পাকিস্তানের ইসলামী রাষ্ট্র হওয়া উচিত কিনা, যদিও ইসলাম ছিল পাকিস্তানের জন্মের ভিত্তি। তাই পাকিস্তানের সংবিধান কেমন হওয়া উচিত সেই ব্যাপারেও তারা ছিল দ্বিধাগ্রস্ত এবং তারা পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন করতে সক্ষম হয়েছে কেবলমাত্র ১৯৭০ সালে, পাকিস্তানের জন্মের দীর্ঘ ২৩ বছর পরে। তা ছাড়াও, তাঁরা ১৯৭০ সালের এই নির্বাচনকে সম্মান জানাতেও ব্যর্থ হয়েছে, এর কারণ, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানী সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোকদের নীতি (সামরিক পদস্থ আধিকারিকগণ সমেত) ছিল পূর্ব পাকিস্তানকে নিস্ক্রিয় বস্তু হিসাবে দেখার। এটাকে কখনই মেনে নেবার মত নয়। তাই ১৯৭১ সালে যা ঘটেছিল, সেটা ঘটারই মত ছিল।

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অসন্তুষ্টি এবং শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন হবার ঘটনার পেছনে ছিল আরও একটি উপাদান। এটা লক্ষ করা গেছে যে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবেই পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দকে একটা কেন্দ্র গঠন করতে হয়েছিল এবং এই উদ্দেশ্যে তাদের প্রদেশ সমূহ থেকে অর্থ ও সম্পদ নতুনভাবে গঠিত কেন্দ্রে নিয়ে আসতে হয়েছে! এই ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তান ছিল সবচাইতে দুর্ভাগ্যের শিকার। সমস্ত দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তান ছিল বাস্তবিক পক্ষে একটা অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ এবং পূর্ব পাকিস্তানে নিযুক্ত পশ্চিম পাকিস্তানী আমলারা ছিল বাস্তবিক পক্ষে ঔপনিবেশিক শাসনকালে ভারতে ব্রিটিশ ভারতের ICS অফিসারদেরই অনুরূপ। পূর্ব পাকিস্তান থেকে শোষণ করে নিয়ে যাওয়া অর্থ ও সম্পদের সুবিধা ভোগকারী ছিল এইসব আমলারাই। আরো খারাপ ছিল তাদের ব্যাপক আধিপত্য বিস্তার যার সাথে যুক্ত ছিল ব্যাপক দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ; ব্রিটিশ আমলে এটা ছিল না।

১৯৭১ সালের উত্তর-কালেও পাকিস্তান সংগ্রাম করছে জাতীয় সংহতি অর্জনের জন্য। সামরিক বাহিনী ও আমলাতন্ত্রের মধ্যেকার মৈত্রী হচ্ছে ক্ষমতার পথ, কোন প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের অভাবে এই পথে তাদের কাজ হবে ক্ষমতা ভাগাভাগি করা। এই মৈত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঞ্জাবীদের প্রায় একচেটিয়া হওয়ায়, অন্যান্য জাতিগত জনগোষ্ঠী সমূহ, বিশেষতঃ মহাজিরগণ (পাকিস্তানের স্বপ্ন দ্রষ্টা ও স্রষ্টা) এবং সিন্ধীরা মোহমুক্ত ও নিরুৎসাহী হয়ে পড়েছে। ফলতঃ পাকিস্তানে জনগোষ্ঠীগত বিভাগ সৃষ্টি করছে জনগোষ্ঠীগত শত্রুতা ও বিরোধসমূহ। এই ঘটনায় পাকিস্তানের জন সংখ্যার ভিত্তি অনেকটা কৃশ হয়ে পড়েছে, এর ফলে পাকিস্তানে গণতন্ত্রের সম্ভাবনা আরো ক্ষীণ হয়ে উঠেছে। এর ফলে পাকিস্তানের অন্যান্য শ্রেণীর লোকেরা রয়েছে গ্রহণকারী প্রান্তে, এই দুই শ্রেণীর কাজকর্ম ও বিধি ব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য অবস্থায় এই সব কিছুই নির্দেশ করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিকৃত গঠনের রূপ। অন্য কথায় বলা যায় যে পাকিস্তানের যে জন্মগত ত্রুটিসমূহ ছিল, ঐ রাষ্ট্র এখনো সেগুলি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এর প্রতিকার হিসাবে জনগণের কাছে যে ধর্মীয় বটিকা তা পাকিস্তানের অবস্থাকে আরো খারাপ দিকে নিয়ে যেতে পারে। সংক্ষেপে বলা যায় যে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্বের সাথে যুক্ত অন্যান্য উপাদান ও শক্তিসমূহ পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে অনুকূল হয়ে ওঠেনি।

Model Questions :

1. Assess the differential impact of the administrative legacy on state formation in India and Pakistan.
2. Do you agree with the view that effects of inherited bureaucratic authoritarianism have not been beneficial to the Pakistan polity. Argue your case fully.

Short Questions :

1. Has the political vacuum in Pakistan during the initial years of her existence helped grow bureaucratic high handedness ? Show reasons for your answer.
2. What do you understand by 'policy vacuum' in Pakistan ?
3. Do you agree with the view that in India democratic institution and bureaucratic authoritarianism have coexisted. Argue your case.

Readings :

1. Ayesha Jalal, Democracy and Authoritarianism in South Asia (1996)
2. B. B. misra, Government and Bureaucracy in India 1947-1976 (1986).
3. Partha Chatterjee (ed), Wages of Freedom : Fifty years of Indian Nation State (1998).
4. Subrata K. Mitra and D. Rothermund (3d), Legitimacy and conflict in South Asia (1997).
5. A Wilson and D. Dalton (eds), The States of South Asia : Problems of National Integration (1989).
6. James Manor (ed), Rethinking Third Politics (1991).
7. S. K. Mitra, The Post-colonial State (1990).

দ্বিতীয় পাঠ

ভারতে জন-জাতি ভিত্তিক রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল

যদিও ভারতবর্ষ বহু ব্যাধিতে আক্রান্ত তবুও সে গণতন্ত্রকে বয়ে চলেছে — সে আজ বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র — একটা স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে তার এই যাত্রা শুরু হয়েছে ১৯৪৭ এ স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে। বস্তুতঃ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সামগ্রিক কর্মসূচীতে প্রধান উপাদান ছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অর্ন্তনিহিত লক্ষ্য অবশ্যই ছিল বিদেশী শাসন থেকে মুক্তি। কিন্তু এই লক্ষ্য কার্যতঃ ছিল একটা উপায় — যার মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়। কেননা, প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছানোর পূর্ণতাই জাতীয় স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তুলতে পারে। মনে রাখা দরকার যে, স্বাধীনতা'র জন্যই 'স্বাধীনতা' কখনই কাম্য নয়। বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই গণতন্ত্র একটা সার্বজনীন আদর্শ হিসেবে আদৃত হয়। এবং তখন থেকেই গণতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবলী যেমন, প্রতিনিধিত্বমূলক, দায়িত্বশীল ও দায়বদ্ধ সরকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা, বৈষম্যবিরোধী সংরক্ষণ ইত্যাদি তার পক্ষে অপরিহার্য রূপে বিবেচিত হয়েছে।

আবার আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কর্মসূচী শুধুমাত্র গণতন্ত্রের (একরকম সরকারী ব্যবস্থা হিসেবে) মধ্যেই সীমিত থাকেনি। এর প্রধান কারণ হোল, যে মানুষকে বস্তিতে অনাহারে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থাকতে হয়, সে কখনো গণতন্ত্রকে ভালোবাসতে পারে না, তার কাছে এ গণতন্ত্র মূল্যহীন। এজন্য, স্বাধীনতার পর, ভারত-রাষ্ট্রকে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার বাহক হতে হয়। তাকে "উঠ্তি প্রত্যাশা'র বিপ্লবের" মোকাবিলার সম্মুখীন হতে হয়। অন্যথায়, গণতন্ত্রের ইমারতটি, তা যত সযত্নেই গড়ে তোলা হোক্, অনতিবিলম্বে চুরমার হয়ে যেত। অতএব, ভারত-রাষ্ট্রের পক্ষে দায়িত্ব ছিল গুরুভার স্বরূপ। সুতরাং ব্যাপক অর্থে, তাকে স্বাধীনতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করতে হয়েছে। এই নবদিগন্তকে গান্ধীর ভাষায় 'সর্বোদয়' বলা হয়, যে 'সর্বোদয়'-এর অর্থ হোল ঃ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদির সর্বার্থে প্রত্যেক ভারতীয়ের পুনরুজ্জীবন। নতুন রাষ্ট্রের কাছে এটা ছিল একটি গুরুদায়িত্ব। তবুও ভারতকে এটার সঙ্গে যুঝতে হয়েছে। ভারতকে (বুর্জোয়া) গণতন্ত্র ও সংসদীয় সরকার, (যা অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রীয় কেননা, এখানে রয়েছে অঞ্চল, ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি এবং জাতির বিস্ময়কর বৈচিত্র্য — যাদের ঐক্যবদ্ধ রূপই হোল ভারত) এবং কেন্দ্রিয় পরিকল্পনা-নিয়ন্ত্রিত মিশ্র-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে গ্রহণ করতে হয়। তা ছাড়াও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সংবিধানে ব্যক্তি-অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে হয় এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবস্থাদি '(ততটা সুনিশ্চিত না হলেও) গ্রহণের কথা বলতে হয়।

গণতান্ত্রিক সরকার চালাতে হলে, অর্থাৎ প্রতিনিধিত্বমূলক, দায়বদ্ধ সরকার সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক দলের বহুমুখী কাজ রয়েছে। অন্যান্য কাজের মধ্যে — রাজনৈতিক সচেতনতার বিস্তৃতি, নানা স্বার্থের গ্রন্থীকরণ এবং জনসমাবেশ ঘটানোই হোল তাদের কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ।

এই পত্রে রাজনৈতিক সমাবেশ/জমায়েতে'র কৌশল হিসাবে আমরা জনজাতি ভিত্তিক রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলের উত্থানের কারণ খোঁজার চেষ্টা করবো। বর্তমান পর্যায়ে এটাকে সত্য বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ভারতে (এবং অন্যান্য দেশেও) জন-জাতি রাজনীতির উত্থানের পিছনে 'স্যালরিয়েট' কারণই (অন্যান্য কারণ ছাড়াও) হোল অত্যন্ত তাৎপর্যবাহী। জন-জাতি ভিত্তিক সমাবেশ এবং আন্দোলনে, যা এখন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে — 'স্যালরিয়েট' শ্রেণী নেতৃত্ব দিচ্ছে। উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, "প্রত্যেকের জন্য সবকিছু"র নীতি জনগণের প্রত্যাশাকে ইন্ধন যুগিয়েছিল। তারা রাষ্ট্রনীতির দ্বারা এমনভাবে চালিত হয়েছে যেন, সংশ্লিষ্ট সরকার-ই

তাদের যাবতীয় দুঃখ কষ্টের লাঘব করবে। সুতরাং উন্নয়ন ও জনকল্যাণের ছত্রছায়ায় রাষ্ট্রের উপস্থিতি হবে সর্বত্র — তা সে খাদ্য ও জ্বালানী বন্টন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা বা দ্রব্যাদির মূল্যহ্রাস — যাই হোক না কেন। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ঐতিহাসিকভাবে ভারতের যুগসঞ্চিত বাধ্য/পিছুটানের পরিপ্রেক্ষিতে ঐসব প্রত্যাশা পূরণ সীমিত আকারে-ই সম্ভব। সুতরাং জনগণের প্রত্যাশা এবং রূঢ় বাস্তবের মাধ্যমে যে দুস্তর ফারাক থাকবে তা পূর্বনির্ধারিত। এটাও আগে থেকেই বোঝা যায় যে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বৃহৎ সংখ্যক মানুষের হতাশা থাকবে। এ ধরনের হতাশা প্রধানতঃ উগ্র-রাজনীতি, অ-রাজনৈতিক দলীয় সংগঠন এবং জন-জাতি-ভিত্তিক দলের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, জন-অসন্তোষ প্রকাশের মূলধারায় রাজনৈতিক দলগুলোর কোনো ভূমিকা নেই। শুধু তাই নয়, উগ্র রাজনীতি এবং জন-জাতি-ভুক্ত রাজনীতির ঘটনা একে অপরকে অতিক্রমণও করে থাকে। এই পরিস্থিতিতে বিবিধ জন-জাতি-ভুক্ত গোষ্ঠীর পক্ষে একইসঙ্গে সন্ত্রাসবাদ এবং (জনজাতি-ভুক্ত) দলীয় রাজনীতিকে আশ্রয় করার প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। আমরা অবশ্য এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় জন-জাতিভুক্ত রাজনীতির দিকটাই দেখবো।

এখানে এটা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, কিছু জন-জাতিভুক্ত আন্দোলনের মধ্যে আঞ্চলিকতার চড়া সুর আছে। কেননা, এরকম অনেক ঘটনায় যেমন ঝাড়খণ্ড ও আসামের আন্দোলনে — স্থানগত বঞ্চনা এবং জনসংখ্যাসংক্রান্ত বঞ্চনা সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ, ঝাড়খণ্ডে বঞ্চনা'র অর্থে অঞ্চল, উপজাতি, জাত ও শ্রেণী-র অভিসৃতি ঘটেছে। এবং পুনরাবৃত্তি হলেও বলতে হয় যে, অল্প কিছু আঞ্চলিক জন-জাতি-ভুক্ত আন্দোলনেও 'স্যালরিয়েট' শ্রেণী প্রধান চালিকাশক্তির ভূমিকা পালন করেছে।

'Salariat' একটা মূল শ্রেণী নয়। এটা বরং একটা সাহায্যকারী গোষ্ঠী যার উৎপত্তি হয় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এবং 'রাজ' প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমে। প্রখ্যাত পাকিস্তানি বিশেষজ্ঞ আম্‌জা আলভি, স্যালিরিয়েট বলতে এমন এক জনসমষ্টিকে বুঝিয়েছেন, যার মধ্যে সরকারী পরিকাঠামোয় বাবু-কাজে যুক্ত ব্যক্তিরা ছাড়াও রয়েছেন তাঁরা — যাঁরা ঐ ধরনের কাজ পেতে আগ্রহী, এবং ঐ ধরনের কাজ পাবার জন্য যোগ্যতা অর্জনে উৎসুক। প্রসঙ্গতঃ ভারতে এবং অন্যত্র, 'স্যালরিয়েট' পরিচালিত জন-জাতি-ভুক্ত রাজনীতিকে বোঝার ক্ষেত্রে আলভি'র সংজ্ঞায় — "যথার্থ শিক্ষা না থাকলেও প্রয়োজনীয় শংসাপত্র"র অভিব্যক্তিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সোজা কথায়, এর মানে হোল, রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় ঐসব কাজ/চাকরী পেতে আগ্রহী ব্যক্তিরা সাধারণতঃ আশা করে না যে, তাঁরা মেধার ভিত্তিতে মুক্ত প্রতিযোগিতায় শিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণের দ্বারা ঐ কাজ পাবে। বরং তাঁরা কিছু বিশেষ বিবেচনার ভিত্তিতে যেমন জাত, সম্প্রদায়, উপজাতি ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে তা পেতে আগ্রহী। কার্যতঃ এটাই হোল 'কোটা-রাজনীতি', 'সংরক্ষণে'র রাজনীতি। এটা তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের 'মণ্ডল' রাজনীতি'র কথা মনে করিয়ে দেয়, যার মাধ্যমে ভারতে জন-জাতি-র ভিত্তিতে রাজনৈতিক সমাবেশের তাৎপর্যপূর্ণ প্রকাশ ঘটে। এটার শুরু এই বিশ্বাস (এবং ঘটনা) থেকে যে, ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতা-অর্পণ-ই হোল অর্থনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের চাবিকাঠি।

অবিভক্ত ভারতে 'স্যালরিয়েট'-এর বন্টন সম্পর্কে আমরা আলভি'র লেখাকে প্রসারিতভাবে উল্লেখ করতে পারি ঃ "দুটি কারণ স্যালরিয়েট-এর বন্টনকে আঞ্চলিকভাবে এবং আন্তঃসাম্প্রদায়িকভাবে প্রভাবিত করে। ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের সংযোগস্থলগুলোকে যেমন কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং পরবর্তীকালে দিল্লিকে কাছাকাছি আনার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্যের ভালো ভূমিকা ছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রে মিশনারী কার্যাবলীর বিভেদমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও আঞ্চলিক ও সাম্প্রদায়িক বৈষম্যবৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। তাই কোন কোন সম্প্রদায় অন্যদের তুলনায় রাষ্ট্রীয় পরিষেবার ধারাবাহিকভাবে কর্মী সরবরাহ করেছে।" ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বৈদ্যরা (প্রধানতঃ বাংলায়) ইংরেজী মাধ্যমে মিশনারী শিক্ষায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদেরকে আলোকদীপ্ত করেছে এবং এই গোষ্ঠীগুলোর মানুষেরাই ব্রিটিশ রাজত্বে রাষ্ট্রযন্ত্র এবং ব্যবসায়িক সংগঠনগুলোকে পরিচালিত করেছে। এই উঁচু জাতের মানুষদের আধিক্যযুক্ত আমলাতন্ত্রকে

আলিগড় আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে উত্তর ভারতীয় মুসলিমদের প্রথম মোকাবিলা করতে হয়। ইতোমধ্যে ভারতের বৃহৎ অংশে অসন্তোষ দেখা দেয় — যার পিছনে অসংখ্য কারণ ছিল ঃ যার মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ঃ রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় চাক্‌রীপ্রার্থী নব্যশিক্ষিত যুবকদের হতাশা, দেশব্যাপী ব্যক্তি ও গোষ্ঠী-র মধ্যে 'আপেক্ষিক বঞ্চনা'-র অভিব্যক্তি, এবং অবশ্যই ভয়াবহ আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতা। এ ঘটনার প্রধান প্রকাশ-ই হোল জন-জাতি-ভুক্ত রাজনীতির দ্রুত প্রস্ফুটন। অর্থনৈতিক কারণ জন-জাতি-ভুক্ত হতাশা'র উৎসমুখ হতে পারে, কিন্তু আদিম পরিচিতির বিবেচনাসমূহ রাজনৈতিক সমাবেশ/মোবিলাইজেশন্ ও তার লক্ষ্যের বাহক হিসেবে কাজ করেছে। এমনকি, আর্থিকভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত জাতি-গোষ্ঠী ও অঞ্চলগুলোও জন-জাতি-ভুক্ত আন্দোলনে আশ্রয় নিয়েছে। স্বতন্ত্র খালিস্তান রাজ্যের জন্য ভারতে শিখদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হোল তার সুস্পষ্ট উদাহরণ।

যাইহোক, জন-জাতি-গোষ্ঠী এবং তুলনামূলকভাবে অনুন্নত অঞ্চল, যেখানে এই গোষ্ঠীর লোকেরা বাস করে — এই উভয়ের মধ্যেই 'আপেক্ষিক বঞ্চনা'র ধারণা — প্রধানতঃ আর্থিক অর্থে, জন-জাতি-ভুক্ত সমাবেশ এবং আন্দোলনে প্রধান শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। আঞ্চলিক ভাষায়, সাধারণতঃ দেয় এই ব্যাখ্যা'র নামকরণ করা হয়েছে 'আভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিকতাবাদ'। ভারতে, ঝাড়খণ্ড এবং আসাম হোল সম্ভবতঃ দুটো সামনের সারির আভ্যন্তরীণ উপনিবেশ। কিছুটা অদ্ভুত মনে হলেও অনুন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণ (বিশেষতঃ শিক্ষার বিস্তার এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিস্তৃতি-এর দৃষ্টিকোণ হতে) উভয়েই এ ধরনের আন্দোলনে ইন্ধন যুগিয়েছে।

প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি — অন্ততঃপক্ষে রাজনৈতিক সমাবেশের যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তির প্রাথমিক প্রত্যাশা — যা কুলগত, সাম্প্রদায়িক এবং জাত-এর বিবেচনা থেকে মুক্ত, জন-জাতি/জাত/ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক সমাবেশে'র এবং আঞ্চলিকতা-ভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর উত্থানের পথ প্রশস্ত করেছিল। এবং আপাতবিরোধী হলেও এ ধরনের পরিণতি কিন্তু ভারতের পক্ষে অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য যেমন ঐতিহ্য, নিরক্ষরতা এবং দারিদ্র্য প্রসূত নয়। বরং এটা হোল আধুনিকতা'র ফলস্বরূপ, বিশেষতঃ ইংরেজী শিক্ষার প্রসার এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিস্তৃতি (সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে 'স্যালারিয়েট' শ্রেণী-র আয়তন বৃদ্ধি/প্রসারণ) ভারতে জন-জাতি-সম্পর্কীয় রাজনীতিকে ইন্ধন যুগিয়েছে। দুটো জিনিষ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রথমতঃ যোগাযোগ ব্যবস্থায় অগ্রগতি আপেক্ষিক বঞ্চনা'র ধারণাকে প্রবলভাবে চিহ্নিত করতে সাহায্য করেছে; এবং তাই এটা বঞ্চিত গোষ্ঠীর হতাশাকে আরও প্রকট করে তুলেছে, এবং জন-জাতি-গোষ্ঠী'র দাবিকে প্রশ্রয় দেওয়া হোল — বলা যেতে পারে, চাক্‌রী-সংরক্ষণের আকারে যা পুনরায় 'ইয়্‌নিক্ মোবিলাইজেশ্‌নে' ইন্ধন যোগায় — যার পরিণতি চক্রাকারে চলতে থাকে। এইসব তথাকথিত আদিম অনুমোদন, অপসৃত হওয়ার পরিবর্তে, ভারত সহ তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশ-এর রাজনীতি'র গতিপথকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

উপরের অংশে উপস্থাপিত যুক্তিগুলোকে আরও স্পষ্ট করে বোঝার জন্য আমরা খুব সংক্ষেপে আসাম ও ঝাড়খণ্ডের ঘটনাকে উদাহরণ হিসেবে বিশ্লেষণ করবো। কেননা, জন-জাতি-ভুক্ত আন্দোলনের এই দুটো ঘটনাকে 'স্যালরিয়েট' এবং 'আভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিকতাবাদে'র ধারণার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। বস্তুতঃ, এই দুটো ঘটনার গতিপ্রকৃতিকে সম্যকরূপে বোঝার জন্য উভয় প্রকারের ব্যাখ্যা-ই যুগপৎ গ্রহণ করা যেতে পারে।

বেশ কিছুদিন যাবৎ আসাম একটা সংগঠিত 'স্যালরিয়েট' আন্দোলন প্রত্যক্ষ করেছে। 'স্যালরিয়েট' কারণ ছাড়া অন্য কারণও আছে। — সেটি হোল, আসামের বাইরে অবস্থিত এলাকা ও মানুষের উপকারার্থে আসামের সম্পদের (বিশেষতঃ তেল ও বনজ সম্পদ) শোষণ।

আসামের পক্ষে এটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, হিন্দু এবং মুসলমান উভয় বাঙালীদের-ই ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটেছে আসামে। এই অনুপ্রবেশের জনসংখ্যাগত এবং অর্থনৈতিক তাৎপর্য্য সম্পর্কে অসমীয়রা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গ

তভাবে সচেতন। বাবু-কাজ ও বৃত্তিতে যুক্ত বাংলাভাষী হিন্দুদের সম্পর্কে অসমীয়ারা প্রথম সচেতন হয়। পরবর্তীকালে তারা জমি-দখলকারী বাংলাভাষী মুসলমান চাষীদের অনুপ্রবেশ সম্পর্কে আতঙ্কিত হয়। অর্থনৈতিক দিকটাই অসমীয়াদের বেশি ভাবিয়ে তুলেছিল, কেননা বহিরাগতরা সরকারী চাকরী ও পেশার ক্ষেত্রে ভালো কাজের সুযোগ পাচ্ছিল। যাইহোক, সত্তর দশকের শেষ দিক হতে অসমীয়ারা বাঙালী অনুপ্রবেশ সম্পর্কে ভীত ও চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, আর এই ভিত ও আশঙ্কার পরিণতিস্বরূপ আসামে যে প্রতিবাদ আন্দোলন ও রাজনৈতিক টালমাটাল-এর সৃষ্টি হয় — তার মধ্যে দিয়েই জন্ম হয় 'সারা আসাম ছাত্র সঙেঘর (AASU), এই আসু-ই সেখানে জন-জাতি-ভুক্ত সমাবেশে/জমায়েতে নেতৃত্ব দিয়েছিল। বস্তুতঃপক্ষে, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে 'আপেক্ষিক বঞ্চনা'র ধারণায় কষ্ট পাওয়া যুবসমাজের কাছে 'আসু' একটা আদর্শ প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। আসু'র নেতৃত্বে আন্দোলন-এর মাধ্যমে জন্ম হয় আসাম গণ-পরিষদ-এর (AGP) যারা কিছুদিন আসামে শাসক দল হিসাবে কাজ করেছে। 'আপেক্ষিক বঞ্চনা'র ধারণায় কষ্ট পাওয়া জন-জাতি-গোষ্ঠী'র একটা চিরায়ত উদাহরণ হোল আসাম ঃ অ-অসমীয়াদের দীর্ঘ, ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রাধান্যের কারণে আসামে জন-জাতি গোষ্ঠী 'আপেক্ষিক বঞ্চনা'র ধারণায় ভুগেছে এবং তারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবসমাজ ও প্রসারিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আসামে জন-জাতি-ভুক্ত রাজনীতি এখনো সন্ত্রাসবাদী পথে চালিত হচ্ছে — আর এই আন্দোলনের চাঁই হোল আসাম সংযুক্ত মুক্তি মোর্চা (United Liberation Front of Assam/ULFA)।

একইরকমভাবে, আসাম-পশ্চিম বাংলার সীমান্তে, অবস্থিত পশ্চিমবাংলার উত্তরবঙ্গীয় জেলার 'রাজবংশী'রা মনে করে যে, তারা আরও উন্নত ও সুবিধাপ্রাপ্ত বাঙালীদের দ্বারা বঞ্চিত; তারা এখন তাই আলাদা 'কামতাপুর' রাজ্যের দাবি জানাচ্ছে।

এখন ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের দিকে সংক্ষিপ্ত দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। সংকীর্ণ, অর্থে, ছোটনাগপুর মালভূমি এবং বিহারের সাঁওতাল পরগণা অঞ্চল নিয়ে ঝাড়খণ্ড গঠিত। বিস্ময়কররূপে প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ, বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ উপজাতি ও বৃহৎ সংখ্যক তপশীলী-জাতি ভুক্ত মানুষে অধ্যুষিত ঝাড়খণ্ডের ঘটনা হোল, একটা বঞ্চনা-অশান্তি-প্রতিবাদ-আন্দোলনের মূর্ত প্রতীক। ঝাড়খন্ড সমস্যা, কোন একক তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার পক্ষে অনুকূল নয়, কারণ, সবদিক বিবেচনায় এ হোল এক অনন্য সমস্যা। ঝাড়খণ্ড আন্দোলন, জন-জাতি-গোষ্ঠীর রাজনীতি এবং আঞ্চলিকতাবাদের মিশ্রিত রূপ — এ ধরনের বিতর্কিত যুক্তি সমস্যার সব মাত্রাকে ব্যাখ্যা নাও করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, শোষণ ও নিপীড়নের ধাঁচকে বোঝার যে কোন উদ্যোগে 'শ্রেণী'-র ধারণা তাৎপর্যপূর্ণ। তাই ঝাড়খণ্ড আন্দোলনে, ঝাড়খণ্ডীরূপে 'সাদান'দের (যে অ-উপজাতিরা দীর্ঘকাল যাবৎ ঝাড়খণ্ডে বাস করছে এবং ঝাড়খণ্ডীদের আত্মিক বৈশিষ্ট্যকে স্বাঙ্গীভূত করেছে) গ্রহণ তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা এর একটা অঙ্গীভূত মাত্রা রয়েছে। এটা আন্দোলনের সমর্থন-ভূমিকে প্রসারিত করতে সাহায্য করেছে। তবুও বলা যায় যে, ভারতে অভ্যন্তর-উপনিবেশবাদের কঠিনতম উদাহরণ হোল ঝড়খণ্ড।

ঝাড়খণ্ড অসংখ্য উপজাতির দেশ। প্রচুর পরিমাণে খনিজ সম্পদ, বন ও জলসম্পদে সমৃদ্ধ ঝাড়খণ্ডের অধিবাসীরা সমমাত্রায় শোষিত হয়েছে। এই শোষণ, যা ব্রিটিশ আমলে ছিল তীব্র, তা স্বাধীন ভারতে আরও খারাপ হয়েছে — বিবেচনাযোগ্য শিল্পায়ন ও নগরায়নকে (যার ফলশ্রুতি বনশূন্যতা) ধন্যবাদ দিতেই হয়। এইভাবে 'উন্নয়নে'র জন্য ঝাড়খণ্ডের উপজাতিদের যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছে। এখন তারা তাদের ভূমি ও বনসম্পদ থেকে বিচ্যুত এবং সামাজিকভাবে অধঃপতিত। আবারও বলা যায় যে, ঝাড়খণ্ড হোল এক অনন্য আভ্যন্তরীণ উপনিবেশ। উদাহরণস্বরূপ, বিহারের মোট রাজস্বে ছোটনাগপুরের অবদান যেখানে শতকরা সত্তর ভাগ সেখানে ঐ রাজস্বের শতকরা মাত্র কুড়ি ভাগ ব্যয়িত হয় ছোটনাগপুরের জন্য। বাস্তবিকই, ছোটনাগপুরের শোষণের ধাঁচকে সমকেন্দ্রিক বৃত্তাকারে প্রকাশ করা যেতে পারে ঃ ছোটনাগপুরের ভেতরে অ-উপজাতিদের (এবং তাদের উপজাতীয় সেনাদল) দ্বারা উপজাতিদের শোষণ; এবং উত্তর বিহারের দ্বারা ছোটনাগপুরের শোষণ।

খ্রীষ্টান মিশনারীদের শিক্ষাসংক্রান্ত কার্যাবলী'র (যা শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে) ফলস্বরূপ বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ছোটনাগপুরে ইংরেজী শিক্ষিত যুবকদের বিশেষতঃ মুণ্ডা এবং ওঁরাওদের মধ্যে উত্থান ঘটে। এই ইংরেজী শিক্ষিত খ্রীষ্টান যুবকেরা স্বাভাবিকভাবেই সরকারী চাক্‌রী পেতে আগ্রহী ছিল, কিন্তু তারা নিজেদেরকে দেখেছিল উঁচু জাতের হিন্দুদের বিপক্ষে লাঞ্ছিত হতে; ছোটনাগপুরে এই হিন্দুদের প্রবেশ করানো হয় প্রথমে মুঘলদের (সংখ্যায় অল্প) দ্বারা, এবং পরে ব্রিটিশদের (সংখ্যায় অনেক বেশী) দ্বারা — যে ব্রিটিশরা দীর্ঘকাল ধরে ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছে। তাই এই শিক্ষিত উপজাতি যুবকেরা তাদের উপজাতীয় পরিচিতির ওপর নির্ভর করে জন-জাতি-ভুক্ত রাজনীতিতে নিজেদেরকে নিয়োজিত করে। ছোটনাগপুর ছাত্র সংঘর্ষ সমিতির জন্ম হয় ১৯৭৮ সালে আর অল্ ঝাড়খণ্ড স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন-এর (AJSU) আবির্ভাব হয় ১৯৮৬ সালে। এগুলি হোল ঝাড়খণ্ড জন-জাতি-ভুক্ত রাজনীতি-র সাম্প্রতিক প্রকাশ, যেগুলি পুরোপুরি না হলেও, প্রধানতঃ 'স্যালারিয়েট' বিবেচনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে, ১৯৮০ সালে রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপজাতীয় এবং আঞ্চলিক ভাষা বিভাগের (ডিপার্টমেন্ট অব্ ট্রাইবাল এ্যাণ্ড রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজ) প্রতিষ্ঠা উল্লেখের দাবি রাখে। ঝাড়খণ্ডের অনেক রাজনৈতিক দল যেমন, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (JMM) ঝাড়খণ্ড পার্টি (JP) এবং অন্যেরা, উপজাতীয় পরিচিতি'র ওপর নির্ভর করেই রাজনীতিতে সংগঠিত হচ্ছে। এবং বঞ্চনা'র ভাষায় বলতে গেলে, এটা ঝাড়খণ্ডে অঞ্চল, উপজাতি, জাত ও শ্রেণী সবকিছুকে একবিন্দুতে মিলিত হবার জন্য কাছাকাছি নিয়ে এসেছে; আর এসবের অনিবার্য সহগামী হোল — আঞ্চলিক তথা জন-জাতি-ভুক্ত রাজনীতি। ভারতে যে জন-জাতিভুক্ত রাজনীতি চলতে-ই থাকবে তার সব সংকেত-ই দেখতে পাওয়া যায়। জন-জাতি-ভিত্তিক পরিচিতি'র আবেদনের উপর নির্ভর করে যে সব রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছে এবং তাদের কর্মসূচী ঠিক করেছে — সেগুলোকে আমরা ইচ্ছা করলেই দূরে ফেলে দিতে পারি না। এর পিছনে সবথেকে বড় কারণ হোল, এই যে, তারা নিরবিচ্ছিন্নভাবে তাদের ন্যায়সম্মত দাবি-দাওয়া জানাতে থাকবে। আমরা দেখেছি যে, আধুনিকীকরণ, বিশেষত, শিক্ষার প্রসার জন-জাতি-চেতনাকে ক্ষয় করতে পারেনি। বরং এটা ঐ চেতনাকে আরও শক্তিশালী করেছে। তা ছাড়াও রাষ্ট্র যখন 'ইথ্‌নিক্' দাবি-দাওয়াকে মেনে নেয় (যেহেতু রাষ্ট্র তা বেশিদিন অগ্রাহ্য করতে পারে না), তখন প্রকৃতপক্ষে তা পুনরায় জন-জাতি-ভুক্ত সমাবেশ ঘটানো এবং সংশ্লিষ্ট আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উৎসাহিত করে।

আবার, ১৯৬০-এর মধ্যবর্তী সময় থেকে 'কংগ্রেস'-এর ক্ষয়প্রাপ্তি চলমান। ১৯৯৯-র সংসদীয় নির্বাচনের ফলাফলও এটাকে সুদৃঢ় করে। একই সময়ে দেখতে পাওয়া যায় যে, কংগ্রেস-এর ক্ষয়প্রাপ্তি-র ফলে যে রাজনৈতিক শূণ্যতা সৃষ্টি হয়েছে সে সব জায়গা দখল করা এখনো পর্যন্ত অন্য দলের পক্ষে সম্ভব হয়নি। যদিও, জন-জাতি-ভুক্ত অভিযোগ বর্তমান। এর ফলে, জন-জাতি-ভুক্ত গোষ্ঠীর পক্ষে, রাজনৈতিক সমাবেশ ঘটানোর বৃহত্তর সুযোগ সৃষ্ট হয়েছে; এবং তারা মূল ধারার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দরকষাকষি করতে পারছে। অন্যভাষায় বলতে গেলে, মূল ধারার রাজনৈতিক দলগুলোকে যেমন ভারতীয় জনতা পার্টি বা কংগ্রেসকে 'মোর্চা'র ওপর নির্ভর করতেই হবে, আর সে 'মোর্চা' যে কোনোভাবেই হতে হবে ইথনিক্/রিজিওনাল দলগুলোর সঙ্গে । কার্যতঃ এ ধরনের 'মোর্চা' কে হতে হবে সমসাময়িক এবং আকারে আরও বড়; স্বাধীনতার প্রথম তিন দশকে কংগ্রেস যে কৌশলে 'ইথ্‌নিক এলিট'-দের নিজদলে অন্তর্ভুক্ত করেছিল — এই মোর্চাকেও সেই কৌশলের বিকল্প পথ নিতে হবে। আরও মনে রাখতে হবে যে, প্রথম দিকের বছরগুলোতে কংগ্রেসী হোমরাচোমড়া ব্যক্তিরা স্থানীয় অঞ্চলভিত্তিক ক্ষমতা-কাঠামোকে অগ্রাহ্য করতে পারেনি (ব্রিটিশ শাসকরাও যেমন পারেনি)। ঐ একই যুক্তিতে ভারতীয় জনতা পার্টি বা অন্য দলকেও সেই পদাঙ্ক-ই অনুসরণ করতে হবে। সুতরাং ইথনিক্ পলিটিক্স/জন-জাতি-ভুক্ত রাজনীতি থেকেছে, এবং ভারতীয় রাজনৈতিক দৃশ্যাবলীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে বহমান থাকবে।

আদর্শ প্রশ্ন ঃ

১। জন-জাতি-ভুক্ত রাজনীতির উত্থানকে তুমি কেমনভাবে ব্যাখ্যা করবে ?

২। ঝাড়খণ্ডে জন-জাতি-চেতনার প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। AASU-র উপর ছোট টীকা লেখ।

২। ঝাড়খণ্ডকে কেন আভ্যন্তরীণ উপনিবেশ রূপে বিবেচনা করা হয়েছিল?

৩। ঝাড়খণ্ডের জন-জাতি-ভুক্ত রাজনীতিতে 'স্যালারিয়েট'-এর ভূমিকার ওপর টীকা লেখ।

Readings :

1. Anthony Smith, Enthnic Revival (1981)
2. Hamza Alovi and R. Harris (eds.), Sociology of Developing Countries : South Asia (1989)
3. T. K. Oommen, State and Society in India : Studies in Nation Building (1990).
4. Sajal Basu, Regional Movements : Politics of Ethnicity – Identity (1992).
5. Watter Fernandes (ed), National Development and Tribal Deprivation (1992).
6. Susama Devalle, Discourses of Ethnicity : Culture and Protest in Jharkhand (1992).
7. Sekhar Ghosh, ''Jharkhand : Dynamics of Deprivation and Protest'', Jadavpur Journal of International Relations, Vol. 4 (1998).

তৃতীয় পাঠ

ইসলামিক মতাদর্শ ও পাকিস্তানের উদ্ভব

(Islamic Ideology and the Formation of Pakistan)

মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদের (seperatism) উৎসগুলির অনুসন্ধানে বহুসংখ্যক তাত্ত্বিক ব্রতী হয়েছিলেন। সৈয়দ আহমেদ বেরেলভি সহ অধিকাংশ তাত্ত্বিকেরই বক্তব্য হল, ভারতীয় মুসলমানদের মানসিকতা অন্যান্য ভারতীয় সম্প্রদায় হতে পৃথক। কখনোই এরা একত্রে বসবাস করতে পারে না, এবং এদের সাথে একত্রে বসবাস করতে বাধ্য করার অর্থ মুসলমানদের তাদের স্বাতন্ত্র্যকে পরিহার করতে বাধ্য করা। তবে ডঃ আম্বেদকরের বিশ্বাস ছিল, একজন মুসলমানের বশ্যতা, সে কোন দেশে বাস করে তার উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে নিষ্ঠা ও ধর্মের প্রতি তার শ্রদ্ধার উপর। তাই ইসলামীয় রীতি অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করতে হলে মুসলমানদের স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রয়োজন হয়। একারণেই বিশ্বের যেখানেই ইসলামের শাসন আছে, তাদের পৃথক রাষ্ট্র আছে।

যাই হোক, আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের পরিধি বেশ সীমিত। তাই এখন আমরা দেখব পাকিস্তান ধারণাটির উদ্ভব হল কীভাবে এবং কীভাবে তার বাস্তবায়ন ঘটল।

একটি ভৌগোলিক সত্তা হিসাবে পাকিস্তান শব্দের ব্যবহার প্রথম করেছিলেন কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র চৌধুরী রহমৎ আলি। তিনি ও তাঁর আরও কয়েকজন অনুগামী ১৯৩৩ সাল থেকে পাকিস্তানের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। ঐ বছর জানুয়ারী মাসে চৌধুরী রহমৎ আলি ও তাঁর আরও তিন সহযোগীর প্রচেষ্টায় Now or Never নামক একটি ছোট প্রচার পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাতে তাঁরা যে বক্তব্য পেশ করেছেন তা হল ভারতীয় মুসলমানরা একটি স্বতন্ত্র জাতি, স্বাভাবিকভাবেই তাদের স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করার অধিকার আছে। তাঁদের মতে পাকিস্তান গড়ে উঠবে উত্তর-পশ্চিম ভারতের পাঁচটি রাজ্য নিয়ে এগুলি হল পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (আফগান), কাশ্মীর, সিন্ধু ও বালুচিস্তান। তাঁদের দাবি, পাকিস্তান (Pakistan) শব্দটিও পাঞ্জাবের P, আফগানের A, কাশ্মীরের K, সিন্ধুর S এবং বালুচিস্তানের tan অক্ষরগুলির সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। রহমৎ আলির বক্তব্য ছিল, উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমানরা একটি আলাদা স্বতন্ত্র জাতি ছিল, যাদের জীবনধারা ভারতের অন্যান্য অংশে বসবাসকারী মানুষদের থেকে স্বতন্ত্র। তিনি আরও দেখিয়েছেন, হিন্দু-মুসলমানরা একে অপরের সাথে মেশে না। খানাপিনা করে না, বিবাহ করে না। হিন্দু-মুসলমানদের রীতিনীতি, খাদ্যাভ্যাস এবং পোষাক পরিচ্ছদ পৃথক। তাদের যদি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে থাকতে হয় তাহলে তারা হবে মোট ভারতীয় জনগণের এক দশমাংশ অর্থাৎ সেই যুক্তরাষ্ট্রের একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মাত্র। এই অবস্থায় জাতিটির মৃত্যু হবে। পাকিস্তানের দাবি আরও জোরালো করবার জন্য তিনি দেখিয়েছেন যে প্রস্তাবিত পাকিস্তানের আয়তন হবে ফ্রান্সের দ্বিগুণ এবং বিশ্বের মোট মুসলমান সম্প্রদায়ের এক দশমাংশ বসবাস করবে এখানে। তাই এই অঞ্চলে একটি স্বতন্ত্র জাতীয় মর্যাদার স্বীকৃতি দেওয়াই উচিত।

প্রসঙ্গতঃ কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র গোষ্ঠীর এই পাকিস্তান দাবি ইতিমধ্যে উত্থাপিত কবি ইকবালের দাবির থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র ছিল। ইকবাল চারটি রাজ্য নিয়ে সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মুসলিম ভারত চেয়েছিলেন, কিন্তু কেমব্রীজ গোষ্ঠী ইকবাল বর্ণিত চারটি রাজ্য ব্যতীত কাশ্মীরও চেয়েছিলেন এবং সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে তাঁরা থাকতে চাননি। অর্থাৎ স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তানের দাবি তাঁরাই প্রথম করেন।

কেমব্রীজ গোষ্ঠীর এই সকল কথাবার্তা প্রথমদিকে ভারতীয় রাজনীতিকে খুব একটা প্রভাবিত করতে পারেনি, কারণ এই গোষ্ঠীর সাথে ভারতীয় রাজনীতির প্রত্যক্ষ যোগসূত্র কোন দিনই ছিল না। কিন্তু তাঁরা বসে থাকেননি। ১৯৪০ সালে চৌধুরী রহমৎ আলি আর একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে বলেন (১) মুসলমানরা কখনোই ভারতীয় নয় — তারা পাকিস্তানি এবং এশিয়। (২) মুসলমান সম্প্রদায় ভারতীয়দের কাছ থেকে একরাশ সমস্যাই শুধু পেয়েছে। ভারতীয়তাবাদ (Indianism) মুসলমানদের নীতি, মূল্যবোধ প্রভৃতির মান ও কাঠামোকে ধ্বংস করেছে এবং রাজনৈতিক দিক থেকে তাদের চিরকাল বঞ্চিত করে এসেছে। (৩) এই সময় থেকে কেমব্রীজ গোষ্ঠী একটির পরিবর্তে তিনটি পাকিস্তানের দাবি করতে থাকে। একটি হল ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত পুস্তিকার দাবিমত উত্তর-পশ্চিম ভারত নিয়ে পাকিস্তান। দ্বিতীয়টির হল বঙ্গ-ই-ইসলাম যা বাংলা ও আসামের মুসলমানদের নিয়ে গড়ে উঠবে এবং তৃতীয়টি হল উসমানিস্তান (Usmanistan) যা হায়দ্রাবাদ রাজ্য নিয়ে গড়ে উঠবে। এই সকল মুসলমান রাজ্যগুলি নিয়ে গড়ে উঠবে পাক-কমনওয়েলথ।

প্রসঙ্গতঃ রহমৎ আলি শেষ পর্যন্ত তিনটি অংশের সমন্বয়ে পাকিস্তান গড়ে তোলার দাবির মধ্যেও নিজেকে সীমিত রাখেননি। ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত "India : the Continent of Diania or the Country of Doom" পুস্তিকাতে তিনি দাবি তুলেছেন পাক কমনওয়েলথ কেবলমাত্র পাকিস্তান, বঙ্গ-ই-ইসলাম ও উসমানিস্তানকে নিয়ে গড়ে তোলা উচিত হবে না। সিদ্দিকিস্তান, ফারুকীস্তান, হায়দারিস্তান, মুইনিস্তান এবং মোপানিস্তানকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। আর এই পাক কমনওয়েলথ-এ স্থান পাবে মুসলমান, দ্রাবিড়, হিন্দুমতে অস্পৃশ্য জাতিসমূহ, খ্রীষ্টান, শিখ, বৌদ্ধ, পার্সী এবং ভারতীয়তাবাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ অন্যান্য জাতিসমূহ।

কবি মহম্মদ ইকবালকে পাকিস্তানের একজন স্রষ্টা বলে মনে করা হয়। ১৯৩০ সালের মুসলিম লীগের ২১তম সর্বভারতীয় সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি উত্তর পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলিকে একটু পৃথক করে মুসলমানদের বাসভূমি (homeland) গঠনের ব্যক্তিগত ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেন যেখানে স্বায়ত্তশাসন থাকবে এবং সেটাই হবে, তাঁর মতে, উত্তর পশ্চিম ভারতের মুসলমানদের শেষ নিয়তি। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন ইকবাল কখনোই ভারত বিভাজন চাননি। বস্তুতঃপক্ষে, তাঁর ইচ্ছা ছিল প্রকৃত একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল আরও কয়েকটি পরিকল্পনায়। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ সৈয়দ আবদুল লতিফ তিনটি পুস্তিকায় তাঁর মতবাদ প্রচার করেন — এগুলি হল *The Cultural Future of India (1938), A Federation of Cultural Zones for India (1938)* এবং *Muslim Problem in India (1939)*। তিনি ভারতকে ১৫টি সাংস্কৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন যার মধ্যে চারটি মুসলিম এবং ১১টি হবে হিন্দু প্রধান। নবাব মহম্মদ শাহ নওয়াজ খান ভারতকে পাঁচটি 'দেশে' ভাগ করে একটি সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেন। সিকান্দার হায়াৎ খানও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে সাতটি অঞ্চলে ভাগ করবার পরামর্শ দেন যার মধ্যে দুটি হবে মুসলিম অধ্যুষিত এবং পাঁচটি হিন্দুপ্রধান।

সুতরাং এ থেকে পরিষ্কার, ভারতকে কতটুকরো করা হবে সে ব্যাপারে মত পার্থক্য থাকলেও, ভারতকে যে একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করা প্রয়োজন, এব্যাপারে কোন দ্বিধার অবকাশ তাঁদের মধ্যে ছিল না। এঁরা কেউই স্বাধীন, সার্বভৌম, স্বতন্ত্র মুসলমান রাষ্ট্র চাননি। বস্তুতঃপক্ষে, এমন কিছু ছিল না যা ভারত বিভাজনকে অবশ্যম্ভাবী করতে পারে। যুগ যুগ ধরে এজাতীয় কোন দাবির অস্তিত্ব ছিল না, ১৯৩৭ থেকে ১৯৪২ সালের মধ্যে রাজনৈতিক কারণে এজাতীয় কিছু দাবি ওঠে ও বৃটিশরা নিজস্বার্থে তা মেনে নেয়।

যতদিন পর্যন্ত ক্ষমতা বৃটিশদের হাতে ছিল, জিন্না এবং মুসলিম লীগ উচ্চকণ্ঠে তাঁদের দাবি তুলতে থাকেন। পাকিস্তানের দাবি তীব্রতম হয় ১৯৩৭ সালের পর থেকে যখন কংগ্রেস এই অঞ্চলে নির্বাচনে সুবিধাজনক অবস্থায় পৌঁছায়। তবে Upper Province-এর মন্ত্রীসভায় মুসলিম লীগের সদস্যদের যোগ দিতে না দেবার সিদ্ধান্ত উভয়ের

মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি করে। এছাড়াও বিভিন্ন রাজ্যে মুসলিম লীগের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে না দেবার সিদ্ধান্ত উপমহাদেশের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকারক হয়ে উঠেছিল। এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন জিন্না এবং শেষ পর্যন্ত তা পাকিস্তানের রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

এরপর জিন্না এবং লীগ কঠোরভাবে পাকিস্তানের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। ইউরোপে যুদ্ধ ঘোষণার পর এবং কংগ্রেস মন্ত্রীসভার ইস্তফা দানের পর, জিন্নার পক্ষে সময়টা অনুকূল হয়েছিল। জিন্না সুচতুরভাবে এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন এবং বৃটিশদের তাঁর সাথে বোঝাপড়ায় আসতে বাধ্য করেছিলেন।

যদি ধরে নেওয়া যায়, বৃটিশরা তাঁর সাথে গোপনে কোন কথা বলেননি (যা অসম্ভব) তবুও ভারতের ভাইসরয় এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ বৃটিশ ক্ষমতাভোগীদের প্রদত্ত বিভিন্ন সরকারী বক্তৃতামালা পর্যালোচনা করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না তারা মুসলিম লীগের কংগ্রেস বিরোধী ভূমিকাকে উৎসাহিত করছে এবং বারংবার ঘোষণা করেছে এই দুপক্ষের মতবাদের বিভিন্নতার কারণে বৃটিশদের পক্ষে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা সম্ভব হচ্ছে না।

বৃটিশ সরকারের সাথে দরকষাকষির সময় জিন্না একটি বৃহৎ মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ভবিষ্যৎ ভারতের সংবিধান রচনায় মুসলিম লীগের ভিটোর অধিকার বৃটিশদের কাছ থেকে আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অর্থাৎ এর ফলে, তাঁর এবং তাঁর অনুগামীদের সম্মতি ব্যতীত সংবিধানের কোন ধারা কিংবা উপধারা সংযোজন সম্ভব ছিল না। এই প্রতিশ্রুতি দ্বারা সুরক্ষিত জিন্না এরপর যে শুধু কংগ্রেসীদের সাথে চরম একনায়কোচিত ব্যবহার শুরু করেছিলেন তা নয়, মুসলমান প্রধান রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীর সাথেও একই ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছিলেন। মুসলিম লীগকেই ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র মুখপাত্র হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে কংগ্রেসের কাছে তিনি এ দাবি মেনে নেবার জন্যেও চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। বৃটিশ শাসকদের সাহায্য নিয়ে তিনি, তাঁর অনুগত নয় এমন মুসলমান মন্ত্রীদের পদচ্যুত করেছিলেন। যেমন খুব তুচ্ছ কারণে সিন্ধের মুখ্যমন্ত্রী আল্লাবাক্সকে (Allabux) পদচ্যুত করেছিলেন এবং পরে তাঁকে হত্যা করা হয়। বাংলায় ফজলুল হক্‌কে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। পাঞ্জাবে সিকান্দার হায়াত খানের আকস্মিক মৃত্যু জিন্নাকে চরম শাসক হয়ে উঠতে সহায়তা করেছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ব্যতীত উত্তর-পশ্চিম ভারতের সকল মুসলমান প্রধান রাজ্যে তাঁর আদেশ শিরধার্য ছিল। এর উপর ভারতের সংবিধান রচনার প্রক্রিয়ায় তাঁর ভিটো ক্ষমতা, তাঁর ক্ষমতাকে কোন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়।

বহুসংখ্যক তাত্ত্বিক মনে করেন ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ পাশ হওয়া 'পাকিস্তান সংকল্প' (Pakistan Resolution) মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের কাছ থেকে আরও সুযোগ সুবিধা আদায় করে দেবার পথ সুগম করে দিয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তানে নিযুক্ত ভারতের প্রথম পাক হাই-কমিশনার শ্রীপ্রকাশ সিন্দের প্রথম প্রধানমন্ত্রী খুবরোকে এবং অন্য এক মুসলিম লীগের বড় মাপের নেতাকে উদ্ধৃত করে দাবি করেছেন তাঁরা কখনোই বিভাজন চাননি। তাঁদের অধিকাংশেরই মনে স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তানের কোন স্বপ্ন ছিল না।

এমনকি 'পাক সংকল্প' রচনা ও ঘোষিত হবার সময়ও এর কোন সুদৃঢ় মতাদর্শগত ভিত্তি ছিল না। একারণেই সংকল্পটি পাস হবার কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি লিখছেন, "এমন একটি পরিকল্পনা রচনা করতে হবে যা থেকে পরিষ্কার হবে ভারতে দুটি জাতি আছে, কিন্তু তারা একটি মাতৃভূমি এবং একটি সরকার ভাগ করতে বাধ্য হচ্ছে।"

মুসলিম লীগ কর্তৃক পাস হওয়া পাক সংকল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া ছিল। কিন্তু

এসবের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতিতেই যে ভারত বিভাজন হয়েছিল তা বলা যায় না। ভারত বিভাজনের মূল কারণ ছিল হিন্দু আধিপত্যের প্রচার। "ইসলামধর্ম বিপন্ন" এই সুচতুর স্লোগানই বস্তুতঃপক্ষে খণ্ডিত ভারতবর্ষের কারণ হয়েছিল।

যাই হোক, ১৯৩৭ সালের পর লীগ অত্যন্ত সফলভাবে রাজনীতিকে ধর্মাশ্রয়ী করে, ফলে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের মধ্যে হতাশা আসে, তাই গান্ধী ও নেহেরু আর ভারত বিভাজনের বিরোধিতা করেননি। তারা যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, তা করলে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি অনির্দিষ্টকালের জন্য বিলম্বিত হবে। জিন্নাও এর সুযোগ নিতে চেয়েছিলেন, আর বৃটিশরাও ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য জিন্নার সমস্ত অন্যায় আবদার মেনে নিতে আরম্ভ করেছিল। ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল। মরগেনথাউ (Morgenthau)-এর মতে, পাকিস্তান কোনদিনই জাতি ছিল না, এটি শুধুমাত্র একটি রাষ্ট্র। জাতিগত দিক থেকে, কিংবা ভাষা ও সভ্যতার দিক থেকে পাকিস্তান নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। কেবলমাত্র হিন্দু ভীতি থেকেই পাকিস্তানের উদ্ভব ঘটেছিল — অর্থাৎ নিরাপত্তাহীনতার ভীতিই ছিল পাকিস্তানের জন্মের কারণ।

পাকিস্তান ছিল জিন্নার মস্তিষ্কজাত সন্তান। অস্বীকার করার উপায় নেই, তিনি আদতে ছিলেন একজন জাতীয়তাবাদী ; পরবর্তীকালে রাজনীতির ক্ষেত্রে যাঁর বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এসেছিল। এই পরিবর্তনই তাঁকে কংগ্রেস ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসের শত্রুতে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন এক দূরদর্শী রাজনীতিবিদ। যখন তিনি দেখলেন, তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের নেতৃত্বদান করতে পারছেন না, তখন তিনি স্থির করলেন, কেবলমাত্র মুসলমানদের তিনি নেতৃত্ব দেবেন। একারণেই একসময়কার হিন্দু-মুসলমান একতার দূত ১৯৪০-এর দশকে গোঁড়া সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিলেন। জিন্নার চরিত্রের এই বিশেষ দিকটিও পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য দায়ী। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, স্বাধীন পাকিস্তান পেয়েও তিনি সন্তুষ্ট হননি। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল, যে পাকিস্তান তিনি দাবি করেছিলেন, সে পাকিস্তান তিনি পাননি। যা পেয়েছিলেন তা হল moth eaten পাকিস্তান, যা নিয়ে তাঁর ক্ষোভের শেষ ছিল না। যাই হোক, সে অন্য প্রসঙ্গ।

Further Readings :

1. Dey, Amalendu, *Islam in Modern India*.

চতুর্থ পাঠ

পাকিস্তানের উদ্ভবে ইসলামের ভূমিকা

Role of Islam in the Formation of Pakistan

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের উদ্ভব হয়। প্রাথমিকভাবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আলিগড় স্কুল এবং স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের নেতৃত্ব ভারতীয় মুসলমানদের পৃথক নেশন হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও, মুসলিম লীগের সক্রিয় প্রচেষ্টায় পাকিস্তানের দাবি জোরদার হয়। যদিও ভারতীয় মুসলিমদের মধ্যে ছিল প্রচন্ড মতপার্থক্য, তথাপি নব্য শিক্ষিত বেতনভুক শ্রেণী স্বার্থের কারণেই রাজনৈতিক স্তরে পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের দাবি সংহত রূপ নিতে পেরেছিল। এই স্বার্থ ছিল স্থানীয় নির্বাচিত সংস্থায় চাকুরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ, ইংরাজী শিক্ষার প্রসার এবং বৃটিশরাজের সাথে নিকট সম্পর্ক বজায় রাখা। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতকের শেষার্ধের রাজনৈতিক পরিবেশই মুসলিমদের সম্পূর্ণ নিজস্ব সংগঠন হিসেবে বিংশ শতকের প্রথমে (১৯০৬ সাল) মুসলিম লীগের উদ্ভবের কারণ হয়। এরপর মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে থাকে। ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীর যোগদান, ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার, কংগ্রেস দলের গণসংগঠনে রূপান্তর, প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের অবসান, অসহযোগ আন্দোলন, খিলাফৎ আন্দোলন, ভারতীয়দের হতাশা, মুসলিম লীগে জিন্নার যোগদান প্রভৃতি এর অল্প কিছুকালের মধ্যেই ঘটে গেল। গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস যখন একটি গণসংগঠনে পরিণত হচ্ছিল তখন বৃটিশরাজ এক বিচিত্র 'বিভক্ত করে শাসন করা'র নীতি গ্রহণ করে। ব্রিটিশরাজ তার এই নীতি কার্যকর করে গান্ধীর স্বপ্নভঙ্গ করার ক্ষেত্রে মুসলিম লীগের নেতৃত্বের সমর্থন আশা করেছিল। সে এই সমর্থন পেয়েছিল এবং ১৯২০ সাল নাগাদ কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে দুরত্ব প্রচন্ড বৃদ্ধি পায়।

১৯৩০ এর দশকে পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের দাবি ব্যাপক আকার ধারণ করে। সেই সময় ইকবাল স্বীকার করেন যে ভারতের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক আকার ধারণ করেছে এবং সমাধান সূত্র হিসাবে ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তোলার কথা বলেন যাতে উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমান অধ্যুষিত রাজ্যগুলির উল্লেখযোগ্য পরিমাণ স্বাধিকার ভোগ করতে পারে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন ১৯৩৭ সালের মধ্যেই এই প্রাথমিক রাজনৈতিক অবস্থান থেকে সরে গিয়ে তিনি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের স্বপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। এদিকে ১৯৩৩ সালে চৌধুরী রহমত আলি এবং তার কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুরা সম্মিলিতভাবে 'Now or Never' পুস্তিকায় পাকিস্তান গঠনের যৌক্তিকতা প্রচার করেন। তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতর্কিত এই পুস্তিকায় বলা হল যে ভারতীয় মুসলমানরা একটি পৃথক জাতি, তাই এদের একটি পৃথক রাষ্ট্র থাকা উচিত। এরা এই রাষ্ট্রের নাম দিলেন পাকিস্তান। প্রথম দিকে এই দাবি উপেক্ষিত থাকলেও পরবর্তীকালে পাকিস্তান গড়ে ওঠে।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ মুসলিম অধ্যুষিত একটি রাজ্যেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারেনি। যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং স্বভাবতই সংসদীয় ব্যবস্থার রীতি অনুসারে মন্ত্রীসভা গঠন করে ও জিন্না কোয়ালিশনের প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। যেহেতু মুসলিম লীগ কংগ্রেসকে হিন্দু সংগঠনরূপে বর্ণনা করত তাই তারা সিদ্ধান্তে এল যে অবিভক্ত ভারতে হিন্দুরা সর্বদাই আধিপত্য করবে। কংগ্রেস সরকার যেদিন বিভিন্ন রাজ্যের

প্রাদেশিক আইনসভা থেকে বৃটিশ রাজের অসহযোগিতার কারণে পদত্যাগ করে, সেদিন মুসলিম লীগ 'মুক্তি দিবস' পালন করে। এই পর্যায়ে ব্রিটিশরাজের সাথে মুসলিম লীগের আঁতাত আরও সুদৃঢ় হয় এবং এই পটভূমিতে ১৯৪০ সালে "লাহোর প্রস্তাব" রচিত হয় যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান দাবি করা। এর পরবর্তী অধ্যায়ে ব্রিটিশরাজ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে রাজনৈতিক দর কষাকষি শুরু হয় যেখানে কংগ্রেস অপেক্ষা মুসলিম লীগের প্রতি বৃটিশ সরকার পক্ষপাতিত্ব করতে আরম্ভ করে। এরপর ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল। অর্থাৎ বলা যায় যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ধর্মীয় কারণে পাকিস্তানের উদ্ভব, কিন্তু বাস্তব সত্য হল এই পাকিস্তানের জন্য আন্দোলন শুরু করে মুসলমান বেতনভোগী শ্রেণী তার নিজ সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থতার উদ্দেশ্যে।

———————

পঞ্চম পাঠ

পাকিস্তান দাবি প্রসঙ্গে ইকবালের দৃষ্টিভঙ্গীর বিবর্তন

Evolution of Iqbal's approach to the demand for Pakistan

ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় জাতি, ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট শ্রেণী অবস্থান ইত্যাদির মানদণ্ডে সংহত জনগোষ্ঠী না হলেও একটি সাধারণ ধর্মের অর্থাৎ ইসলামের অজুহাতে স্বাতন্ত্র্য দাবি করতে আরম্ভ করে। নিজেদেরকে একটি পৃথক সম্প্রদায় হিসাবে চিহ্নিত করে তারা ব্রিটিশ রাজের কাছে পক্ষপাতমূলক ব্যবহার আশা করেছিল। উনবিংশ শতকের শেষদিকে আলিগড় স্কুলের আন্দোলনের সময় থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান গঠনের মাধ্যমে তা চরম পরিণতি লাভ করে। তবে ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক রাষ্ট্রের জন্য আন্দোলনের পিছনে কাজ করেছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের এক আশঙ্কা যে স্বাধীনতার পর ভারত যদি অবিভক্ত থাকে তাহলে সেখানে হিন্দু আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয় সরকারী চাকুরি ও বিভিন্ন পেশার ক্ষেত্রেও হিন্দুদের একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এই ধারণার দ্বারা বিখ্যাত কবি মহম্মদ ইকবালও প্রভাবিত হয়েছিলেন।

যাই হোক কবি ইকবাল উত্তর পশ্চিম ভারতের তীব্র সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং যদিও পরবর্তী কালে 'পাকিস্তান' ধারণার দার্শনিক নেতা রূপে চিহ্নিত হয়েছিলেন। তথাপি প্রথম দিকে তিনি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের সমর্থক ছিলেন না। প্রথম দিকে তিনি মুসলিম অধ্যুষিত উত্তর পশ্চিমের রাজ্যগুলিকে অধিকতর স্বাধিকারের জন্য আন্দোলন করতে বলেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ঐ সকল রাজ্যে মুসলমানরা যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির ভিত্তিতে গঠিত ঐক্যবদ্ধ ভারতের মধ্যেই নিজেদের শাসন করুক। তবে ইকবাল মূলত উত্তর পশ্চিমের রাজ্যগুলি যেখানে মুসলিমদের প্রাধান্য আছে সেখানেই এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলেছিলেন।

১৯৩০ সালে "ভারতীয় ইউনিয়নের" মধ্যেই পাঞ্জাব, সিন্ধ এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সমন্বয়ে এক পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের কথা বলেন। রফিকুল জাকারিয়া মনে করেন এই সময় ইকবাল স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনার কোন সূক্ষতম ইঙ্গিত দেননি। ইকবাল কেমব্রিজ গোষ্ঠীর পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের প্রস্তাব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এমনকি ১৯৩৪ সালেও তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে তিনি পৃথক পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব সম্পর্কে অবহিত কিন্তু ভারতকে বিভক্ত করে পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাবের প্রতি তাঁর কোন সমর্থন নেই। কিন্তু ১৯৩৭ সাল নাগাদ তিনি তাঁর প্রাথমিক অবস্থান থেকে সরে আসেন এবং ভারতকে বিভক্ত করে মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করেন। মুসলিম লীগের অন্যান্য নেতাদের মত তিনি বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেন যে একমাত্র ভারত বিভাজন করেই এদেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হতে পারে। তিনি ভবিষ্যত ভারতের হিন্দু আধিপত্যের ভয় পেতে আরম্ভ করেন। তাঁর এই ভয় আরও তীব্র হয় কংগ্রেস নেতাদের ঐক্যবদ্ধ ভারত এবং ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রতি অবিচল আস্থা লক্ষ্য করে। যাই হোক ইকবালের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গী ১৯৪০ সালের "লাহোর প্রস্তাবে" প্রতিফলিত হয় যেখানে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য পৃথক বাসভূমির প্রস্তাব করা হয়েছিল।

ষষ্ঠ পাঠ

পাকিস্তান প্রসঙ্গে কেমব্রিজ গোষ্ঠীর চিন্তাভাবনা

Views of Cambridge Group on Pakistan

ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় জাতি, ভাষা, সংস্কৃতি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, শ্রেণী অবস্থান ইত্যাদির মানদণ্ডে সংহত জনগোষ্ঠী না হলেও একটি সাধারণ ধর্মের অর্থাৎ ইসলামের অজুহাতে স্বাতন্ত্র্য দাবি করতে আরম্ভ করে। নিজেদেরকে একটি পৃথক সম্প্রদায় হিসাবে চিহ্নিত করে তারা ব্রিটিশরাজের কাছে পক্ষপাতমূলক আচরণ আশা করেছিল। উনবিংশ শতকের শেষদিকে আলীগড় স্কুলের আন্দোলনের সময় থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান গঠনের মাধ্যমে তা চরম পরিণতি লাভ করে। তবে ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক রাষ্ট্রের জন্য আন্দোলনের পিছনে কাজ করেছিল শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই আশঙ্কা যে স্বাধীনতার পর ভারত যদি অবিভক্ত থাকে তাহলে সেখানে হিন্দু আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয় সরকারী চাকুরী ও বিভিন্ন পেশার ক্ষেত্রেও হিন্দুদের একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। অন্যদিকে ইসলামের ভিত্তিতে মুসলমানেরা যদি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করতে পারে তাহলে নব্য শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সহজলভ্য হবে। চৌধুরী রহমত আলীর নেতৃত্বে ১৯৩৩ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্রগোষ্ঠীর পাকিস্তানের দাবিতে একথাই প্রতিফলিত হয়েছে।

একথা আজ সর্বজনবিদিত যে ১৯৩৩ সালে কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী সর্বপ্রথম সুনির্দিষ্ট সার্বভৌম ভূখণ্ড হিসাবে পাকিস্তান শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি এবং তাঁর অন্য তিনজন সহকারী 'Now or Never' নামে এক ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করেন। সেখানে বলা হল যেহেতু সব দিক থেকেই ভারতের মুসলমানরা একটি পৃথক জাতি তাই তাদেরকে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে দিতে হবে। কেমব্রীজ গোষ্ঠী 'PAKISTAN' শব্দটি চতুরভাবে গঠন করেন যার প্রতিটি অক্ষরকে বিশ্লেষণ করলেই পাকিস্তানের সম্ভাব্য ভৌগোলিক এলাকা পাওয়া যাবে। যেমন P–Punjab, A–Afghanistan, K–Kashmir, S–Sind এবং Tan–Baluchistan কে সূচিত করে। কেমব্রীজ গোষ্ঠী উত্তর পশ্চিমের সকল বৃটিশ রাজ্যকে একত্রিত করে একটি রাজ্যে পরিণত করবার ইকবালের চিন্তাধারার বিরোধিতা করে। কারণ তাদের মনে হয়েছিল এই ব্যবস্থায় রাজ্যটি হয়ে পড়বে হিন্দু শাসিত। এজন্য তাদেরকে পৃথক পাকিস্তান নামক মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসের সুযোগ দিতে হবে। যৌথ সংসদীয় কমিটি যখন তার কার্যকলাপ পরিচালিত করছিল তখন এই পুস্তিকা প্রচারিত হলেও তেমনভাবে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। এমনকি তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারী মুসলিম প্রতিনিধিদের মধ্যেও এই পুস্তিকা সম্পর্কে তেমন কোন আগ্রহ দেখা যায় নি।

তবে রহমত আলির কাছে পাকিস্তান গঠন অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় বিষয় ছিল। ১৯৪০ এর দশকে তিনি "Millat of Islam and the Menace of Indianism" নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি ভারতকে একাধিক অংশে বিভক্ত করার প্রস্তাব করেন। উত্তর-পশ্চিমে পাকিস্তান গঠনের পাশাপাশি তিনি 'বঙ্গ-ই-ইসলাম' গঠনের প্রস্তাব করেন যার অন্তর্ভুক্ত হবে বাংলা ও আসাম এবং একটি স্বাধীন ওসমানিস্তান দাবি করেন সেটি নিজামের রাজ্য হায়দ্রাবাদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে। বস্তুতপক্ষে তিনি তিনটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের ধারণা ব্যক্ত করেন।

পরবর্তীকালে তাঁর তথাকথিত উন্নত মস্তিষ্কে ভারতকে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রে ভাগ করার উদ্ভট পরিকল্পনা দেখা দেয়। ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত বারো পাতার পুস্তিকা "India : The Continent of Diana or the Country of Doom" তিনি পাকিস্তান ব্যতীত, বঙ্গইস্তান, ওসমানিস্তান, সিদ্দিকিস্তান, ফারুকিস্তান, হায়দারিস্তান, মুইনিস্তান এবং মোপলাস্তান গঠনের কথা বলেন। এই বিতর্কিত পুস্তিকায় তিনি বলেছিলেন যে, "আমরা অভারতীয় জাতিগুলি অর্থাৎ মুসলমান, দ্রাবিড়, অস্পৃশ্য, খ্রীষ্টান, শিখ, বৌদ্ধ, পার্শীরা চিরকাল ভারতীয়তাবাদের শিকার।" এজন্য তিনি এইসব জাতিগুলিকে নিজেদের "সার্বভৌম জাতি" হিসাবে তুলে ধরতে অনুরোধ করেন।

সপ্তম পাঠ

স্বাধীনোত্তর পাকিস্তানে ইসলামের ভূমিকা
(Role of Islam in Independent Pakistan)

পাকিস্তান সৃষ্টির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সেখানে ইসলাম নামক একটি পবিত্র ধর্মকে কীভাবে রাজনীতির হীন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণভাবে দেখলে মনে হয়, পাকিস্তানের দাবিদাররা এক একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান, ইসলামের ঐতিহ্য বজায় রেখে তার সমৃদ্ধি ঘটাতে সদাতৎপর। মুসলমানদের কাছে শরিয়তী আইন মান্য করা খুব জরুরী, কিন্তু সর্বভারতীয় আইন ও শরিয়তী আইন এই দুরকম আইনের বেড়াজালে আটক থাকাটাও অসুবিধাজনক। তাই তারা একটি স্বতন্ত্র বাসস্থান চায় যেখানে তারা কেবলমাত্র শরিয়তী আইনের দ্বারা শাসিত হবে। আসলে এসব যুক্তির পিছনে ছিল রাজনৈতিক কারণ। যখন বৃটিশরা মুঘলদের একরকম উৎখাত করে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করে তখন থেকেই ভারতীয় মুসলমানদের মনোগত ইচ্ছা ছিল একটি আলাদা দেশের, যেখানে মুসলমানরা শাসনক্ষমতা ভোগ করবে। তাছাড়া, বিশ্বের সকল দেশের মুসলমানদের মধ্যেই তাদের বিশ্বাস ও ধর্মের ভিত্তিতে রাজনীতিকে সংঘটিত করবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। মুসলমানরা যেখানে কর্তৃত্বসম্পন্ন সেখানে দেখা গেছে মুসলিম সংগঠনগুলি দলের আকার নিয়েছে, যাদের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠেছে ইসলামীয় নীতি অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিচালনা করা। এব্যাপারে মিশরের 'মুসলিম ব্রাদারহুড ' অথবা পাকিস্তানের জামাত-ই-ইসলামীর কথা বলা যায়। আর যেখানে মুসলিমরা সংখ্যালঘু সেখানে তাদের স্বাতন্ত্র বিঘ্নিত হচ্ছে এই অজুহাতে দেশের অভ্যন্তরে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য বা একটি পৃথক রাষ্ট্রের দাবি করতে থাকে। এব্যাপারে পাকিস্তানের দাবি একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। কিন্তু বৃটিশদের কাছে পাকিস্তান নামক একটি পৃথক দেশ কোন রাজনৈতিক কারণ দেখালে যে পাওয়া যাবে না, দাবিদাররা সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। একমাত্র ধর্মের যুক্তি দেখালে বৃটিশরা হয়ত রাজী হলেও হতে পারে। তাই তাঁরা শেষ পথ হিসাবে ইসলামকে তুলে ধরেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁদের ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল ও ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট অবিভক্ত ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব অংশের প্রায় ৩ লক্ষ ৬৬ হাজার বর্গমাইল জায়গা নিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর আশা করা গিয়েছিল সৃষ্টিকর্তাদের দাবিমত দেশটিতে ইসলামীয় রীতিনীতি অনুযায়ী শাসন কার্য পরিচালিত হবে এবং দেশটিকে একটি ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করা হবে। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর এর প্রধান স্রষ্টা মহম্মদ আলি জিন্নাকে প্রশ্ন করা হয়, তিনি কিজাতীয় রাষ্ট্র চান ? উত্তরে জিন্না বলেন, তিনি ইসলামিক রাষ্ট্র নয়, পরিবর্তে চান পাকিস্তানকে একটি মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তুলতে। আপাতদৃষ্টিতে দুটিকে প্রতিশব্দ বলে মনে হলেও উভয়ের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। ইসলামিক রাষ্ট্র হল সেই ধরনের রাষ্ট্র যেখানে শাসনব্যবস্থা চালিত হয় ইসলামিক রীতি অনুযায়ী। দেশের সকল আইন শরিয়তী আইনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে প্রণীত হবে এবং সেখানে এমন কোন সাংবিধানিক নিয়মকানুন থাকবে না যা শরিয়ৎ বিরোধী। এখানে মুসলিম ব্যতীত অপরাপর ধর্মের অনুসরণকারীদের জন্য কোন সুযোগসুবিধা বিশেষভাবে দেওয়া হবে না এবং দেশের শাসন ব্যবস্থা চালিত হবে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদের দ্বারা। কিন্তু মুসলমান রাষ্ট্র হল এমনই এক রাষ্ট্র যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সেই রাষ্ট্র কিন্তু ইসলামিক রীতিনীতির দ্বারা শাসিত হবে না, সেখানে তুলে ধরা হবে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার কথা। এখানকার আইন শরিয়তী আইনের সাথে সাযুজ্য রেখে তৈরী করবার কোন কারণ নেই, এখানে শরিয়তী আইনের বিরোধী কোন আইনও প্রণীত হতে পারে। মুসলমান রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের জন্যও আইন প্রণীত হয়, কিছু সুযোগ সুবিধাও দেওয়া হয়, অর্থাৎ স্বার্থ দেখা হয় যা ইসলামিক রাষ্ট্রে চিন্তা করা

যায় না, আবার দেশটি মুসলমানদের দ্বারাই শাসিত হবে এমন কোন ধরাবাঁধা নিয়মও নেই। আইনকানুন এখানে আধুনিক নিয়মানুযায়ী বিশেষতঃ গণতন্ত্রের ধাঁচে গঠন করা হয়ে থাকে। যাই হোক, জিন্না স্বাধীন পাকিস্তান পাবার পর ঘোষণা করলেন তিনি পাকিস্তানকে মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তুলতে চান।

জিন্না আসলে ছিলেন একজন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমান এবং তাঁকে একজন আধুনিকতাবাদী (modernist) বলেও অভিহিত করা যেতে পারে। প্রসঙ্গতঃ পাকিস্তান সৃষ্টির সময় থেকেই মুসলমানরা দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল — একটি শ্রেণী পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, পেশাদার রাজনীতিবিদ, উচ্চবিত্ত এবং মূলতঃ বণিক ও জমির মালিক। অর্থাৎ অগ্রসর মুসলমানরা একটি গোষ্ঠীর অন্তর্গত হয়েছিল যাদের আধুনিকতাবাদী বলে অভিহিত করা যেতে পারে। মুসলমানদের অপর গোষ্ঠীটি ছিল গোঁড়া এবং তাদের উলামা (Ulama) নামে অভিহিত করা হত। এই আধুনিকতাবাদীরাই প্রথম স্বাধীন স্বতন্ত্র পাকিস্তানের দাবি তোলেন, এবং জিন্নার উপর এদের প্রভাব এত বেশী পড়েছিল যে তিনি শেষ পর্যন্ত একজন অবিভক্ত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রবক্তা থেকে স্বাধীন ইসলামিক রাষ্ট্রের যোদ্ধায় পরিণত হয়েছিলেন। জিন্না কিন্তু পাকিস্তান গড়ে ওঠার পরই ঘোষণা করলেন, পাকিস্তানের বাহ্যিক আবরণ হিসাবে ইসলামকে রাখা হলেও এর সরকার বৃটিশ ও ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অনুযায়ী চালিত হওয়া উচিত। কারণ পাকিস্তানে বহু অমুসলমান রয়েছে যাদেরও মুসলমানদের সমান অধিকার ভোগ করবার অধিকার রয়েছে। তাই পাকিস্তান কখনোই আধুনিক গণতান্ত্রিকতার নীতি অস্বীকার করতে পারে না। পাকিস্তানের পক্ষে পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থা হবে আদর্শ এবং দেশটি ন্যায়, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের আধুনিক নীতি অনুযায়ী চালিত হওয়া উচিত। বস্তুতঃপক্ষে, পাকিস্তানকে পাবার জন্য ইসলামকে যথাসম্ভব কাছে টেনে আনা হলেও, স্বাধীন পাকিস্তান পাবার পর তাকে আবার দুরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা হল।

জিন্না পাকিস্তানকে মুসলমান রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার মনোগত ইচ্ছা জানাবার পর বেশীদিন জীবিত থাকেননি। ১৯৪৮ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন ততদিন তাঁর বক্তব্য বা ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে বেশী হৈ চৈ হয়নি। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই উলামারা এর বিরোধিতা করতে থাকে। তাদের বক্তব্য ছিল পশ্চিমী উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কোরান ও সুন্নার শিক্ষা বিরোধী এবং পাকিস্তানী সংবিধানে এই উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আদলে গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থান দেবার অর্থ যে শপথ নিয়ে সংগ্রাম করে পাকিস্তান জয় করা হয়েছিল তার অবমাননা করা। তাঁদের বক্তব্য হল খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে আরবে যে শরিয়তী অনুশাসন চলত সেই অনুযায়ী পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থাকে পরিচালিত করা উচিত। পাকিস্তানে যে দুচারজন অমুসলমান রয়েছে তাদের নিয়ে অত চিন্তাভাবনা করবার কোন দরকার নেই। উলামারা চেয়েছিলেন খলিফার (Caliphs) আদলে একটি শক্তিশালী শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে। ইসলামিক আইন তাঁদের মতে যথেষ্ট শক্তিশালী এবং বর্তমান দিনের পক্ষেও তা যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। মুসলমান নারীরা পুরুষদের তুলনায় নিকৃষ্ট জীব এরকম একটা ধারণা তাদের মধ্যে ছিল এবং রাজনীতিতে তাদের অংশগ্রহণের কোন অধিকার থাকা উচিত নয় এরকম বক্তব্যও তাঁরা রেখেছিলেন। পাশাপাশি অমুসলমানদের রাজনীতিতে কোন স্থান দেবার পক্ষপাতী তাঁরা ছিলেন না। উলামাদের মতে, অমুসলমানরা হবে Dhimmies বা রক্ষিত মানুষ (the protected people)। আইন প্রণয়নে তাদের বক্তব্য পেশের কোন অধিকার থাকবে না, আইনের প্রয়োগ তারা করতে পারবে না এবং গুরুত্বপূর্ণ সরকারী দপ্তরে তাদের উচ্চপদস্থ কর্মী হিসাবে নিযুক্ত হবার কোন অধিকার থাকবে না। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, মুসলমানদের এই গোষ্ঠীর একটা গোঁড়া ও মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গী ছিল যা পশ্চিমী মনোভাবাপন্ন মুসলমান গোষ্ঠীর সংস্কৃতি বিরোধী।

স্বাধীনতা পরবর্তী পাকিস্তানে ইসলামের মর্যাদা কি হবে তা নিয়ে দুই পরস্পর বিরোধী শিবিরের বাদ প্রতিবাদের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট উত্তাল পরিবেশে একটি গণ পরিষদ তৈরী করা হয় যা ১৯৪৯ সালে Objective Resolution পেশ করে। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সাম্য, সামাজিক ন্যায়, সহনশীলতার ইসলামিক নীতি অনুযায়ী এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সেগুলি কার্যকর করা হবে। রাষ্ট্রকে কোরান ও সোন্নায় মুসলমানদের জীবনযাপনে যে ইসলামিক রীতি রয়েছে তাকে কার্যকর করতে এগিয়ে আসতে হবে। তবে রাষ্ট্রকে এইভাবে ইসলামিক রীতিনীতি কার্যকর করার পাশাপাশি সংখ্যালঘুদের জন্যও এমন কিছু সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে যার ফলে তারাও তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে পারে। এই প্রস্তাব এ ঘোষণাও করেছিল যে, ব্যক্তি মৌলিক অধিকারও ভোগ করতে পারবে তবে তা হবে আইন ও নৈতিকতার অধীন। এইভাবে গণপরিষদের Objective Resolution ভাষার মারপ্যাঁচে গোঁড়া ও পশ্চিমী দুধরনের মুসলমানদেরই মোটামুটি শান্ত করতে পেরেছিল যদিও তারা উলামাদের অন্যতম মূল দাবি শরিয়তের নির্দেশমত খলিফা ধরনের শাসন ব্যবস্থার স্বীকৃতিকে নিপুণভাবে পাশ কাটিয়ে গিয়েছিল। তারা ওয়েষ্ট মিনিস্টার ধাঁচের পার্লামেন্টীয় আকারকে সরকারের কাঠামো হিসাবে সমর্থন করেছিল ও মধ্যযুগীয় দেবতত্ত্বকে কোণঠাসা করেছিল।

প্রায় একই ধরনের বক্তব্যের প্রতিধবনী পাওয়া গেছে লিয়াকৎ আলি খাঁর বক্তব্যে। পাকিস্তানের স্রষ্টা ও দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি জিন্নার মৃত্যুর পর দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খাঁ পাকিস্তানের সর্বময় কর্তা হিসাবে নিজেকে অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। ১৯৫১ সালে আততায়ীর গুলিতে নিহত হবার আগে পর্যন্ত তিনি উলামাদের গোঁড়া মধ্যযুগীয় চিন্তাধারাকে দূরে সরিয়ে রেখে ইসলামিক রাষ্ট্রের নয়া সংজ্ঞা অর্থাৎ মুসলমান রাষ্ট্রের ধারনাকে কার্যকর করতে বদ্ধ পরিকর হন। তিনিও পাকিস্তানী সরকারের ক্ষেত্রে বৃটিশ ধর্মনিরপেক্ষতার মানকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, যা ভারত করেছিল।

লিয়াকৎ আলির মৃত্যুর পর ১৯৫৩ সালে অরহর (Ahrar) নামক উলামা দ্বারা সমর্থিত পাকিস্তান বিরোধী মুসলমান গোষ্ঠী একটি বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু করে আহ্‌মাদিস (Ahmadis) দের বিরুদ্ধে। অরহরদের দাবি ছিল আহ্‌মাদিস্‌দের অ-মুসলমান সংখ্যালঘু বলে ঘোষণা করতে হবে এবং তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী মহম্মদ জাকরউল্লা খাঁকে বরখাস্ত করতে হবে কারণ তিনি একজন আহ্‌মাদিস্‌। এই দাবির পশ্চাতে কারণ ছিল এই, গোঁড়া পন্থীদের মতে, শাসনকার্যে অ-মুসলমানদের কোন ঠাই নেই। এই আন্দোলন এত তীব্ররূপ পরিগ্রহ করে যে, লাহোর জেলার জনজীবন বিপর্যস্ত হয় এবং সেখানে সামরিক শাসন জারী করতে হয়। এরপর Panjab Disturbances Inquiry Committee গঠন করা হয়, যা সিদ্ধান্তে আসে উলামাদের দাবিমত ইসলামিক রাষ্ট্র গঠন করা হলে তা আজকের দিনে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়ে উঠবে না। এই রাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতাও থাকবে না কারণ শরিয়ৎ অনুযায়ী সার্বভৌম হলেন ঈশ্বর। অমুসলমানদের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গী উলামারা নিতে চেয়েছে তা কার্যকর করা হলে ভারতেও অহিন্দুদের প্রতি একই আচরণ হবার সম্ভাবনা থেকে যায়, তাছাড়া, দেশের মধ্যে তারা জনসমর্থন হারাবে, অন্যান্য দেশও তাদের ভাল চোখে দেখবে না। রিপোর্টে উলামাদের শুধু সমালোচনা করা হল তাই নয়, তাদের ইসলামিক রাষ্ট্রের ধারণাটি প্রতিক্রিয়াশীল, মতাদর্শগত ভাবে বিভ্রান্ত এবং রাজনৈতিক দিক থেকে সংহতি নাশক একথাও বলা হল।

যাই হোক, ১৯৪৮ সালে গঠিত গণপরিষদ প্রণীত প্রথম সংবিধান গৃহীত হয় ১৯৫৬ সালে। এই সংবিধানের প্রস্তাবনায় পাকিস্তানকে 'ইসলামিক প্রজাতন্ত্র' বলে বর্ণনা করা হয় এবং Objective Resolution এর বক্তব্যের প্রতিধবনী করে বলা হয়, পাকিস্তানে কোরান ও সোন্নার নীতি অনুসৃত হবে। এই সংবিধানে ভারতীয় সংবিধানের

মত রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি রাখা হল এবং এখানে বলা হল সংখ্যালঘুদের জন্য যথাযোগ্য সুযোগ সুবিধা ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। এই নির্দেশমূলক নীতি অবশ্য এখানে প্রথম থেকেই সকলকে মান্য করতে বাধ্য করানো হল। সংবিধানে আরও বলা হল পাকিস্তান রাষ্ট্রের কর্তব্য হবে মুসলমান দেশগুলির মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করা, পাকিস্তানের মানুষদের কোরান ও সোন্নার নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপনে উৎসাহিত ও বাধ্য করা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ করা, নাগরিকদের জীবন যাপনের মানোন্নয়ন করা এবং সংখ্যালঘুদের অধিকারকে বজায় রাখা। কিন্তু মূল সংবিধানের মাত্র তিন জায়গায় ইসলামীয় রীতিনীতির পরিচয় আমরা পাই। প্রথমটি পাওয়া যায় ৩২(২) ধারায় যেখানে বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে গেলে তাঁকে একজন মুসলমান হতে হবে এবং দ্বিতীয়তঃ ১৯৭ নং ধারায় বলা হয়েছিল, রাষ্ট্রপতিকে ইসলামীয় গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে যা দেশের মুসলমান সমাজকে পূর্ণ ইসলামীয় রীতি অনুযায়ী পুনর্গঠিত হতে সহায়তা করবে। এছাড়া ১৯৮ নং ধারায় বলা হয়েছিল, রাষ্ট্রপতি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিশন গঠন করবেন যা দেশের প্রচলিত আইনকে ইসলামীয় নীতির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ করে তুলবে। রাষ্ট্রপতি সংবিধান কার্যকর হবার এক বছরের মধ্যে কমিশন গঠন করবেন এবং কমিশন পাঁচ বছরের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করবে। এই রিপোর্ট জাতীয় সংসদে পেশ করা হবে ও সেখানে বিচার বিবেচনার পর তা কার্যকর করবার ব্যবস্থা হবে।

১৯৫৬ সালের সংবিধানের ৩২ (২) ধারার দাবিমত রাষ্ট্রপতিকে মুসলমান হতে হবে, এই যুক্তি প্রমাণ করে না যে ১৯৫৬ সালের সংবিধান ইসলামীয় রাষ্ট্রের প্রতিফলন ঘটাচ্ছে। দেখা গেছে, বেশীর ভাগ ধর্মনিরপেক্ষ দেশেই রাষ্ট্রপ্রধান সেদেশের প্রধান ধর্মে দীক্ষিত। বৃটেন, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশের কথা বিবেচনা করলে একথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। সুইডেন ও ডেনমার্কের সংবিধানে একথা পরিষ্কার বলা আছে যে, দেশের সার্বভৌম হবেন একজন লুথারীয়। মার্কিন সংবিধানে এরকম কোন উল্লেখ না থাকলেও সেখানকার রাষ্ট্রপতি বরাবরই হচ্ছেন একজন প্রোটেস্টান্ট ধর্মাবলম্বী। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে দেশের মূল ধর্ম ইসলাম, অতএব এখানকার রাষ্ট্রপ্রধান মুসলীম হবেন এটাই স্বাভাবিক।

১৯৫৬ সালে প্রথম পাক সংবিধান গৃহীত হবার দুবছর পর ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারী হয়। ক্ষমতায় আসেন মার্শাল আয়ুব খাঁন। পাকিস্তানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এদেশ দীর্ঘ সময় সামরিক শাসনের অধীন ছিল যে সময়টুকুতে আপাতদৃষ্টিতে সামরিক শাসন ছিল না সে সময়েও সামরিক কর্তাদের ও আমলাদের অঙ্গুলি সংকেতে সরকার চলেছে। কারণ ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত এদেশে যদিও সরকারের সুস্থিতি ছিল কিন্তু তারপর ১৯৫১ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত যে অসামরিক শাসন ছিল তার ভিত্তি ছিল অত্যন্ত দুর্বল এই সময় ঘন ঘন সরকারের পরিবর্তন ঘটে ও কোন ক্যাবিনেটের আয়ু এক বছর দু-তিন মাসের বেশী হয়নি। এই সময় প্রচুর ব্যক্তিকেন্দ্রিক দল তৈরী হয় যারা পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, কালোবাজারী চরম সীমা ছাড়িয়ে যায়, ব্যবসা থেকে যে যা ইচ্ছা মুনাফা করতে থাকে, সমাজ বিরোধীরা চাঙ্গা হয়ে ওঠে এবং দেশে এক তীব্র অরাজকতা দেখা দেয়। সরকারের ঘন ঘন পরিবর্তনের ফলে শাসকদের আমলাদের কথামত কাজ করতে হত কারণ তাদের নিজস্ব কোন অভিজ্ঞতা তৈরী হত না যার ভিত্তিতে তারা দেশশাসন করতে পারে। এই অবস্থায় আমলা ও সামরিক কর্তারা জোট বেঁধে নিজেদের সুবিধামত নীতি প্রণয়ন করিয়ে শাসনকার্য চালাত। ১৯৫৬ সালে প্রথম সংবিধান গৃহীত হলেও তা কার্যকরী হয়নি, আবার বিগত দশ বছরে একবারও নির্বাচন হয়নি —এমতাবস্থায় পাকিস্তানী জনমানসে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে পাকিস্তানে বোধহয় কোনদিনই নির্বাচিত সংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। ১৯৫৭ সালের একটি ধর্মীয় সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে তৎকালীন পাক রাষ্ট্রপতি

ইস্কান্দার মির্জা সংবিধান বাতিল করেন ও দেশের সকল প্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপ অবৈধ ঘোষণা করে দেশে সামরিক শাসন জারী করেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা ছিল এই যে তিনি সামরিক কর্তাদের চাপে সামরিক শাসন জারী করতে বাধ্য হন। এরপর ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর কিন্তু আয়ুব খানকে ক্ষমতায় আনতে তাঁকে বাধ্য করা হয়। ক্ষমতায় আসার দুসপ্তাহের মধ্যে ইস্কান্দার মির্জাকে তিনি পদচ্যুত করেন ও নিজেকে প্রেসিডেন্ট বলে ঘোষণা করেন। ৮ই অক্টোবর তিনি Radio Pakistan থেকে জনগণের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন, তাঁর কোন রাজনৈতিক উচ্চাশা নেই, দীর্ঘদিন তিনি ক্ষমতায় থাকতে চান না, যতদ্রুত সম্ভব নির্বাচন করে সামরিক শাসনের অবসান তিনি ঘটাবেন ও সেই অনুযায়ী উপযুক্ত শাসক নিযুক্ত করবেন। তিনি এসেছেন কেবল এদেশের অরাজকতা দূর করতে। তবে নির্বাচন কবে হবে সেকথা এখনই বলা যাচ্ছে না। একমাত্র ঘটনা পরম্পরা ও দেশের পরিস্থিতিই সঠিকভাবে তা বলতে পারে। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেছে তিনি নিজেকে ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে থাকেন ও নির্বাচনে তিনি নিজেই যাতে জয় লাভ করতে পারেন তার জন্য Basic Democracy র ব্যবস্থা করেন। ১৯৫৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে আয়ুব জয়লাভ করে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হন। তিনি আর সামরিক শাসক রইলেন না, হয়ে উঠলেন দেশের নির্বাচিত ও জনগণের বৈধ প্রতিনিধি।

সামরিক শাসক আয়ুব খাঁ আপাত দৃষ্টিতে গণতান্ত্রিক ভাবে ফিরে এসে নূতন সংবিধান রচনার কথা ঘোষণা করলেন। তিনি সংসদীয় গণতন্ত্র যা ১৯৫৬ সালের সংবিধানে উপযুক্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছিল তার বিরোধিতা করে বলেন এখানে রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা করা উচিত। পাকিস্তানের জনগণ, বৃটেনের আদলের সংসদীয় গণতন্ত্রের অনুপযুক্ত। অবশ্য তিনি গণতন্ত্রের পূর্ণ বিরোধিতা করেননি পরিবর্তে তিনি ইন্দোনেশিয়ার সুকর্নের আদলের গণতন্ত্রের প্রস্তাব দেন যা হল controlled বা guided democracy র অনুরূপ।

আয়ুব খাঁন কিন্তু গোঁড়া মুসলমান ছিলেন না। তিনি মনে প্রাণে চেয়েছিলেন দেশে ধর্মীয় গোঁড়ামির অবসান ঘটুক এবং ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে একটা সুস্পষ্ট সীমারেখা থাকুক। ১৯৬২ সালে অর্থাৎ ক্ষমতায় আসার চার বছর তিনি পাকিস্তানের যে দ্বিতীয় সংবিধান ঘোষণা করেন সেখানে তাই প্রস্তাবনা থেকে 'ইসলামিক' শব্দটি বাদ দেন ও বলেন, পাকিস্তান হবে এমন একটি প্রজাতন্ত্র যেখানে মানুষের স্বাধীনতা থাকবে। তিনি অবশ্য উলামাদের সন্তুষ্ট করবার জন্য এই ব্যাখ্যা দেন যে পাকিস্তান নিশ্চয়ই ইসলামিক আদর্শ বাস্তবায়িত করবে কিন্তু ইসলামিক শব্দের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত ভাল দেখায় না তাই বাদ দেওয়া হচ্ছে। এর পিছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। তিনি ইসলামিক নীতির প্রতিদান হিসাবে দুটি প্রতিষ্ঠান গঠনের কথা বলেন যার একটি হল Advisory Council of Islamic Ideology এবং অপরটি Islamic Research Institute.

Advisory Council of Islamic Ideology র সদস্য সংখ্যা ৫ এর কম কিংবা ১২ র বেশী হতে পারবে না এবং সংখ্যাটি ঠিক কত হবে তা নির্ধারণ করবেন রাষ্ট্রপতি। সদস্য নির্বাচনের সময় রাষ্ট্রপতি ব্যক্তির ইসলাম অনুধাবন ক্ষমতা ও দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আইনগত ও প্রশাসনিক সমস্যা সমাধানে সক্ষম এমন ব্যক্তিদের উপর গুরুত্ব দেবেন। এক একজন ব্যক্তি নির্বাচিত হবেন তিন বছরের জন্য। এই কাউন্সিলের কাজ হবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরের আইনসভায়, ও পাকিস্তানের মুসলমানদের জীবনযাপন যাতে ইসলামিক নীতির ভিত্তিতে হয় তার জন্য সুপারিশ প্রেরণ। এই সুপারিশের ভিত্তিতে কেন্দ্র ও রাজ্যে আইন প্রণীত হবে। দ্বিতীয়তঃ সেই সকল আইন বাতিলের সুপারিশ করা যা ইসলাম নীতি বিরোধী এবং তৃতীয়তঃ এ সংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্রপতি, কেন্দ্র ও রাজ্য আইনসভা যে পরামর্শ চাইবে সেই অনুযায়ী সুচিন্তিত পরামর্শ দেওয়া হবে এই কাউন্সিলের কাজ।

Islamic Research Institute ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এর কাজ হবে মুসলমান সমাজকে

পুরোপুরি ইসলামীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করা। কিন্তু এই দুই প্রতিষ্ঠান নিয়েই উলামারা সন্তুষ্ট থাকেনি। তারা বারংবার সংবিধানে 'ইসলামিক' শব্দটি যুক্ত করবার দাবি পেশ করে চাপসৃষ্টি করতে থাকে, অবস্থা একসময় এমন হয় যে আয়ুবের ক্ষমতায় থাকাটাই তখন প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। এমতাবস্থায় গদি বাঁচাবার জন্য আয়ুব সংবিধান প্রবর্তিত হবার এক বছর পর ১৯৬৩ সালের ২৪ শে ডিসেম্বর সংবিধান সংশোধন করে পাকিস্তানকে ইসলামিক রাষ্ট্রের মর্যাদা দেন। এই সংশোধনীতে আরও বলা হয়, দেশে যে কর্তৃত্ব প্রযুক্ত হবে তা ঈশ্বর কর্তৃক সীমায়িত গন্ডীর মধ্যে থাকবে।

আয়ুব খাঁন এই সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করে ১৯৬৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত টিকে থাকেন। ২৫শে মার্চ তিনি সামরিক বাহিনীর Commander-in-Chief ইয়াহিয়া খানকে তাঁর পদ অসুস্থতা এবং সামরিক শাসনের দশবর্ষ পূর্তি উৎসবকে কেন্দ্র করে দেশে যে অস্থিরতা হয় তার কারণে তাঁর পদ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। অর্থাৎ দেশে দ্বিতীয়বার সামরিক শাসন জারী হল। কিন্তু পাকিস্তানের জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে পুনরায় গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনবার জন্য চাপসৃষ্টি করতে থাকেন। তখন ইয়াহিয়া খান বাধ্য হয়ে ১৯৭০ সালে দেশে সাধারণ নির্বাচন করেন। নির্বাচনে একটি বিচিত্র অবস্থা সৃষ্টি হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি (PPP) জয়লাভ করে আর পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ। জাতীয় আইনসভায় আওয়ামীলীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে। বেশী তাই মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের সরকার গঠন করবার কথা। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ তাতে রাজী নন। এমতাবস্থায় পাকিস্তানের পশ্চিম ও পূর্ব অংশে যুদ্ধ বাধে যার ফলে পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে পরিণত হয়। আর পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান হন PPP র জুলফিকার আলি ভুট্টো।

ভুট্টো ক্ষমতায় এসে একটি নূতন সংবিধান ঘোষণার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি নিজে একজন মনে প্রাণে বিদেশী, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমান ছিলেন। ইসলামিক রীতিনীতি মান্য করে দেশে শাসনকার্য পরিচালিত হোক তা চাননি, তবে বাস্তব অবস্থা মেনে ১৯৭৩ সালে গৃহীত পাকিস্তানের তৃতীয় সংবিধানে পাকিস্তানকে 'ইসলামিক' রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেন। তিনি, আবার রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এই সংবিধানে তিনি Council of Islamic Ideology নামক একটি সংস্থা গঠনের প্রস্তাব রাখেন যার সদস্য সংখ্যা ৮এর কম বা ১৫ এর বেশী হবে না। কাউন্সিলের গঠন বিষয়ে তিনি কয়েকটি শর্ত আরোপ করেন। তিনি বলেন, কাউন্সিল এমনভাবে গঠিত হবে যার ফলে সেখানে ইসলামের বিভিন্ন মতাবলম্বী গোষ্ঠীর যথার্থ ও সঠিক প্রতিফলন ঘটে। কাউন্সিলে অন্তত দুজন এমন ব্যক্তি থাকবেন যারা সুপ্রীম কোর্ট অথবা হাইকোর্টের বিচারকের পদে আসীন ছিলেন। চারজন সদস্য হবেন এমন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে যারা গত ১৫ বছর যাবৎ ইসলামের উপর গবেষণায় নিয়োজিত আছেন এবং একজনকে মহিলাদের মধ্য থেকে নিযুক্ত হতে হবে। এই সংস্থার কাজ হবে প্রথমতঃ শরিয়তী আইনের সাথে সাযুজ্য রেখে আইন প্রণয়নে সাহায্য করা। দ্বিতীয়তঃ, ইসলামিক নীতি বিরোধী আইনগুলিকে বাতিল করে দেবার সুপারিশ করা। তৃতীয়তঃ, যে সকল আইন দেশে প্রচলিত আছে সেগুলিকে ইসলামিক নীতি অনুযায়ী পুনর্গঠিত করা যায় কিনা তা খাতিয়ে দেখা। চতুর্থতঃ, ইসলামিক নীতিগুলিকে এমনভাবে একত্রিভূত করা যার ফলে মুসলমানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছে সেগুলি গ্রহণযোগ্য হয় এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ভবিষ্যৎ দিশারী হিসাবে কাজ করে। এছাড়াও রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল এবং কেন্দ্র ও রাজ্য আইনসভা যদি কোন বিষয়ে পরামর্শ চায় তা সরবরাহ করাও এই সংস্থার কাজ হবে। এই কাউন্সিল সাত বছরের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে বাধ্য থাকবে এবং কেন্দ্র ও রাজ্য আইনসভাকে সেগুলি কার্যকর করতে হবে।

বস্তুতঃ পক্ষে, ভুট্টো একজন ঝানু রাজনীতিবিদ্ ছিলেন বলেই তাঁর নয়া সংবিধানে ইসলামকে রাখলেন এবং

Council of Islamic Ideology কে পূর্বের এজাতীয় সংস্থা থেকে অধিক ক্ষমতাশালী করে তুলেছিলেন। আসলে তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে ধর্মের ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন না, কিন্তু একথা খুব দ্রুত উপলব্ধি করেছিলেন যে, ক্ষমতায় থাকতে গেলে তাঁর সামনে ইসলামকে ব্যবহার করা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। কিন্তু ইসলামের জন্য এত করেও ভুট্টো ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে পারেননি। ১৯৭৭ সালে তিনি দেশে সাধারণ নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেন। স্থির হয় ৭ই মার্চ জাতীয় স্তরে এবং ১০ই মার্চ রাজ্য স্তরে নির্বাচন হবে। নির্বাচনে PPP বিপুল ভোটে জয়লাভ করে ও জুলফিকার আলি ভুট্টো পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হন। জয়লাভের অব্যবহিত পরেই তিনি Islamic Socialism এর কথা বলেন। একাজ অবশ্য তিনি তাঁর ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করবার জন্য করেছিলেন। এই সময় বিরোধী শিবির পাল্টা প্রচার করে যে তিনি শত্রু নিধনের জন্যই Islamic Socialism এর কথা বলছেন। ফলে বেশীরভাগ বড় বড় শহরে প্রচন্ড বিক্ষোভ, বিশৃঙ্খলা ও উত্তেজনা দেখা দেয়। পরিস্থিতি এমন হয়ে ওঠে যে ভুট্টোকে এই সকল শহরে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সেনাবাহিনীর আশ্রয় নিতে হয় এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি আবার সামরিক শক্তিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিজের পতনের বীজ রোপন করলেন। ১৯৭৭ সালের ৫ই জুলাই দেশের সামরিক বাহিনী হঠাৎ ক্ষমতা দখল করে। রাষ্ট্রপ্রধান হন জিয়াউল হক। শেষ হল পাকিস্তানের ইতিহাসের দ্বিতীয় অসামরিক শাসনের যুগ, সূচনা হল তৃতীয় সামরিক শাসনের পর্বের। জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় এসে ১৯৭৯ সালের ৪ঠা এপ্রিল রাওয়ালপিণ্ডির কারাগারে সমগ্র বিশ্বের জনমতকে উপেক্ষা করে ভুট্টোকে ফাঁসি দেন।

জেনারেল জিয়া তাঁর শাসনকালে ক্ষমতার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করবার জন্য ১৯৭৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী Islamic Package এর কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, এখন থেকে দেশের শাসন ব্যবস্থা, অর্থনীতি ইসলামিক নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হবে। সুদ নেওয়া ও দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হবে। ফৌজদারি অপরাধের শাস্তি হিসাবে প্রকাশ্য স্থানে বেত্রাঘাতের প্রথা চালু করা হবে যা শরিয়তী আইনে রয়েছে। এছাড়াও এই package এ তিনি সুপ্রীম কোর্ট ও প্রত্যেক হাইকোর্টে শরিয়তী বেঞ্চ গঠনের কথা বলেন এবং এটাই হবে আপীলের শেষ স্তর। ১৯৮০ সালে জেনারেল জিয়া চতুর্থ পাক সংবিধান ঘোষণা করেন। ১৯৮১ সালের মার্চ মাসে ইসলামিক রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণা পোষণ করেন। তিনি বলেন, তাঁর ইসলামিক রাষ্ট্রের কর্তব্য হবে পাকিস্তানী সমাজের ইসলামীকরণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা। এই সময় তিনি কোরানে উল্লিখিত কতকগুলি শাস্তিকে রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে বৈধ করে তোলেন। কোরানে মদ্যপানের শাস্তি ৮০বার বেত্রাঘাত, ভেজাল মেশানোর শাস্তি পাথর ছুড়ে মারতে মারতে মৃত্যুঘটানো, চুরির শাস্তি ডান হাত কেটে দেওয়া প্রভৃতিকে দেশে বাস্তবায়িত করেন। হাইকোর্টকে তিনি, কোন আইন কোরান ও সোন্না বিরোধী মনে করলে বাতিল করবার ক্ষমতা দিলেন। কোরানের নীতি অনুযায়ী তিনি সুদমুক্ত ব্যাঙ্কিং প্রথা চালু করেন যার ফলে গরীবদের প্রভূত উপকার হয়েছিল।

তাঁর শাসনকালে বারংবার নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনবার দাবি উঠেছে। বারংবার তিনি নির্বাচনের দিন ঘোষণা করে পিছিয়ে দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৮৮ সালে তিনি দেশের সাধারণ নির্বাচন আহ্বান করেন। নির্বাচনের দিন ঘোষণার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর পর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে PPP জয়লাভ করে ও জুলফিদার আলি ভুট্টোর কন্যা বেনজির ভুট্টো ক্ষমতায় আসেন। তিনিও তাঁর পূর্বসুরীদের মতই ইসলাম তোষণ নীতি চালু রাখেন। তাঁর সরকারও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিছুকালের মধ্যেই (১৯৯০সালে) রাষ্ট্রপতি গোলাম ইশাক খান তাঁর সরকারকে বরখাস্ত করেন ও দেশের সাধারন নির্বাচন আহ্বান করেন। এই নির্বাচনে PPP ক্ষমতায় আসতে পারেনি, বিরোধী দল মুসলীম লীগ ক্ষমতায় আসে। কিন্তু তারাও ইসলাম তোষণ নীতির কোন পরিবর্তন ঘটায়নি। এই সরকারও সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে অল্পদিনের মধ্যে ভেঙ্গে

যায়। ১৯৯২ সালের নির্বাচনে বেনজির ভুট্টো পুনরায় ক্ষমতায় আসেন এবং তাঁর পুরাতন নীতিতে অনড় থাকেন। ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনে পর নওয়াজ শরিফের নেতৃত্বে মুসলীম লীগ সরকার গঠন করলেও এ পর্যন্ত পূর্বে প্রচলিত অবস্থার কোন পরিবর্তন ঐ সরকার ঘটায়নি।

বস্তুতপক্ষে, পাকিস্তান সৃষ্টির সময়কার ইতিহাসের মত পাকিস্তান গঠিত হবার পরবর্তীকালের রাজনৈতিক ইতিহাসেও ইসলাম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। সমগ্র বিশ্বে মাত্র দুটি দেশ আছে যাদের অস্তিত্ব বজায় রয়েছে ইসলামের জন্য। দেশগুলির মধ্যে একটি হল ইসরায়েল (ইসলাম বিরোধীতার জন্য) ও অপরটি পাকিস্তান। পাকিস্তানে প্রচুর রাজনৈতিক সমস্যা রয়েছে, রয়েছে অর্থনৈতিক সমস্যা। সামরিক বাহিনীরও দেশ শাসনের প্রচন্ড প্রবণতা রয়েছে। কিন্তু কি সামরিক, কি অসামরিক, কোন শাসনেই দেশের প্রকৃত অবস্থার উন্নতি ঘটেনি। আসলে তার জন্য প্রকৃত কোন চেষ্টাও হয়নি। পরিবর্তে নিজেদেরকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতেই শাসকরা উৎসাহী ছিলেন এবং একাজে তাঁরা নির্লজ্জের মত ব্যবহার করেছেন ইসলামকে, ইসলাম নামক পবিত্র একটি ধর্ম রাজনীতির নোংরা খেলনায় ব্যবহৃত হয়েছে। ইসলামকে একসময়ে Cementing Force হিসাবে দেখাবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সেই ইসলাম কি অবিভক্ত ভারতের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ রাখতে পেরেছে ? পাকিস্তান তো ১৯৭১ সালে দুটুকরো হয়ে গিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে । অবশ্য এই বিভাজনের জন্য ইসলাম ধর্মকে কোনভাবেই দায়ী করা চলে না একথা সত্য, কিন্তু ইসলাম এই বিভেদকে যে রোধ করতে পারেনি সেকথাও সমান সত্য। পাকিস্তান দেশটির অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত করুণ। কিন্তু তাকে প্রতিবেশী দেশের সাথে প্রতিযোগিতা করে সামরিক অস্ত্র ক্রয় করে প্রচুর অর্থের অপচয় করতে হচ্ছে। ফলে দেশের প্রকৃত সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। দেশে যে এত অশান্তি রয়েছে তার মূল কারণ অর্থনৈতিক সমস্যা। এই সমস্যাকে চাপা দিতে শাসকরা ব্যবহার করছেন ইসলামকে। তাই পাকিস্তানের রাজনীতিতে ধর্ম আজও একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। কিন্তু এইভাবে সমস্যার সমাধান না করে তাকে কোনক্রমে ঠেকিয়ে রেখে দেশকে টিকিয়ে রাখা অত্যন্ত কঠিন। তাই পাকিস্তানের শাসকদের উচিত দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসা—এতে তাঁদের শাসনের ভিত্তি যথার্থ অর্থেই মজবুত হবে।

Further Readings :

1. Sharan, P., *Political System of Pakistan.*
2. Burki, S. J., *Pakistan Under Bhutto : 1971-77*
3. Ali, T., *Pakistan : Military Rule or People's Power.*
4. Pye, L. W., *Asian Power and Politics.*
5. Taylor, D. and Yapp, M.(ed.), *Political Identity in South Asia.*

অষ্টম পাঠ

সিন্ধের জাতিগত সমস্যা ও মহাজির কোয়ামি মাহাজ (MQM) এর আন্দোলন

[Ethnicity in Sind and the Movement of the Mahajir Quami Mahaz (MQM)]

জাতিগত রাজনীতি বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিরও একাধিক কারণে জাতিগত রাজনীতির অভিজ্ঞতা হচ্ছে। পাকিস্তান একটি বহুজাতি গোষ্ঠীভিত্তিক রাষ্ট্র যার আঞ্চলিক বৈষম্যের এবং অসম সুযোগসুবিধার বন্টনের ফলে পাকিস্তানের বিভিন্ন জাতিগুলি 'জাতিগত জাতীয়তাবাদের' প্রকোপ থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারেনি। সৈয়দ ভালি রাজা নাসের (Seyyed Vali Raja Nasar) মন্তব্য করেছেন যে, ইসলামকে কেন্দ্র করে যদিও পাকিস্তানের উদ্ভব হয়েছে তথাপি তাকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে ইসলাম যথেষ্ঠ বলে কখনোই বিবেচিত হয়নি। কারণ এথনিক বিষয় সংক্রান্ত ধারণার সাথে ইসলাম সমার্থকরূপে গণ্য হতে পারে না। কিন্তু ইসলামের সাহায্যেই বর্তমানে এথনিক সমস্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলেছে। সমসাময়িক পাকিস্তানে জাতিগত রাজনীতির অন্যতম পীঠস্থান হল সিন্ধুদেশ। এর পিছনে কতগুলি ঐতিহাসিক, আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক কারণ রয়েছে।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের সময় পাকিস্তানের ভৌগোলিক এলাকায় বসবাসকারী হিন্দুরা ভারতে চলে আসেন এবং পশ্চিম ও উত্তর ভারতের উর্দু ভাষাভাষি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলিম জনসাধারণ পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। এই সকল মুসলমান যারা পাকিস্তানে নূতনভাবে বসতি স্থাপন করেন তারাই মহাজির সম্প্রদায় নামে পরিচিত। এই মহাজির সম্প্রদায় প্রকৃত সিন্ধীবাসিদের তুলনায় বেশী সুবিধা ভোগী ছিল। যেমন 70% মহাজির শিক্ষিত, অন্যদিকে মাত্র 10% প্রকৃত অধিবাসী ছিল শিক্ষিত। তাছাড়া মহাজির সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকতর ব্যবসায়িক উদ্যোগ এবং প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ছিল যা স্থানীয় সিন্ধি অধিবাসীদের ছিল না।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে পাকিস্তানে গৃহীত বিভিন্ন নীতি ছিল মহাজির সম্প্রদায়ের অনুকূল। এর সবথেকে প্রকৃষ্ট উদাহরণ গুজরাটি ভাষী মহাজির মহম্মদ আলি জিন্নার উর্দুকে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষায় পরিণত করার সিদ্ধান্তটি। পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ যা ১৯৫৫-৬৯ সালের 'One Unit Scheme' নামে পরিচিত, সেটিও মহাজির সম্প্রদায়ের স্বার্থের অনুকূল ছিল। এই নীতি গ্রহণের পিছনে যুক্তি হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগোলিক আয়তনের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের আয়তনের সামঞ্জস্য বিধান এবং ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানী সংবিধানের খসড়া প্রস্তুতিকে তুলে ধরা হয়েছিল। 'One Unit Scheme'-এর ফলে সিন্ধুপ্রদেশের প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা হ্রাস পায়, যেখানে ১৯৫৫ সালের আগে সিন্ধিদের আধিপত্য ছিল। উপরন্তু আয়ুবখানের অর্থনৈতিক কর্মসূচি করাচির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটায় যেখানে পাকিস্তানের সর্বাধিক সংখ্যক মহাজির বসতি স্থাপন করেছিলেন।

প্রাথমিক এই সকল সুযোগসুবিধা মহাজিরদের পাকিস্তানের শাসক এলিট শ্রেণীতে নিজেদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পরিমান বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। ১৯৭৩ সাল নাগাদ পাক আমলাতন্ত্রের গেজেটেড অফিসারের পদের ৩৩.৫ শতাংশ মহাজির সম্প্রদায়ের সদস্যরা দখল করেছিল, যদিও দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র 8% ছিল

মহাজির সম্প্রদায়ভুক্ত। অনুরূপভাবে পাক সচিবালয়েও মহাজিররা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং পাকিস্তানের ব্যবসায়িক শ্রেণীতে তাদের প্রধান্য ছিল প্রশ্নাতীত। ১৯৭৪ সাল নাগাদ পাকিস্তানের সরকারী উদ্যোগের অর্ধেকেরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ পদ মহাজিরদের দখলে চলে আসে। ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রেও তাদের প্রাধান্য আরও বেশী পরিলক্ষিত হয়। ১৯৭০ এর দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত পাক সামরিক বাহিনীতেও জনসংখ্যার আনুপাতিক বিচারে মহাজিরদের অধিক প্রতিনিধিত্ব ছিল, যদিও সেকথা প্রকাশ্যে স্বীকার করা হত না।

১৯৬৮ সালে পাকিস্তানের সামরিক বিভাগের সর্বোচ্চ 48টি পদের মধ্যে 11 টি (অর্থাৎ 23%) মহাজিরদের দখলে ছিল। অন্যদিকে এলিট গোষ্ঠীতে স্থানীয় সিন্ধিদের প্রতিনিধিত্ব আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছিল। যদিও স্থানীয় সিন্ধিদের সংখ্যা মহাজিরদের দ্বিগুণ ছিল তথাপি ১৯৭০ সালে সিন্ধিরা মাত্র 2.7% গেজেটেড কর্মী পদে, 4.3% সচিবালয়ের পদে এবং 3.6% সরকারী উদ্যোগের প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত ছিল। ১৯৬৮ সালে সামরিক বাহিনীর জেনারেলের পদে কোন স্থানীয় সিন্ধি প্রতিনিধিত্ব ছিল না।

গুলাম মুস্তাফা সৈয়দ যাকে সিন্ধি জাতীয়তাবাদের জনক বলা হয়, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে মন্তব্য করেন বিভাজনের পর থেকেই সিন্ধিরা হল 'পাঞ্জাবী মহাজির সাম্রাজ্যবাদের' শিকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার সিন্ধি সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতি অমনোযোগী। তাই ১৯৭১ এর গৃহযুদ্ধের আগে পর্যন্ত সিন্ধি জাতীয়তাবাদের মূল লক্ষ্য ছিল 'One Unit Scheme' অবসান এবং প্রাদেশিক স্তরে সরকারী ভাষা হিসাবে সিন্ধি ভাষার পুন প্রবর্তন ঘটানো।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সৃষ্টির পর পাকিস্তানের রাজনৈতিক মানচিত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। বাঙালীদের অসম প্রতিনিধিত্বের ইস্যুটির পরিবর্তে সিন্ধীদের দাবি প্রকট হয়। ১৯৭১ সালের নির্বাচনের পর সিন্ধি সম্প্রদায়ভুক্ত জুলফিকার আলি ভুট্টো প্রধানমন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হন এবং স্বাভাবিকভাবেই তিনি নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার্থে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

প্রথমেই বলা যায় সিন্ধীকে রাজ্যের সরকারী ভাষার মর্যাদা দেবার কথা যা পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি (PPP)র নির্বাচনী ইস্তেহারে ছিল। ১৯৭২ সালে সিন্ধের রাজ্যবিধানসভা সিন্ধীকে রাজ্যের সরকারী ভাষার মর্যাদা দেয়। মহাজির সম্প্রদায় এই পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করেছিল। কারণ এর ফলে সিন্ধুপ্রদেশে তাদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছিল। সিন্ধীদের নেতা সৈয়দ এই সময় মহাজিরদের ভারতে ফেরত পাঠাবার দাবি তুলে সিন্ধি জনসাধারণকে উত্তেজিত করেন। ১৯৭২ সালে হিংসাত্মক দাঙ্গায় 55 জন নিহত এবং সহস্র ব্যক্তি আহত হয়েছিল। এই সময় বহু অ-সিন্ধি সিন্ধুপ্রদেশের গ্রামাঞ্চল ত্যাগ করে করাচি ও হায়দ্রাবাদের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান। ১৯৭৩ সালে সংবিধান সংশোধন করে PPP সিন্ধি এবং উর্দু উভয়কেই এই রাজ্যের সরকারী ভাষার স্বীকৃতি দান করে ও দাঙ্গার সাময়িক অবসান ঘটে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রে নিয়োগের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক কোটা ব্যবস্থার পুনঃ প্রবর্তনের ঘটনা সিন্ধুপ্রদেশের জাতিগত সম্পর্কের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ১৯৭১ সালে প্রবর্তিত এই কোটা ব্যবস্থায় স্থির হয় দেশের 10% সরকারী পদে মেধার ভিত্তিতে পূরণ করা হবে; 50% পাঞ্জাব থেকে 11.5% উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে, 7.6% সিন্ধুপ্রদেশের শহরাঞ্চল থেকে, 11.4% সিন্ধুপ্রদেশের গ্রামাঞ্চল থেকে এবং 3.5% বালুচিস্তান থেকে পূরণ করা হবে। প্রকৃতপক্ষে এই কোটা ব্যবস্থার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের কাঠামোয় স্থানীয় সিন্ধি প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হয়েছিল। যে কারণে গ্রামীন সিন্ধি (সিন্ধী) এবং শহরাঞ্চলের সিন্ধী (মহাজির)দের মধ্যে পৃথকীকরণ ঘটানো হয়েছিল যার কোন ব্যবস্থা ১৯৪৯ সালের যুক্তরাষ্ট্রীয় কোটা নিয়মে ছিল না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় কোটা ব্যবস্থার ব্যবহারিক প্রয়োগ প্রাথমিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় সচিবালয়ে সীমিত ছিল, কিন্তু শীঘ্রই বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারী উদ্যোগ এবং বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে প্রযুক্ত হতে লাগল। কোটা ব্যবস্থার তাৎপর্য স্পষ্ট বুঝা গেল যখন ভুট্টো তার অর্থনৈতিক নীতির অঙ্গ হিসাবে ১৯৭২-৭৬ সালে পাকিস্তানের একাধিক ব্যক্তিগত উদ্যোগের জাতীয়করণ করেন এবং এইসব নতুন সরকারী উদ্যোগগুলিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় কোটা ব্যবস্থা প্রয়োগ করেন। এই জাতীয়করণ কর্মসূচির অধিকাংশই পরিচালিত হয়েছিল পাকিস্তানের বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে যারা ছিল করাচির মহাজির।

জেনারেল জিয়া-উল-হক ভুট্টো প্রবর্তিত ফেডারেল কোটা ব্যবস্থা সংরক্ষণের পাশাপাশি সামরিক বিভাগের সর্বোচ্চ পদাধিকারী হিসাবে নিজস্ব পছন্দ অপছন্দ আরোপ করতে থাকেন। ১৯৮২ সালে সরকারীভাবে ঘোষিত জিয়ার নীতি অনুযায়ী সচিবালয়ের 10% শূণ্য পদ অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয় এবং পাকিস্তানের সরকারী উদ্যোগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসারদের নিয়োগ করা শুরু হয়। তাছাড়া পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং আইন বিভাগে ভর্ত্তির ক্ষেত্রেও সামরিক বিভাগের পদস্থ অফিসারদের পুত্র-কন্যাদের জন্য বিশেষ সুবিধাদানের নীতির কথা ঘোষণা করা হল। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে যেহেতু পাঞ্জাবী এবং পাঠানদের আধিপত্য লক্ষ্য করা যায় তাই প্রধানত: তারাই এইসব নীতির সুবিধাভোগী হয়েছিল।

ভুট্টো এবং জিয়ার নীতি সম্মিলিতভাবে পাকিস্তানের আমলাতন্ত্রে এবং সরকারী উদ্যোগে মহাজিরদের আধিপত্য হ্রাস করে এবং পাঞ্জাবী এবং স্থানীয় সিন্ধিদের স্বার্থ রক্ষা করে। ১৯৭১ সাল থেকে যে সকল সরকারী নীতি গৃহীত হয়েছিল তার ফলে সেদেশের আমলাতন্ত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাবসায়িক ক্ষেত্রগুলিতে স্থানীয় সিন্ধ্রিদের প্রতিনিধিত্ব দ্বিগুণ হয়। ১৯৭১ থেকে ৮৬ সালের মধ্যে মহাজিরদের দাবির রাজনীতিকরণের গতি অত্যন্ত মন্থর ছিল। শিক্ষিত মহাজির যুবসম্প্রদায় এইসব নীতির জন্য প্রচন্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৭৯ সালে করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র আলতাফ হোসেন (Altaf Hussain) 'All Pakistan Mahajir Student Organisation' (APMSO) প্রতিষ্ঠা করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর আধিপত্য প্রতিহত করা এবং জামাত-ই-ইসলামীর-যুব সংগঠন জামিয়াত তালাবার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। APMSO এর মূল দাবী ছিল মহাজিরদের স্বপক্ষে কোটা ব্যবস্থার সংশোধন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, কোটা ব্যবস্থার জন্যই আলতাফ হোসেন করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের ফার্মেসি বিভাগে ভর্তি হতে পারেননি। এই ব্যর্থতাই তাঁকে APMSO গড়ে তুলতে উৎসাহিত করে। ১৯৮৪ সালে জিয়া এই ছাত্র সংগঠনটিকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেন। তখন আলতাফ হোসেন 'মহাজির কোয়েমি মাহাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। তবে ১৯৮৪-৮৫ জাতিগত দাঙ্গার পূর্ব পর্যন্ত পার্টির আয়তন ছিল অত্যন্ত সীমিত।

পূর্বেই বলা হয়েছে, ১৯৭০ এর দশকের শেষ দিক থেকে ১৯৮০ দশকের প্রথম ভাগে করাচিতে অভিবাসী জনসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এইসব অভিবাসীদের অধিকাংশই মহাজির ছিল না সত্য, তবে তারা ছিল আফগানিস্তান থেকে অথবা NWFP থেকে আগত শরণার্থী। কিছু সংখ্যক অভিবাসী আবার বালুচিস্তান এবং পাঞ্জাব থেকেও এসেছিল। ফলে করাচির সর্বত্র জবরদখলকারী বস্তিতে ভর্তি হয়ে যায়। নতুন অভিবাসীরা বিভিন্ন সাধারণ চাকরী এবং আবাসনের প্রশ্নে নিম্নশ্রেণীর মহাজির, যাদের অধিকাংশই ছিল বাংলাদেশ থেকে আগত উর্দু ভাষী বিহারী মুসলমান, তাদের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। কোন এলাকায় এই ধরনের জাতিগোষ্ঠীগত বিন্যাস অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং বিপজ্জনক। একবার করাচিতে বাস দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধে যায়। ১৯৮৫ সালে পাঠান ও মহাজিরদের দাঙ্গা শুরু হয় এবং অবস্থা এমন ভয়াবহ হয় যে সেখানে সেনাবাহিনী

মোতায়েন করতে হয়। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী উভয়পক্ষের বেশ কিছু জীবনহানি হয়।

১৯৮৬ সালে নভেম্বর, ডিসেম্বর মাসে করাচি এবং হায়দ্রাবাদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রচন্ড ভয়াবহ হয়ে ওঠে । ১৯৮৫-৮৬ সালের সাম্প্রদায়িক অশান্তি MQM এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে। ১৯৮৭ সালে আলতাফ হোসেন MQM এর প্রস্তাব সংক্রান্ত চার্টার বা Qaradad-i-Maqasid প্রকাশ করেন যাকে দলের প্রতিষ্ঠাকালীন দলিল হিসাবে গণ্য করা হয়। প্রস্তাবে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি ছিল ঃ

(১) শুধুমাত্র 'প্রকৃত সিন্ধি' (মহাজির ও স্থানীয় সিন্ধি) দের সিন্ধে ভোট দেবার ক্ষমতা থাকবে।

(২) ব্যবসার লাইসেন্স এবং পারমিট ভোটাধিকার নেই এমন ব্যক্তিবর্গকে দেওয়া চলবে না।

(৩) বিদেশের পাকিস্তানী (বাংলাদেশে বসবাসকারী পাকিস্তানী বা বিহারী) জনগণকে পাকিস্তানে বসবাস করবার অধিকার দিয়ে পাকিস্তানের নাগরিকত্ব দিতে হবে।

(৪) আফগান শরণার্থীদের শুধুমাত্র NWFP ও বালুচিস্তানের শরণার্থী শিবিরেই বসবাসে বাধ্য করতে হবে এবং সিন্ধুপ্রদেশে বসবাস করতে অথবা সম্পত্তি ক্রয়ের অধিকার দেওয়া চলবে না।

(৫) স্থানীয় বাস চলাচল ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে করাচি পুর কর্পোরেশনের হাতে অর্পণ করতে হবে এবং শুধুমাত্র শিক্ষিত বাসচালকদের বাস চালানোর অধিকার প্রদান করতে হবে (বাস চালকদের মধ্যে পাঠান আধিপত্য হ্রাসের জন্য এই নীতির প্রস্তাব করা হয়েছিল)

(৬) সিন্ধি এবং মহাজির নয় এমন ব্যাক্তিদের সিন্ধু প্রদেশের স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করতে দেওয়া চলবে না।

(৭) সিন্ধু প্রদেশে পুনরায় জনগণনা করতে হবে। মহাজিরদের অনুপাত যথাযথভাবে প্রতিফলিত হতে পারে এমনভাবে 'ফেডারেল কোটা' ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে।

(৮) সিন্ধু প্রদেশের প্রকৃত অধিবাসী হিসাবে চিহ্নিত হবার জন্য একাদিক্রমে ২০ বছর সিন্ধু প্রদেশে বসবাস করতে হবে এবং এই ধরনের শর্ত পূরণ করছেন এমন অধিবাসীরাই ফেডারেল কোটার সুযোগ পাবার অধিকারী বলে বিবেচিত হবেন।

(৯) মহাজিরদের প্রতি নৃশংসতার অভিযোগে অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারদের বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করতে হবে। (বেশীর ভাগ অভিযুক্ত অফিসারই পাঞ্জাবী)

মূল প্রস্তাবের অন্তর্গত না হলেও আলতাফ হোসেন মহাজির সম্প্রদায়কে পাঞ্জাবী, পাঠান, বালুচ ও সিন্ধী পাশাপাশি পাকিস্তানের পঞ্চম জাতিগোষ্ঠী হিসাবে স্বীকার করে নেবার দাবি করেন। এই দাবির যৌক্তিকতাকে অস্বীকার করা যায় না। করাচি ও হায়দ্রাবাদের স্থানীয় পুর নির্বাচনে MQM সন্তোষজনক আসন লাভ করে এবং ১৯৮৭ এর নভেম্বরে MQM এর প্রার্থী করাচির মেয়র পদে অধিষ্ঠিত হন।

১৯৮৮ সালের নভেম্বর মাসের সাধারণ নির্বাচনে সিন্ধু প্রদেশে PPP এবং MQM সুস্পষ্ট ভাবে জয়ী হয়। গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি সংসদীয় আসনে PPP জয়লাভ করে। শহরাঞ্চলগুলির ক্ষেত্রে দেখা গেল হায়দ্রাবাদে পাঁচটি আসনের মধ্যে তিনটি এবং করাচির ১২টি আসনের মধ্যে ১টি PPP লাভ করেছে। বাকি আসনগুলি গেছে MQM এর দখলে। একই রকমভাবে দেখা গেল ১০০ আসনবিশিষ্ট প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনে। গ্রামাঞ্চলের আসনগুলিতে PPP-র আধিপত্য। তারা ৭০টি আসন লাভ করে। অপরদিকে MQM এর সংগ্রহে ছিল মাত্র ২৪টি আসন। ১৯৮৮ এর নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে এরাজ্যে দুটি বিষয় স্পষ্ট—(১) ভোট পড়েছিল জাতিগত ভিত্তিতে PPP প্রার্থীরা সিন্ধী সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভ করেছিল এবং মহাজিররা MQM প্রার্থীদের নির্বাচিত করে।

(২) MQM জনমত সংগঠিত করতে পেরেছিল একথা প্রমাণিত হল। বস্তুতপক্ষে চার বছরের মধ্যেই MQM পাকিস্তানের তৃতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের মর্যাদা পেয়ে যায়।

MQM নেতা আলতাফ হোসেন PPP র সরকারে অংশগ্রহণে রাজী হয় কিন্তু এজন্য PPP র সাথে আনুষ্ঠানিক চুক্তির দাবি করে। ফলশ্রুতিতে ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসের দুই তারিখে ৫৯টি ধারা বিশিষ্ট MQM-PPP চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, আনুষ্ঠানিক ভাবে যা করাচী ঘোষণা নামে পরিচিত।

কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই বেনজির সরকারও MQM এর আঁতাত ভেঙে যায়। তখন নওয়াজ শরিফ সরকারের সাথেও MQM ১৯৯০ সালে চুক্তি করে। সেটিও বিশেষ কার্যকরী হয়নি। ১৯৯৩ সালে PPP সরকার মহাজিরদের উপর বিশেষত করাচির মহাজিরদের উপর নৃশংস অত্যাচার চালায়। ফলশ্রুতিতে দীর্ঘস্থায়ী হিংসাত্মক আন্দোলন শুরু হয় যাতে সহস্রাধিক মহাজির নিহত হয়। আলতাফ হোসেন তখন প্রচার করতে আরম্ভ করেন যে বেনজির সরকার মহাজিরদের বিরুদ্ধে গণহত্যা (genocide) সংগঠিত করেছেন। ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারী নির্বাচনে MQM জাতীয় ও প্রাদেশিক উভয় স্তরেই সন্তোষ জনক ফল করে। এবারও জাতিগত ভিত্তিতেই ভোট প্রদত্ত হয়েছিল। তবে সরকার পরিবর্তিত হলেও অর্থাৎ নওয়াজ শরিফের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ সরকার গঠন করলেও মহাজিরদের নিরাপত্তা এবং কল্যাণ বিধানে সে সরকার সক্ষম হবে কিনা তাতে সন্দেহ থেকে যায়। তবে একথা বলতে কোন অসুবিধা নেই যে মহাজির সম্প্রদায় যারা একসময় পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ এবং ইসলামের সঙ্গে একাত্মবোধ করত, তারাই বর্তমানে পাকিস্তানে জাতিগত রাজনীতির সম্মুখ সারিতে অবস্থান করছে। বাস্তবে মহাজির সম্প্রদায় পাকিস্তানের পঞ্চম জাতিগোষ্ঠী হিসাবে নিজেদেরকে সংগঠিত করতে পেরেছে এবং তাদের বৈধ দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য আন্দোলনের সামিল হয়েছে।

Further Readings :

1. Kennedy C. H. "The Politics of Ethnicity in Sind". in *Asian Survey* (31) 1991.
2. Phandis, Urmila, *Ethnicity and Nation-Building in South Asia*, Sage, Delhi.
3. Engineer, Asghar Ali(ed) — *Ethnic conflict in South Asia*.
4. Gardezi, H and Rashid J.,(ed.), Pakistan : *The Roots of Dictatorship*.
5. Nasar, S. Vali Raja, "Pakistan : The Islamic State and Ethnic Policy", *Forum of World Affairs* Vol—16, 1992.

নবম পাঠ

বালুচ জাতিগোষ্ঠীয় আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ

(Reasons for the Failure of Baluch Ethnic Movement)

পাকিস্তান বহুজাতিভিত্তিক রাষ্ট্র হওয়ায় এবং পাকিস্তানে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত বিকাশ না হওয়ায় সেদেশে জাতিগত সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে। পাকিস্তানের জনসংখ্যার মাত্র 4 শতাংশ বালুচ জাতি গোষ্ঠী অন্যান্য এথনিক গোষ্ঠীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী অত্যাচারিত হওয়ায় তারাও অত্যাচার ও শোষণের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের আশায় জাতিগত রাজনীতির ধারা অনুসরণের পথ অবলম্বন করতে আরম্ভ করে।

পাকিস্তানের শাসক এলিট গোষ্ঠীর মধ্যে বালুচদের প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত সীমিত ছিল। ভৌগোলিক কারণে বালুচিস্তান ছিল পাকিস্তানের সর্বাধিক পশ্চাদপদ প্রদেশ। শাসক এলিট শ্রেণী বালুচিস্তানকে তাদের "আভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশ" বলে মনে করত। বালুচ জনগোষ্ঠী তাদের অধিকারের ব্যাপারে প্রথম থেকেই সচেতন ছিল এবং তারা জাতিগত রাজনীতির পথ দাবি আদায়ের পথে গিয়েছিল। তাদের আন্দোলন শুরু হয় শের মহম্মদের নেতৃত্বে ১৯৬০ এর দশকের প্রথমদিকে যা পাহাড়ী আন্দোলন নামে পরিচিত। পরবর্তী কালে বালুচ ছাত্রসম্প্রদায় Baluch Student Organisation (BSO) এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব গ্রহণ করে। আরও পরে "Baluch People Liberation Front" (BPLF) গঠিত হয়। বামপন্থী মনোভাবাপন্ন BPLF একথা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে বালুচদের বিভিন্ন অভাব অভিযোগের সুরাহা প্রতিবেদন পেশের মাধ্যমে দূর হবে না। এতদসত্ত্বেও BPLF প্রথমদিকে সাংবিধানিক পথ অনুসরণ করত। যার ফলে ১৯৭২ এর নির্বাচনে NAP-JUI জোট ক্ষমতায় আসে। কিন্তু বালুচ এবং পাঠান জোট সরকার যখন প্রাদেশিক আমলাতন্ত্রে নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধি করতে শুরু করে এবং এলাকার উন্নয়নের জন্য বালুচিস্তানের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে আরম্ভ করে তখন ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ঐ সরকারকে বাতিল করে দেয়। এতে বালুচদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিল। একদিকে এর ফলে গুরুত্বপূর্ণ বালুচ নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হল অন্যদিকে অধিকাংশ বালুচের হতাশা এমন সীমায় গেল যে তারা সশস্ত্র আন্দোলনের পথে অগ্রসর হল। অবশ্য প্রথম থেকেই তাদের সাংবিধানিক পথে আন্দোলনে আস্থা ছিল না। সাংবিধানিক পথের পরিবর্তে হিংসাত্মক পথ অনুসরণের জন্য বালুচ জনসম্প্রদায়কে চরম মূল্য দিতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের সামরিক বাহিনী সীমাহীন সন্ত্রাসের মাধ্যমে বালুচদের আন্দোলন দমন করে। এতে সহস্রাধিক বালুচের মৃত্যু হয়। এর কিছুকাল পর জিয়া-উল-হক বালুচদের বিক্ষোভকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যে একাধিক বালুচ নেতাকে মুক্তি দিয়েছিলেন। এর প্রধান লক্ষ্য বালুচদের সমর্থন সুনিশ্চিত করা। এর পর বালুচ জাতিগত আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি, যদিও বালুচদের উপর অত্যাচার ও অবিচারের অবসান আজও হয়নি। যাই হোক, বালুচ জাতিগত আন্দোলনের ব্যর্থতার একাধিক কারণ ছিল, যেগুলি নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত ঃ বালুচিস্তানের ভৌগলিক এলাকা তুলনামূলকভাবে বড় হলেও পাকিস্তানের জনগণের মাত্র 4 শতাংশ বালুচ জাতিভুক্ত এবং ১৯৮১ সালের জনগণনার রিপোর্ট অনুযায়ী বালুচিস্তানে শতকরা 57 জন অধিবাসী বালুচ। কিন্তু বিগত 15 বছরে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণ বহু সংখ্যক পাঠান বালুচিস্তানে প্রবেশ করায় এবং বহু সংখ্যক বালুচ পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশে বা বিদেশে গমন করায় বালুচিস্তানে বর্তমানে বালুচদের সংখ্যা অত্যন্ত কমে গেছে। বর্তমানে এখানে ব্যবসা, শিল্প ও আমলাতন্ত্র, প্রতিটি ক্ষেত্রেই অন্যান্য জাতিভুক্ত মানুষদের আধিপত্য দেখা যাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত ঃ ইরান, আফগানিস্তান এবং বালুচিস্তানের সংলগ্ন পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশগুলিতে যত বালুচ জনগণ বাস করে তাঁরা সকলে মিলে বৃহত্তর বালুচিস্তান রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন করতে পারে, যা পাঞ্জাবী ও মোহাজির রাই নয় ইরানের ন্যায় বিদেশী রাষ্ট্রেও হতে দিতে চাইবে না। এমতাবস্থায় বালুচ জাতিগত আন্দোলনকে ১৯৭৪-৭৫ সালে ভুট্টো সহজেই দমন করেছিলেন।

তৃতীয়ত ঃ বালুচ জনগণ একাধিক উপজাতিতে বিভক্ত হওয়ার ফলেও তারা একটি সংহত জাতি হিসেবে উদ্ভুত হতে পারেনি। উপজাতি প্রধানেরা অত্যন্ত প্রভাবশালী হলেও তারা সংঘবদ্ধ হতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে বালুচদের আনুগত্য এক অভিন্ন কেন্দ্রের দিকে পরিচালিত হয়নি। তাদের আনুগত্য শুরু হয় উপগোষ্ঠীস্তরে এবং শেষও হয় উপজাতি স্তরে। উপরন্তু, বিভিন্ন বালুচ উপজাতির সর্দারদের মধ্যে তীব্র পারস্পরিক সন্দেহের মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। এজন্য ১৯৫৬ সালে কালাতের খান সাহেব বহুধা বিভক্ত বালুচ জনজাতিগোষ্ঠী সংঘবদ্ধ করবার যে চেষ্টা করেছিলেন তা তৎকালীন পাকিস্তানী রাষ্ট্রপতি ইসকন্দার মির্জার পক্ষে সমূলে উৎপাটিত করা কঠিন হয়নি।

অতএব বলা যায়, একাধিক উল্লেখযোগ্য কারণ বালুচদের সংহতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়েছে। আর এই সংহতির অভাবেই বালুচ জাতিগত আন্দোলন সুগঠিত আকার ধারণ করেনি।

Exercise - 1

(a) Essay Type Questions :

1. Analyse the role of Islam in the formation of the state in Pakistan.
2. Examine the impact of religious fundamentalism in the formation and growth of Pakistan.
3. Examine the role of Pakistani armed forces in that country's politics.
4. Give a critical account of the role of Mohajir Qaumi Mahaj (MQM) in Pakistani ethnic politics.
5. The Mahajir Qaumi Mahaj (MQM) has emerged as a significant actor in the arena of ethnic politics in Pakistan' — Elucidate.

(b) Short Answer Type Questions :

1. How did Iqbal visualise a seperate Muslim state ?
2. What was the difference between the modernists and the conservatives about the concept of Islamic state in Pakistan ?
3. What were the major traits of the Islamisation package as announced by the late Zia-ul-Haque ?
4. Point out the main problems for political integration in Pakistan.
5. How did people of Pakistan react against Ayub's observance of the 'Decade of Reforms'?

6. How did Jinnah distinguish between a Muslim state and an Islamic State ?
7. Who was called the 'Father of Pakistan'? Why was he so called ?
8. What was the plan of Dr. Latif regarding the solution of Moslem problem in India ?
9. What was the plan of the Cambridge Group for the solution of the Moslem problem in India ?
10. Why did the Muslims of East Bengal support the demand for Pakistan ?
11. Write a short note on Baluch People's Liberation Front (BPLF).
12. Why did not the Pakistani armed forces feel the need for direct military rule before 1958 ?
13. Write a note on 'Ethnicity in Baluchistan'.
14. Write a note on 'Pakistan Resolution of 1940'.
15. Write a note on 'Charter of Demands of MQM' (1987).

———

দশম পাঠ

বাংলাদেশের জাতীয়তা সংক্রান্ত সমস্যা

(Nationality Problem in Bangladesh)

ইউরোপের ইতিহাসে ধনতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক জাতীয় আন্দোলনের উত্থান প্রায় সমকালীন ঘটনা। এ জাতীয় মুক্তি আন্দোলন শুধুমাত্র ইউরোপের ক্ষেত্রেই দেখা যায় তা নয়, এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার যেখানেই সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল, সেখানেই এই নিয়ন্ত্রণকে কাটিয়ে উঠতে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি পেশ করা হয়ে থাকে। আরনেস্ট রেনান (Ernest Renan) বলেছেন, এক জনসম্প্রদায়ের জনগণের মধ্যে তখনই একটি জাতীয়তার মনোভাব গড়ে ওঠে যখন তাদের মধ্যে ভৌগোলিক সান্নিধ্য, ভাষা, ধর্ম, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস প্রভৃতির ক্ষেত্রে সমরূপতা থাকে ও আদান প্রদান ঘটে। এরা তখন নিজেদের একটি জাতি বলে ঘোষণা করে ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করে। আত্মনিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়িত করতে গেলে তাদের প্রয়োজন নয়া রাষ্ট্রের। তাই তারা নূতন রাষ্ট্রের জন্য আন্দোলন করে এবং রাষ্ট্র গড়ে তুলতে যদি তার সফল হয় তাহলে সেই রাষ্ট্রকে বলা হবে জাতীয় রাষ্ট্র । আত্মনিয়ন্ত্রণের তত্ত্বে যদিও কিছু সীমাবদ্ধতা আছে, তবুও একথা স্বীকার করতেই হয় যে, প্রত্যেক জাতিরই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকা উচিত। একটি জাতি যদি মনে করে তারা অন্য জাতির অধীনে রয়েছে এবং সেই অধীনতার কারণে তারা তাদের নিজেদের আত্মবিকাশ ঘটাতে পারছে না, তাহলে তারা জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের দাবি তুলতে পারে।

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক দেশে একটি সর্বজনস্বীকৃত নীতি। ধনতান্ত্রিক দেশে যোগাযোগ ও যাতায়াতের সুবিধার জন্য মানুষের আদানপ্রদান সহজ হয়, জাতীয়তার মানসিকতা গড়ে ওঠার পক্ষে যা অনুকূল। তাই সামন্ত যুগের তুলনায় শিল্পোন্নত যুগে, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, অর্থাৎ যারা জাতীয়তাবাদকে বিকশিত করে, তাদের পক্ষে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি তুলে ধরা সহজ হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো থাকা সত্ত্বেও বৃটিশ শাসনের উত্তরাধিকার হিসাবে এসেছিল আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, যার প্রথম স্ফুরণ হয় সিপাহী বিদ্রোহের মাধ্যমে। অবশ্য সিপাহী বিদ্রোহকে অনেকেই গণতান্ত্রিক জাতীয় আন্দোলন বলে মানতে নারাজ, কিন্তু একথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে এই বিদ্রোহই ভারতবাসীকে প্রথম আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। যাই হোক, ভারতবর্ষে সেই সময় জমিদারী প্রথা ছিল এবং হিন্দু জমিদাররা মুসলিম প্রজাদের চরমভাবে শোষণ করত। হিন্দুরাই বস্তুতঃ মুসলমানদের সুযোগ করে দিয়েছিল আলাদা জাতির কথা বলতে। সেই জাতির দাবির ভিত্তিতেই পরবর্তী কালে গড়ে উঠেছিল পাকিস্তান।

জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিতেই ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করবার সময় যুক্তি হিসাবে দেখানো হয়েছিল যে, ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান দুটি জাতির বাস এবং তাদের ভাষা, ধর্ম, খাদ্যাভাষ, পোষাক-পরিচ্ছদ সব কিছুতেই ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। হিন্দুদের সংস্কৃতির সাথে পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সংস্কৃতির মিল আছে আর মুসলমানদের সাথে পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার সংস্কৃতির। হিন্দু ও মুসলমানদের মানসিক ব্যবধান এত বেশী যে অতীতে তাদেরকে সমরূপ করবার চেষ্টা হলেও সে চেষ্টা সফল হয়নি। এই অবস্থায় হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য পৃথক পলিটির (Polity) ব্যবস্থা করাই উচিত। তাছাড়া, ইসলাম কেবলমাত্র একটি ধর্ম বা আধ্যাত্মিক বিষয় নয়, সে কেবলমাত্র মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে তা নয়, বাস্তব

জীবনকেও সে নিয়ন্ত্রণ করে, কারণ ইসলামে এমন কিছু অনুশাসন আছে যা প্রত্যেকে মানতে বাধ্য এবং সেগুলি মানলে সুন্দর জীবন নিশ্চিত। আবার, ইসলামিক মতাদর্শ অনুযায়ী ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক করে দেখা অপরাধ এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ইসলাম মতামতের বিধান অনুযায়ী আত্মশাসনের অধিকার থাকা উচিত। অবিভক্ত ভারতবর্ষে বসবাস করলে ধর্মের একটি অংশ অস্বীকৃত হবে, যার অর্থ অপর অংশেরও অস্বীকৃতি। এই সকল বক্তব্য পেশ করে জিন্নার নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য পাকিস্তানের দাবি জানায় এবং বৃটিশরা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা হস্তান্তর করবার আগের দিন ভারতবর্ষের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের কিছু অংশকে বিচ্ছিন্ন করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে।

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলিম জাতীয়তাবাদকে সামনে রেখে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হলেও সেই পাকিস্তান অবিভক্ত থাকেনি। প্রায় একই ধরনের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবিতে ১৯৭১ সালে পাকিস্তান আবার বিভক্ত হয় এবং গড়ে ওঠে বাংলাদেশ রাষ্ট্র। কিন্তু বারংবার যদি এভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবি মেনে নিতে হয় তাহলে বিশ্ব অসংখ্যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিতে বিভক্ত হবে এবং তার ভিত্তিতে গড়ে উঠবে অসংখ্য দেশ। আসলে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ধারণার অপব্যাখ্যার ফলেই এই জাতীয় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ধারণায় একথাই বলা হয়, একটি অঞ্চলের সব থেকে বড় জাতিটি যেন অন্য জাতির অধীনস্থ না হয়ে পড়ে। এর অর্থ এই নয় যে, একটি অঞ্চলের সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিকে দেশ গঠন করতে দিতে হবে। যাই হোক এখন দেখা প্রয়োজন বাংলাদেশ সৃষ্টির সময় যে জাতীয়তাবাদের কথা বলা হয়েছিল, অর্থাৎ সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বাঙালীর জাতীয়তাবাদ, প্রকৃত জাতীয়তাবাদ বলতে যা বুঝায় সেই উপাদানে গঠিত হয়েছে কিনা, এবং বাঙালীর জাতীয়তাবাদ কতদূর সমর্থনযোগ্য।

পাকিস্তান রাষ্ট্র গড়ে ওঠার পর, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে একমাত্র ধর্মীয় ঐক্য ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রেই দুস্তর ব্যবধান পরিলক্ষিত হল। পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে ছিল হাজারো মাইলের ব্যবধান—অর্থাৎ সেখানে ভৌগোলিক ঐক্য ছিল না — উভয় অংশের মুসলমানদের মধ্যে ভাষাগত ঐক্য ছিল না — পাকিস্তানের একাংশের প্রধান ভাষা ছিল উর্দু, পাঞ্জাবী, পস্তু প্রভৃতি, অপর অংশের বাংলা। বাঙালী অংশের মুসলমানদের খাদ্যাভাসের সাথে পাঠান ও পাঞ্জাবী মুসলমানদের খাদ্যাভাসের কোন সাদৃশ্য ছিল না। পোষাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও মোটামুটি একই কথা প্রযোজ্য। বস্তুতঃপক্ষে, উভয় অংশের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য বিন্দুমাত্র ছিল না। ধর্মীয় ক্ষেত্রে ঐক্য ছিল একথা বললেও সূক্ষাতিসূক্ষ বিচারে দেখা যাবে পাকিস্তানের উভয় অংশের নাগরিকদের মধ্যে বিভেদ ছিল। তাদের ধর্মীয় আবেগানুভূতির মাত্রা এক ছিল না। ধর্মীয় রীতিনীতি পালনের ব্যাপারেও তাদের মধ্যে মতভেদ ছিল। এই অবস্থাতেও পাকিস্তানের উভয় অংশকে হয়ত ঐক্যবদ্ধ রাখা যেত যদি পাকিস্তানকে মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত না করে ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করা হত।

বাঙালী মুসলমানরা যে পাঞ্জাবী বা পাঠান মুসলমানদের থেকে স্বতন্ত্র এই বোধ ক্রমশ জাগ্রত হতে লাগল। অবস্থার অবনতি হল যখন দেখা গেল পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে কোন রকম স্বীকৃতি দিল না এবং তারা পূর্ব পাকিস্তানকে কলোনি হিসাবে ব্যবহার করতে চাইল। পূর্ব পাকিস্তান বরাবরই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে উর্বর ছিল, সেখানে ফলন বেশী হত। সেখানকার মুনাফায় পশ্চিম পাকিস্তান নিজেদের উন্নত করতে লাগল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের উপর কর্তৃত্ব করত যার চরম বহিঃপ্রকাশ হয় ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে। আইনানুযায়ী মুজিবর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় আসার কথা, কিন্তু পশ্চিম

পাকিস্তান তা হতে দেয়নি এবং সেই ঘটনাই বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। পশ্চিম পাকিস্তানিরা দেশের আমলাতন্ত্রে প্রতাপশালী ছিল কারণ বাঙালীদের সেখানে প্রবেশাধিকার পাওয়া সহজসাধ্য ছিল না। এরপর উর্দুকে জাতীয় ভাষা হিসাবে বাঙালীদের উপর চাপাবার চেষ্টা হতে লাগল। পশ্চিম পাকিস্তানিদের এই বিমাতৃসুলভ মনোভাবে বাঙালীরা যারপর নাই অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয়েছিল এবং সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করতে আরম্ভ করে। উর্দুকে জাতীয় ভাষা করাকে কেন্দ্র করে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয় যার চরম পরিণতি ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর পাকিস্তানের কর্ণধার হিসাবে মুজিবকে মেনে না নেবার পরবর্তী ঘটনাবলী।

বস্তুতঃপক্ষে বাংলাদেশ সৃষ্টিতে সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সামনে রাখা হয়েছিল যেমন পাকিস্তান সৃষ্টির সময় সামনে রাখা হয়েছিল ধর্মীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে। কিন্তু আজকের বাংলাদেশের দিকে দৃষ্টিপাত করলে বুঝা যায় এই সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সমগ্র বাংলাদেশবাসীর ছিল না, ছিল মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের। সন্দেহ নেই, পূর্ব পাকিস্তানে প্রচুর সমস্যা ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দুটি দীর্ঘ দশকেরও বেশী সময় অতিক্রান্ত হয়েছে তথাপি সেই সকল সমস্যার সমাধান আজও হয়নি। বাংলাদেশের উচ্চবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত ধনিক শ্রেণীরই উন্নতি হয়েছে, সেখানকার সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের অবস্থা পূর্ব পাকিস্তানের আমলে যেমন ছিল আজও সেইরকমই আছে। বাঙালীর জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশকে স্থায়ী রাষ্ট্র দিতে পারেনি, সেখানে আজ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের ইচ্ছায় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি—দেশটি নয়া ঔপনিবেশিকতার শিকারে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের মুসলমান রাজনীতিবিদ্‌গণ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে ক্ষমতার লোভে সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণকে সামনে রেখে বাংলাদেশ দাবি করে গেছেন, যেমন করেছিলেন জিন্না ও তাঁর অনুগামীরা পাকিস্তান সৃষ্টির সময়। তবে মুজিবের সাথে জিন্নার পার্থক্য ছিল এখানেই, জিন্না ভারত বিভক্তিকরণের সময় সামনে রেখেছিলেন ধর্মীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিকে, আর মুজিব সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে।

মুজিব ও তার অনুগামীরা যে সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণকে ব্যবহার করে ক্ষমতা ভোগ করবার জন্যই পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন তার বড় প্রমাণ এটাই যে, তাঁর কখনো পশ্চিম ও পূর্ব এই দুই বাংলাকে এক করবার কথা বলেননি, দুই বাংলার সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার চাইতে অভিন্নতাই বেশী এবং তাদেরকে একত্রিত করতে বিশেষ অসুবিধা থাকার কথা নয়। দুই বাংলা একত্রিত করতে পারলে বাংলাদেশে যে নানারকম সমস্যা রয়েছে তার বেশীর ভাগ সমস্যারই মোকাবিলা হবে বলে পণ্ডিতবর্গ মনে করেন। ভারতবর্ষও বাংলাদেশীদের অনুপ্রবেশ জাতীয় যে সকল সমস্যার জর্জরিত তারও একটা স্থায়ী সমাধান হতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এর কোন প্রয়াস তাদের তরফ থেকে দেখা যায় না।

Further Readings :

1. উমর, বদরুদ্দীন—**পূর্ব বাংলার সংস্কৃতির সংকট।**

একাদশ পাঠ

শ্রীলঙ্কার জাতিগত রাজনীতি

(Ethnic Politics in Sri Lanka)

দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কাকে বহুজাতিগোষ্ঠী সমন্বিত সংহত বহুত্ববাদী সমাজ (plural society) রূপে চিহ্নিত করা যায়। এই সব জাতিগোষ্ঠীগুলি অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে বসবাস করলেও তাদের মধ্যে ভাষা, ধর্ম এবং ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার পার্থক্য দেখা যায়। ১৯৫০-এর দশক থেকেই অন্যতম দুই বৃহৎ সম্প্রদায়; তামিল এবং সিংহলীদের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিতে থাকে। পরবর্তীকালে এই দ্বন্দ্ব আরো ব্যাপক হয়েছে তামিলদের পৃথক, স্বাধীন বাসভূমির দাবিকে কেন্দ্র করে। বিচ্ছিন্নতাবাদী এই দাবিকে কেন্দ্র করে হিংসার মাত্রা এবং উগ্রপন্থামূলক কার্যকলাপ এবং স্বতস্ফূর্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শ্রীলঙ্কার সামাজিক জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে। জাতিগোষ্ঠীর দ্বারা বহুধা বিভক্ত সমাজে জনগণের অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার সমস্যার জ্বলন্ত উদাহরণ হল শ্রীলঙ্কা।

শ্রীলঙ্কার তিন--চতুর্থাংশ সিংহলী, অতএব তাদের গুরুত্ব কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং সিংহলী ভাষাভাষী, অন্যান্য জাতিগুলির মধ্যে তামিলরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা হিন্দু এবং তামিল ভাষী। শ্রীলঙ্কায় তামিলরা আবার দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। একটি সিংহলী তামিল যারা তামিলদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অপরটি ভারতীয় তামিল। শ্রীলঙ্কার ভারতীয় তামিলরাও হিন্দু এবং তামিল ভাষায় কথা বলে। কিন্তু উভয় তামিলগোষ্ঠী নিজেদের পৃথক গোষ্ঠীস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। সিংহলী তামিলরা কয়েক শতাব্দী যাবৎ ঐ দ্বীপে বসবাস করছে। ভারতীয় তামিলরা দক্ষিণ ভারত থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে চা বাগিচায় চাকুরির সূত্রে শ্রীলঙ্কায় এসেছে। ভারতীয় তামিলরা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে যোগ দেয়নি, উপরন্তু তারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কার তামিলদের বিরুদ্ধে পরিচালিত জনরোষের শিকার হয়েছে। তামিলরা এক পৃথক রাষ্ট্রের দাবিদার। দেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চল তামিল অধ্যুষিত তাই তামিলরা সেই অঞ্চলকে নিজেদের বাসভূমি বলে মনে করে। চারটি জেলায় যথা উত্তর জাফনা, মান্নার (Mannar), ভবানীয়া (Vavaniya) এবং মুল্লাইতিভু (Mullativu) তারা জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। তারা বাত্তিকোলাতেও সংখ্যাগরিষ্ঠ, কিন্তু ত্রিংকোমালী ও আম্পারাই (Ampa-rai) তে তারা সংখ্যালঘু। ১৯৪৮ সালে বৃটিশ উপনিবেশের শৃঙ্খলামুক্ত হবার পর পরবর্তী এক দশকের মধ্যেই প্রত্যেকটি জাতিগোষ্ঠী নিজেদের সম্প্রদায়গত স্বাধিকার বজায় রাখার জন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পথ অনুসরণ করে। কিছু দিনের মধ্যেই রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপরেও এই দাঙ্গার নেতিবাচক প্রভাব দেখা যায়। দ্বীপরাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিগোষ্ঠী হিসাবে সিংহলীরা নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয় কারণ তাদের মনে হয়েছে বিগত চার শতাব্দী ব্যাপী ইউরোপীয় শাসনের সময় তাদের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়েছে। এটাই ছিল তামিলদের সাথে সিংহলীদের অশান্তির প্রধান কারণ। তামিলরা চেয়েছিল নিজেদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সিংহলীদের আধিপত্যের অধীন না করতে বা সিংহলীদের সাথে একাত্মীভূত না হতে। শ্রীলঙ্কার তামিলরা যে সংখ্যালঘু তা প্রমাণিত হয় ভাষা ও ধর্মকে কেন্দ্র করে তাদেরকে যেভাবে কোণঠাসা করা হয়েছিল তা পর্যালোচনা করলে। অন্যদিকে সিংহলীদের মনে এই ধারণা ছিল যে তামিলভাষী হিন্দুদের হাতে ক্ষমতা দিলে তাদের স্বার্থ আদৌ সুরক্ষিত হবে না। এক সিংহলী রাজনীতিবিদ্ আক্ষেপ করে বলেছেন ঃ "এই দেশে তামিলদের সমস্যা সংখ্যালঘুর সমস্যা নয়। দ্রাবিড় স্থানে সিংহলীরাই হল সংখ্যালঘু। দ্রাবিড় স্থানে গরিষ্ঠদের বিরুদ্ধে আমরা নিজেদের জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে পরিচালিত হচ্ছি।"

তামিল এবং সিংহলী জাতিগোষ্ঠী যত বেশী করে তাদের নিজ নিজ প্রতীক এবং ঐতিহ্য অনুসরণ করার চেষ্টা করতে থাকে রাজনৈতিক স্তরে তত বেশী করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই রাজনৈতিক বিদ্বেষ যত দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে তত প্রতিটি জাতির মধ্যে ঐক্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে সহমর্মিতার অনুভূতি লোপ পেতে থাকে।

এই পরিস্থিতিতে Dononghmore সংবিধান অনুযায়ী ১৯৩১ সাল থেকে প্রচলিত সর্বজনীন ভোটাধিকারকে কেন্দ্র করে তামিল ও সিংহলীদের মধ্যে বিবাদ আরো প্রকট হয়। এই সংবিধানে একাধিক বিতর্কিত বিষয় যেমন— এককেন্দ্রিক সরকারের উপস্থিতি এবং আইনপরিষদে আঞ্চলিক ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা ছিল। উভয় বিষয়কেই সংখ্যালঘুর তামিলরা মেনে নিতে পারেনি, কারণ তাদের মতে, এর ফলে দ্বীপরাষ্ট্র শাসনের একচ্ছত্র অধিকার সিংহলীদের হাতে চলে যাবে এবং তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হবে। এই জন্য তারা সংখ্যালঘু হিসাবে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং আইনসভায় সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের দাবি জানিয়ে ছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক সরকার এই দাবি অগ্রাহ্য করে। একারণে তামিলরা ১৯৩১ সালের নির্বাচন বয়কট করে। পরবর্তীকালে ১৯৪৪ সালে তারা আইনসভায় আধাআধি প্রতিনিধিত্বের দাবি করে। এই দাবির মূল উদ্দেশ্য ছিল আইনসভায় কোন একটি সম্প্রদায়ের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত না হতে দেওয়া। কিন্তু সিংহলীদের মতে, এই প্রস্তাব ছিল এক ধরনের সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের দাবি।

ভারতীয় তামিলরাও আইনসভায় অর্ধেক আসনের দাবির পক্ষে মতামত দেয় এবং তারা তাদের জন্য নির্ধারিত দুটি আসনেই ১৯৪৭ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে। তাদের মধ্যে মার্কসীয় রাজনীতির প্রভাব ছিল এবং তারা শ্রীলঙ্কার তামিলদের সাথে হাত মিলিয়েছিল। এই সব ঘটনাগুলি সিংহলীদের কাছে অত্যন্ত মারাত্মক মনে হয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের পর সেনানায়কে সরকার নাগরিকতার আইন চালু করেন ১৯৪৮ সালে, যার ফলে শ্রীলঙ্কার ভারতীয় তামিলরা রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়ে। এই ঘটনার প্রতিবাদে সেনানায়েকের ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টি (UNP) সমর্থনকারী তামিল কংগ্রেসের দলভুক্ত বাণিজ্যমন্ত্রী ক্যাবিনেট থেকে পদত্যাগ করেন। এস. জে. ভি. সেলভানায়কমের নেতৃত্বে তিনি ফেডারেল পার্টি (FP) গঠন করেন। এই দল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা গঠনের, রাষ্ট্রহীন তামিলদের নাগরিকত্ব প্রদানের এবং তাদের জন্য প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের দাবি করে। ১৯৫১ সালে এই পার্টির প্রথম সম্মেলনে বলা হয়, "তামিলরা সিংহলীদের থেকে পৃথক জাতি"।

১৯৫১ সালে এস. ডব্লিউ. আর. ডি. বন্দরনায়েক UNP থেকে পদত্যাগ করেন এবং শ্রীলঙ্কা ফ্রীডম পার্টি (SLFP) গড়ে তোলেন। মুলতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ সিংহলীদের স্বার্থরক্ষা করাই এই দলের লক্ষ্য ছিল। তিনি সিংহলী বৌদ্ধদের সংঘবদ্ধ করেন এবং তামিলদের পেছনে লাগিয়ে দেন। এভাবে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নেতা হিসেবে উদ্ভূত হন।

১৯৫৫ সালে ভগবান বুদ্ধদেবের মহাপ্রয়াণের ২৫০০ বছর পূর্ণ হয়। ১৯৫০ সাল থেকেই মহাপ্রয়াণ বর্ষ উদযাপনের আয়োজন শুরু হয়। একই সাথে সরকার শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধধর্মের পরিস্থিতি বিচার বিবেচনা এবং কীভাবে বৌদ্ধধর্মকে অধিক শক্তিশালী করা যায় সে বিষয়ে রিপোর্ট তৈরী করার জন্য এক অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেন। এতে সিংহলীদের আনন্দ উৎসাহ বৃদ্ধি পায়, বৌদ্ধধর্মের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের উদ্ভব হয়। বিরোধী পক্ষের নেতা হিসেবে বন্দরনায়েক এই সময় UNP সরকারের ভাষানীতি এবং ধর্মনীতির সমালোচনা করেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি যদি নির্বাচনে জয়লাভ করেন তবে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সিংহলী ভাষাকে সরকারী ভাষার মর্যাদা দেবেন। সিংহলী শিক্ষিত শ্রেণী, শিক্ষক সম্প্রদায়, শিক্ষিত

বেকার, কবিরাজী চিকিৎসক এবং নব্য ভিক্ষুরা SLFP ভাষানীতির সপক্ষে প্রচার করেন। ১৯৫৬ সালে UNP তার নীতি পরিবর্তন করে শুধুমাত্র সিংহলীদের পক্ষে মত প্রকাশ করে। অর্থাৎ একমাত্র FP ই থাকল তামিলদের শেষ আশা ভরসা। ১৯৫৬ সালের নির্বাচনে SLFP ৫১টি আসনে জয়লাভ করে এবং বন্দরনায়েকের নেতৃত্বে সরকার গঠন করেন। UNP মাত্র আটটি আসন পেয়েছিল। আর FP উত্তরাঞ্চলে তামিলদের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত হল। তারা ১০টি আসন লাভ করেছিল। FP যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির মাধ্যমে তামিলদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র এবং তামিল ও সিংহলীদের সমমর্যাদা প্রদানের পক্ষে মতামত দেয়।

১৯৫৬ সালে শুধুমাত্র সিংহলীকে সরকারী ভাষার মর্যাদা প্রদানের ফলে, তামিল অধ্যুষিত অঞ্চলে FP-এর প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। পার্টি রাজনৈতিক আন্দোলন (ধর্মঘট, সত্যাগ্রহ ইত্যাদি) শুরু করে যার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল তামিলদের সমঅধিকার এনে দেওয়া। ফলে বন্দরনায়েক বাধ্য হন FP সাথে চুক্তি করতে যা 'বন্দরনায়েক-সেলভানায়কম চুক্তি, ১৯৫৭' নামে পরিচিত। কিন্তু চরমপন্থী সিংহলীরা বন্দরনায়েকের নরমপন্থী মনোভাব পছন্দ করেনি। আসলে, বন্দরনায়েক উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটাবার জন্য কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর চিন্তাভাবনা রূপায়িত হবার পূর্বেই তাঁকে ২৫শে সেপ্টেম্বর (১৯৫৯) হত্যা করা হয়।

পরবর্তীকালে ভাষানীতিকে কেন্দ্র করে সে দেশে বিতর্ক আরও তীব্র হয়। ভাষা এবং সমমর্যাদার দাবি হয়ে ওঠে রাজনীতির প্রধান ইস্যু। ভাষার প্রশ্নে দুই সম্প্রদায়ের বস্তুতপক্ষে, সম্পর্কে প্রচন্ড অবনতি পরিলক্ষিত হয়। পিছনের দিকে তাকিয়ে আজ বলতে অসুবিধা নেই, শ্রীলঙ্কার রাজনীতিতে বন্দরনায়েক উগ্র সিংহলী স্বদেশিকতার উদ্ভবে সাহায্য করেন, তিনি তারই শিকার হন।

পরবর্তী দশকে অর্থাৎ ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে দ্বীপের সব দলগুলিই (UNP, SLFP এবং FP) সাম্প্রদায়িক পদ্ধতির মাধ্যমে রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হয়। FP-এর নেতা সেলভানায়কম ও দেশের প্রধানমন্ত্রী সেনানায়কমের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার মূল বিষয়গুলি ছিল ঃ

(১) উত্তর এবং পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলিতে প্রশাসন এবং তথ্য সংরক্ষণে তামিল ভাষা ব্যবহার করা হবে;

(২) এই সব জেলাগুলিতে আদালতের কাজকর্ম তামিল ভাষায় পরিচালিত হবে;

(৩) সমগ্র দেশের প্রশাসন জেলা পরিষদের মাধ্যমে বিকেন্দ্রীভূত করা হবে এবং;

(৪) তামিল প্রদেশগুলির উপর সিংহলীদের ঔপনিবেশায়নের উপর বিধিনিষেধ আরোপিত হবে।

এই চুক্তির ফলে সমস্যা মেটেনি। ১৯৭০-এর নির্বাচনে মিসেস বন্দরনায়েক প্রধানমন্ত্রী হন। ক্ষমতায় এসেই তিনি নতুন সংবিধান চালু করেন ২২শে মে ১৯৭২ তারিখে। এই সময়ে ইউনাইটেড ফ্রন্ট সরকার দেশের মুদ্রাস্ফীতি, বেকারী এবং JVP-এর অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্মের জন্য শীঘ্রই বিব্রত হতে থাকে। JVP-এর সদস্যরা সকলেই সিংহলী যুবক যুবতী, যারা নিজেদের জন্য চাকুরির দাবি করতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে নতুন সংবিধানের মাধ্যমে সিংহলীদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করা হয়। সরকার ঘোষণা করল যে, সব আইন সিংহলী ভাষায় জারি করা হবে; যদিও প্রত্যেকটি আইনকে তামিল ভাষার অনুবাদের ব্যবস্থা থাকবে। FP-এর নেতৃত্বে তামিল ভাষা ও সিংহলী ভাষাকে শ্রীলঙ্কার সরকারী ভাষার মর্যাদা দানের জন্য একটি সংশোধনী বিল উত্থাপিত হয়। কিন্তু সরকার তা প্রত্যাখ্যান করে। তখন FP সরকারের সিংহলী প্রবণতার এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষার ব্যর্থতার তীব্র সমালোচনা শুরু করে। এর মধ্যেই সরকার বৌদ্ধ ধর্মকে অগ্রাধিকার দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

তামিল সম্প্রদায়ের তখন বুঝতে অসুবিধা থাকল না যে সিংহলীদের কাছ থেকে ন্যায় বিচার পাওয়া যাবে না। সুতরাং চারটি তামিল দল—FP, TC, শ্রীলঙ্কা শ্রমিক কংগ্রেস এবং তামিল প্রগতিশীল মোর্চা একযোগে তামিল ইউনাইটেড ফ্রন্ট (TUF) গঠন করে যার লক্ষ্য হিসাবে বিদ্যমান রাষ্ট্রকাঠামোর পরিধির মধ্যে তামিল সম্প্রদায়ের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশী সুযোগ সুবিধা আদায়কে চিহ্নিত করে।

১৯৩০-এর দশক থেকেই বিভিন্ন শ্রীলঙ্কা সরকার উত্তরাঞ্চলের তামিল অধ্যুষিত অঞ্চলে যাতে সিংহলীদের স্থায়ী বসতি স্থাপিত হয় তার চেষ্টা করে আসছে। কারণ উত্তরাঞ্চলের সমভূমিতে জলসেচের মাধ্যমে কৃষিকাজ ভাল হয়। কিন্তু তামিলরা দাবি করতে থাকে যে ঐ অঞ্চলের উপর তাদের স্থানীয় অধিবাসী হিসাবে অগ্রধিকার প্রাপ্য। তামিলরা মনে করে সিংহলীরা ঐ অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করতে চাইছে। উদাহরণ হিসেবে তারা ত্রিংকোমালী শহরের কথা বলে। যেখানে ১৯৪৮ সালে সিংহলীদের সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল; কিন্তু বর্তমানে তারা তামিলদের সমান হয়েছে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৯৭০ সালে কলেজে ভর্তির 'কোটা ব্যবস্থা'র মাধ্যমে সিংহলী ছাত্রদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হল। ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির গুণমান ছিল মেধার মানদন্ড। কোটা ব্যবস্থার ফলে যারা তামিল ভাষা পঠন পাঠন করে তাদের অনুপাত হ্রাস পায়।

অনুরূপভাবে, সিংহলীদের চাকুরির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া শুরু হল। ফলে তামিল যুবকদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়; তারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গেরিলা পদ্ধতিতে কাজকর্ম শুরু করে। এদের প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তারা তামিলদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র দাবি করতে আরম্ভ করে। এই সময়ে ১৯৭৬ সালে TUF স্বাধীন, ধর্মনিরপেক্ষ, সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক "তামিল ইলম্" রাষ্ট্র গঠনকে লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করে। এটাই সম্ভবত দ্বীপ রাষ্ট্রকে জাতিগোষ্ঠীর ভিত্তিতে বিভক্ত করার প্রথম প্রয়াস। ১৯৭৭-এর সাধারণ নির্বাচনে TUF এর এই দাবি তামিল ভোটারদের স্বতস্ফূর্ত সমর্থন লাভ করে। TULF উত্তরাঞ্চলে ১৪টি আসনই লাভ করে। প্রসঙ্গতঃ TUF-কে ১৯৭৬ সালে পুনর্গঠিত করে তামিল ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট বা TULF-এ পরিণত করা হয়।

১৯৭৭-এর নির্বাচনে জয়লাভ করে জয়বর্ধনে ১৯৭২-এর সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন। যদিও এই সরকার তামিলদের জন্য বহুবিধ ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যেমন তামিল ভাষাকে "জাতীয় ভাষার" মর্যাদা দেওয়া হয়, কিন্তু তামিল নেতৃবর্গ সিংহলীদের উপর আস্থা রাখতে পারেনি। ১৯৭৮ সালে জয়বর্ধনে নতুন সংবিধান চালু করার পর এ. অমৃতলিঙ্গম মন্তব্য করেন যে "গত ৩০ বছর যাবৎ প্রচলিত রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে তামিলদের সমস্যা মীমাংসার সিংহলীদের যাবতীয় আন্তরিক প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। পরিস্থিতি এখন এমন হয়েছে যে তামিল ও সিংহলী জাতি দুটি কোনভাবেই একসাথে বসবাস করতে পারছে না।"

বস্তুতপক্ষে ভাষানীতি, চাকুরি, শিক্ষা, উপনিবেশিক মানসিকতা এবং পৌর স্বাধীনতা প্রভৃতি ইস্যু ক্রমশ তামিল যুবকদের রাষ্ট্রবিরোধিতায় প্ররোচনা দেয়। ফলে একাধিক সামরিক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। প্রতিটি গোষ্ঠীই তামিল ইলম প্রদর্শিত সহিংস পদ্ধতির উপর গুরুত্ব দেয়। এসব গোষ্ঠীর মধ্যে প্রভাকরনের নেতৃত্বে "লিবারেশন টাইগারস অফ তামিল ইলম" (LTTE) সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। অন্যান্য গোষ্ঠীগুলির মধ্যে Tamil Eelam Liberation Organisation, (TELO); People's Liberation Organisation of Tamil Eelam (PLOTE), Eelam People's Revolutionary Liberation Front (EPRLF) : Eelam National Liberation Front (ENLF) এবং Eelam Revolutionary Organisation of Students (EROS)-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীলঙ্কার জাতিগত বিরোধ এরপর ক্রমশ গৃহযুদ্ধের রূপ নেয়। ১৯৮৩-এর ২৩ শে জুলাই তামিল উগ্রপন্থীরা ১৩ জন সিংহলী সামরিক ব্যক্তিকে হত্যা করে। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পরের দিন অর্থাৎ ২৪ জুলাই জাফনায় ৩০ জন তামিল অসামরিক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়। তারপর ২৭ শে জুলাই কলম্বোয় জেলে ৫৭ জন তামিল অপরাধীকে সিংহলী কয়েদীরা হত্যা করে। এই ভাবে ক্রমশ দ্বীপরাষ্ট্রে হিংসাত্মক ঘটনা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সরকারী তথ্যানুসারে ৪০০ অসামরিক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয় এবং ১,৫০,০০০ ব্যক্তি তামিল শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করে। তামিলদের বাড়ি দোকানঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তামিল যুবকদের হেনস্থা করা শুরু হয়। তামিল যুবতীরা সিংহলী সামরিক ব্যক্তিদের দ্বারা অপহৃত ও লাঞ্ছিত হয়। শ্রীলঙ্কার বৈদেশিক দপ্তরের এক উচ্চপদস্থ অফিসার মন্তব্য করেন যে, "এযাবৎ যে দাঙ্গা হয়েছে তা করেছে উন্মত্ত জনতা কোন নেতার নেতৃত্ব ছাড়াই। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই দাঙ্গা হাঙ্গামা সংঘবদ্ধভাবে ঘটতে থাকে। কলম্বোর তামিলদের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে লক্ষ্য করে এই সব সংঘবদ্ধ দাঙ্গা হাঙ্গামা চলতে থাকে। তামিলদের ঘরবাড়িতে সুপরিকল্পিতভাবে আগুন লাগানো হয়। ভোটার তালিকা দেখে এই সব ঘর চিহ্নিত করা হয়।

সংঘবদ্ধ হিংসা প্রচন্ডভাবে শুরু হল। ১৯৮১-এর মে-জুনের পর যখন জাফনার লাইব্রেরী জ্বালিয়ে দেওয়া হল। এই সময় থেকেই পুলিশ এবং সেনাবাহিনী নিরপেক্ষতা সম্পর্কে শ্রীলঙ্কার তামিলরা আস্থা হারায়। জুলাই মাসের দাঙ্গা সেনাবাহিনীর অফিসারদের দ্বারাই সংগঠিত হয়েছিল। তারাই লুঠতরাজে ইন্ধন যুগিয়েছিল, ফলে ১,৫০,০০০ তামিল ভারতে চলে আসে ১,২০,০০০ গৃহহীন হয়ে পড়ে। ২০০০ জন মারা যায় এবং ৭০টি তামিল মালিকানাধীন কারখানা পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

১৯৮৩ জুলাই দাঙ্গার পর তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী রামচন্দ্রন মাদ্রাজে ২৮শে জুলাই এক সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান করেন, সেখানে শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীর দ্বারা তামিল নিধন যজ্ঞের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। এই সম্মেলনে স্থির হয় যে শ্রীলঙ্কার জাতিগোষ্ঠীকেন্দ্রিক দ্বন্দ্বের অবসানের জন্য নয়াদিল্লীর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করা হবে। শ্রীমতি গান্ধী এক প্রশ্নের উত্তরে এ প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারত সরকার শ্রীলঙ্কার তামিল সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করছে। তিনি নরসিমা রাও এবং জি. পার্থসারথিকে একাধিকবার শ্রীলঙ্কার তামিল সমস্যা সমাধানের জন্য প্রেরণ করেন। শ্রীমতি গান্ধী TULF নেতা অমৃতলিঙ্গম এবং রাষ্ট্রপতি জয়বর্ধনের ভাই বিশেষ দূত হেক্টর জয়বর্ধনের সাথে পৃথক পৃথক ভাবে আলাপ আলোচনা করেন। এর পরে জয়বর্ধন সর্বদলীয় সম্মেলনের মাধ্যমে জাতিদাঙ্গা অবসানের একটি রাজনৈতিক চেষ্টা করেন। ভারতের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বিবদমান গোষ্ঠীগুলিকে থিম্পু শহরে আলাপ আলোচনার জন্য আহ্বান করা হয়, যদিও এই আলাপ-আলোচনা বিশেষ ফলদায়ী হয়নি। তামিলরা নিজেদের পৃথক জাতিসত্তা রূপে দাবি করতেই থাকে; সেজন্য তামিল নেশনের পৃথক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং তামিলদের জন্য পৃথক বাসভূমি চাইতে থাকে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীও উভয়ের পক্ষে গ্রহণযোগ্য সমাধান সূত্রের অনুসন্ধান করেছিলেন। ভারত বারবার তামিল সমস্যার সমাধানের ইতিবাচক রাজনৈতিক সমাধান এবং শ্রীলঙ্কার ভূখন্ডগত সংহতির প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে।

কিন্তু ক্রমশ দু দেশের মধ্যে সন্দেহের বাতাবরণ গড়ে ওঠে। প্রথমতঃ শ্রীলঙ্কা সামরিক সাহায্যের প্রার্থনা জানিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, পাকিস্তানে কোন দূত পাঠিয়েছে কি না সে-বিষয়ে ভারত অনুসন্ধান করে। দ্বিতীয়তঃ মার্কিন সামরিক সচিব, ক্যাসপার ওয়েগবার্গার ১৯৮৩-এর অক্টোবরে কলম্বো সফরকালে শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি জয়বর্ধনের সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রথম ঘটনার ফলে শ্রীলঙ্কার মনে ভারতের আধিপত্যমূলক মনোভাব সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। এবং দ্বিতীয় ঘটনার ফলে ভারতের মনে হয় যে দক্ষিণপন্থী UNP সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ

প্রার্থনা করছে। ইন্দো-শ্রীলঙ্কা সম্পর্ক যখন এই রকম পারস্পরিক সন্দেহে আচ্ছাদিত তখন জাফনা শহরে তামিল গেরিলাদের সাথে শ্রীলঙ্কার নিরাপত্তা রক্ষীদের মধ্যে প্রচন্ড রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হয়।

এই ঘটনার ফলে মনে হতে থাকে যে, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আর কিছু হবে না। তামিলরা বুঝে নিল তাদের দাবি আদায়ের একমাত্র পথ হল হিংসাশ্রয়ী দাঙ্গা হাঙ্গামা। শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী প্রেমদাসা এবং নিরাপত্তামন্ত্রী ললিথ আথুলামুদালি সরাসরি অভিযোগ করেন ভারতে তামিল উগ্রপন্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। রাষ্ট্রপতি জয়বর্ধনে তামিল অধ্যুষিত উত্তর এবং পূর্বাঞ্চলের তামিল উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের নির্দেশ দেন।

শ্রীলঙ্কার সরকার যখন সামরিক পদ্ধতিতে অবস্থা আয়ত্তে আনতে ব্যর্থ হল তখন সে ভারতের সাহায্যে প্রার্থনা করতে বাধ্য হয়। ভারতের তরফ থেকে শ্রীলঙ্কার সরকারকে বারবার আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে অনুরোধ করা হয়।

এরপর ভারত তার অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা শুরু করে সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে। সে জাফনার কিছু সাহায্য পাঠায়, যদিও জাফনার জনসাধারণকে ভারতের তরফে মানবিক সাহায্যদানের ঘটনাকে নানাভাবে বিস্তর সমালোচনা করা হয়। আসলে শ্রীলঙ্কা সরকারের অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে জাফনায় সাধারণ মানুষ প্রভূত অসুবিধার মধ্যে পড়ে। সে কারণেই ভারত কিছু সাহায্য পাঠিয়েছিল। কিন্তু এই ঘটনার পর থেকেই ভারত শ্রীলঙ্কার ঘটনাবলীতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে, যার ফলে ইন্দো-শ্রীলঙ্কা চুক্তির পথ প্রশস্ত হয়।

ইন্দো-শ্রীলঙ্কা চুক্তির সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী মন্তব্য করে যে শ্রীলঙ্কার ঐক্য, সংহতি এবং স্থায়িত্বের প্রতি ভারতের যথেষ্ট আগ্রহ আছে। চার বছর পারস্পরিক আলাপ আলোচনার পর ঐতিহাসিক ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তি সাক্ষরিত হয় ২৯শে জুলাই ১৯৮৭।

এই চুক্তির পর ভারত-শ্রীলঙ্কার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে সহজ করে তোলে। এমনকি এই চুক্তির মাধ্যমে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা পথও প্রশস্ত হয়। উভয় দেশই পারস্পরিক মতপার্থক্যের অবসান ঘটিয়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করে। চুক্তির ২.১৬ অনুচ্ছেদে বলা হল, শ্রীলঙ্কায় সক্রিয় সামরিক গোষ্ঠীগুলি যদি চুক্তির প্রস্তাব না গ্রহণ করে তবে তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এজন্য ভারত প্রয়োজনীয় সামরিক সাহায্য দান করবে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতীয় সেনাবাহিনী ও ভারতীয় শান্তিরক্ষীবাহিনী (IPKF) শ্রীলঙ্কায় গিয়েছিল। অন্যদিকে কলম্বোও অন্যান্য দেশের সঙ্গে তামিল সমস্যা সংক্রান্ত আলাপ আলোচনার হ্রাস করেছিল।

চুক্তি অনুযায়ী শ্রীলঙ্কা সরকার উত্তর ও পূর্ব অঞ্চল থেকে সেনাবাহিনী সরিয়ে নেবে এবং উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলি অস্ত্র সমর্পন করবে। এই দুই অঞ্চলের সমন্বয়ে একটি পৃথক ইউনিট গঠন করে কিছু পরিমাণ স্বাতন্ত্র্য প্রদানের কথাও ঘোষণা করা হল।

ভারত এই দুই প্রদেশে আইন ও শান্তি রক্ষার গ্যারান্টি দেবে। তাই সেখানে শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী ও পুলিসের পরিবর্তে ভারতের শান্তিরক্ষাবাহিনী দায়িত্ব গ্রহণ করবে। শ্রীলঙ্কাও প্রতিশ্রুতি দেয় পূর্ব উপকূলের ত্রিঙ্কোমালি শহরকে ভারত-বিরোধী স্বার্থে ব্যবহার করা যাবে না এবং কলম্বোয় ভয়েস অফ আমেরিকার রিপিটর রেডিও স্টেশন থেকে ভারত-বিরোধী কোন রাজনৈতিক প্রচার চালান হবে না।

সিংহলী এবং তামিলরা উভয়েই এই চুক্তির বিরোধিতা করেছিল। সিংহলী রাজনীতিবিদ্‌রা এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এই চুক্তিকে শ্রীলঙ্কার সার্বভৌমত্বের অবমাননা মনে করত। উগ্র স্বদেশীকতায় আচ্ছন্ন সিংহলীরা এবং JVP ক্রমান্বয়ে জয়বর্ধনে সরকারের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কার্যকলাপ অব্যাহত রাখে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সিরিমাভো বন্দরনায়েকও

চুক্তি স্বক্ষরের জন্য রাষ্ট্রপতি জনবর্ধনকে সমালোচনা করেন। তিনি মন্তব্য করেন, চুক্তির ফলে উত্তর এবং পূর্ব অঞ্চলের পৃথক রাষ্ট্র গঠনের পথ প্রশস্ত হল। LTTE গোষ্ঠীও চুক্তির তীব্র সমালোচনা করে। সামান্য কিছু পরিমাণ অস্ত্র এই উগ্রপন্থী গোষ্ঠী সমর্পন করেছিল। কিন্তু সে কলম্বো সরকার ও IPKF -এর বিরোধিতা করতে থাকে এবং ইলমের প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য যা করণীয় তাই করে যেতে থাকে।

এই গোষ্ঠী আপসহীনভাবে IPKF এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলে। অক্টোবর মাসে ১২ জন LTTE গেরিলা IPKF-এর হাতে ধরা পড়ার পর আত্মহত্যা করে। এই ঘটনার পর LTTE পূর্ণমাত্রায় IPKF-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে তারা তামিলদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে কোন রকম আপস রফায় রাজি ছিল না।

গেরিলাদের বিভিন্ন গোষ্ঠী এরপর নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। হিন্দু তামিল ও মুসলিম তামিলদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। দ্বন্দ্ব মূলত LTTE-এর সাথে অন্য তিন তামিল গোষ্ঠী PLOTE, EPRLF এবং TELO মধ্যে চলতে থাকে। বস্তুতপক্ষে LTTE নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যেকোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে রাজী ছিল।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত LTTE সর্বাধিক শক্তিশালী ও সক্রিয় উগ্রপন্থী গোষ্ঠী হিসেবে আবির্ভূত হয়। IPKF-এর পক্ষে LTTE-কে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করা সম্ভব হয়নি। ১৯৮৮ সালে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হয় ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তি অনুযায়ী। EPRLF উত্তর-পূর্ব প্রাদেশিক পরিষদের ক্ষমতায় আসীন হয়। কিন্তু বহুবিধ সমস্যা পরিষদের সুষ্ঠু কার্যকলাপের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে জাতি সমস্যার কোন রাজনৈতিক মীমাংসা এখনো পর্যন্ত শ্রীলঙ্কায় সম্ভব হয়নি। উপরন্তু সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রেমদাসাকে উগ্রপন্থীরা হত্যা করে। পরে UNP-র রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী জেমিনী দেশনায়েক উগ্রপন্থীদের হাতে নিহত হন। এই সব হত্যাকান্ড দ্বীপরাষ্ট্রের রাজনৈতিক অস্থিরতা বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে। এই অস্থিরতার পরিবেশের মধ্যে SLEP-র নেত্রী চন্দ্রিকা কুমারতুঙ্গা নির্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতায় আসীন হন। তিনি আন্তরিকতার সাথে জাতিসমস্যার রাজনৈতিক সমাধান সূত্র অনুসন্ধান করে ছিলেন।

তবে তামিল দাবিদাওয়া সম্পর্কে সরকার বৈপ্লবিক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে অক্ষম কারণ তাতে সিংহলী সম্প্রদায় অসন্তুষ্ট হবে। অন্যদিকে তামিল জনগোষ্ঠী শ্রীলঙ্কার সরকারের উপর আস্থা রাখতে ভরসা পায় না। UNP এবং SLEP উভয় রাজনৈতিক দলই তামিলদের কাছে নিজেদের বিশ্বস্ততা হারিয়েছে। রাজা পক্ষে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হাবার পর তিনি তামিলদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সামরিক অভিযান শুরু করেন। সংঘর্ষে LTTE নেতা প্রভাকরন নিহত হবার পর তামিলদের আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু এই সমস্যার সামরিক নয়, রাজনৈতিক সমাধান প্রয়োজন। না হলে আবার ভবিষ্যতে তামিলদের আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠতে পারে।

Further Readings :

1. Wilson, A. J., *Politics Sri Lanka; 1947-73*
2. Ram, Mohun, *Sri Lanka : The Fractured Island*
3. Padnis, Urmila, *Ethnic Groups in Sri Lanka* in Taylor, D and Yapp, M., (ed.) *Political Identity in South Asia*

দ্বাদশ পাঠ

শ্রীলঙ্কার JVP বিদ্রোহ

(JVP Revolt in Sri Lanka)

জনতা বিমুক্তি পেরামুরা (Janata Vimukti Peramura JVP) শ্রীলঙ্কার একটি উগ্রপন্থী সিংহলী বৌদ্ধদের সংগঠন যারা শ্রীলঙ্কায় তামিলরা যে অধিকতর সুযোগ সুবিধা দাবি করছিল এবং পাচ্ছিল তার বিরোধিতা করেছিল। JVP ছিল মূলতঃ ১৫-২৫ বয়ঃ গোষ্ঠীর বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী যুব সম্প্রদায়ের সংগঠন। কন্দয়ন উচ্চভূমি এবং নিম্নভূমি উভয় স্থানের সিংহলীদের নিয়েই এই সংগঠনটি গড়ে ওঠে। মূলতঃ শ্রীলঙ্কার প্রথম প্রজন্মের শিক্ষিত বেকার ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা শেষ করে বসে থাকা যুবক যুবতীরা, যারা সংসদীয় ব্যবস্থা ও সনাতন বামপন্থী কর্মধারায় অধৈর্য হয়ে উঠেছিল তারাই JVP নামক সংগঠনে যোগ দিয়েছিল। মতাদর্শ হিসাবে তাদের কাছে ট্রটস্কির চিন্তাধারা গ্রহণযোগ্য হয়েছিল এবং তারা লাটিন আমেরিকার সমসাময়িক কালের তরুন নায়ক চি - গুয়েভারা (Che-Guevara) প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেছিল। এই কারণে JVP কে গণমাধ্যমগুলি একসময় "Che-Guevarist" বলে অভিহিত করত, যদিও JVP র সদস্যরা কখনোই সেকথা স্বীকার করত না। মাও এর চিন্তাধারার প্রতিও তারা সহানুভূতিশীল ছিল। যদিও নিজেদেরকে তারা মার্কসবাদী লেনিনবাদী বলে দাবি করত কিন্তু JVP-র রাজনৈতিক সমঝোতা ছিল সীমাবদ্ধ। তারা মূলতঃ সিংহলীদের দাবি আদায়ের জন্য সংগ্রাম করত, তামিলদের অধিকতর সুযোগ সুবিধাদানের বিরোধিতা করত, নয়া-উপনিবেশবাদের বিরোধী ছিল এবং শ্রীলঙ্কায় তামিল প্রশ্নে ভারতীয় হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করত।

জনতা বিমুক্তি পেরামুরা (JVP) বিগত শতকের সত্তরের দশকের প্রথম দিকে পরিচিতি লাভ করলেও এই সংগঠনের অস্তিত্ব এক JVP মুখপাত্রের মতে ১৯৬৪ সাল থেকেই ছিল। ১৯৬৫ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় JVP, UNP র সাথে যোগ দেয় এবং বাম মনোভাবাপন্ন দল SLFP কে পরাজিত করে। কিন্তু ১৯৬৫-৭০ সালে তামিল প্রশ্নে তাদের সাথে UNP নেতৃবৃন্দের বারংবার মতবিরোধ হয়। তামিল প্রশ্নে UNP সাথে JVP র মতবিরোধ থাকলেও নির্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতায় আসার বাসনায় তারা ১৯৭০ সালের নির্বাচনেও UNP র সাথেই থেকে যায়। কিন্তু ১৯৭০ সালের নির্বাচনে UNP র শোচনীয় ফল করে ও অপ্রত্যাশিতভাবে UF ক্ষমতায় আসে। JVP র পক্ষেও এই নির্বাচনে একটাও আসন লাভ করা সম্ভব হয়নি যদিও ১৯৬৫ সালের নির্বাচনে তারা দশটি আসন পেয়েছিল।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে যখন JVP একটাও আসন লাভ করতে সমর্থ হল না তখন সাংবিধানিক পথে আন্দোলনের ব্যাপারে তারা প্রচন্ড হতাশ হয় এবং শ্রীলঙ্কায় সিংহলীদের স্বার্থ তুলে ধরার জন্য উগ্রপন্থার আশ্রয় নেওয়া উচিত বলে সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে রোহনা বিজয়বীরার (Rohana Wijeveera) নেতৃত্বে হিংসাত্মক ও বিপ্লবাত্মক ভঙ্গীতে তারা আত্মপ্রকাশ করে। JVP র এই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত হিংসাত্মক বিদ্রোহ সমগ্র দ্বীপ ভূমির শান্তিকে বিঘ্নিত করে এবং দ্বীপভূমির রাজনীতিকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করে। সেই সময় চিরায়ত পথে শ্রীলঙ্কায় যে বামপন্থী আন্দোলন চলছিল তা JVP র বিপ্লবাত্মক কর্মকাণ্ডের ফলে দিকভ্রান্ত হয়। এই বিদ্রোহে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল কিছু হাতে তৈরী বোমা ও গাদা বন্দুক যা মূলতঃ শিকারের কাজে ব্যবহৃত হত। বেশ কিছু সিংহলী-বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মহিলাও বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল। বিদ্রোহীরা চি-গুয়েভারা ও মাও প্রদর্শিত পথ বেছে নিয়েছিল এবং বিদ্রোহের গ্রামীণ ভিত্তির উপর আস্থা স্থাপন করেছিল। কিন্তু তারা বিদ্রোহের

মতাদর্শগত পরিপ্রেক্ষিতকে স্পষ্টভাবে প্রকটিত করতে পারে নি। আর এই মতাদর্শগত দৃষ্টিকোণকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারেনি বলেই বিদ্রোহও শেষ পর্যন্ত সাফল্যের মুখ দেখেনি।

JVP র পূর্বে অপর কোন সংগঠন উগ্রপন্থামূলক কার্যকলাপের পথে না যাবার ফলে শ্রীলঙ্কার জাতীয় জীবন এরকম সশস্ত্র সংগ্রাম বা রাজনৈতিক হিংসার সাথে পরিচিত ছিল না। ফলে JVP তার আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে জাতীয় নেতৃত্বকে স্বভাবতই স্তম্ভিত করেছিল। ৫ই এপ্রিল রাত্রে বিদ্রোহীরা দেশের বিভিন্ন পুলিস স্টেশানে হানা দেয় ও ভাঙচুর করে। দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি সিরিমাভ বন্দরনায়েককে অপহরণ অথবা খুন সেই রাত্রে করবার পরিকল্পনা থাকলেও ঐ পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত বানচাল হয়ে যায়। এর ফলশ্রুতিতে আন্দোলনের তীব্রতা কমে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশের বিক্ষিপ্ত কয়েকটি অঞ্চলে কয়েক সপ্তাহ ধরে বিদ্রোহী ও সরকার পক্ষের শান্তি রক্ষকদের মধ্যে জোরদার লড়াই চলতে থাকে। শ্রীলঙ্কা সরকারও ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করে এবং বিদ্রোহকে কঠোর হস্তে দমন করবার সাধ্যমত চেষ্টা করে। জুলাই মাস পর্যন্ত প্রায় চোদ্দ হাজার সিংহলী উগ্রপন্থী হয় আত্মসমর্পন করে কিংবা গ্রেপ্তার হয়। প্রধানমন্ত্রীর হিসাবমত ১৯৭১ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত বিদ্রোহের ফলে ১২০০ শ্রীলঙ্কার নাগরিক নিহত হয়েছেন যার মধ্যে ৬০ জন পুলিশ বা মিলিটারী কর্মচারী। কিন্তু বেসরকারী মতে মৃতের সংখ্যা ছিল ৬০০০ এর বেশী। কোন কোন সংগঠন এও দাবি করেছিল যে মৃতের সংখ্যা আট থেকে পনেরো হাজারের মধ্যবর্তী কোন সংখ্যা হতে পারে।

JVP র এই হিংসাত্মক বিদ্রোহের কারণ হিসাবে দেশের তীব্র বেকার সমস্যাকেই প্রথমে চিহ্নিত করতে হয়। যে কোন উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে যদি বেকারত্বের সমস্যা তীব্র হয় তাহলে সেখানকার পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে ওঠে। শ্রীলঙ্কাও এর ব্যতিক্রম নয়। দেশের শিক্ষার প্রসারের সমানুপাতে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সেখানে হয়নি। ফলে ১৯৭১ সাল নাগাদ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষা শেষ করবার পর তাদের সামনে কর্মসংস্থানের কোন সুযোগ ছিল না। তারা সিংহলী ভাষা এবং কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ের নানান জটিল তত্ত্ব আয়ত্ব করেছিল কেবলমাত্র শিক্ষক কিংবা সরকারী কর্মচারী হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য। কিন্তু কর্মসংস্থানের কোন সুযোগ না থাকায় তাদের মধ্যে হতাশা আসে এবং তারা বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। অবশ্য কতকগুলি জেলায় বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপে নিপীড়িত ও শোষিত নিম্নস্তরের জাতিগুলির স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। নিম্নস্তরের জাতিগুলির প্রতি শোষণের মাত্রা এমন পর্যায়ে গিয়েছিল যে তাদের পক্ষে শোষণ সহ্য করা আর সম্ভব হচ্ছিল না — এই অবস্থায় তাদের বিদ্রোহে যোগ দেওয়াটাই স্বাভাবিক। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল যে, গ্রেপ্তার হওয়া JVP উগ্রপন্থীদের মধ্যে অর্ধকেরও বেশী ছিল বিভিন্ন নিম্ন সম্প্রদায়ভুক্ত অশিক্ষিত দরিদ্র শোষিত মানুষ আর বাদবাকিরা দেশের শিক্ষিত বেকার যুব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।

যাই হোক, JVP র বিদ্রোহ শুরু হবার পর বিদ্রোহের পিছনে কোন বিদেশী শক্তির হাত আছে কিনা শ্রীলঙ্কা সরকার সেটা খতিয়ে দেখার কাজ শুরু করে। উগ্রপন্থীদের হিংসাত্মক বিপ্লবাত্মক কর্মকাণ্ড শুরু করার অব্যবহিত পরেই উত্তর কোরীয় দূতাবাস যা ১৯৭০ সালের নির্বাচনে UF ক্ষমতায় আসার পর খোলা হয়েছিল তা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং তার সমস্ত কর্মচারীকে দেশে ফিরে আসার আদেশ দেওয়া হয়। শ্রীলঙ্কা সরকার অবশ্য উত্তর কোরিয়া বা অন্য কোন বিদেশী শক্তিকে JVP কে সহযোগিতা করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেনি। তবে কলম্বো সরকার বিদ্রোহের সূচনার পরই বিভিন্ন দেশের কাছে বিদ্রোহ দমনে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করার আবেদন জানায়। একমাত্র চীন ব্যতীত শ্রীলঙ্কা প্রায় সকল দেশের কাছ থেকেই সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যায়। কিন্তু চীনা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আসে অনেক বিলম্বে। বিদ্রোহ মোটামুটি ভাবে আয়ত্তে আনার পর চীনারা এই বিদ্রোহকে প্রতিবিপ্লব বলে আখ্যায়িত করে এবং শ্রীলঙ্কা সরকারকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবে সহযোগিতা করবে এই প্রতিশ্রুতি দেয়।

শ্রীলঙ্কায় পুলিস স্টেশান আক্রমণ করে JVP যে বিদ্রোহের সূচনা করেছিল তা কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। বিদ্রোহ ব্যাপকভাবে চলেছিল মাত্র দুসপ্তাহ এবং তারপর তার তীব্রতা কমে যায় এবং ১৯৭১ সালের জুলাই মাস থেকে JVP র সংগঠন ভেঙে যেতে আরম্ভ করে। ফলে বিদ্রোহ আর বেশীদিন চালান সম্ভব হয়নি। বিদ্রোহ যে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, শেষ বিচারে ব্যর্থ হয়েছিল তার কারণ হিসাবে কয়েকটি যুক্তির অবতারণা করা যেতে পারে। **প্রথমত ঃ** বিদ্রোহীরা চেয়েছিল কেবলমাত্র একটি দ্রুত হিংসাত্মক আঘাতকরণের মাধ্যমে সরকার ফেলে দিতে যার সম্ভাব্যতা বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে যে কোন সংগঠনের পক্ষেই এককথায় অসম্ভব। তারা বিদেশী শক্তির সাহায্য পাবে এমন আশাও করেছিল যা শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। Robert N. Kearney-র মতে, বিদ্রোহীদের মধ্যে অবিশ্বাসবাদ (nihilistic) দৃষ্টিভঙ্গী ছিল এবং তারা মনে করত যে কোনক্রমে যদি প্রচলিত সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিকাঠামো ভেঙে দেওয়া যায় তাহলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে গড়ে উঠবে দেশের নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিকাঠামো এবং দেশের যাবতীয় সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আসলে অধ্যাপক Kearney সঠিকভাবেই দেখিয়েছেন যে রাজনৈতিক দিক থেকে তাদের দুরদৃষ্টির অভাবই তাদের বিদ্রোহকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছিল। তাদের ব্যর্থতার **দ্বিতীয়ঃ** কারণ হিসাবে বলা যায়, JVP র আন্দোলন কখনোই সামাজিক ভিত্তি পায়নি। জনমানসে এর প্রভাব সীমিত ছিল দেশের দক্ষিণ ও মধ্য অংশের মধ্যেই। তারা আক্রমণের কেন্দ্রস্থল হিসাবে যে পুলিস স্টেশানগুলিকে বেছে নিয়েছিল সেগুলি সবই দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ছিল। ফলে JVP র আন্দোলন সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। **তৃতীয়ত ঃ** দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলিও তাদের কাছে অভেদ্য ছিল। এগুলি মূলতঃ তামিলদেরই আয়ত্ত্বাধীন ছিল। JVP যদি ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে নিজেদের অধীনে আনতে পারত তাহলে আন্দোলন আরও স্বতস্ফূর্ত হত এবং সাফল্যের মুখ দেখতে পারত। **চতুর্থত ঃ** JVP আশা করেছিল তারা বিদেশী শক্তির সাহায্য পাবে। কিন্তু বিপরীত দিকে সরকার পক্ষও যে বিদ্রোহ দমনে বিদেশী শক্তির সাহায্য পেতে পারে সেদিকটি সম্পর্কে বিশেষ চিন্তাভাবনা করেনি। আর এই বিদেশী সাহায্য যা শ্রীলঙ্কা সরকার পেয়েছিল সেটাও JVP র পরাজয়ের অন্যতম কারণ হয়ে ওঠে। **পঞ্চমত ঃ** JVP আশা করেছিল ১৯৭০ সালের নির্বাচনে UNP ক্ষমতায় আসবে এবং বামদলগুলির জোট UF বিরোধী আসনে বসবে। তাদের পরিকল্পনা ছিল নির্বাচনের পর তারা বিদ্রোহ করবে এবং বিদ্রোহে বিরোধী দল হিসাবে বামদলগুলির সহযোগিতা পাবে। কিন্তু নির্বাচনে বিপরীত ফল হওয়ায় তারা অত্যন্ত বিচলিত হয় এবং ঐ অবস্থায় বিদ্রোহ করতে গেলে বামদলগুলির সাহায্য যে পাওয়া যাবে না সেব্যাপারে নিশ্চিত ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে পরিকল্পনা বাতিল করা সংগঠনের পক্ষে সম্ভব ছিল না কারণ সেটা করলে সদস্যদের মধ্যে একটা হতাশা আসার সম্ভাবনা ছিল। অর্থাৎ একরকম বাধ্য হয়েই JVP বিদ্রোহে নেমেছিল যদিও তারা জানত তাদের পরাজয় অনিবার্য।

JVP র বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও তৎকালীন ক্ষমতাসীন UF জোটের সনাতন বামপন্থী দলগুলির কাছে বিদ্রোহের পর্যায়টি একটি বেদনাদায়ক অধ্যায়ে পরিণত হয়েছিল। লঙ্কা সমসমাজ পার্টি (LSSP) এবং কমিউনিস্ট পার্টি (CP) ছিল ঐসময় ক্ষমতাতাসীন UF এর বড় শরিক এবং মূলত তারাই সরকার গঠন করেছিল। তাদের বিপ্লবাত্মক আন্দোলনকে ব্যর্থ করবার জন্য অতিমাত্রায় দেশের সামরিক বাহিনী ও বিদেশী শক্তির পদানত হতে হয়েছিল। JVP র এই আন্দোলন ব্যর্থ হলেও তার তাৎপর্য খুব সীমিত ছিল একথা বলা যায় না কারণ দেশের যুবসম্প্রদায়ের বেকারত্বের অবস্থা কতখানি ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেছিল JVP সেটা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিল। শুধুমাত্র JVP র সদস্য বেকার যুবকদের মধ্যেই নয়, অন্যান্য সংগঠনের বিশেষতঃ মার্কসবাদে বিশ্বাসী এবং মার্কসীয় দলের সাথে যুক্ত যুবকদের মধ্যেও তারা সচেতনতা ব্যপকভাবে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। মার্কসীয় দলগুলি থেকে তারা

নূতন প্রজন্মের বেশ কিছু যুব সম্প্রদায়ের সদস্যকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছিল। JVP র এই আন্দোলন মার্কসবাদী দলগুলিকে যুব সম্প্রদায়ের জন্য গঠনমূলক কিছু করে তাদের হতাশা দূর করবার কথা ভাবতে বাধ্য করেছিল কারণ তার উপরই নির্ভর করেছিল ক্ষমতাসীন বামদলগুলির জোটের ভবিষ্যৎ।

পরিশেষে, আর একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১৯৭১ সালের JVP বিদ্রোহ অল্প কয়েকদিনের মধ্যে ব্যর্থ হয়ে গেলেও, সংগঠনের ব্যাপক ক্ষতি হলেও তারা কিন্তু নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। পরবর্তীকালে তারা আবার শ্রীলঙ্কার রাজনীতিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ কারক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৮৩ সালে সেই রোহানা বিজয়বীরা (Rohana Wijeveera) নূতন প্রজন্মের যুবকদের সিংহলী বৌদ্ধ মতাদর্শ তুলে ধরতে আহ্বান জানান এবং সেই সময় থেকেই JVP আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৮৩ সালের তামিল বিরোধী দাঙ্গা JVP র নেতৃত্বে হয়েছিল । এবং তারা জয়বর্ধনের সরকার ফেলে দেবার চক্রান্তও করতে থাকে। ১৯৮৭ সালে ভারতীয় শান্তি সেনা (IPKF) পাঠানোর জন্য ভারত শ্রীলঙ্কার মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল তার কতকগুলি ধারাকে তারা মানতে পারেনি এবং এই চুক্তিকে কেন্দ্র করে তারা ভারত বিরোধী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে থাকে এবং শ্রীলঙ্কা সরকারকে ঐ চুক্তি বাতিলের জন্য চাপসৃষ্টি করতে থাকে। বস্তুতঃপক্ষে, শ্রীলঙ্কার বর্তমান রাজনীতিতে LTTE-র মত JVP ও এক শক্তিশালী উগ্রপন্থী সংস্থায় পরিণত হয়েছে।

Further Readings :

1. Wilson, A. J., *Politics in Sri Lanka : 1947-73*
2. Ram, Mohun, *Sri Lanka : A Fractured Island*

Exercise-3

(a) Essay Type Questions :

1. Critically trace the roots of the ethnic crisis in Sri Lanka.
2. Assess the importance of religion as a factor in the politics of Sri Lanka.
3. "Considerations of religion play a significant role in the ethnic politics of Sri Lanka." —Elucidate.
4. Do you agree with the view that ethnic conflict played a major role in the growth of Tamil seperatism in Sri
   Lanka ? Give reasons for your answer.
5. Do you agree with the view that the Provincial Council system in Sri Lanka cannot be a satisfactory solution to the ethnic problems there ? Give reasons for your answer.
6. Trace the roots of Tamil Seperatism in Sri Lanka.
7. What were the reasons behind the JVP revolt in Sri Lanka in the early 1970's ? What was its significance for the Left Partis ?

(b) Short Answer Type Questions :

1. How does religion play its role in the politics of Sri Lanka ?
2. What are the differences among the major ethnic groups in Sri Lanka ?
3. What has been the role of the LTTE in Sri Lanka in recent times ?
4. What were the reasons for the JVP revolt in Sri Lanka in early 1970's ?
5. What are the claims and counter-claims made by the Sinhalese and the Tamils with regard to the origin of Sri Lanka ?
6. Write a brief note on Tamil United Liberation Fron (TULF).
7. What is the political stand of the LTTE ?
8. What are the different phases into which the politics of Sri Lanka can be divided ?
9. What are the major ethnic groups in Sri Lanka ?
10. What were the major provisions of the Bandarnaike—Chelvanayakam Pact of 1956 ?
11. What were the reasons behind the failure of the JVP revolt in Sri Lanka in the early 1970s ?
12. What has been the role of the LTTE in Sri Lanka in recent years ?
13. Mention the major provisions of the Indo-Sri Lankan Accord of 1987.
14. Do you agree with the view that the Estate Tamils have been the worst victims of the ethnic strife in Sri Lanka ?
15. Did S.R.W.D. Bandernayke play a key role in mobilizing the Sinhalese on the basis of Buddhism ? Give reasons for your answer.

———————

ত্রয়োদশ পাঠ

SAARC চার্টারের দূর্বলতা

(Weaknesses in the SAARC Charter)

বর্তমানে জনগণের সকল আশা আকাঙ্খা বাস্তবায়িত করা এককভাবে কোন রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য আঞ্চলিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এজাতীয় একটি আঞ্চলিক সংগঠন হল SAARC। আঞ্চলিক সংগঠন হিসেবে, SAARC বয়সে নবীন কিন্তু সে জন্মলগ্ন থেকেই বিশ্বাসযোগ্য প্রত্যাশা সৃষ্টি করতে পারেনি। আসলে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে সমরূপতা থাকলেও এখানে সহযোগিতার পরিবর্তে নানা কারণে কিছু সমস্যা দেখা যাচ্ছে। ফলপ্রসু সহযোগিতার পথে এগুলি গুরুত্বপূর্ন অন্তরায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় অপ্রতিসাম্যের সমস্যা, পরিপূরক অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলার সমস্যা এবং রাজনীতিকে অগ্রাধিকার প্রদানের সমস্যার কথা। এইসব সমস্যা যা দক্ষিণ এশিয়ার সহযোগিতার ক্ষেত্রের অন্তরায় SAARC এর চার্টারেও প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয় অঞ্চলের সহযোগিতার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী উপাদানগুলির হাত থেকে SAARC চার্টার অব্যাহতি পায়নি। উদ্ভবের সময় থেকেই SAARC এর চার্টারে একাধিক দূর্বলতা রয়েছে। সেগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে।

দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিকে SAARC চার্টারের পরিধির বাইরে রাখা হয়েছে। প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয় এবং অবাধ বাণিজ্যের পরিবেশ সৃষ্টি সংক্রান্ত কোন বিষয় SAARC চার্টারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এইসব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিশেষত বাণিজ্যের বিষয়ে সহযোগিতার অভাবে সার্কের অবস্থা অনেকটা ডেনমার্কের রাজপুত্র ব্যতীত হেমলেট নাটক অভিনয়ের মত। আঞ্চলিক সহযোগিতার নামে SAARC চার্টারকে কয়েকটি গুরুত্বহীন বিষয়ে নজর দিতে বলা হয়েছে ; যেমন আবহাওয়া বিজ্ঞান, বনসৃজন উন্নয়নের ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা ইত্যাদি। অবশ্য 1994 সালে SAPTA স্বাক্ষরের পর আন্তঃরাষ্ট্র বাণিজ্য সমস্যা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

সার্কের চার্টারের অন্তর্গত বিষয়ে যাবতীয় সিদ্ধান্ত শিখর সম্মেলনেই নেওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধানগণ যারা শিখর সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন তাঁরা রাজনৈতিক জীব এবং এদের উপর সর্বদাই আভ্যন্তরীণ নির্বাচন এবং অন্যান্য রাজনৈতিক চাপ ক্রিয়া করে। ফলে তাঁরা অত্যন্ত সতর্কভাবে সম্মেলনে মতামত প্রকাশ করেন। কোন কঠোর সিদ্ধান্ত যদি আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অসন্তোষ সৃষ্টি করার সম্ভাবনা থাকে তাহলে সেগুলি সযত্নে পরিহার করা হয়। আসলে সার্ক সম্মেলনের আলোচনার প্রতি পদে রাজনীতি প্রাধান্য পায়, তাই বলা হয় অরাজনৈতিক বিষয়ের উপরেও এখানে রাজনীতির ছায়া পড়ে।

রাজনীতির প্রাধান্যের কারণেই 'দ্বিপাক্ষিক এবং বিতর্কিত' বিষয়গুলি SAARC এর চার্টার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। একথা সত্যি যে SAARC এর সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এমন অনেক দ্বিপাক্ষিক এবং বিতর্কিত বিষয় আছে যেগুলি তাদের সম্পর্ককে তিক্ত করেছে। কিন্তু সেগুলি বৈঠকে আলোচনা করা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে ভারতের সাথে অন্যান্য SAARC রাষ্ট্র যথা পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপালের নানা বিষয়ে তিক্ততা

রয়েছে কিন্তু সেগুলি SAARC-এর অধিবেশনে আলোচনা করা যায় না। এইসব বিষয়গুলির সমাধান না হওয়ার ফলেও সহযোগিতার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, SAARC এর শিখর সম্মেলনে সিদ্ধান্তগ্রহণ পদ্ধতি 'একক ভেটো ব্যবস্থা' ব্যতীত আর কিছু নয়। যেহেতু প্রতিটি সিদ্ধান্ত মতৈক্যের ভিত্তিতে গৃহীত হয়, তাই কোন একটি বিষয়ে SAARC এর প্রতিটি সদস্যের সম্মতি সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। এককভাবে কোন একটি রাষ্ট্র কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে পারে। আসলে এজাতীয় ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল এই কারণে, যাতে কোন রাষ্ট্র মনে না করে যে সংখ্যা গরিষ্ঠের সমর্থনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি আশ্রয়ে তার স্বার্থের প্রতিকূল কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। ভারত মনে করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সাথে যেহেতু তার সম্পর্ক ভাল নয় তাই সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে এই সব রাষ্ট্র জোটবদ্ধভাবে তাদের সিদ্ধান্ত ভারতের উপর চাপিয়ে দিতে পারে। অনুরূপভাবে পাকিস্তান মনে করে এতে ভারত অন্য রাষ্ট্রগুলির সাথে আতাঁত করে তার স্বার্থের প্রতিকূল যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কার্যকরী করবে।

চতুর্দশ পাঠ

সার্ক ঃ সমস্যাবলী ও ভবিষ্যৎ

ভূমিকা

দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে ১৯৮৫ সালের ৮ই ডিসেম্বর একটি স্মরণীয় দিন। ঐ দিনটিতে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতে অনুষ্ঠিত এক শীর্ষ বৈঠকে সমবেত হয়ে 'ঢাকা ঘোষণা'য় এবং দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা বা সার্ক-এর সনদে স্বাক্ষর করেন। যে-সাতটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা 'সার্ক' নামক আঞ্চলিক সংস্থাটি গঠন করেছিলেন, তাঁরা হলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী, পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জিয়াউল হক্, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদ, শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি জে আর জয়বর্ধনে, নেপালের রাজা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম সাহ্ দেব ভুটানের রাজা জিগ্‌মি শিঙ্গে ওয়াংচুক এবং মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি এম এ গায়ুম। ঐ শীর্ষ বৈঠকের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এরশাদ। বাংলাদেশের সংসদ ভবনে ঐ শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

উদ্দেশ্য

সার্কের সনদের ১নং ধারায় সংস্থাটির আটটি উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যগুলি হোল ঃ

(১) দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের কল্যাণসাধন ও তাদের জীবনের উৎকর্ষ বিধান করা;

(২) এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি, সামাজিক অগ্রগতি ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ত্বরান্বিত করা এবং প্রতিটি ব্যক্তিকে মর্যাদা-সহ জীবনযাপন ও পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের সুযোগ দান করা;

(৩) দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে যৌথ আত্মনির্ভরশীলতার প্রসার সাধন করা ও তাকে শক্তিশালী করা;

(৪) সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস, বোঝাপড়া ও পারস্পরিক সমস্যা অনুধাবনে সাহায্য করা;

(৫) অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহায্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করা;

(৬) বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে সহযোগিতার সম্প্রসারণ ঘটানো;

(৭) সাধারণ স্বার্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংগঠনে আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং

(৮) একই ধরনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমন্বিত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংগঠনসমূহের সঙ্গে সহযোগিতা করা।

সনদের মুখবন্ধে বলা হয়েছে যে, ক্রমবর্ধমান আন্তঃনির্ভরশীল বিশ্বে অভিন্ন ইতিহাস ও সংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে গড়ে-ওঠা পারস্পরিক বোঝাপড়া, সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক ও অর্থবহ সহযোগিতার মাধ্যমে শান্তি, স্বাধীনতা ও সামাজিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ সুগম করা সম্ভব হবে। ঐ দলিলে একথাও বলা হয়েছে যে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সামাজিক ও কারিগরী ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারণের ফলে তাদের জাতীয় ও যৌথ স্বনির্ভরশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং বলা যায়, সার্কের প্রধান উদ্দেশ্য হোল দক্ষিণ এশীয় দেশগুলির মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের জাতীয় ও যৌথ স্বনির্ভরশীলতার পথ প্রশস্ত করা।

সমস্যাবলী

অনেক প্রত্যাশা নিয়ে ১৯৮৫ সালে সার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু সেইসব প্রত্যাশা আজও পূরণ হয়নি। এমনকি, ইতিমধ্যে ২৭ বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও যৌথ স্বনির্ভরশীলতা ও সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি আদৌ ঘটেনি। সার্কের সাফল্যের পথে যেসব সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, সেগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হোল ঃ

(১) জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাধান্য ঃ যে-কোন আঞ্চলিক সংগঠনের সাফল্যের জন্য সদস্য-রাষ্ট্রগুলিকে জাতীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে আঞ্চলিক স্বার্থের কথা ভাবতে হয়। তাই তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটানো প্রয়োজন। অবশ্য একথা বলার অর্থ এই নয় যে, আঞ্চলিক সংগঠনের সদস্যদের জাতীয় স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দিতে হবে। অন্যভাবে বলা যায়, যে-কোন আঞ্চলিক সংগঠনের সাফল্যের জন্য তার সদস্য-রাষ্ট্রগুলিকে জাতীয় স্বার্থ ও সার্বভৌমিকতার প্রতি দায়বদ্ধ থেকেও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হতে হয়। কিন্তু দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী অপেক্ষা জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অনেক বেশি প্রাধান্য লাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে ইন্দোনেশিয়ার প্রয়াত রাষ্ট্রপতি সুকর্ণ বলেছিলেন যে, বিশ্বের অনেকের কাছে জাতীয়তাবাদ একটি অপ্রচলিত মতবাদ বলে পরিগণিত হলেও আমাদের কাছে অর্থাৎ এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির কাছে জাতীয়তাবাদই হোল সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার চালিকা শক্তি। সুকর্ণের বক্তব্য যে অতিরঞ্জিত নয়, তা দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায়। উপনিবেশবাদের হাত থেকে মুক্তিলাভের পর ঐসব রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দের মধ্যে জাতীয় রাষ্ট্র ও জাতীয় সার্বভৌমিকতার প্রতি আসক্তি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রাণ চোপড়া তাঁর 'সার্ক অ্যান্ড আসিয়ান' নামক প্রবন্ধে বলেছেন যে, মাত্রাতিরিক্ত জাতীয়তাবাদ সার্কের মন্থর অগ্রগতির অন্যতম প্রধান কারণ।

(২) সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ ঃ সার্কের স্রষ্টারা মূলতঃ আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁরা রাজনৈতিক বিষয়গুলিকে আলোচ্য বিষয়সূচী থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু এরূপ অরাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হলেও দক্ষিণ এশীয় দেশগুলির মধ্যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য এবং রাজনৈতিক বিরোধ বিশেষভাবে বর্তমান থাকায় অরাজনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রশ্ন যথেষ্ট সাফল্যলাভ করতে পারেনি। অবশ্য ঐ অঞ্চলের রাষ্ট্রনেতারা একথা ভালভাবেই জানতেন যে, সুদীর্ঘকাল ধরে রাজনৈতিক বিষয়কে তাঁরা দূরে সরিয়ে রাখতে পারবেন না। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ভুটানের রাজা জিগ্‌মি ওয়াংচু বলেছিলেন যে, সার্কের আলোচনাকে কেবল অরাজনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখা যেমন সম্ভব নয়, তেমন কাম্যও সম্ভব নয়। কারণ, দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল সার্কের আলাপ-আলোচনাকে নিশ্চিতভাবেই প্রভাবিত করবে। বস্তুতঃ, দক্ষিণ এশীয় দেশগুলির রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মৌলিক পার্থক্য ঐসব দেশের রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠার পথে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা বলে বিবেচিত হয়। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীগত ক্ষেত্রে এরূপ পার্থক্যের জন্যই যে-কোন আন্তর্জাতিক ফোরামে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলির একটি ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ইস্যুতে অনেক সময় তারা পরস্পর-বিরোধী অবস্থান গ্রহণ ক'রে থাকে। প্রধানতঃ ভারতে ও পাকিস্তানের মধ্যে এরূপ ঘটতে প্রায়শই দেখা যায়। বিস্ময়ের ব্যাপার হোল — পাকিস্তান নিজেকে একটি দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্র অপেক্ষা একটি পশ্চিম এশীয় রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। বলা বাহুল্য, এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিকতা সার্কের সাফল্যের পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায়।

(৩) সার্কভুক্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমস্যা ঃ সার্কের সনদে দ্বি-পাক্ষিক ও বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলিকে আলোচনার বাইরে রাখা হয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি সার্কের ফোরামে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভারতের বিরুদ্ধে জোট গঠন করতে পারে বলে ভারত আশঙ্কা করেছিল। কারণ, ভারতের সঙ্গে এই অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রেরই দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে কাশ্মীরকে কেন্দ্র ক'রে ভারত ও পাকিস্তান; তিস্তার জল বন্টনকে কেন্দ্র ক'রে ভারত ও বাংলাদেশ; মহাকালী নদীর জল বন্টনকে কেন্দ্র ক'রে ভারত ও নেপাল এবং শ্রীলঙ্কার জাতিসত্তাগত বিষয়ে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ভারত ও শ্রীলঙ্কার বিরোধের কথা উল্লেখ করা যায়। রাজীব গান্ধীর প্রচেষ্টাতেই কার্যতঃ দ্বি-পাক্ষিক ও বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে সার্কের ফোরামে কোন আলোচনা হবে না বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু তত্ত্বগত ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও বাস্তবে দ্বি-পাক্ষিক ও বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলি বর্তমান থাকার ফলে সার্কভুক্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সহযোগিতার বন্ধন সুদৃঢ় হতে পারেনি। বস্তুতঃ, পারস্পরিক বোঝাপড়াই হোল আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তি। কিন্তু সার্কভুক্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক ক্ষেত্রে সমস্যা বর্তমান থাকায় আঞ্চলিক স্তরে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়াস লোক-দেখানো বিষয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

(৪) প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির ভারত-ভীতি এবং তাদের ঐক্য সম্পর্কে ভারতের ভীতি ঃ আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তি হোল — সহযোগিতাকারী রাষ্ট্রগুলি তাদের সাধারণ কল্যাণ বিধানের জন্য সম-পরিমাণে আগ্রহী হবে এবং তারা প্রত্যেকেই একইভাবে সহযোগিতা বৃদ্ধির কাজে অংশগ্রহণ করবে। ইউরোপীয়ান ইকনমিক কমিউনিটি (ই ই সি) বা আসিয়ান-এর মতো সফল আঞ্চলিক সংস্থাগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই এই বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু সার্কের ক্ষেত্রে বিপরীত চিত্র প্রত্যক্ষ করা যায়। কারণ, সার্কের সাতটি (বর্তমানে আটটি) রাষ্ট্রের মধ্যে ভৌগোলিক আয়তন, জনসংখ্যা, সামরিক ক্ষমতা, অর্থনৈতিক উন্নতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে অন্য সাতটি রাষ্ট্রের কোন তুলনাই চলে না। স্বাভাবিক কারণে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির ভারত সম্পর্কে এক ধরনের আতঙ্ক রয়েছে। ভারত এই অঞ্চলে তার আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্য নিয়েই সার্ককে ব্যবহার করবে — এরূপ আশঙ্কা তাদের মনে প্রথম থেকেই থেকে গেছে। তাছাড়া, ভারতের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যও প্রতিবেশী সামরিক কিংবা কর্তৃত্বমূলক শাসনব্যবস্থার অধীন দেশগুলির শাসকদের মনে এরূপ ভীতির সঞ্চার করেছে যে, সার্কের মাধ্যমে ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পেলে ঐসব দেশে গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার সম্প্রসারণ ঘটবে। এর ফলে তাদের শাসন-কর্তৃত্ব বিনষ্ট হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা দেবে। তাই প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কেউ কেউ বিদেশী রাষ্ট্রের সহায়তায় দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে ভারতের প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। এর ফলে সার্কের মাধ্যমে দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহাযোগিতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। এই ধরনের মানসিকতাসম্পন্ন প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি সার্কের মাধ্যমে যাতে ভারতের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে, সেজন্য বিবাদপূর্ণ দ্বি-পাক্ষিক বিষয়গুলিকে সার্কের এক্তিয়ার-বহির্ভূত রাখার ক্ষেত্রে ভারত যথেষ্ট তৎপর হয়ে ওঠে। সুতরাং বলা যায়, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির ভারত-ভীতি এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির ভারত-বিরোধী ঐক্য সম্পর্কে ভারতের ভীতি সার্কের সাফল্যের পথে অন্যতম অন্তরায় হিসেবে বিবেচিত হয়।

(৫) ভারত-পাকিস্তানের বিরোধ ঃ সার্কের সনদে সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সমতার নীতি প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও বাস্তবে ভারত ও পাকিস্তান সর্বক্ষেত্রেই অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি প্রভাবশালী সদস্য বলে বিবেচিত হয়। আবার, অনেক বিষয়ে 'ভারতের দাদাগিরি মনোভাব' প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির, বিশেষতঃ পাকিস্তানের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। তাই এই দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে কার্যতঃ স্থায়ী শত্রুতার সম্পর্ক গড়ে ওঠার ফলে তারা একে অপরকে

আদৌ বিশ্বাস করতে পারে না। সার্কের সনদকে উপেক্ষা ক'রে পাকিস্তান সার্কের বৈঠকে বারবার কাশ্মীর প্রসঙ্গ উত্থাপনের চেষ্টা করেছে। এইভাবে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সার্কের অষ্টম শীর্ষ বৈঠকে (১৯৯৫) পাকিস্তান কাশ্মীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। উপমহাদেশের এই দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ তাদের পারমাণবিক নিবৃত্তিকরণ তত্ত্বের প্রতি আস্থাশীল ক'রে তুলেছে। তাই ১৯৯৮ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কার্যতঃ পারমাণবিক বিস্ফোরণের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। এরূপ বিস্ফোরণের কিছুদিন পরেই (১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে) কলম্বোয় অনুষ্ঠিত দশম সার্ক সম্মেলন এই বিষয়টিকে কেন্দ্র ক'রে যথেষ্ট উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তদানীন্তন পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ সার্কের সম্মেলনে মন্তব্য করেছিলেন যে, সদস্যদের মধ্যে মতপার্থক্যজনিত ও উত্তেজনাকর পরিবেশ বর্তমান থাকলে সার্ক কখনই নিরপেক্ষ থাকতে কিংবা নিরপেক্ষ থাকার ভান করতে পারে না। তবে আশার কথা হোল — অন্যান্য সদস্য-রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের ফলে ঐ সম্মেলনে ভারত-পাকিস্তান বিরোধ গুরুতর আকার ধারণ করতে পারেনি।

(৬) বিদেশী রাষ্ট্রগুলির পরোক্ষ হস্তক্ষেপ ঃ নয়া উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রগুলি এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির জনগণকে যেমন শোষণ করতে চায়, তেমনি চায় তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ অবৈধভাবে লুণ্ঠন করতে। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রগুলি আঞ্চলিক জোট গঠনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হোক্ — এটা তারা কখনই চায় না। তাই ঐসব নয়া উপনিবেশবাদী রাষ্ট্র, বিশেষতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সব সময়ই কোন-না-কোনভাবে এইসব রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ জিইয়ে রাখার চেষ্টা করেছে এবং এখনও ক'রে চলেছে। ভারতের নেতৃত্বে জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন কিংবা ভারতের সাম্রাজ্যবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ ও জাতি-বিদ্বেষবাদ বিরোধী পররাষ্ট্র নীতি এই অঞ্চলে মার্কিন প্রভাব-প্রতিবত্তি বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান অন্তরায় বলে মার্কিন প্রশাসন মনে করে। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে ভারতের প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাসের জন্য পাকিস্তানকে বর্শাফলক হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে। আবার, এশিয়ার নেতৃত্ব নিয়ে চীনের সঙ্গে ভারতের বিরোধ দীর্ঘদিনের। ভারতের প্রভাব খর্ব করার উদ্দেশে চীনও পাকিস্তানকে সামরিক এবং অন্যান্য সাহায্য ও সহযোগিতা ক'রে চলেছে। এইভাবে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির পরোক্ষ হস্তক্ষেপ সার্কের সমস্যাকে জটিলতর ক'রে তুলেছে। পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবর্তে সার্কের সদস্য-রাষ্ট্রগুলি প্রায়শই দ্বন্দ্ব ও বিরোধে লিপ্ত থাকে।

(৭) পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঃ দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রগুলি বিশ্বের বাজারে তাদের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী বিক্রীর জন্য পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। উদাহরণ হিসেবে চা ও পাট রপ্তানির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই দু'টি জিনিসের উৎপাদক দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা সার্কের সাফল্যের পথে অন্যতম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া, গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়ে আন্তর্জাতিক ফোরামে সার্কভুক্ত রাষ্ট্রগুলি একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসেবে নিজেদের তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর নববই-এর দশকের পূর্ব পর্যন্ত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রশ্নে ভারত পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশে দাঁড়ালেও পাকিস্তান মার্কিন বৃত্তের মধ্যেই ঘোরাফেরা করত। এইসব কারণে একটি প্রকৃত আঞ্চলিক সংগঠন হিসেবে সার্ক আজও নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি বলে মনে করা হয়।

ভবিষ্যৎ

'সাপ্‌টা' ও 'সাফ্‌টা' স্বাক্ষর ঃ নানা প্রকার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সার্কের সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৮৫ সালে সার্ক গঠিত হওয়ার পর সদস্য-রাষ্ট্রগুলির প্রচেষ্টায় সংস্থার একটি স্থায়ী সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। 'সার্কনেট' নামে পরিচিত সচিবালয়টি কাঠমাণ্ডুতে অবস্থিত। প্রথমে পাঁচটি ক্ষেত্রকে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও পরবর্তী সময়ে তার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে বারোটি করা হয়েছে। নতুন ক্ষেত্রগুলি হোল কৃষি, শিক্ষা, পরিবেশ, যোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, মাদকদ্রব্যের চোরাচালান প্রতিরোধ

এবং মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধ। ১৯৯৫ সালের ৮ই ডিসেম্বর নতুন দিল্লীতে স্বাক্ষরিত 'সাপ্‌টা' সার্কের সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হয়। চুক্তি-স্বাক্ষরকারী দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের সুদৃঢ়করণ, আন্তঃ-আঞ্চলিক বাণিজ্যের উদারীকরণ, বাণিজ্যিক শুল্ক ছাড় প্রদান প্রভৃতি উদ্দেশে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 'সাপ্‌ট'র দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য হোল ২০০০-২০২৫ সালের মধ্যে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলকে একটি মুক্ত বাণিজ্যিক অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলা। এই কর্মসূচী 'সাফ্‌টা' নামে পরিচিত। সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই কেবল এরূপ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার সম্ভব। কিন্তু এই লক্ষ্যে উপনীত হতে গেলে সার্ককে এখনও অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে। 'সাফ্‌টা' অনুযায়ী সার্কভুক্ত দেশগুলির বৈঠক একাধিকবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঐসব বৈঠকে কোন্ কোন্ বাণিজ্যিক পণ্যকে ছাড় দেওয়া হবে, সেগুলির তালিকার সম্প্রসারণ ঘটানো হয়েছে। তাছাড়া, মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গঠনের লক্ষ্যের পথে অন্যতম পদক্ষেপ হিসেবে আমদানি-রপ্তানির ওপর শুল্কের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়েছে। আবার, সাম্প্রতিককালে সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পণ্য চলাচলের সুবিধার জন্য একটি গমনাগমন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। এর ফলে সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য অনেকখানি বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

ইউ এন বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক সংস্থা ও অন্যান্য আঞ্চলিক সংগঠনের সঙ্গে সহযোগিতামূলক চুক্তি সম্পাদন ঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক সংস্থাসমূহ এবং অন্যান্য আঞ্চলিক সংগঠনগুলির সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সার্ক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাণিজ্য-বিশ্লেষণ ও তথ্য প্রদান ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আঙ্কটাডের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঐ একই বছরে শিশুদের কল্যাণ সাধনের ব্যাপারে সার্ক 'ইউনিসেফ'-এর সঙ্গে একটি সহযোগিতামূলক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে উন্নয়ন বিষয়ে সহযোগিতার উদ্দেশে সার্ক ও 'এসকাপ' এবং ১৯৯৫ সালে মাদকদ্রব্যের চোরাচালান ও অপব্যবহার রোধের উদ্দেশে সার্ক ও ইউ এন ডি সি পি-র মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তাছাড়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কলম্বো প্ল্যান প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গেও সার্ক সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির অবসানের জন্য চুক্তি সম্পাদন ঃ সার্কের সদস্য-রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যেও বেশ কয়েকটি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটানোর উদ্দেশে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উদাহরণ হিসেবে গঙ্গার জলবন্টন ব্যাপারে ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাছাড়া, নেপালের সঙ্গে ভারতের মহাকালী নদী উপত্যকা পরিকল্পনা বিষয়ে সম্পাদিত চুক্তিটিও ভারতের সঙ্গে নেপালের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলেই বিবেচিত হয়। আবার, ভারত-বাংলাদেশ এবং ভারত-পাকিস্তান সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির আন্তরিক প্রয়াস সার্কের এই তিনটি সদস্য-রাষ্ট্রের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে সার্কের অসাফল্য ঃ অদ্যাবধি সার্কের বেশ কয়েকটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে কলম্বোয় অনুষ্ঠিত হয়েছে দশম সম্মেলন। ১৯৯৯ সালের ২৪-২৭শে নভেম্বর নেপালের কাঠমাণ্ডুতে একাদশ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হওয়ার

পর ঐ সম্মেলন স্থগিত রাখা হয়। এমনকি, ২০০১ সালের ২৭শে জুন সার্কের স্থায়ী কমিটির তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের অনুরোধে তা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে। যাই হোক্, প্রতিটি সম্মেলনে নানা প্রকার গুরুগম্ভীর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সত্ত্বেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সার্কের অগ্রগতি আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, দিল্লীতে অনুষ্ঠিত অষ্টম শীর্ষ সম্মেলনে (১৯৯৫) দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচীর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হলেও দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রগুলির প্রায় ৪০ শতাংশেরও বেশি মানুষ আজও দারিদ্রসীমার নীচে রয়েছে। মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে অনুষ্ঠিত নবম শীর্ষ সম্মেলনে (১৯৯৭) সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম, মাদকদ্রব্য পাচার রোধ, শিশুশ্রম নিষিদ্ধকরণ, নিরস্ত্রীকরণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু ঐসব ক্ষেত্রে সার্ক অদ্যাবিধি বিশেষ কোন সাফল্যলাভ করতে পারেনি। বরং, দশম সম্মেলন (১৯৯৮) অনুষ্ঠিত হওয়ার ঠিক পূর্বে ভারতে এবং পাকিস্তান — উভয় রাষ্ট্রই পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। এইসব দিক থেকে বিচার-বিবেচনা ক'রে অনেকেই সার্কের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তবে মাত্র ২৭ বছরের কার্যাবলীর নিরিখে বিচার ক'রে সার্কের মতো একটি আঞ্চলিক সংগঠনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করা কতটা সমীচীন, তা নিয়ে ভেবে দেখা প্রয়োজন। অবশ্য একথা সত্য যে, সার্কের সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে নানা ক্ষেত্রে বিরোধ ও বির্তক যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকার ফলে তার অগ্রগতি আশানুরূপভাবে ঘটেনি।

সার্কের সাফল্যের শর্তাবলী ঃ সার্কের সাফল্য কতকগুলি শর্ত পূরণের ওপর নির্ভরশীল। এই শর্তগুলি হোল ঃ

(১) সার্কের প্রতি সদস্য-রাষ্ট্রগুলির দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটাতে হবে। কারণ, এর সদস্য হিসেবে যোগদান করলেও ভারত ও পাকিস্তান সার্ককে সন্দেহের চোখে দেখে। সার্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপরে যখন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল, তখন ভারত সরকার মনে করেছিল যে, ভারতেকে বিব্রত করার উদ্দেশেই এই ধরনের একটি 'ক্ষতিকর পদক্ষেপ' গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, সার্কের মতো, একটি সংগঠন গড়ে তোলাকে পাকিস্তান ভারতের 'চাণক্য-পরিকল্পনা' বলে চিহ্নিত করতে দ্বিধাবোধ করেনি। কারণ, পাকিস্তানের মতে, দক্ষিণ এশিয়ার ওপর আধিপত্য বিস্তারের জন্যই ভারত সার্ক গঠনের ব্যাপারে তৎপরতা দেখিয়েছিল। বলা বাহুল্য, সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ, বিদ্বেষ ও ভুল-বোঝাবুঝি বিদূরিত না হলে সার্ক কখনই সাফল্যলাভ করতে পারবে না।

(২) সার্কের সাফল্যের পথে সর্বপ্রধান প্রতিবন্ধকতা হোল ভারত ও পাকিস্তানের পারস্পরিক সম্পর্ক। যদিও সার্কের সনদে দ্বি-পাক্ষিক ও বিরোধিতাপূর্ণ বিষয়গুলিকে আলোচ্য বিষয়সূচির বাইরে রাখার কথা বলা হয়েছে, তথাপি প্রায়শই সার্কের অধিবেশনে কাশ্মীর-সহ নানা বিষয় চলে আসার ফলে আলোচনা অবাঞ্ছিত রূপ পরিগ্রহ করে। তাই সার্কের সাফল্যের জন্য সার্কের সনদের প্রতি সদস্য-রাষ্ট্রগুলির আনুগত্য ও ইতিবাচক মনোভাব বিশেষভাবে প্রয়োজন।

(৩) কাশ্মীরের মতো দ্বি-পাক্ষিক বিষয়গুলি তুলে যাতে কোন সদস্যই হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনার পথ রোধ করতে না পারে, সেজন্য অন্যান্য সদস্য-রাষ্ট্রকে বিশেষভাবে তৎপর হতে হবে।

(৪) কেবল ভারত ছাড়া দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রগুলির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ আদৌ উন্নত নয়। ফলে দারিদ্র, ভাষা-সমস্যা, জাতি-সমস্যা, ধর্মীয় সমস্যা প্রভৃতি ঐ অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রের অগ্রগতির

পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ক'রে চলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো নয়া সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার ক'রে একের বিরুদ্ধে অপরকে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছে। ফলে সার্কের সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস, বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। এমতাবস্থায় সার্ক সাফল্যলাভ করবে — এমন আশা করা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই সার্কের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করা। এ কাজে সার্ককেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

References :

1. Bipattaran Ghosh, 'SAARC : Some Major Impediments to its Success' in *Asian Studies,* vol. 13, No. 1, 1995.
2. Pramod Kumar Mishra, *Dhaka Summit and SAARC*, 1985.
3. *Text of the SAARC Charter.*
4. Promod K Mishra, *South Asia in International Politics,* 1986.
5. S D Muni and Anuradha Muni, *Regional Cooperation in South Asia*, 1984.
6. N C Menon, 'Problems and Promise of SAARC' in *Hindustan Times*, 10 December 1985.
7. Saral Patra, ''SAARC'' The Dhaka Summit and Beyond' in *Patriot*, 10 December 1985.

পঞ্চদশ পাঠ

দক্ষিণ এশিয়ায় জাতিগত দ্বন্দ্ব

(Ethnic Conflict in South Asia)

বহুজাতিক সমাজে জাতীয় রাষ্ট্রের গঠন, বিকাশ ও তার সুস্থিতি সর্বদাই সমস্যা ও সংকটে জর্জরিত থাকে। উন্নত বা উন্নয়নশীল বেশীর ভাগ দেশেরই রাজনৈতিক কাঠামো স্বজাত্য রাজনৈতিক (ethno-political) চাপের দ্বারা প্রভাবিত থাকে। শুধু যে নিজের দেশেই এই সমস্যা থাকে তা নয়, প্রতিবেশী অন্যান্যদের ঐক্য ও সংহতির প্রশ্নে এগুলি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেখানে বহু স্বজাত্য রাজনৈতিক গোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ সেখানে চার ধরনের চাপের উদ্ভব হয় যা আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে সক্ষম। একটি রাষ্ট্র অনেক সময় অন্য রাষ্ট্রকে তার সমস্যার জন্য দায়ী করে। কখনো কখনো আবার এক রাষ্ট্রের শাসক অন্য রাষ্ট্রে সেই জাতীয় সমস্যার বীজ বপন করে দ্বিতীয় দেশটিকে প্রভাবিত করবার উদ্দেশ্যে অথবা নিজ দেশের মানুষদের সন্তুষ্ট করবার জন্য। এছাড়াও কোন জাতিগত রাজনৈতিক আন্দোলনকে প্রতিবেশী দেশ সমর্থন ও শক্তি যুগিয়ে সেই দেশটিকে শক্তিহীন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করে ও নিজের প্রভাব বৃদ্ধি করে চলে। চতুর্থতঃ অনেক সময় স্বজাত্য রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলি একত্রিত হয়ে একটি নূতন স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে তোলবার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

দক্ষিণ এশিয়ায় এই চার ধরনের সমস্যাই পরিলক্ষিত হয়। এখানে বহুসংখ্যক জাতিগোষ্ঠী রয়েছে যাদের বিস্তার কেবলমাত্র একটি দেশে সীমিত নয় এবং এরা বিশ্বের সর্বাপেক্ষা জটিল আন্তঃ জাতিগত মিথস্ক্রিয়ার জালিকাবিন্যাস করে থাকে। কোন রাষ্ট্র তার আভ্যন্তরীণ স্বজাত্য রাজনৈতিক সমস্যার চাপের জন্য রাষ্ট্রকে দায়ী করে। যেমন সাম্প্রতিক কালে শ্রীলঙ্কা সেদেশের তামিলদের সৃষ্ট সমস্যার জন্য ভারতকে দায়ী করছে। আবার ১৯৮৪-৮৫ সালে ভারত পাঞ্জাবে শিখ উগ্রপন্থীদের সহায়তা করবার জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরব হয়। অন্যদিকে পাকিস্তান বালুচি ও পুস্তুন (Pustun) দের সৃষ্ট অশান্তির জন্য দায়ী করতে চাইছে আফগানিস্তানকে।

হিমালয় অঞ্চলে তার প্রভাব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ভারত একসময় সিকিমের নেপালীদের ব্যবহার করে দ্বিতীয় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে ছিল। তৃতীয় ধরনের সমস্যা সৃষ্টির পথেও ভারত একসময় অগ্রসর হয়েছিল। ১৯৭০-৭১ সালে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ সমর্থন করে। আবার চীনও বহুদিন যাবৎ একই কাজ করছে ভারতের উত্তর পূর্ব সীমান্তের উপজাতি নাগা ও মিজোদের বিদ্রোহে মদত দিয়ে।

চতুর্থ ধরনের সমস্যার বাস্তব রূপ দক্ষিণ এশিয়া প্রত্যক্ষ না করলেও তার সম্ভাব্যতা উপলব্ধি করছে। ১৯৬০ সালে নেপাল, সিকিম, ভূটান এবং বাংলার নেপালী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি একত্রিত করে একটি Greater Himalayan Federation গড়ে তোলার দাবি উঠেছিল। একইভাবে পাকিস্তানের বালুচিস্তান এবং আফগানিস্তান ও ইরানের বালুচরা একটি নূতন সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিল। পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে আফগানিস্তানের পুস্তুন অধ্যুষিত এলাকা পর্যন্ত স্বাধীন পুস্তুনিস্তানের দাবি আজও উঠছে।

১৯৪৭ সালের ভারতীয় উপমহাদেশের অযৌক্তিক বিভাগ এই অঞ্চলের স্বজাত্য রাজনৈতিক বিভেদ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ভারত পাক বিবাদের কারণ এই দ্বন্দ্ব। যাই হোক, ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাজন যে ত্রুটিপূর্ণ ছিল তা ক্রমশ প্রকটিত হতে থাকে এবং ১৯৭১ সালে বাঙালী অধ্যুষিত পূর্ব পকিস্তান সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু তাতেও এই অঞ্চলের সমস্যার সমাধান হয়নি। ভারত বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষাবলম্বন করে ও নিজেকে এই অঞ্চলে একটি বৃহৎ শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে ওঠার পর পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিমাংশের মধ্যে যে জাতিগত সমস্যা নিয়ে অশান্তি চলছিল তা বন্ধ হলেও এই উপমহাদেশের সকল গণ আন্দোলন স্তব্ধ হয়নি। ভারত পাকিস্তানের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান মতাদর্শগত বিরোধ বন্ধ হবার কোন লক্ষণ দেখা যায়নি। উপরন্তু ভারত-পাক মতাদর্শগত সমস্যা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়বার সম্ভাব্য কারণ হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে, যদিও সে সময় দেশে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছে স্বজাত্য-রাজনৈতিক সমস্যার আকারে।

১৯৭০ সাল থেকে উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে উত্তেজনা ও বিরোধের তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে থাকে যখন পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশ থেকে হিন্দুরা ত্রিপুরায় চলে যেতে আরম্ভ করে। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ত্রিপুরা সেই সময় ছিল উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা, কিন্তু বাঙালীরা সেখানে বসতি স্থাপন করায় ঐ রাজ্যে উপজাতিরা সংখ্যালঘু (১৮ %) হয়ে পড়ে। ত্রিপুরার উপজাতির একটা অংশের যুব সম্প্রদায় এর ফলে হিংস্র হয়ে ওঠে ও ১৯৭৭ সালের জুন মাসে ক্ষমতায় আসা বাম সরকারের প্রধান বিরোধী সংগঠনে পরিণত হয়। ত্রিপুরার কমিউনিস্ট সংগঠন যদিও একসময় উপজাতির সমর্থন পুষ্ট ছিল কিন্তু এই সময় থেকেই তারা সুস্পষ্ট রাজনৈতিক দাবি দাওয়া ছাড়াই হিংসাত্মক হয়ে ওঠে ও উগ্র গেরিলা কার্যকলাপ চালাতে থাকে। কংগ্রেস গোপনে সমর্থন যোগাচ্ছে এই অভিযোগ উঠতে থাকে। একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় আসামও, ১৯৭১ সালের পর থেকে আসামে বাঙালী মুসলমানরা অনুপ্রবেশ ঘটাতে থাকে এবং বিদেশী পুনর্বাসন নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। এছাড়াও অসমীয়া ও অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে তীব্র সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। বাংলাদেশের মধ্যেও চট্টগ্রামের পাহাড়ী দুর্গম এলাকায় উগ্রপন্থা চালাতে থাকে একটি ছোট গোষ্ঠী। ভারত ও বাংলাদেশ এই অবস্থায় উভয়ই উভয়কে উগ্রপন্থীদের সমর্থন যুগিয়ে দেশে সংকট সৃষ্টির অভিযোগে অভিযুক্ত করতে থাকে।

দক্ষিণ এশিয়ার আটটি দেশের (আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ, মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কা) মধ্যে চারটির (নেপাল, ভূটান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান) ভারতের সাথে সীমান্ত আছে। অবশ্য সংখ্যাটি পাঁচ হয় যদি শ্রীলঙ্কাকে, যা ভারত থেকে একটি সরু উপসাগর দ্বারা বিচ্ছিন্ন, হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভারত তাই দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ স্বজাত্য-রাজনৈতিক সমস্যার সাথে জড়িত, পাঁচটি দেশের নিজেদের মধ্যে কোন সীমানা নেই (পাকিস্তান, নেপাল, ভূটান, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা) এবং এদের মধ্যে তিনটি দেশে (নেপাল, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা) বন্টিত ধরনের বা আন্তঃরাষ্ট্র স্বজাত্য-রাজনৈতিক উত্তেজনার সমস্যা নেই। যদিও পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে ভারতীয় ভূখন্ডের একহাজার মাইলেরও বেশী ব্যবধান রয়েছে তথাপি দুদেশের মধ্যে সমস্যা আছে। নেপাল ও ভুটানের মধ্যে একটি ছোট ভারতীয় ভূখন্ডের ব্যবধান থাকলেও ভূটানে ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ অধিবাসী নেপালী হওয়ায় ঐ সকল অধিবাসীর নেপালের সাথে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক শক্তিশালী বন্ধন থেকে গেছে। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে ১৯৪৭ সাল থেকে বিরোধ রয়েছে। আসলে পাকিস্তান সৃষ্টির সময় এমন চারটি রাজ্য এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল যেখানে মুসলীম লীগ দুর্বল। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (NWFP) ভারত বিভক্তিকরণের সময় জাতীয় কংগ্রেসের অধীন ছিল। সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফর খান NWFP তে থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নেন এবং তিনি পাঠানদের জন্য পুস্তুনিস্তান গড়ে তুলতে উৎসাহ দেখান ও আন্দোলন শুরু করেন। আফগান সরকার তাঁকে সমর্থন যোগায় যার ফলশ্রুতি আফগান পাক সম্পর্কের অবনতি ও প্রায় যুদ্ধের পটভূমি।

পাকিস্তানের তিনটি জাতি গোষ্ঠীর উপস্থিতি তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতেও রয়েছে। পুস্তু, বালুচি ও পাঞ্জাবীদের পাকিস্তান ছাড়াও দেখা যাবে ইরান, আফগানিস্তান ও ভারতে। পুস্তুরা আফগানিস্তানে ভীষণ প্রভাবশালী। বালুচিস্তান হল পাকিস্তানের সব থেকে বেশী অনুন্নত অংশ এবং ১৯৭০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে বালুচরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। পাকিস্তান সরকারের ধারণা আফগানিস্তান বিদ্রোহীদের মদত দিচ্ছে এবং তারা ইরানের সামরিক বাহিনীর সহযোগিতায় বিদ্রোহ দমন করে।

পাকিস্তানের সিন্ধিদের মধ্যেও তারা বঞ্চিত এরকম একটা বোধ জাগ্রত হয় বোম্বাই-এ বসবাসকারী ভারতীয় সিন্ধিদের সাথে নিজেদের তুলনায় এবং ভারতীয় সিন্ধিদের মদতে তারা অশান্তি শুরু করে। পাকিস্তানের অপর একটি রাজ্য পাঞ্জাবের বাসিন্দা অধিকাংশই পাঞ্জাবী মুসলমান। অন্যদিকে ভারতীয় পাঞ্জাবের অধিবাসীরা পাঞ্জাবী শিখ ও হিন্দু। কিন্তু উভয় দেশের পাঞ্জাবীদের ভাষা এক হওয়ায় ভারত ও পাকিস্তানের দুই পাঞ্জাবের মধ্যে স্বজাত্য-রাজনৈতিক মিথস্ক্রিয়া শুরু হয়। ভাষার অভিন্নতা বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৭১ সালে ভারতীয় বাংলা ভাষাভাষী রাষ্ট্র পশ্চিমবাংলা ও ত্রিপুরা বাংলাদেশের স্বপক্ষে দাড়িয়েছিল। একইভাবে শ্রীলঙ্কার তামিল উগ্রপন্থীরা প্রত্যক্ষ মদত পাচ্ছে তামিলনাড়ুর।

স্বজাত্য-রাজনৈতিক ভাবে ভারত প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে নানাভাবে মিথস্ক্রিয়ায় আবদ্ধ। ভারত পাকিস্তানের মধ্যে অনুপ্রবেশ জাতীয় সমস্যা আজ আর বিশেষ নেই। সাম্প্রদায়িকতার বিষময় ফল উভয় দেশের মণিকোঠায় চিরস্থায়ী থাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কোন দেশে হলে অপর দেশটি সহানুভূতিশীল মনোভাবের বহিপ্রকাশ ঘটায়।

ভারত ও নেপালের মধ্যে সমস্যা আছে দুটি। একটি হল দুদেশের হিন্দী ভাষাভাষী মানুষদের নিয়ে অপরটি দেশের মানুষের এক দেশ থেকে অপর দেশে অবাধে যাওয়াকে কেন্দ্র করে। ভূটানের জাতিগত বিরোধ ড্রুকপা (Drukas = Bhutias + Lepchas) এবং নেপালীদের মধ্যে। ভূটানে বসবাসকারী নেপালীদের ভূটানের প্রতি নয় দুর্বলতা রয়েছে ভারতের প্রতি। এছাড়াও ভূটানে রয়েছে বাঙালী, আসামী ও মারোয়ারী, ড্রকপা রাজতন্ত্র যাদের আনুগত্য আরও বেশীমাত্রায় দাবি করে।

ভারত বাংলাদেশ স্বজাত্য রাজনৈতিক বিবাদের সূত্রপাত বাংলাদেশ সৃষ্টির সময় থেকে। মুসলমান ও হিন্দু দুধরনের বাঙালীরাই একদা জনবিরল আসামে অনুপ্রবেশ ঘটাতে থাকে। ১৯৫০ ও ১৯৬০ এর দশকে মুসলমান বাঙালীদের অনুপ্রবেশ ব্যাপক মাত্রায় হয়েছে, এমনকি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সৃষ্টির পরও এই অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়নি। আশির দশকের প্রথম থেকেই অসমীয়া যুব সম্প্রদায়ের একটি গোষ্ঠী এই সকল অনুপ্রবেশকারীর ভোটাধিকার বাতিল করে তাদেরকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাবার দাবি তুলেছে, যেহেতু তারাই বর্তমানে সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ দাবি করছে আসামে এমন কিছু বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ ঘটেনি তাই তাদের দায়িত্ব তার নেবার কোন প্রশ্ন নেই। ১৯৮৩ সালে বাংলা দেশের আপত্তি সত্ত্বেও ভারত-আসাম অঞ্চলের ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর কাঁটা তারের বেড়া দেবার কথা ঘোষণা করে। ১৯৮৫ সালের আগষ্ট মাসে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধী আসামের আন্দোলনকারীদের সঙ্গে একটা চুক্তি সম্পাদন করেন যার ফলে আসাম শান্ত হয় ঠিকই কিন্তু সমস্যার সমাধান আজও ঠিকমত হয়নি।

ভারত শ্রীলঙ্কার সাথেও স্বজাত্য রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত। ১৯৮৩ সালের আগস্ট মাসে শ্রীলঙ্কার তামিল সংখ্যালঘু এবং সিংহলীদের মধ্যে দাঙ্গা বাধে এবং ভারতীয় তামিলদের সাথে শ্রীলঙ্কার তামিলদের সাংস্কৃতিক যোগসূত্র থাকায় জাফনার তামিলরা ভারতীয় তামিলদের সহযোগিতা প্রার্থনা কের। শ্রীলঙ্কার তামিল উগ্রপন্থী সংগঠন TULF তামিলনাড়ুতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে এবং সেখান থেকেই তাদের সংগঠনের কার্যকলাপ চালাতে থাকে। এরপর তারা ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সাহায্য চায় এবং শ্রীলঙ্কায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ভূমিকার পুনরাবৃত্তি কামনা করে। তামিলনাড়ুর AIADMK শ্রীলঙ্কায় তামিলদের স্বাধীনতা সংগ্রাম 'Eelam' এর জন্য ভারতীয় সেনার সহায়তা দানের প্রশ্নে সমর্থন যোগায়। ভারত-শ্রীলঙ্কার ঐক্য ও অখন্ডতার প্রশ্নে হস্তক্ষেপ না করবার সিদ্ধান্ত নেয়। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী কোন দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারত হস্তক্ষেপ করবে না একথা ঘোষণা করেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর রাজীব গান্ধী ক্ষমতায় আসার পর পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধনের অনুরোধে তিনি সেদেশে ভারতীয় সেনা (IPKF) প্রেরণ করেন ঐক্য ও সংহতি আনার স্বার্থে। ভারতীয়

সেনারা সেকাজ করতে গিয়ে তামিল জঙ্গী (LTTE) দের আক্রমণ করতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ TULF সেজন্য ভারতীয় সেনার সাহায্য চেয়েছিল, ভারতীয় সেনারা সেদেশে গিয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত ভূমিকা পালন করে। ফলে শ্রীলঙ্কার তামিলদের সাথে ভারতীয়দের সম্পর্ক খুব খারাপ হয়ে যায় এবং মনে করা হয় ঐ ঘটনা রাজীব গান্ধী হত্যাকান্ডের মূল কারণ।

সংক্ষেপে বলা যায়, দক্ষিণ এশিয়ার আটটি দেশের মধ্যে সাতটি দেশেই রয়েছে আন্তঃ রাষ্ট্র স্বজাত্য রাজনৈতিক সমস্যা যা এই দেশগুলির উত্তেজনা ও সমস্যার মূল কারণ। একমাত্র মালদ্বীপ এই সমস্যা থেকে মুক্ত সম্ভবতঃ এই দেশগুলি থেকে দূরে সমুদ্রবেষ্টিত অবস্থানের এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সংস্কৃতি সম্পন্ন হবার কারণে। ভারতের যে পাঁচটি দেশের সাথে সীমানা রয়েছে তাদের প্রত্যেকের সাথেই কোন না কোন বিষয়ে মনোমালিন্য রয়েছে। আফগান-পাক সম্পর্ক পুস্তুনিস্তানকে কেন্দ্র করে ক্রমাগত অবনতি হচ্ছে। নেপাল ও ভূটানের মধ্যেও দ্বন্দ্ব বিরাজমান। এমনকি পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে হাজারো মাইলের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও তাদের সম্পর্কও স্বজাত্য রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের দ্বারা প্রভাবিত।

Further Readings :

1. Sengupta, B., *South Asian Perspective.*

Exercise - 4

(a) Essay Type Questions :

1. "Significant differences among the major South Asian States have been reflected in the weakness of the SAARC." — Elaborate.
2. Analyse the impediments to the successful working of the SAARC.
3. Critically analyse the issue of ethnic conflict in South Asia.
4. Do you think that most of the problems faced by the South Asian countries are the out come of colonial rule ? Give reasons for your answer.

(b) Short-Answer Type Questions :

1 Briefly mention some of the political difficulties afflicting the SAARC.
2. Mention three weaknesses in the SAARC charter.
3. Do you agree with the view that the problem of asymmetry has been the major weakness of the SAARC ? Give reasons.